পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ড. শান্তিকুমার দাশগুপ্ত
ও
নির্মলনারায়ণ গুপ্ত

রত্নাবলী/ ৩৯এ, বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র ১৩৭২ / সেপ্টেম্বর ১৯৬৫

প্রকাশক
এস. চট্টোপাধ্যায়
রত্নাবলী
৫৯এ, বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক
স্টার এন্টারপ্রাইজ
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মানবিক মূল্যবোধের স্মরণে

নিবেদন

প্রায় আড়াই বছর আগে ভ্রাতৃপ্রতিম করবীবরণ মুখোপাধ্যায় আমাকে চৈতন্যদেবের জীবনী নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করতে অনুরোধ করেন। তিনি জানতেন যে, চৈতন্য দেবকে আমি শুধু সন্ন্যাসী ব'লেই মনে করি না : তিনি একাধারে সমাজ সংস্কারক, অর্থনীতিবিদ এবং রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন একটি ব্যক্তিত্বও বটে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ তাঁকে কুক্ষিগত করার চেষ্টা করলেও তিনি সমস্ত গণ্ডীর ঊর্ধ্বে। বাল্যকাল থেকেই আমরা ঊর্ধ্ববাহু রুগ্ন দেহ গৌর-নিতাইয়ের নৃত্যরত মূর্তি দেখেছি : কিন্তু তাঁরা দু'জনেই ছিলেন ছ'ফুট দীর্ঘ বৃষস্কন্ধ সিংহগ্রীব ব্যক্তিত্ব। সমস্ত দিক দিয়েই আমরা তাঁদের খর্ব করেছি। তাই সাধ্যমত চৈতন্যদেবকে আবিষ্কার করার সাধনায় মগ্ন হয়েছিলাম।

আমার এ কার্যে সাধ্যমত গ্রন্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন অধ্যাপক ড. বিষ্ণু বসু, ভগিনী অধ্যাপিকা কৃষ্ণা কুণ্ডু এবং জামাতা অধ্যাপক নীরদবরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রায় দু'বছর পড়াশুনা ক'রে এবং লিখে বুঝলাম যে, আরও বছর খানেক সময় চলে যাবে লেখা শেষ করতে। তখন আমার প্রিয় ছাত্র নির্মলনারায়ণ গুপ্তকে আহ্বান করলাম আমাকে সাহায্য করার জন্যে। শ্রীমান নির্মল বহু দিন ধরে চৈতন্যদেব সম্বন্ধে গবেষণায় রত। সুতরাং তার সাহায্যে গ্রন্থ দ্রুত সমাপ্ত হলো তাই নয়, উৎকর্ষ লাভও করলো।

অধ্যাপক ধ্রুব মুখোপাধ্যায় নিয়ে গেলেন 'রত্নাবলী'র স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সুনীল ভট্টাচার্য মশায়ের কাছে। সাহসী শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব নিলেন। এ'রা দু'জনেই আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

দ্রুতগতিতে গ্রন্থটি ছাপা চলছিল—তার সঙ্গে তাল রেখে প্রুফ দেখা খুবই কঠিন কাজ—রাত্রি জাগরণ অবশ্যম্ভাবী। এই কার্যে শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য ও শ্রীমান নির্মলের সহযোগী হয়েছে আমার পুত্র পার্থসারথি দাশগুপ্ত। এদের অক্লান্ত পরিশ্রম গ্রন্থখানিকে যতদূর সম্ভব ত্রুটি মুক্ত করবে।

ব্লকের জন্যে দুখানি ছবি দিয়ে কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন শ্রীযুক্ত করবীবরণ মুখোপাধ্যায়। অসম্ভব দ্রুততর সঙ্গে ব্লক তৈরি ক'রে এবং ছবি ছেপে দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন রিপ্রোডাকসন সিণ্ডিকেটের স্বত্বাধিকারী আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সৌরীন দাশগুপ্ত।

শান্তিকুমার দাশগুপ্ত

প্রাক্‌কথন

১৪৮৬ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারী পূর্ণিমার সন্ধ্যায় নবদ্বীপে শচী মায়ের কোলে যে মহামানবের জন্ম হয়েছিল, সেই শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পঞ্চশত বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বর্তমানে দেশব্যাপী নানা উৎসব-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হচ্ছে এবং চৈতন্যের জীবনকর্ম সম্পর্কে নানা গ্রন্থও প্রকাশিত হচ্ছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, কি উৎসব-অনুষ্ঠানে, কি গ্রন্থ রচনায়, অধিকাংশই চলেছেন ধর্মীয় বা সম্প্রদায়গত অনুশাসন মেনে, প্রথাবদ্ধ পথে। কোথাও গৌরকৃষ্ণ-সমীকরণজাত আরাধনা চলেছে নববারিব্যাপী নবকুঞ্জ রচনার মধ্য দিয়ে, কোথাও চলেছে নৃত্যগীত প্রমত্ত ভক্তি বিহ্বল নরনারীর শোভাযাত্রা; এর মধ্যে চাপা পড়ে যায় ইতিহাসের কথা, মানুষ গৌরাঙ্গের কথা।

অথচ একালে প্রয়োজন অভ্যাসের অন্ধ অনুবর্তন নয়, তথ্য সংগ্রহ ও যুক্তি বিশ্লেষণের মাধ্যমে অতীতের বাস্তব চেহারাটির আবিষ্কার। আজ প্রয়োজন পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে শ্রীচৈতন্যের একান্তভাবে বাস্তব ও মানবিক ক্রিয়াকলাপের মূল্যায়ন। সৌভাগ্যের কথা, সেকালের রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পরিপ্রেক্ষিতের ঐতিহাসিক সূত্রগুলি আজও লুপ্ত হয় নি। এগুলির সঙ্গে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে রচিত চৈতন্যচরিত গ্রন্থগুলিতে প্রাপ্ত তথ্যগুলি মিলিয়ে নিলেই চমকপ্রদ ফল পাওয়া যায়। অন্ততঃ দেব মহিমার ধোঁয়াটে পরিমণ্ডলের বাইরে, বাস্তবের মানুষ, সামাজিক মানুষ, এমন কি রাজনীতি-সচেতন মানুষ চৈতন্যের আমরা সাক্ষাৎ পাই।

চৈতন্য-জীবনীগ্রন্থগুলির কোন একটির মধ্যে সেই বিরাট ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক পরিচয় নেই। তাছাড়া চৈতন্যচরিত গ্রন্থগুলিতে যে-সব তথ্য পাওয়া যায়, সেগুলি ষোল আনাই খাঁটি এ কথা বলা চলে না। কতটা খাঁটি, কতটা ভেজাল বা প্রক্ষিপ্ত, তা বিচারসাপেক্ষ। তা ছাড়া, অধিকাংশ প্রাচীন পুঁথির উপর পরবর্তীকালের স্থূল হস্তাবলেপ ঘটেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। চৈতন্য-পার্ষদ ও অনুগামীদের মধ্যে শাখা সম্প্রদায়গত নানা কোন্দল যে দেখা দিয়েছিল, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে—এবং সেক্ষেত্রে তাঁদের হাতে ন্যস্ত চৈতন্যচরিতের প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলি অক্ষত ছিল, এ কথা মনে করার কোন যুক্তি নেই। বরং সঙ্গতভাবে মনে করা চলে, চৈতন্যভাগবতের আকস্মিক পরিসমাপ্তি, চৈতন্য তিরোভাব সম্পর্কে চরিত গ্রন্থগুলির নীরবতা, চৈতন্যের জীবনকর্ম সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী তথ্য পরিবেশন—এ সবের মূলে আছে চৈতন্যচরিতের পাণ্ডুলিপিগুলিতে ইচ্ছাকৃত ভাবে তথ্যের বিকার ও বিলোপ সাধন। একালের পাঠককে তাই যুক্তিপ্রয়োগ ক'রে প্রদত্ত তথ্যের সত্যাসত্য বিচার করতে হবে।

যুক্তিবাদীর দৃষ্টিতে চৈতন্যচরিত গ্রন্থগুলির অসম্পূর্ণতা ও অবাস্তবতা চোখে না পড়ে পারে না। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতাদের অধিকাংশের মতে কৃষ্ণদাস

কবিরাজ প্রণীত 'চৈতন্যচরিতামৃত' চৈতন্যচরিত কাব্যগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ :—"চৈতন্য চরিত হিসাবে কি ঐতিহাসিকত্ব, কি রসজ্ঞতা, কি দার্শনিক তত্ত্ববিচার, সব দিক দিয়া চৈতন্য চরিতামৃত শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ।" বৈষ্ণব সাহিত্য বিশেষজ্ঞ ড. বিমানবিহারী মজুমদার এই উক্তি উদ্ধৃত ক'রে লিখেছেন—"এইরূপ উক্তি দেখিয়া সত্য সত্য কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য যে কতদূর তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। এই বিচারে দেখা গেল কৃষ্ণদাস কবিরাজের অলৌকিক ঘটনা বর্ণনার প্রতি ঝোঁক অত্যন্ত বেশি। তিনি পূর্ববর্তী কোন গ্রন্থ অনুসরণ করিতে করিতে সহসা তাহার আনুগত্য ছাড়িয়া অলৌকিক ঘটনার সন্নিবেশ করিয়াছেন ; যথা—আদিলীলায় আম্রভক্ষণ লীলা ; মধ্যলীলায় বৌদ্ধ পণ্ডিতের মাথা কাটা যাওয়া ও পুনরুজ্জীবন, কাশী মিশ্র ও প্রতাপরুদ্রকে চতুর্ভুজ মূর্তি বা ঐশ্বর্য দেখানো, রথাগ্রে কীর্তন করিতে করিতে এক কালে সাতটি সম্প্রদায়ে উপস্থিতি, যে রথ মত্ত হস্তী টানিতে পারিত না তাহা শ্রীচৈতন্য কর্তৃক চালানো, আবির্ভাব রূপে শচীর অন্ন খাওয়া, কৃষ্ণনাম কহিয়া অমোঘের বিসূচিকা আরাম করা, বৃন্দাবনের পথে যাইতে যাইতে বাঘ-হরিণকে একসঙ্গে হরিনাম বলানো ; অন্ত্যলীলায় ভাবাবেশে শ্রীচৈতন্যের এক একখানি হাত দেড়গজ দীর্ঘ হওয়া, তিন দ্বারে কপাট লাগানো সত্ত্বেও প্রভুর বাহির হইয়া যাওয়া প্রভৃতি"।

[শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান : পৃ. ৩৯৪]

এই সব অলৌকিক ঘটনা সমাবেশ অধিকাংশ চৈতন্যচরিতের ঐতিহাসিক ভিত্তি দুর্বল ক'রে দিয়েছে।

অবশ্য অ-লৌকিক হলেই তা অবাস্তব এমন কথা আমরা বলি না। চৈতন্য দেহে মনে বড় মাপের মানুষ ছিলেন, অলোকসামান্য ছিল তাঁর প্রতিভা। অলৌকিকের যে অংশ অতিলৌকিক, তা লোকোত্তর ; কিন্তু অবাস্তব নয়। কিন্তু অলৌকিকের যে অংশ অলীক, তা অবাস্তব কল্পনাবিলাস মাত্র, যুক্তি বিচারে তা কখনও গ্রহণ করা চলে না।

চৈতন্য চরিত্রের যে লোকোত্তর মহিমা, তা এসেছে মানবচরিত্রের বিকাশের ধারাপথে। বুদ্ধ-চৈতন্য-রামকৃষ্ণ—তিন জনকেই আমরা 'দেব' অভিধা দিয়েছি—কিন্তু তাঁরা কেউই সুরলোকবিহারী ছিলেন না, এ অভিধা তাঁদের লোকোত্তরতার স্বীকৃতি মাত্র।

আমরা অবতার ছেড়ে মহামানব যুগন্ধর পুরুষ চৈতন্যদেবের মহতী কর্মপ্রচেষ্টাকে অনুধাবন করতে চাই। দুই বাহু তুলে নৃত্যরত গৌর নিতাইয়ের যে চিত্র দেখতে আমরা অভ্যস্ত, সেই চিত্র আমাদের চিত্তকে বিভ্রান্ত করেছে—সেই বিরাট দেহী তেজস্বী মানুষটিকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি। বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ বাঙ্গালীকে আচ্ছন্ন করেছে—কিন্তু যে শ্রীকৃষ্ণ হেলায় কংসবধ করেছিলেন, মহাভারতের সেই রাজনীতিদক্ষ উর্জ্জশির শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ না করলে অর্ধেক শ্রীকৃষ্ণকে জানা হবে। আমরা অর্ধেক চৈতন্যকে জানতে চাইনা। পরিপূর্ণ মানুষটিকে জানাই সত্য জানা।

বীর্যবান মহামানব চৈতন্যদেব সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ যা বলেছিলেন, সে কথা এখানে স্মরণ করি—"একবার মাত্র এক মহতী প্রতিভা সেই 'অবিচ্ছিন্ন অবিচ্ছেদক' জাল ছেদন করিয়া উত্থিত হইয়াছিলেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। একবার মাত্র বঙ্গের আধ্যাত্মিক তন্দ্রা ভাঙ্গিয়াছিল। কিছুদিনের জন্য উহা ভারতের অপরাপর প্রদেশের ধর্ম জীবনের সহভাগী হইয়াছিল।"

এই আধ্যাত্মিক তন্দ্রা ভাঙ্গাবার জন্য বিধর্মী রাজশক্তির ধর্মের উপর আক্রমণকেও প্রতিহত করার প্রচেষ্টা চালাতে হয়েছে সেই মহামানবকে। মুসলমান রাজশক্তির

অনাচারের সঙ্গে মুসলমান সুফীদের প্রেমপ্রচার, হিন্দু মুসলমানে ঐক্য স্থাপনের প্রাণপাত প্রচেষ্টা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। ধর্মে ধর্মে বিরোধ নেই, মানুষে মানুষে বিরোধ নেই, বিরোধ সৃষ্টি করে শক্তির দম্ভ এবং তারই উস্কানি। এই শিক্ষাকে সামনে রেখে কর্মে অবতীর্ণ হয়েছিলেন শ্রীচৈতন্য।

সে বিষয়ে কিছু ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করা হল এই গ্রন্থে। ভবিষ্যৎ গবেষকরা সত্যের অনুসন্ধান করবেন, এই আমাদের বিশ্বাস। সে যুগ ভারতের গৌরবের যুগ—উত্তর ভারত এবং পাঞ্জাবে রামানন্দ, কবীর, নানক, রবিদাস, দাদু, রজ্জব, মীরাবাঈ প্রভৃতি, বঙ্গে শ্রীচৈতন্য, আসামে শঙ্করদেব যে ধ্বনি তুলেছিলেন, তা মানবতা প্রতিষ্ঠার ধ্বনি, ঐক্যের ধ্বনি—ভারতের জনচিত্ত উদ্বুদ্ধ করার ধ্বনি। ভারত ব্যাপী সেই ধ্বনির স্পষ্টরূপ আবিষ্কার করার দায়িত্ব গবেষকদের—এ দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া মহাপাপ।

শান্তিকুমার দাশগুপ্ত
নির্মলনারায়ণ গুপ্ত

সূচীপত্র



হরিদাসের তনু প্রভু কোলে উঠাইয়া।
অঙ্গনে নাচেন প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা॥

১· চৈতন্য-আবির্ভাব ও পরিবেশ

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সমকালীন পৃথিবীর ধর্মজগতে নূতন জাগরণ দেখা দিয়েছিল। খ্রীস্টধর্মে তখন নানা কুসংস্কার অনুপ্রবেশ করেছে—ধর্মগুরু হিসেবে পোপের অখণ্ড প্রতাপ তাঁর স্বৈরতন্ত্রী মনোভাবের প্রকাশ ঘটাচ্ছিল। ধর্মজগতের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করলেন সুইডেনের ডেসিডেরিয়াস ইরেসমাস (Desiderius Erasmus-1466 ?-1536)। তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান ধর্মসংস্কারক। যুগে যুগে ধর্মের মধ্যে অনেক কুসংস্কার, অনেক মিথ্যা আলৌকিকত্বের কথা অনুপ্রবেশ করে। সেই সব ঐতিহ্যরূপী মিথ্যাকে দূর করার জন্য তাঁর লেখনীতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা দিল—বাইবেলের মূল বক্তব্যের দিকে তিনি দৃষ্টি ফেরাতে বললেন। জার্মান ধর্মসংস্কারক লুথারকে তিনি বিশেষ ভাবে সমর্থন করেন। অনেকে মনে করেন যে, ইরেসমাস ডিমটি পাড়েন এবং তাতে তা দিয়ে ফোটান লুথার অর্থাৎ সংস্কারের ভাবনাটি প্রথমে প্রকাশ করেন ইরেসমাস এবং তাঁরই ভাবনাকে রূপায়িত করেন লুথার।

ইরেসমাস ইংলণ্ডে গিয়ে টমাস মোর (Thomas More) এবং কেলেট-এর (Calet) সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন। তাঁর লেখা 'বোকামির প্রশংসা' বইতে তিনি পুরোহিতদের অনাচার এবং মানুষের বোকামির পরিচয় দেন। নিজে বহুদিন পুরোহিত ছিলেন বলেই এ গ্রন্থ রচনা তাঁর পক্ষে সহজতর হয়েছিল। খ্রীস্টধর্মের গ্রন্থ 'নিউ টেস্টামেণ্টের' এক সংস্করণ প্রকাশ করে তিনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন—বাইবেলের সমালোচনায় তিনিই ছিলেন পুরোধা। তিনি প্রচলিত ধর্মব্যবস্থাকে আক্রমণ করে এক গ্রন্থ রচনা করেন (ম্যানুয়েল অব দি ক্রিশ্চিয়ান সোলজার)—সমকালীন পুরোহিত এবং অন্যান্যদের মতামতকে তীব্র সমালোচনা করে রচনা করেন ধারাবাহিক গ্রন্থ 'কোলো-কুইয়া' (Colloquia)।

কথিত আছে যে, প্রতিবাদী ধর্মসংস্কারের (Protestant Reformation) জনক মার্টিন লুথার (Martin Luther . 1483-1546) বলেছিলেন, "এই আমার অভিমত, আর কিছুই আমি করতে পারি না, ভগবান আমার সহায় হোন, আমেন।" সেটা ১৫২১ খ্রীস্টাব্দে—এই সময় মহাপ্রভু নীলাচলে, অর্থাৎ পর্যটকের কাজ, নতুন মানব-ধর্মের চিন্তায় মানুষকে জাগ্রত করার কাজে নিজের দায়িত্ব সম্পূর্ণ করে জগন্নাথের সচল বিগ্রহ রূপে উদ্বুদ্ধ করছেন সকলকে।

রোমান ক্যাথলিক ধর্মের অনুশাসনে তখন জার্মানরা উত্যক্ত হয়েছিলেন—তাই শতকরা ৯০ জনেরও বেশী সাধারণ মানুষ সংস্কারক পাদ্রী লুথারের অনুগামী হয়েছিলেন। সম্রাট তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন, তাঁর গ্রন্থরাজিকে পুড়িয়ে ফেলার আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু কোনটাই করা সম্ভব হয় নি জনসমর্থনের চাপে।

এ দেশের দুর্ভাগ্য যে, প্রচুর জনসমর্থন সত্ত্বেও তার চাপ প্রায় কোন বিষয়েই উপলব্ধি করা যায় না।

লুথারের কৃষক পরিবারে জন্ম, এক সময় তাঁকে গান গেয়ে ভিক্ষা করতে হয়েছে। শ্রমশীল পিতার প্রেরণায় এবং নিজের চেষ্টায় তিনি আগস্টেনিয়ান চার্চে ভর্তি হন এবং ধর্ম শিক্ষা করে উইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই রোমে যান প্রচারের কাজে। তিনি পোপের বক্তব্যসমূহের প্রকাশ্য বিরোধিতা আরম্ভ করেন—দেশে ভয়ানক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ঠিক একই সময়ে চৈতন্যদেবের চিন্তা এবং কার্যাবলীও এ দেশে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

চার্চের বিধি-বিধানের এক খণ্ড পুস্তিকা পুড়িয়ে ফেলে তিনি জেহাদ ঘোষণা করেন। শেষ জীবন তিনি অতিবাহিত করেন লিখে, প্রচার করে এবং প্রোটেস্টান্ট চার্চ প্রতিষ্ঠার কাজ করে।

প্রোটেস্টান্টদের মধ্যেও নানা গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল। সব দেশেই নতুন পুরাতন সব ধর্মেই গোষ্ঠী তৈরী হয়ে যায়। বৈষ্ণব ধর্মেও অনেক গোষ্ঠী আছে। মানুষের চিন্তা নব নব সৃষ্টি করে, তাই এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

সুইজারল্যাণ্ডে প্রোটেষ্টান্টদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন উলরিস জিউইনাগ্‌ল (Ulrich Zwingli : 1484-1531)। তিনি বিশেষ করে শহরে অনেক শিক্ষিত মানুষকে নিজ ধর্মের আওতায় আনেন।

উলরিসের কাজ এগিয়ে নিয়ে যান জন কেলভিন (John Calvin : 1509-64)। ১৫৩৬ খ্রীস্টাব্দে শ্রান্তক্লান্ত অবস্থায় কেলভিন জেনেভায় এসে হাজির হন। তাঁর আগমন-বার্তা পেয়ে জেনেভার প্রোটেস্টান্ট চার্চের পুরোহিত তাঁকে জেনেভায় থেকে যেতে বলেন। সমস্ত সুইজারল্যাণ্ডকে তিনি প্রোটেস্টান্ট ধর্ম পরিচালিত রাষ্ট্রে পরিণত করতে অনুরোধ করেন।

কেলভিন ছিলেন ফরাসী দেশীয় পুরোহিত কিন্তু রোমান ক্যাথলিক মতবাদের বিরোধিতা করায় তিনি সেখান থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হন। সুইজারল্যাণ্ড তখন স্বাধীন রাজ্য এবং প্রোটেস্টান্ট ধর্মমতাবলম্বী। ধর্মমতের বিরোধ সর্বত্রই। এদেশেও মুসলমান সম্রাট-বাদশারা কম ধর্মমন্দির ভাঙ্গেন নি, লুণ্ঠন করেন নি। সাধু-সন্তদেরও তখন শান্তিতে বাস করা সব সময়ে সম্ভব হয় নি। চৈতন্যদেবের সময়েও এই মঠ-মন্দির ভাঙ্গার কাজ অব্যাহত ছিল। চৈতন্যদেবের ওপর কি তার কোন প্রভাবই পড়ে নি ?

নিজের চিন্তার অনুসরণে সুইজারল্যাণ্ডকে প্রোটেস্টান্ট ধর্মের আওতায় সুন্দর রূপ দানের উদ্দেশ্যে কেলভিন সে দেশে রয়ে গেলেন। জগন্নাথদেবের প্রভাবে প্রভাবিত বৈষ্ণবদের দেশে থাকার পেছনে কি মহাপ্রভুরও সে ধরনের কোন মনোভাব কাজ করেছিল ?

১৫৩৬ খ্রীস্টাব্দে কেলভিনের অপূর্ব গ্রন্থ 'দি ইনস্টিটিউটস্ অব দি ক্রিশ্চিয়ান রিলিজিয়ন' প্রকাশিত হয়। কেলভিনের মতবাদ স্কটল্যাণ্ডে বিশেষ প্রতিষ্ঠা পায়।

জেনেভা কেলভিনের শহর বলে পরিচিত হয়—'প্রোটেস্টান্টদের রোম' বলে তার খ্যাতি ছড়ায়।

ভারতের সন্ত কবীর (আনুমানিক ১৪৪০ ১৫১৮)। কবীরদাসের জন্ম কাশীতে। কথিত আছে যে, তিনি বিধবার গর্ভজাত বলে পরিত্যক্ত হলে নিরু নামে এক মুসলমান জোলা তাঁকে পালন করে। শৈশব থেকেই তিনি সাধনা আরম্ভ করেন। তিনি মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক রামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন. পরে তিনি বহু দেশ ভ্রমণ করেন।

তিনি লেখাপড়া না জানলেও স্বভাব-কবি ছিলেন। সুফী,বৈদান্তিক প্রভৃতির সংস্পর্শে এসে তিনি তাঁর দার্শনিক ধ্যান-ধারণা গঠন করেন। তাঁর জ্ঞান, ভক্তি, নিষ্ঠা, সদাচার ও রামনাম কীর্তনের কথা প্রচারিত হওয়ার পর বহু হিন্দু ও মুসলমান তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের কাল থেকেই ভারতে নামকীর্তনের প্রাধান্য দেখা দেয়। কবীর হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেন এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক রীতি-নীতি ও সংস্কারের বিরোধিতা করায় তিনি উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মান্ধ ব্যক্তিদের অপ্রীতিভাজন হন। কবীরের বাণী সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের মধ্যেই বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়েছিল।

'পরমাত্মা এক' এই সত্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মিলন সাধনই ছিল কবীরের লক্ষ্য। অদ্বৈতবাদ এবং ইসলামের একেশ্বরবাদের সূক্ষ্ম পার্থক্য বিচারের চেষ্টা না করে দুয়ের মিশ্রণে তিনি তাঁর 'ভক্তিপন্থ' গড়ে তোলেন। রাম-রহিম, আল্লা-হরিকে তিনি এক বলে প্রচার করেছেন। বৈষ্ণব রামানন্দ স্বামীর প্রধান দ্বাদশ শিষ্যের অন্যতম ছিলেন তিনি, তাই বৈষ্ণবদের প্রতি তাঁর বিশেষ প্রীতি লক্ষ্য করা গেলেও ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের দিক দিয়ে কবীরপন্থীরা কারও প্রভাব স্বীকার করেন না। সন্ন্যাসী কবীরপন্থীরা কবীরেরই ভজন করেন। সংগীতই তাঁদের উপাসনা।

কবীরের অনুসরণে উত্তর ভারতে সন্ত সাহিত্য গড়ে উঠেছে। কবীরের কাল থেকে আরম্ভ করে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই ধারার প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়। সন্ত কবিদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, একদিকে যেমন তাঁরা ঈশ্বরের নাম ও গুরুর মহিমা কীর্তন করেছেন, অন্যদিকে আবার জাত-পাতের ভেদ-ভাব দূরে রেখে মূর্তিপূজা, অবতারবাদ ও কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করেছেন। সুতরাং এই অঞ্চলে জাতপাতের বিরোধিতার বিগ্রহ স্বরূপ মহাপ্রভুর উপস্থিতি বিশেষ কার্যকর হয়েছিল সন্দেহ নাই। উত্তর ভারতে কবীর-নানক-রৈদাস, ধরমদাস, দাদু, রজ্জব, মীরাবাঈ প্রভৃতি সন্তরা অনেকদিন ধরে আলোর রোশনাই জ্বালিয়েছেন, তাঁদের কেউ কেউ মহাপ্রভুর পূর্ববর্তী, কেউ কেউ সমকালীনও বটেন। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের আকাশে তখন অন্ধের অন্ধকার! সেখানেই কি সর্বপ্রথম মহাপ্রভুর পদরেণু পড়ার প্রয়োজন ছিল না?

১৪৮৫ খ্রীস্টাব্দে সপ্তম হেনরী ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসেন। রানী ক্যাথারিনের সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের বিষয়টি নিয়ে পোপ ক্লেমেন্ট-এর সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে এবং সেই সূত্রেই ধীরে ধীরে রোমের চার্চের থেকে ইংলণ্ডের চার্চ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই সপ্তম হেনরীর সিংহাসনে আরোহণের কাল থেকেই আরম্ভ হয় আধুনিক যুগ। ইউরোপীয়রা

ভারতবর্ষের সঙ্গে জলপথে সরাসরি যোগ স্থাপনের চেষ্টা আরম্ভ করে ১৪৮৭ খ্রীস্টাব্দ থেকেই। অবশেষে ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে পোর্তুগীজ-নাবিক ভাস্কো-দ-গামা কালিকট বন্দরে এসে পৌঁছান। এই পোর্তুগীজদের বিশেষ প্রভাব পড়ে দক্ষিণ ভারতে। 'শ্রীচৈতন্যদেব' গ্রন্থে শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সুন্দর করে বলেছেন, "১৫১৬ খ্রীস্টাব্দে পাশ্চাত্ত্য দেশে যখন Utopia (No-Where) নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া আদর্শ পার্থিব সমাজের কাল্পনিক চিত্র-প্রচার করিতেছিল সেই সময় ও তৎপূর্বেই শ্রীচৈতন্যদেব ঐকান্তিক পরমার্থের অনুগমনকারী আদর্শ-সমাজের বাস্তব-চিত্র বঙ্গদেশে প্রচার করিয়াছিলেন" (পঞ্চম সংস্করণ : পৃ. ৩৮)।

চৈতন্যদেব যখন নূতন সমাজ গঠনের কাজে এগিয়ে এলেন তখনকার এবং তার পূর্ববর্তী কালে বঙ্গদেশের সামাজিক, ধর্মনৈতিক, আর্থনীতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল নিশ্চিতরূপে তা বুঝে নেওয়া দরকার। চৈতন্যদেব কিসের ভিত্তিতে তাঁর চিন্তাকে সংহত করলেন? পরিবেশই তো মানুষকে পথের সন্ধান দেয় এবং অনেক সময় তাকে গড়েও তোলে।

বিষ্ণুভক্ত বর্মণ রাজারা বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন। অথচ রাঢ়-বঙ্গ গৌড়ে তখন বৌদ্ধের সংখ্যা কম নয়। সপ্তম শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর রামায়ণ-প্রণেতা রামানন্দ নিজেকে বুদ্ধদেবের অবতার বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন—দেশে বৌদ্ধের সংখ্যা অনেক না থাকলে এ চেষ্টার মূল্য কি? ধর্মমঙ্গলে বৌদ্ধমতেরই প্রাধান্য। ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরবর্তীকালে রচিত ধর্মমঙ্গলে অবশ্যই ব্রাহ্মণ্য প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বৌদ্ধদের সংখ্যা দেশে যখন এত অধিক তখন বৌদ্ধবিদ্বেষী রাজারা প্রতিষ্ঠা পেতেই পারেন না। এঁদের বৌদ্ধবিদ্বেষ এত অধিক পরিমাণে ছিল যে, বর্মণ রাজাদের অন্যতম মন্ত্রী ভবদেব ভট্ট, অগস্ত্য যেমন সমুদ্র শোষণ করেছিলেন, তেমনি তারা বৌদ্ধদের শোষণ করবেন বলে গর্ব করতেন।

ভবদেব ভট্টের 'প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে' দেখা যায় যে, রজক কর্মকার নট কৈবর্ত ভিল চণ্ডাল কাপালিক তক্ষণ স্বর্ণকার শৌণ্ডিক এবং পতিত ও নিষিদ্ধ বৃত্তিজীবী ব্রাহ্মণের ছোঁয়া বা রান্না যদি ব্রাহ্মণেরা খায় তবে তাদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। শূদ্রের রান্না ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য গ্রহণ করলেও প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। অথচ আশ্চর্যের কথা এই যে, শূদ্রের হাতের তৈল পক্ব বা দুগ্ধপক্ব খাদ্য ব্রাহ্মণের পক্ষে গ্রহণ নিষিদ্ধ নয়। এর জন্য অবশ্য সামান্য অনুতাপের বিধি আছে। আরও আশ্চর্যের কথা এই যে, ব্রাহ্মণের পক্ষে নিম্নবর্ণের স্ত্রী গ্রহণে কোন বাধা ছিল না।

পাল রাজাদের আমলে একটা মহৎ দিকের পরিচয় পাওয়া গেছে। তাঁরা বৌদ্ধ হলেও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতাও করতেন। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে কৈবর্তরাও উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পাল রাজাদের প্রেরণাতেই বঙ্গদেশে প্রথম সামাজিক সমন্বয়ের চেষ্টা হয়। সে সময় যে সমন্বিত সংস্কৃতি গড়ে ওঠে প্রকৃতপক্ষে তাকেই আমরা উত্তরকালের বাঙালীর সংস্কৃতি বলতে পারি। এই সমন্বয়ের প্রচেষ্টা বঙ্গের বৈশিষ্ট্য। সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা সহজ সুন্দর বোঝাপড়া করতে পেরেছিলেন বলেই বোধ হয় সকলের

সহযোগিতায় তাঁরা সুদীর্ঘ ৪০০ বছর রাজত্ব করতে পেরেছিলেন। এখানে এ কথাটাও মনে রাখতে হবে যে, পাল রাজারা ছিলেন খাঁটি বাঙালী। এ দেশে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছে অনেক পরে—তার আগে থেকেই এখানে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয়ের প্র চষ্টা চলছিল। পাল রাজাদের আমলের লিপিগুলোতে কৃষক-কর্ষকদের নাম, ডোমদের নামও পাওয়া গেছে।

জাতি বর্ণ প্রভৃতি নানা স্তরের ভেদ সৃষ্টি অনেক আগে থেকে আরম্ভ হলেও সেন-বর্মণ রাজাদের আমল থেকেই এই ভেদবিন্যাস দৃঢ় ও অনমনীয় হয়ে সমাজকে স্তরে-উপস্তরে বিভক্ত করে ফেলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তখনও দেশে এমন সব সাধকেরা ছিলেন যাঁরা মানুষে-মানুষে ভেদকে স্বীকার করতেন না। জাতিভেদ বর্ণভেদের অপদেবতা তাঁদের উদার মনের পবিত্রতাকে কলুষিত করতে পারে নি। মানব মহিমাকে তাঁরা প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছিলেন। ভাগবতধর্মী এবং সহজয়ানী সাধকেরা এই মহান আদর্শ উঁচে ধারণ ক'রে রেখেছিলেন।

সুতরাং এ কথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সে কালে সাধারণ মানুষের মন দোটানায় পড়েছিল—(১) রাজশক্তির পৃষ্ঠ-পোষকতায় জাতি-বর্ণে বিভক্ত সমাজকে ছিন্ন ভিন্ন ক'রে ফেলা এবং (২) সাধকদের পৃষ্ঠপোষকতায় মানুষে মানুষে মিলনের গ্রন্থি রচনা।

সেন-বর্মণ আমলে ভেদবুদ্ধি চরমে ওঠে। এই দুই বংশই বঙ্গের বাইরে থেকে আসা। ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের আওতায় বর্ধিত এই দুই বংশই বৌদ্ধ পালরাজাদের মানবতার বিরোধিতা করেছিলেন। "সমাজে ওই স্তরভেদ এবং স্তরে স্তরে আদান-প্রদানের বিচিত্র বিধি-নিষেধ নবগঠিত বাঙলার সমাজ ও বাঙালী জাতিকে দুর্বল ও পঙ্গু ক'রে দিয়েছিল নিশ্চয়ই। ··অব্রাহ্মণকে শিক্ষাদান এবং অব্রাহ্মণের যাগযজ্ঞ পূজা অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল" (নীহাররঞ্জন রায়: বাঙালীর ইতিহাস)।

আর্যেতর ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান এবং তন্ত্রের বিকৃতি তৎকালীন বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মে এবং স্বভাবতই তখনকার সমাজে প্রবিষ্ট হয়ে নানাপ্রকার ব্যভিচারে ব্যাধিগ্রস্ত করে তুলেছিল। তারই ফলে সমাজের সমস্ত স্তরে নানা ধরনের যৌনবিকৃতি দেখা দিয়েছিল। একাদশ-দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে এর বিশেষ প্রাবল্য লক্ষ্য করা যায় রামাবতী, বিজয়পুর এবং নবদ্বীপে। দ্বাদশ শতাব্দীর তাম্রশাসনগুলোতে নরনারীর প্রতি আসক্তির জয়গীতিও ঘোষিত হয়েছে। এক তাম্রশাসনে পাওয়া যায় যে, কলিঙ্গ রমণীদের প্রেমলাভ করেছিলেন বলে কবি লক্ষ্মণ সেনের প্রসংশা করেছেন। রাজসভায় যে বিকার দেখা দেয় তা যখন সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তখন তা আরও বিকট হয়। "বৌদ্ধধর্মের অবনতির সময় এ দেশে স্বেচ্ছাচারিতা ও ব্যভিচার প্রভৃতি দ্বারা সমাজ একান্তরূপে শিথিল ও উচ্ছৃংখল হইয়া পড়িয়াছিল। বামাচারী বৌদ্ধতান্ত্রিকগণ যে সমস্ত অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা নীতি ও ধর্মবিধ্বংসী। এই সময় ভৈরবীচক্র প্রভৃতি দ্বারা পুরুষও নৈতিক আদর্শ হইতে একান্তরূপে স্খলিত হইয়াছিলেন। অপরপক্ষে তান্ত্রিকগণের খাদ্যাখাদ্যের কোন বিচার ছিল না। বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে তান্ত্রিক দীক্ষা প্রচারিত হইয়া সমাজকে বীভৎস করিয়া তুলিয়াছিল। হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানে সর্ববিষয়ে এতদ্-

রূপ স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। ব্যভিচারের সংশোধনার্থ যে সংস্কারকর্ম আরব্ধ হইল তাহাতে 'আচারই' শ্রেষ্ঠ স্থান দখল করিল" (দীনেশচন্দ্র সেন : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)।

ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেন, "শ্রীধর দাসের 'সদুক্তি কর্ণামৃত' গ্রন্থে অবতার বিষয়ক শ্লোকাবলীর মধ্যে দশাবতারের উল্লেখই প্রধান এবং তাহার মধ্যে আবার কৃষ্ণাবতার সম্বন্ধে যাটটি শ্লোক। পরবর্তীকালে চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর বাংলার বিষ্ণুকৃষ্ণধর্মের যে রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি তাহার আদি সংস্কৃতিপুত রূপ এই শ্লোকাবলীর মধ্যেই নিবদ্ধ, এ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।" (বাঙালীর ইতিহাস)। এই শ্লোকাবলী লক্ষ্মণসেনের সভায় রচিত এবং গীত হয়।

ড রায় এই সূত্রে আরও বলেন, "হরিভক্তি বা স্তুতি সমৃদ্ধ 'সদুক্তি কর্ণামৃতে' অনেকগুলি শ্লোক আছে। কবি কুলশেখর রচিত একটি শ্লোক এবং আরও দুই একটি শ্লোকে বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম ও হৃদয়াবেগের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় ইহাদের মধ্যে যেন চৈতন্যোত্তর কালের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তি ও হৃদয়াবেগ প্রত্যক্ষ করিতেছি—

যানি ত্বচ্চরিতামৃতানি রশনা লেহ্যানি ধন্যাত্মনাং
যে বা শৈশব চাপলব্যতিকরা রাধানুবন্ধোন্মুখাঃ
যা বা ভাবিতবেণুগীত গতয়ো লীলামুখাম্ভোরুহে
ধারা বাহিতয়া বহন্তু হৃদয়ে তান্যেব তান্যেব মে॥"

[শ্লোকটির মূল ভাবে রাধাসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের শৈশবচাপল্য, রাধাভাবিত বেণুগীত ইত্যাদি দিব্যলীলার অমৃত ধারার পরম স্বাদুতায় ভক্তহৃদয়ের অনুরাগমুগ্ধতা ব্যক্ত হয়েছে।]

এই শ্লোক বুঝিয়ে দেয় যে, সমাজে অনাচার ব্যভিচার বর্ণভেদ এবং নানা প্রকার নিপীড়ন সত্ত্বেও চৈতন্যদেবের আগমনের পটভূমি প্রস্তুত হচ্ছিল। এ রকম একটা পরিবেশ না থাকলে অবতার বা মহামানবের অভ্যুদয় সম্ভব হয় না।

১২০২ খ্রীস্টাব্দে মুসলমান সৈন্য নদীয়া এবং লক্ষ্মণাবতী অধিকার ও লুণ্ঠন করে। বস্তুতপক্ষে বক্তিয়ার স্বাধীন নবাব হয়ে ওঠেন। তবে মুসলমান সৈন্য ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের পূর্বে পূর্ববঙ্গ অধিকার করতে পারে নি—ত্রয়োদশ শতাব্দী পার হয়ে যাবার পরে তারা দক্ষিণ বঙ্গ অধিকার করতে সক্ষম হয়।

মুসলমান রাজত্ব আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে দেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারও আরম্ভ হয়ে গেল। রাজশক্তি বুঝতে পারলো যে, হিন্দু অধ্যুষিত দেশে তাদের টিকে থাকতে হলে নিজ ধর্মমতে বিশ্বাসী লোক বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে। সুফী সাধকরা এ ব্যাপারে রাজশক্তির অনেক উপকার সাধন করেছেন। তাঁদের ভক্তিবাদ সহজেই হিন্দুর কাছে আদরণীয় হয়েছে। সুফীরা কোরান ও হাদীসের কিছু বিধি ও নির্দেশকে জীবনে প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন। তাঁদের কাছে প্রেমই ছিল প্রধান—"সুফী সাধনায় প্রেমের গুরুত্ব অপরিসীম। স্রষ্টা আর সৃষ্টির মধ্যে মিলনের সেতুই হল প্রেম। সুফী সাধকদের কাছে প্রেমই ধর্ম। সুফী তত্ত্বের বক্তব্য অনুযায়ী আল্লাহ্ প্রেমময়। তিনি সকলের একমাত্র প্রেমাস্পদ।

সবাই আমরা তাঁর প্রেমিক। সুফী তত্ত্বে প্রেম ও দয়া (রহমৎ) মূলতঃ একই অনুভূতির দুটি আলাদা নাম। সুফীর জীবনে তাই আল্লাহ্‌র প্রেম ও দয়াই প্রধান কাম্য।…এই প্রেমের জন্য সুফীরা আত্মবিসর্জনে উন্মুখ"। (মোবারক করিম জওহর : ভারতের সুফী : ভূমিকা)।

বঙ্গদেশে বিষ্ণুর উপাসনা ষষ্ঠ, সপ্তম শতাব্দী থেকে আরম্ভ হলেও 'সদুক্তি কর্ণামৃতে'র পূর্বে ভক্তি ও হৃদয়াবেগের তেমন পরিচয় ছিল না। 'সদুক্তি কর্ণামৃত' যেন রাজাদের সভায় গীত হতো : তাতে ভক্তি ও হৃদয়াবেগের যে পরিচয়ই থাক না কেন সেনবংশের আচার-আচরণে তার কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় নি। তাই সাধারণ মানুষ সেদিকে তেমন ভাবে আকৃষ্টও হয় নি। কিন্তু সুফীদের প্রেমভাব এবং ইসলামের গণতন্ত্র সাধারণ মানুষকে যথেষ্ট আকর্ষণ করে। সুফী শাহ জালাল 'বহু গুণমুগ্ধ ভক্তকে ইসলামে দীক্ষিত করেছিলেন' (তদেব, ভূমিকা, পৃ ৩)।

বঙ্গদেশে স্বাধীন সুলতানরা অনেকদিন রাজত্ব করেন। কিন্তু পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকে মুসলমান রাজবংশের অভ্যন্তরীণ কলহের সুযোগ নিয়ে রাজা গণেশ বঙ্গদেশ অধিকার করে নেন। ড রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন যে, বঙ্গদেশের (উত্তর বঙ্গ গৌড়ের) মুসলমান সমাজে এর ফলে যথেষ্ট উত্তেজনা দেখা দিল। তাঁদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, বঙ্গদেশের সিংহাসনে মুসলমান ব্যতীত আর কেউ বসবার অধিকারী নন। গণেশকে অপসারিত করার জন্য মুসলমান ধর্মনেতারা আন্দোলন আরম্ভ করলেন। গণেশকে বিশেষ শক্তিশালী দেখে তাঁরা বিদেশী নবাব ইব্রাহিম শা শারকীকে বঙ্গদেশ আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান।

ইব্রাহিমের সৈন্যদলকে গণেশ প্রতিরোধ করতে অসমর্থ হন। তাঁর পুত্র যদু শত্রু পক্ষে যোগ দেন। ইব্রাহিম তাঁকে ধর্মান্তরিত করে সিংহাসনে বসিয়ে যান ১৪১৫-১৬ খ্রীস্টাব্দে।

হিন্দু ও বৌদ্ধরা তখন নানা কারণে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ড. দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন যে, ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু পরবর্তীকালেও এই ধর্মান্তর যে অব্যাহত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রধানত তিনটি কারণে এ দেশের মানুষ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন : (১) সুফীদের প্রেম ভক্তি এবং ইসলামের গণতন্ত্র যা সে যুগে হিন্দুসমাজে দেখা যায় নি—তার আকর্ষণে, (২) রাজশক্তির ধর্মগ্রহণের ফলে সুযোগ-সুবিধা লাভের আশায় এবং (৩) জবরদস্তির শিকার হয়ে। গোমাংস খাইয়ে দিয়ে, মুখে কুলকুচি করে জল দিয়ে (যা পরবর্তী কালে কবিকঙ্কন মুকুন্দের লেখাতেও পাওয়া যায়) হিন্দুদের জাতিনাশ করা হত।

শোনা যায়, রাজা গণেশ অন্যান্য হিন্দু রাজার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাতে সফল হন নি।

জালালউদ্দীনের পর বঙ্গদেশে রাজত্ব করে মহম্মদ শাহী বংশ এবং হাবসী খোজারা এই সময় বিরোধ-হত্যার রাজনীতি চলে—দেশে চরম অরাজকতা দেখা দেয়। হাবসী খোজারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে যথেচ্ছচার শুরু করেছিল। পরবর্তী সুলতান আলা-

উদ্দীন হুসেন শা হাবসীদের বঙ্গদেশ থেকে বিতাড়িত করেন। হুসেন শা ১৪৯৯ থেকে ১৫১৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে তিনি সক্ষম হন।

হুসেন শা বিভিন্ন দেশ আক্রমণ করেন, তার মধ্যে উড়িষ্যা একটি। এ সম্বন্ধে ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, "Hussain Shah also carried on a protracted war against Orissa which began shortly after his accession and continued almost up to the end of his reign, at least up to A. D. 1515. There is, however, no doubt that at one stage of the war Hussain Shah penetrated far in the interior of Orissa and destroyed the temple of Puri and the images of deities of the famous place of Hindu pilgrimage. Prataprudra, the king of Orissa, is also credited with victories which enabled him to annex territories of Bengal up to the Ganges. It seems to be certain that the king of Orissa besieged Mandaran (Hooghly District) but failed to capture it" (*History of Mediaeval Bengal*, pg. 51)। [হুসেন শাহ উড়িষ্যাও আক্রমণ করেন এবং অনেকদূর পর্যন্ত প্রবেশ করে পুরীর মন্দির ও প্রসিদ্ধ হিন্দুতীর্থের বিগ্রহ ভগ্ন করেন। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রও বঙ্গদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে হুগলী জেলার মান্দারণ দুর্গ অবরোধ করেন। দুই দেশের যুদ্ধ অন্ততপক্ষে ১৫১৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত চলেছিল]।

হুসেন শাহ হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন, অনেক হিন্দুকে তিনি রাজকার্যের প্রধান প্রধান পদে বসিয়েছিলেন—তাঁর হিন্দু চিকিৎসকও ছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙলা সাহিত্য গৌরবদীপ্ত হয়ে ওঠে।

এ সমস্ত গুণ সত্ত্বেও তিনি অনেক মসজিদ নির্মাণ করলেও হিন্দু প্রজাদের জন্য একটি মন্দিরও তৈরি করে দেন নি। সে কাজে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন বলেও কোথাও উল্লেখ নেই। সমকালীন পোর্তুগীজ পর্যটক ডুয়ার্ট বারবোজ বলেছেন যে, সে সময় বঙ্গদেশে সুলতান এবং তাঁর পদস্থ কর্মচারীদের প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে প্রতিদিন বহুসংখ্যক পৌত্তলিক হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এর থেকে অনুমান করা সম্ভব যে, সাধারণ হিন্দুরা রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা বিশেষ লাভ করতো না।

চৈতন্যদেবের আগমনের পূর্বে বঙ্গদেশে সহজিয়া ধ্যান ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। সে কালের বৈষ্ণবরা এই ধ্যান-ধারণার বিরোধিতা করেও সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। অপর পক্ষে, পরবর্তী কালে বৈষ্ণবরাই সহজিয়া ধ্যান-ধারণার দ্বারা অনেকটা চালিত হয়েছিলেন।

ড. দীনেশচন্দ্র সেনের মতে ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতাব্দী থেকে "এক শ্রেণীর গান আমরা রংপুর, কুচবিহার ও দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে পাইতেছি—তাহার নাম 'কৃষ্ণ ধামালী'; ইহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, এক শ্রেণীর নাম 'আসল' ও অপর শ্রেণীর নাম শুকুল (শুক্ল)" [বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, অষ্টম সংস্করণ, পৃ. ১৩৪]। তিনি আরও মনে করেন

যে, "শক্রাধামালীকে সুন্দর করিয়া সাধুভাষায় প্রবর্তিত করিয়া কবিত্ব মণ্ডিত করিয়া চণ্ডীদাস কৃষ্ণকীর্তন লিখিয়াছিলেন" (তদেব)।

আমরা নীহাররঞ্জনের গ্রন্থ থেকে তখনকার দিনের আর্থনীতিক অবস্থাটাও দেখে নিতে চাই। তিনি লিখেছেন, "প্রাচীন বাঙলার সমাজ যেমন বিভিন্ন বর্ণে তেমনি বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। সামাজিক ধনের উৎপাদন ও বণ্টনানুযায়ী সমাজে অর্থনৈতিক শ্রেণীর উদ্ভব ও স্তরভেদ দেখা যায়। যে সমাজে উৎপাদিত ধনের উপর সকলের সমান অধিকার, ব্যক্তিগত ধনাধিকার যে সমাজে স্বীকৃত নয়, সেই সমাজে শ্রেণী-বিন্যাসের প্রশ্ন অবাস্তব। কিন্তু প্রাচীন বাঙলার সমাজে ব্যক্তিগত ধনাধিকার যেমন আজিকার মতই স্বীকৃত হইত····· তেমনি অস্বীকৃত হইত উৎপাদিত ধনের উপর সকলের সমান অধিকার। বস্তুত বহু প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম চিন্তায় অন্নের উপর সকলের সমানাধিকার অর্থাৎ সকলেরই খাইয়া বাঁচিবার অধিকার স্বীকৃত হইত (ভাগবত: 'সর্বভূতে যথাযোগ্যভাবে অন্নাদির সম্যক বিভাগও ধর্ম'। এই ভাগবতেই অন্যত্র পাইতেছি, 'ক্ষুধার ও প্রয়োজনের অনুরূপ অন্ন পাওয়া দেহী মাত্রেরই অধিকার; তাহার বেশী যে অধিকার করে সে দণ্ডার্হ')।

"৮ম হইতে ১৩শ শতক পর্যন্ত বাঙালী সমাজ প্রধানতঃ এবং প্রথমতঃ কৃষি নির্ভর। সামন্ত প্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত, ভূমিই সমাজের প্রধান সম্পদ। ইহার একপ্রান্তে জনপদজোড়া ভূমির অধিকার লইয়া দোর্দণ্ড প্রতাপে দণ্ডায়মান মুষ্টিমেয় মহামাণ্ডলিক মহাসামন্তরা। অন্যদিকে লেশমাত্র ভূমিবিহীন অসংখ্য প্রজার দল; মধ্যস্থানে ভূমিস্বত্বাধিকারের নানা স্তর। এই বিচিত্র স্তরই প্রধানতঃ শ্রেণী নির্দেশের দ্যোতক।··· বৌদ্ধ আমলে ডোম-ডোম্বী, শবর-শবরীরা স্বীকৃত ছিল। ব্রাহ্মণ্য সংস্কার বা সংস্কৃতিতে তাহা ছিল না, কাজেই সেন আমলে সমাজ-শ্রমিক শ্রেণীর এই অবজ্ঞা অস্বাভাবিক নয়।"

(বাঙালীর ইতিহাস, ১ম খণ্ড)

কাজেই সমাজের এক বিরাট সংখ্যক মানুষের জীবনে দুঃখকষ্ট জীবন সাথী হয়ে পড়েছিল। তাদের জীবনে কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হবার সম্ভাবনা না থাকায় স্বভাবতই তারা ভাগ্যনির্ভর হয়ে পড়ে। ভাগ্যনির্ভর মানুষের আত্মবিশ্বাস জন্মে না। সেই আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলার প্রয়োজন তখন একান্তরূপেই দেখা দিয়েছিল। এই দরিদ্র নিম্নশ্রেণীর সমাজই নবভাব প্রবর্তনের উপযুক্ত ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু সে আমলের অধিকাংশ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ছিলেন যে-কোন নূতন চিন্তা প্রবর্তনের বিরোধী।

ড. সুকুমার সেন বলেন, "দ্বাদশ শতকের একেবারে শেষে পূর্ব ভারতে তুর্কী আক্রমণ শুরু হয়। তাহার পর হইতে দেড়শত বৎসর ধরিয়া বাঙলাদেশে ধ্বংসের ও অরাজকতার তাণ্ডবলীলা চলে। দেশের তৎকালীন শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রগুলো সর্বাগ্রে বিধ্বস্ত হইল। বিদ্যাবুদ্ধিতে পারদর্শীরা নিহত হইলেন। তুর্কীদের সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ বাঙ্গালা দেশে তখনো আর্য-অনার্যের স্তরভেদ ছিল—অখণ্ড বাঙ্গালী জাতি গঠিত হয় নাই। তুর্কী আক্রমণের পরে আর্য-অনার্যের পূর্ণ মিলন ঘটিল, ভাবধর্মী এবং প্রাণধর্মী ধারার মিলন ঘটিল। তারই মূর্তিমান বিগ্রহ চৈতন্যদেব।

১৩৪৫-৪৬ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ ইলিয়াস শাহ বাঙ্গলার স্বাধীন সুলতান হন—দেশে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হ'তে থাকে—জ্ঞানচর্চা সাহিত্যকর্ম আরম্ভ হয়: সর্বপ্রকার উন্নতির জন্য পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত অপেক্ষা করিতেই হইল। (বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস)।

ড. দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, "নবদ্বীপে ন্যায়ের টোল তখন হিন্দুস্তানে অদ্বিতীয়; দর্শন, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রেরও সেই সময় বিশেষরূপে চর্চা হইতেছিল। মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি, ও ষষ্ঠীর পূজা, যোগীপাল ভোগীপাল-মহীপালের গীত এবং পশুরক্ত ও মদ্যের দ্বারা আর্দ্র যজ্ঞস্থালী দেখিয়া কিছু কিছু লোক আক্ষেপ করিতেন। হরিভক্তিহীন নবদ্বীপের অর্থ ও বিদ্যাসমৃদ্ধি তাঁহাদের নিকট সিন্দুরবিহীন রমণী ললাটের ন্যায় বৃথা মনে হইত। তাঁহারা পৃথিবীতে ভক্তির অভাব দেখিয়া অশ্রুপাত করিতেন। এই ভক্তবৃন্দের মধ্যে অদ্বৈত আচার্য অগ্রগণ্য।

"পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে নবদ্বীপ তিনটি শ্রেষ্ঠ পুরুষকে উপহার দিয়াছে—রঘুনাথ শিরোমণি, স্মার্ত রঘুনন্দন ও চৈতন্যদেব। প্রথম দুইজন শাস্ত্রচর্চাকারীদের মধ্যে 'রাজা' উপাধি পাইবার যোগ্য। শেষোক্ত জনও অল্পবয়সে সর্বশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি শুষ্কপত্রের ন্যায় সেই শিক্ষা ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া সদ্য বিকশিত উৎকৃষ্ট মনুষ্যত্ব বা দেবত্ব দেখাইয়াছিলেন। এই তৃতীয়জন মানবজাতির তপস্যার ফলস্বরূপ" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃ. ১৬৮-৯)।

হরিভক্তি নেই, বিশ্বাস নেই। তাই বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবরা আকুল প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন বৈকুণ্ঠনাথের কাছে। 'সম্ভবামি যুগে যুগে'—সেই বিশেষ সময় কি আসে নি? পাষণ্ডরা ভক্তদের জীবন যে দুঃসহ ক'রে তুললো! শ্রীবাসের গৃহে প্রতিদিন কীর্তনের উচ্চরোল উঠছে বৈকুণ্ঠ ঈশ্বরকে লক্ষ্য করে, 'এস, এস প্রাণবল্লভ—তোমার ভক্তদের রক্ষা কর।' অদ্বৈত আচার্যের গৃহে শুধু প্রার্থনাই নয়, উঠছে সিংহবীর্য হুঙ্কার, "আসতেই হবে তোমাকে দরিদ্র নীচ মূর্খদের উদ্ধার করতে: চণ্ডালের কণ্ঠেও উঠবে তোমার জয়ধ্বনি।" দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় আচার্যের, সাধনা কিছুতেই ব্যর্থ হবে না।

গগনভেদী আর্তি শোনা যাচ্ছে নিপীড়িত দরিদ্র ভেদজর্জর মানুষের কণ্ঠে। আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ভাগ্যনির্ভর হয়েছে তারা। বুদ্ধের শূন্যবাদ এবং শঙ্করের মায়াবাদ তাদের মনে জাগাচ্ছে না কোন আশা, ভরসা। তারা চায় জীবন্ত কাউকে, যাকে অবলম্বন ক'রে তারা ফিরে পাবে আত্মবিশ্বাস, সন্তান-সন্ততির উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা জাগবে মনে।

বৈষ্ণব ভক্তগণ ভাবছেন, অবতারের আগমনের সময় তো হয়েছে, এখনও বিলম্ব কেন? সাধারণ মানুষের মনে জাগছে, আমাদের এই দুর্দিনে আমাদের মনে বল-ভরসা জাগিয়ে তোলার জন্য মহামানবের আসার সময় কি হয় নি?

শুধু বঙ্গদেশকে জানলে চৈতন্যদেবের জন্মের তাৎপর্য বোঝা যাবে সত্য কিন্তু তাঁর কর্মের তাৎপর্য বুঝতে গেলে আমাদের বিশেষ ক'রে ওড়িষা এবং দক্ষিণ-ভারতের

সমকালীন অবস্থা কিছুটা বুঝতেই হবে। ওড়িষা সে সময়ে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিল—বঙ্গদেশের হুসেন শাহ এবং কর্ণাটের (বিজয়নগর) সম্রাট কৃষ্ণদেব রায় ছিলেন ওড়িষার তৎকালীন সম্রাট গজপতি প্রতাপরুদ্রের সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু। সম্ভবতঃ এই শত্রুতা আরম্ভ হয় ওড়িষার সোমবংশীয় শক্তিমান রাজা দ্বিতীয় যযাতির সময় থেকেই। তিনি কর্ণাট, গুজরাট, কাঞ্চী, গৌড়, রাঢ় প্রভৃতি দেশের রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতেন। কিন্তু তাঁর পুত্রের পরেই এই বংশের পতন আরম্ভ হয়।

এর পরের শক্তিমান সম্রাট গঙ্গাবংশীয় অনন্ত বর্মণ চোল (চোড়) গঙ্গদেব। তিনি গঙ্গা থেকে গোদাবরী পর্যন্ত রাজ্য স্থাপন করেন: প্রায় তিন শ' বছর এই বংশ ওড়িষায় রাজত্ব করে। ভারতবর্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ হিন্দু রাষ্ট্র ছিল ওড়িষা। এ দেশের ওপর চারদিক থেকে মুসলমান আক্রমণ ঘটেছে।

এ সময় কঠোরতা এবং নিয়মনির্দিষ্টতার জন্য শৈব ধর্ম সাধারণ মানুষকে আর সন্তুষ্ট করতে পারছিল না—জৈন বা বৌদ্ধ ধর্মকেও আর নূতন ক'রে আহ্বান করা সম্ভব ছিল না। এ সময়ে ভারতবর্ষে রামানুজের প্রভাবে বৈষ্ণবধর্ম বিস্তার লাভ করছিল। রামানুজ পুরীতে আসেন চোড়গঙ্গের রাজত্বকালে—"The Kalinga Emperor, during the closing years of a great career turned to religious activities and vigorously championed the cause of Vaishnavism by taking up the construction of the temple of Jagannath……The temple of Jagannath, as the supreme abode of Vaishnavism, has invited millions of Hindus from all parts of India for all these centuries." (*Ancient and Mediaeval Empires and Kingdoms,* Prof. M. N. Das)। [কলিঙ্গ সম্রাট তাঁর গৌরবময় কর্মধারার শেষ দিকে ধর্মেকর্মে আত্মনিয়োগ করেন এবং বৈষ্ণবধর্মকে জোরাল সমর্থন জানিয়ে জগন্নাথদেবের মন্দির নির্মাণে হাত দেন—জগন্নাথদেব বৈষ্ণবদের পরম আশ্রয়স্থল, তাঁর মন্দির যুগ যুগ ধরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হাজার হাজার হিন্দুকে আকর্ষণ করে আসছে।]

এর পর ওড়িষার সিংহাসনে বসেন সূর্যবংশীয় রাজারা। তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কপিলেন্দ্রদেবের রাজত্বকাল আরম্ভ হয় ১৪৩৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে। এর পূর্ব থেকেই ওড়িষা সর্বদিকে শত্রু পরিবেষ্টিত ছিল—বঙ্গদেশের মুসলমান রাজা, বাহমনির মুসলমান সুলতান এবং বিজয়নগরের হিন্দু রাজারাই ছিলেন ওড়িষার স্বাধীন সম্রাটদের প্রধান শত্রু। কপিলেন্দ্রদেব দুর্ধর্ষ শক্তিশালী সম্রাট ছিলেন—তাঁর হস্তীবাহিনীকে সকলেই ভয় করতেন। বিরাট হস্তীবাহিনীর অধিপতি ছিলেন বলে এই রাজবংশের উপাধি হয় গজপতি। বাহমনির মুসলমান সৈন্যদের তিনি বিধ্বস্ত করেন—বাহমনি, বঙ্গ এবং বিজয়নগরের অনেক অঞ্চল তিনি দখল করেন। কাঞ্চীও তিনি জয় ক'রে নেন। অঞ্চল অধিকারের ব্যাপার নিয়ে শত্রুতা চিরস্থায়ী হয়ে থাকে। কপিলেন্দ্রের ন্যায় বীর্যশালী আর কেউ ছিলেন না গজপতি রাজাদের মধ্যে। প্রতাপরুদ্রের রাজত্বকালে বিজয়নগরের সিংহাসনে বসেন কৃষ্ণদেব রায় এবং বঙ্গদেশের সুলতান হন আলাউদ্দীন হুসেন শাহ—এ'রা

দুজনেই ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী, পোর্তুগীজদের কাছ থেকে বহু শত দ্রুতগামী অশ্ব ক্রয় করে কৃষ্ণদেব রায় তাঁর সৈন্যবাহিনীতে নতুন শক্তি এবং গতি সঞ্চার করেন। ফলে প্রতাপরুদ্রের সমূহ বিপদ উপস্থিত হয়েছিল।

কথিত আছে যে কপিলেন্দ্রদেবের ১৮টি পুত্র ছিল—সকলেই সিংহাসনের দাবীদার হ'লে পুরুষোত্তম সকলকে বশীভূত ক'রে প্রত্যেককে ওড়িষার এক একটি অঞ্চলে স্বাধীন রাজত্ব স্থাপন করতে দেন। উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের বিভাগীয় প্রধান মনে করেন, "If this account be correct, here was the beginning of the self-destructive process of Orissa's state power" (Ibid.)। [এ কথা সত্য হলে বলতে হবে যে, ওড়িষার রাষ্ট্রশক্তির ধ্বংসের শুরু হলো সেখান থেকেই]। পুরুষোত্তম নিজেও ছিলেন খুব সংস্কৃতি-সম্পন্ন মানুষ—বহু গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। পুরুষোত্তমেরই পুত্র প্রতাপরুদ্র। ১৪৯৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি সিংহাসনে বসেন।

মাদলা পঞ্জীতে পাওয়া যায় যে, গৌড়ের পাতশা (বাদশা) পুরীতে প্রবেশ করে জগন্নাথ মন্দিরের দেবমূর্তি ধ্বংস করেন। সংবাদ পেয়ে প্রতাপরুদ্র দ্রুত রাজধানীতে ফিরে আসেন (তিনি যখন দক্ষিণ ভারতে অভিযানে যান—সেই সুযোগে গৌড়েশ্বর ওড়িষা আক্রমণ করে ভিতরে প্রবেশ করেন) এবং গঙ্গাতীর পর্যন্ত শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করেন। পাতশা মান্দারণের দুর্গে আশ্রয় নেন, সেই দুর্গ অবরোধ করা হয়। "Govinda Vidyadhara, an officer of the king now turned traitor. Pratap Rudra was compelled to make peace with the Patsa. He handed over the reigns of Government to Govinda Vidyadhara.

"Govinda was the commandant of the fort of Cuttack He was the first of that group of traitors who were partly responsible for the fall of Orissa." (*The Gajapati King of Orissa*, Prof P. Mukherjee)। [রাজার জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারী গোবিন্দ বিদ্যাধর এই সময় বিশ্বাসঘাতকতা করে। ফলে বাদশার সঙ্গে প্রতাপরুদ্র শান্তি চুক্তি করতে বাধ্য হন। সেই অঞ্চলের শাসনভার দিতে হয় গোবিন্দ বিদ্যাধরকেই। গোবিন্দ কটক দুর্গের অধ্যক্ষ ছিল। ওড়িষার পতনের জন্য যে বিশ্বাসঘাতক গোষ্ঠী আংশিকভাবে দায়ী তাদের প্রধান এই গোবিন্দ।]

সম্ভবত হুসেন শাহের অভিযানের কিছু পূর্বেই চৈতন্যদেব পুরী হ'য়ে দক্ষিণ ভারতের পথে বেরিয়ে পড়েন।

আমরা আগেই দেখেছি যে অনন্তদেব চোড়গঙ্গের সময় থেকেই ওড়িষায় বৈষ্ণবধর্ম বিস্তার লাভ করে। জগন্নাথদেবের পূজায় অবশ্যই কিছুটা বৌদ্ধ, শৈব এবং তান্ত্রিক রীতিপদ্ধতি প্রবিষ্ট হয়েছিল। "Jagannath was conceived as Basudeva, Siva and even as the Bhairava" (*History of Mediaeval Vaishnavism in Orissa*, Prof. Pravat Mukherjee, p. 2).

কপিলেন্দ্রর সময় থেকেই জগন্নাথদেব ওড়িষার রাষ্ট্রীয় দেবতা হয়ে ওঠেন। জগন্নাথ মন্দিরে গীতগোবিন্দ গীত হোক এটাও রাজার ইচ্ছা ছিল—এখানে রাধাভাবের কথা রয়েছে যা চৈতন্যদেবের পূর্বে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল না।

রাধার ধারণা এবং গোপী-ধারণা উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতে প্রসার লাভ করে। বৈষ্ণবরা রাধাকে গোপীদের মধ্যে প্রধান বলে মনে করেন। উত্তর ভারত থেকেই এই ভাব ওড়িষায় আসে। তেলেঙ্গী নিম্বার্ক স্বামী বৃন্দাবনে বসবাস করতেন সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। তাঁর শিক্ষাতেও রাধা-ধারণার বিশেষ প্রভাব ছিল। গীতগোবিন্দে এই ধারণা আরও সম্পূর্ণতা লাভ করে। রাধাভাবের জ্বলন্ত নিদর্শন শ্রীচৈতন্যদেব সম্ভবতঃ সেই কারণেই ওড়িষার মানসিকতায় এরূপ গভীর ছাপ ফেলতে পেরেছিলেন এবং সহজেই সাধারণ্যে গৃহীত হ'য়ে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনও ওড়িষায় পরিচিত ছিল।

"Vaishnavism flourished in Orissa even before the advent of Chaitanya……five of the exponents of the pre-Chaitanya school of Vaishnavism in Orissa lived during the reign of Prataprudra and were popularly known as the five Associates (Pancha Sakha). These scholarly and devout Vaishnavas Jagannath, Balaram, Achyutananda, Ananta and Jasovanta regarded Chaitanya as embodiment of Jagannath and came under the spell of his influence. But they did not join the Chaitanya sect commonly known as Gaudiya Vaishnava" (*The Gajapati King of Orissa*, Prof Provat Mukherji, p. 2). [চৈতন্যের আগমনের পূর্বেই ওড়িষায় বৈষ্ণবধর্ম বিশেষ প্রসার লাভ করেছিল। প্রতাপরুদ্রের রাজত্বকালে পাঁচজন বৈষ্ণবতত্ত্ব ব্যাখ্যাতা ওড়িষায় ছিলেন। তাঁরা পঞ্চ সহযোগী বা পঞ্চসখা বলে পরিচিত ছিলেন। এই পণ্ডিত বৈষ্ণব ভক্তরা হলেন জগন্নাথ, বলরাম, অচ্যুতানন্দ, অনন্ত এবং যশোবন্ত—তাঁরা চৈতন্যকে জগন্নাথের প্রতিমূর্তি ব'লে মনে করলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সংগে মিশে যান নি।]

প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধরত কৃষ্ণদেব রায়ও ছিলেন বৈষ্ণব। ওড়িষার অধিকারভুক্ত উদয়গিরির দুর্ভেদ্য পার্বত্য দুর্গ জয় করে তিনি সেখান থেকে কৃষ্ণ মূর্তি নিয়ে গিয়ে বিজয়নগরে প্রতিষ্ঠা করেন এবং বহু জমি দেবোত্তর সম্পত্তি করে দেন। কৃষ্ণের বিরাট মন্দিরও তিনি নির্মাণ করেন।

দুঃখের বিষয় এই যে, দুই বিশেষ প্রতাপশালী বৈষ্ণব সম্রাট পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজেদের শক্তি ক্ষয় করে ফেললেন। মুসলমান সুলতানরাও পরস্পরের সঙ্গে বিরোধিতা করেছেন কিন্তু কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে যুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়ে আদিল শাহ পাঁচটি মুসলমান রাষ্ট্রকে একত্র করেছিলেন। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ কালে চৈতন্যদেব এসব ব্যাপারের অনেক কিছুই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। হুশেন শাহের সঙ্গে প্রতাপরুদ্রের যুদ্ধ প্রস্তুতিকালেই চৈতন্যদেব বঙ্গদেশ থেকে ওড়িষায় আসেন। সন্ন্যাসীর চোখে দেখা অবস্থা কি তাঁর মনে কোন দাগ কাটে নি ?

আমরা দেখেছি যে, ইউরোপে চৈতন্য-সমসাময়িক কালে ধর্ম পুনরুদ্ধার এবং সংস্কার প্রচেষ্টা চলছে ঃ একই ধরনের আন্দোলন চলছে উত্তর ভারতে পাঞ্জাবে। পাল রাজারা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন যে, মানুষে-মানুষে সহযোগিতাই শক্তির উৎস ঃ সেন বর্মণরা দেখিয়েছেন ভেদাভেদ সৃষ্টি করে রাজশক্তিও বেশীদিন টেঁকে না। দেখা গেছে মুসলিম রাজশক্তি এবং ধর্মান্ধ মুসলমান ধর্মনেতারা হিন্দুর মন্দির ভাঙছে, বহু ক্ষেত্রে জোর করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করাচ্ছে অথচ সুফী সাধকরা কত উদার ; হিন্দু-মুসলমানে ঐক্যের বন্ধন বাঁধছেন তাঁরা আগ্রহভরে। হিন্দু রাজারা পরস্পর লড়াই করে শক্তি ক্ষয় করেছেন। এরই মধ্যে প্রসারলাভ করছে বৈষ্ণব ধর্ম : ওড়িষার এবং বিজয়নগরের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৈষ্ণব ধর্মের জয় জয়কার চলছে, প্রেম ভক্তির প্রকাশ ঘটছে।

এই পরিবেশেই তো 'অবতার' বা মহামানবের জন্ম হয়। ধর্মের ওপর যে আঘাত আসছে তাকে রোধ করতে হবে এবং সেই সঙ্গে শুধু বঙ্গের নয়, সমস্ত ভারতের মানুষকে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করতে হবে। মানুষের মধ্যে ছোটো-বড় বলে কিছু নেই—সর্বত্র সমতা সৃষ্টি করা চাই।

যুক্তিবাদীদের মতে পারিপার্শ্বিক অবস্থা যুগস্রষ্টার জন্ম দেয়। দুষ্কৃতকারীদের অত্যাচার যত বৃদ্ধি পায়, মানুষের পরিত্রাতা বা চিন্তাবিদ মহামানবের আবির্ভাব ততই ত্বরান্বিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে নারদ শুনিয়েছেন—

পাপে ভরা না হইলে বংশ কভু তার।
ধ্বংস করিবারে পারে হেন সাধ্য কার॥ [পৃ. ৬৫৭]

নিপীড়িত মানবাত্মার ক্ষোভ তীব্র হতে থাকে অত্যাচারের ফলে ঃ এই ক্ষোভেরই সম্মিত ফল অত্যাচার দমন কল্পে বিরাট ব্যক্তিত্বের জন্ম। এই বিরাট ব্যক্তিত্বের আগমনের পূর্বে বিভিন্ন স্থানে ছোট-বড় নানা ব্যক্তিত্ব জন্মগ্রহণ করে জমি প্রস্তুত করার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেন।

ড. সুকুমার সেন বেশ স্পষ্ট করেই বলেছেন, "দ্বাদশ শতকের একেবারে শেষে পূর্ব ভারতে তুর্কী আক্রমণ শুরু হয়। তাহার পর হইতে দেড়শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলাদেশে ধ্বংসের অরাজকতার তাণ্ডব লীলা চলে। তুর্কী আক্রমণের পরে আর্য অনার্যের পূর্ণ মিলন ঘটিল ভাবধর্মী এবং প্রাণধর্মী ধারার মিলন ঘটিল—তারই মূর্তিমান বিগ্রহ চৈতন্যদেব" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস)।

কিন্তু যে চৈতন্যদেবকে আমরা দেখে অভ্যস্ত তিনি ভাবধর্মী মাত্র। তাঁর প্রাণধর্মের পরিচয় কোথায় ? যে অত্যাচার-নিপীড়ন চলছিল তার প্রতিকার প্রচেষ্টাতেই বা এই বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রতিক্রিয়া কি ঘটেছিল ? সেটা বোঝার চেষ্টা করাই আমাদের কাজ।

২. মধ্যযুগে ভারতে ভক্তিবাদী আন্দোলন ও চৈতন্যদেব

খুব স্পষ্টভাবে না হলেও বেদেও ভক্তির কথা পাওয়া যায়। কঠ এবং মাণ্ডূক্য উপনিষদে ভক্তিবাদের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে শিশু প্রহ্লাদ তার সংগীদের বলেছে—

আমার যাতনা দেখি ভয় নাহি পাও।
উচ্চস্বরে একমনে হরিনাম গাও॥
ভক্তাধীন নারায়ণ তিনি প্রভু হন।
না পাইবে কোন ব্যথা কহিনু বচন॥ [সপ্তম স্কন্ধ : ৫ম অধ্যায়]

শ্রীমদ্ভাগবত শুনিয়েছেন যে, ভক্তি ব্যতীত সবই ব্যর্থ হয়ে যায়—

ধর্মবলে যাহা কিছু পরিচিত হয়।
হরিভক্তি শূন্য হলে ব্যর্থ সমুদয়॥ [১ম স্কন্ধ ঃ ২য় অধ্যায়]

গীতায় ভগবান বলেছেন যে, সব কিছু ত্যাগ করে তাঁকে আশ্রয় করলে নিশ্চিত রূপে তাঁকে লাভ করা সম্ভব হবে-

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ॥ [১২অঃ—৮]

[তোমার মন আমাতে যুক্ত কর। তোমার বুদ্ধি আমাতে রাখো, তাহা হইলে ইহার (এই জন্মের) পর নিঃসংশয়ে আমাকে পাইবে।]

নারদের মতে ঈশ্বরের প্রতি গভীর প্রেমই ভক্তি।

ভারতবর্ষে ভক্তি-পথের পথিক ছিলেন নারদ-শাণ্ডিল্য-শুকদেব-ধ্রুব-প্রহ্লাদ প্রভৃতি। কিন্তু তাঁরা কেউই একালের পরিচিত মানুষ নন— অনেকে কল্পিত চরিত্রও হতে পারেন। কিন্তু একালে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্ব থেকে এবং তাঁর তিরোধানের বহু পরবর্তীকাল পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে প্রেমধর্মের পূজারী বহু সাধক আবির্ভূত হয়েছিলেন : আজও প্রেম-ভক্তি মার্গের সাধকের অভাব নেই। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, সমস্ত মার্গের সাধকদের সম্বন্ধেই নানাবিধ অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত হয়ে যায়। এ কথাও সত্য যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অলৌকিক কাহিনীর ক্ষেত্রও সীমিত হয়ে আসছে। টেলিভিশনের পর্দায় তরঙ্গায়িত চিত্র ও শব্দ ধরা পড়ছে : কোন কোন বিশেষ চিত্তেও তো তা হলে চিত্রসুর ধরা পড়া বিচিত্র নাও হতে পারে। জীবনী-কাররা ইচ্ছাকৃত ভাবে তাঁদের আরাধ্য মানুষটিকে বড় করে দেখাবার জন্য অলৌকিকত্ব আরোপ করতে পারেন—অজ্ঞতাপ্রসূত অলৌকিক কাহিনী চালু হওয়াও বিচিত্র নয়। সত্যকার সাধকরা তাঁদের সম্বন্ধে অলৌকিক কাহিনীর রটনা ভাল চক্ষে দেখেন না;

বিশেষতঃ অলৌকিকত্ব সাধনার নিম্নস্তরের ঐশ্বর্য মাত্র। সাধনার বিশাল ক্ষেত্রে তার মর্যাদা কোনদিন ছিল না, আজও নেই এবং ভবিষ্যতেও হবে না।

ভারতবর্ষে সমস্ত অঞ্চলে সামাজিক ভাবে নিপীড়িত তথাকথিত নিম্নস্তরের মানুষের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম প্রবল বন্যার ন্যায় প্রবেশ করেছিল। বর্ণাশ্রম ধর্মের আক্রমণে জর্জরিত অজ্ঞ মানুষের দল বুদ্ধের বাণীতে মুক্তির আস্বাদ পেয়ে তাকে অবলম্বন করলো—এর পরেই এলো শঙ্করের মায়াবাদ। দক্ষিণ দেশের অগণিত বৌদ্ধদের অজ্ঞতা ততদিনে তাদের তান্ত্রিকতার পথে ঠেলে দিয়েছে। এই হতচকিত বিভ্রান্তিকর অবস্থার মধ্যে আলোক-বর্তিকা হাতে নিয়ে তামিল দেশে এলেন 'আলোয়ারের' দল। সপ্তম থেকে নবম দশম শতাব্দী পর্যন্ত আবিভূর্ত হয়েছিলেন ১২ জন আলোয়ার—তাঁদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ছিলেন, ছিলেন তথাকথিত নিম্ন বর্ণের মানুষ, এমন কি একজন মহিলাও।

'আলোয়ার' কথাটার প্রকৃত অর্থ, 'যিনি গভীরে ঝাঁপ দেন'। বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার হাত থেকে সাধারণ মানুষকে উদ্ধারের জন্যেই হোক, অথবা হিন্দু ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে গোঁড়ামীর অপদেবতাকে দূরে সরিয়ে সত্য প্রকাশের জন্যই হোক, আলোয়ারগণ সাধারণের বোধগম্য সহজ দেশীয় ভাষায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গান গেয়ে বেড়াতে লাগলেন ও বৌদ্ধদের ন্যায় অনুষ্ঠানের অসারতার কথাও বোঝালেন তাঁরা, গান গেয়ে শোনালেন যে, ধ্যান বা অনুষ্ঠানাদির প্রতি ঈশ্বরের কোন আকর্ষণ নেই : ঈশ্বরের প্রেমে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করলেই ঈশ্বর লাভ করা যায়। ভক্তিবাদের প্রচার তাঁরাই সর্বপ্রথমে আরম্ভ করেন। কোন কোন আলোয়ার ঈশ্বরের সঙ্গে পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ স্থাপনও করেছিলেন। কারও কারও মতে মানব সেবাই ঈশ্বর সেবা। ভাগবতে বিষ্ণুর অবতার বলে কথিত কপিল মুনি ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে ওই কথাই বলেছেন—

শ্রীহরির প্রীতি তবে যে করে ভকতি।
তারই সাত্ত্বিক ভক্তি শুন শুন সতী॥
... ...
কিছু নাহি কাম্য তার সংসার মাঝার।
কেবল আমার সেবা করে সেই সার॥
প্রাণিনিন্দা করে যেই, কভু তার প্রতি।
অর্চিত হলেও আমি নাহি লভি প্রীতি॥ [পৃ. ৩০৩-৩০৪]

আলোয়ারদের পরে বলতে হয় রামানুজের কথা।

পুত্র কামনায় যজ্ঞ করে কেশব সোমায়জি এবং কান্তিমতি পুত্রলাভ করেন। ভবিষ্যৎ মহাপুরুষদের প্রায় প্রত্যেকেরই জন্মকালে কিছু না কিছু অলৌকিক ঘটনার কথা প্রচারিত হয়ে থাকে। এই নবজাতকের মস্তকের চারদিকে দিব্যজ্যোতি দেখতে পান তাঁর সন্ন্যাসী মাতুল—শিশুর অঙ্গে রামচন্দ্রের অঙ্গস্বরূপ ভ্রাতা লক্ষ্মণের নানা লক্ষণও পরিদৃষ্ট হয়। এই কারণে শিশুর নাম দেওয়া হয় রামানুজ, ১০১৭ খ্রীস্টাব্দে তামিল দেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীরঙ্গম মঠের প্রধান আলাভান্দার তাঁকে নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। রামানুজের ব্যক্তিত্বে ছিল প্রচণ্ড আকর্ষণী শক্তি : নেতৃত্ব ছিল তার স্বভাবে।

সকল মহামানবেরই আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, দেহ-সৌন্দর্যের এবং বীর্যবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। কেবল বৈষ্ণবদের সম্বন্ধেই নয়, বীরশৈব বাসভায়া বা বাষভ (সং-বৃষভ) সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। বৃষভ ব্রত সম্পন্ন করায় মহাদেবের অনুচর নন্দীর বরে পুত্র লাভ করে পিতা-মাতা শিশুর নাম দেন বাষভ (দ্বাদশ শতক)। চন্দ্ররশ্মির ন্যায় সুন্দর স্নিগ্ধ ছিল তার রূপ। যাঁরা শিশুকে আদর করতেন, শিশু তাঁদের অকৃপণ মধুর হাসিতে অভিষিক্ত করতো।

সুফী মতবাদেও ভক্তির কথাই বলা হয়েছে। মোঙ্গলদের আক্রমণের ফলে বহু মুসলমান সুফী ফকির মদিনা প্রভৃতি ছেড়ে পাঞ্জাবে পালিয়ে আসেন। গজনভীদের শাসন কালে নিশ্চিন্ত ভাবে সাধন-ভজন করার উদ্দেশ্যে বহু সুফী সাধক ভারতে আসেন এবং ক্রমে তাঁরা ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েন। হিন্দু যোগী এবং ভক্তদের সঙ্গে তাঁদের ভাবের আদান-প্রদান চলে। পরস্পরের দ্বারা পরস্পরে প্রভাবিত হন নি এ রকম কথা বলা চলে না; তবে কে কতখানি প্রভাবিত হয়েছেন তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

বাবা সাহেব সেখ ফরিদ (১১৭৩—১২৬৫ খ্রীঃ) ছিলেন সুফীদের অন্যতম প্রধান। তাঁর জন্মকে কেন্দ্র করেও অলৌকিক বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। ফরিদ রমজান মাসে জন্মগ্রহণ করেন, এ মাসে অনেকটা সময় উপবাসে থাকার নিয়ম। শিশু ফরিদ উপবাসের সময়টাতে মাতৃদুগ্ধ পানে অনীহা প্রকাশ করতেন—অলৌকিক বলেই শিশুর পক্ষে এমনটি করা সম্ভব হয়েছিল। ফরিদ ছিলেন অপূর্ব সুন্দর, নিষ্ঠাবান এবং স্থির-বুদ্ধি বালক—তাঁর চোখেমুখে ছিল প্রতিভার দীপ্তি।

দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণব এবং বীরশৈবদের মধ্যে, উত্তর ভারতে হিন্দু ও মুসলমান সুফীদের মধ্যে যা লক্ষ্য করা গেছে, তাই প্রকাশ পেয়েছে গৌড় বঙ্গ এবং কামরূপেও। কামরূপের কায়স্থ ভূঁইএগদেব সর্বেসর্বা শিরোমণি পরিবারে ১৪৪৯ খ্রীস্টাব্দে সুন্দর দর্শন শঙ্করদেবের (১৪৪৯—১৫৬৯ খ্রীঃ) জন্ম হয়। দুর্দান্ত বালক খরস্রোতা ব্রহ্মপুত্রে এপার ওপার করে সাঁতার কাটতেন, দুর্দান্ত ক্ষিপ্ত ষাঁড়কে শিং ধরে বশ মানাতেন। উত্তরকালে তাঁর রাজোপম ব্যক্তিত্বের সামনে মাথা নত হয়ে যেত সকলের। তিনি ছিলেন দীর্ঘদেহী, প্রবল শক্তির অধিকারী প্রশাসক—তীব্র বেগে দৌড়তে পারতেন তিনি। টোলের পণ্ডিত মহেন্দ্র কাণ্ডালির আগ্রহেই শঙ্করকে শঙ্করদেব বলে ডাকা হতো। এক অলৌকিক ব্যাপার দেখে গুরু তার নামের সঙ্গে 'দেব' কথাটা যুক্ত করেন। "একদিন টোলের চৌহদ্দিতে ঢুকে মহেন্দ্র কাণ্ডালি দেখলেন এক কেউটে সাপ ঘুমন্ত শঙ্করকে ফণাছত্র মেলে ধরে রোদ্দুর থেকে আগলাচ্ছে"। (শঙ্করদেব : মহেশ্বর নেওগ, পৃ. ১৫)।

শ্রীনিবাস নায়ক পরে পুরন্দর দাস (১৪৮০/৮৪—১৫৬৪/৬৫ খ্রীঃ) নামে পরিচিত হন; সম্ভবত ইনি কর্ণাটকের অধিবাসী ছিলেন। তিনি বিত্তশালী ব্যবসায়ী ছিলেন। এক অলৌকিক ঘটনায় তাঁর চিত্তের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে; কাহিনীটি এরূপ : এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে তার উপনয়ন দেবার জন্য ভিক্ষা চাইতে যেত তার দোকানে। ছ'মাস প্রতিদিন যাবার পর শ্রীনিবাস বিরক্ত হয়ে অপ্রচলিত দুটো মুদ্রা তাঁর থলি থেকে তুলে নিতে বলেন। বৃদ্ধ একটি মুদ্রা তুলে নিয়ে শ্রীনিবাসের গৃহে তাঁর স্ত্রী সরস্বতী

বাইয়ের নিকটে উপস্থিত হয়ে মুদ্রাটি দেখিয়ে ভিক্ষা চান, সরস্বতীবাঈ মুদ্রাটি দেখে স্বামীর কৃপণতার পরিচয় পান। নিজের কাছে কিছু না থাকায় তিনি ব্রাহ্মণকে দান করতেও অসমর্থ হন। ব্রাহ্মণ তখন তাঁর নাকের মুক্তাটি ভিক্ষা চান। স্বামীর কৃপণতায় লজ্জিত সরস্বতী মুক্তাটি খুলে বৃদ্ধের হাতে তুলে দেন। বৃদ্ধ সেটি নিয়ে হাজির হন শ্রীনিবাসের দোকানে এবং নাকের মুক্তাটির বিনিময়ে অর্থ ভিক্ষা করেন। শ্রীনিবাস অলংকারটি চিনতে পেরে সিন্দুকে তুলে রেখে বৃদ্ধকে পরের দিন আসতে বলে দ্রুত বাড়ীতে গিয়ে স্ত্রীকে অলংকারটির কথা জিজ্ঞাসা করেন। স্বামীর মনোভাব জানতেন সরস্বতী, ভয়ংকর কিছু ঘটবে বুঝে নাকের মুক্তো ঘরের ভেতর থেকে আনবার ছল করে তিনি বিষ পান করতে গেলেন—বিষের পাত্রটি উপুড় করতেই দেখতে পেলেন অলংকারটি। স্বামী সেটা পেয়ে বিস্মিত হয়ে ছুটলেন দোকানে; না, সিন্দুকে সেটি নেই। বৃদ্ধটি মানুষ নন বলে মনে হলো শ্রীনিবাসের, বদলে গেল তাঁর জীবনের পথ।

এ ধরনের অলৌকিক কাহিনী কেবল সমতল ভূমিতেই শোনা গেছে তাই নয়—রাজপুতানার উচ্চাবচ ক্ষেত্রেও সেই একই কাহিনীর কথা শোনা গেছে রানী মীরা বাঈয়ের [১৪৯৮—১৫৪৬/৪৭ (১৫৭০ খ্রীঃ ?)] ক্ষেত্রেও। তাঁকে বিষ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তা পান করেও তাঁর কিছু হয় নি। তাঁর ফুলের সাজিতে যে বিষাক্ত সাপ রেখে দেওয়া হয়েছিল সেটা মালায় পরিণত হয়ে যায়।

ব্যাসরায় (জন্ম ১৪৫৬ খ্রীঃ ?), কবীর (পঞ্চদশ শতকেও জীবিত ছিলেন), নানক (১৪৬৯—১৫৩৮), রবিদাস (ষোড়শ শতক), দাদু (জন্ম ১৫৪৪ খ্রীঃ) প্রভৃতি সকলের জীবনেই অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে বলে সাধারণে বিশ্বাস করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনেও এ ধরনের অলৌকিকত্বের অনেক উদাহরণ দিয়েছেন তাঁর জীবনীকারগণ।

তাঁর রূপ বর্ণনা করে কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—

চৈতন্যসিংহের নবদ্বীপে অবতার।
সিংহ গ্রীব সিংহবীর্য সিংহের হুঙ্কার॥
....
দৈর্ঘ্য-বিস্তারে যেই আপনার হাতে।
চারি হস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাতে॥
... ...
আজানুলম্বিত-ভুজ কমললোচন।
তিলফুল জিনি নাসা সুধাংশুবদন॥ [চৈ. চ., পৃ. ৭-৮]

কবি কর্ণপুর বলেছেন 'কাঞ্চনদ্যুতি সন্ন্যাসী'। মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন; সার্বভৌম ভট্টাচার্য বলেছিলেন—

বড়ই কৃষ্ণের কৃপা হইয়াছে তোমারে।
সবে একখানি করিয়াছ অব্যাভারে॥
পরম সুবুদ্ধি তুমি হইয়া আপনে।
তবে তুমি সন্ন্যাস করিলা কি কারণে॥

বুঝে দেখি বিচারিয়া কি আছে সন্ন্যাসে।
প্রথমেই বন্ধ হয় অহঙ্কার পাশে ॥ [চৈ. ভা , পৃ. ২৬৮]

এবং, ভট্টাচার্য কহে ইহার প্রৌঢ় যৌবন।
কেমনে সন্ন্যাসধর্ম হইবে রক্ষণ ॥
নিরন্তর ইঁহারে আমি বেদান্ত শুনাইব।
বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইব ॥ [চৈ. চ., পৃ. ১৫৭)

চৈতন্যভাগবতে খুব স্পষ্ট করেই সার্বভৌম ভট্টাচার্য বলেছেন—

তথাপিহ তোমার সন্ন্যাস করিবার।
এ সময়ে কেমতে লই অধিকার ॥
সে সব মহান্তগণ ত্রিভাগ-বয়সে।
প্রাণ-রস ভুঞ্জিয়া সে করিলা সন্ন্যাসে ॥
যৌবন প্রবেশ মাত্র সকলে তোমার।
কেমনে হইল সন্ন্যাসের অধিকার ॥ [পৃ. ২৬৯]

চৈতন্যদেব যে নতুন যৌবনে, মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন তা সন্ন্যাস গ্রহণের স্বাভাবিক বয়স নয় : বিশ্বরূপ নিত্যানন্দ ও জীবও অল্প বয়সেই সন্ন্যাস নিয়েছিলেন—এটা সময়োচিত কাজ নয় বলেই বিশ্বাস ছিল সে কালেও। ওড়িষার প্রতাপশালী বৈষ্ণব সম্রাট প্রতাপরুদ্র গজপতিকে যে বৈষ্ণব মহাপুরুষ কৃপা করেছিলেন সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নতুন যৌবনেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন।

প্রতাপশালী বীর্যবান সে যুগের শ্রেষ্ঠতম অপর একজন বৈষ্ণব সম্রাট বিজয়নগরের কৃষ্ণদেব রায়-এর গুরু ব্যাসরায়ও ছিলেন জ্যোতির্ময় পুরুষ। তিনিও পূর্ণ যৌবনে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন—সাধারণ মানুষেরা তাঁকে অপূর্ব দর্শন 'বালক সন্ন্যাসী' বলে অভিহিত করেন : অগ্নিদেবতার ন্যায় দ্যুতিসম্পন্ন ছিলেন তিনি। সালুভা নরসিংহের রাজত্বকালে যখন তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁর সভায়, তখন তাঁর পূর্ণ যৌবন, তেজোদৃপ্ত সমুন্নত হিমালয়ের ন্যায় তাঁর গঠন, সন্ন্যাসীর গৈরিক বস্ত্রে তাঁকে প্রভাত সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান বলে মনে হচ্ছিল। অনুমান করা যেতে পারে যে তাঁরই প্রভাবে নরসিংহ মুসলমানদেরও সৈন্যবাহিনীতে গ্রহণ করেন। তাঁদের মনে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য সিংহাসনের এক পাশে কোরান রাখার ব্যবস্থাও হয়।

ব্যাসরায় এবং চৈতন্যদেব একই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী। চৈতন্যদেব গজপতির ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন—ব্যাসরায় করেছিলেন কৃষ্ণদেব রায়ের ওপর। সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবকে সহজে দমিত করা যায় না ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুই বৈষ্ণব সম্রাট আত্মীয়তায় আবদ্ধ হয়েছিলেন—শান্তি স্থাপিত হয়েছিল উভয়ের মধ্যে।

ভারতের সাধকরা কেউ কেউ সন্ন্যাস নিলেও অনেকেই ছিলেন সংসারী। বীরশৈব বাষান্না, কবীর, নানক, রবিদাস, বল্লভাচার্য, মীরাবাঈ প্রভৃতি সংসার ত্যাগ বা সন্ন্যাস গ্রহণে ককখনও প্রাধান্য দেননি—অনেকেই ছিলেন সংসারী। রামানুজ, ব্যাসরায়, চৈতন্যদেব

সন্ন্যাস গ্রহণ করেন: চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল বলে অবশ্যই অনুমান করা চলে।

অনেক সাধককেই অবতার বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। গুরু নানক অবতারবাদের বিরোধী ছিলেন: নীলাচলে শ্রীবাসাদি ভক্তগণ যখন চৈতন্যদেবের নাম নিয়ে কীর্তন করেন তখন চৈতন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন: ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন রায় রামানন্দের ওপরও, যখন তিনি প্রথমে জগন্নাথ দর্শন না করে তাঁকে দেখতে আসেন।

জগন্নাথদেবের মন্দিরের পুরোহিতদের প্রার্থনায় রামানুজকে বহু যোজন দূরে নিক্ষেপ করা হয়েছিল ব'লে কিম্বদন্তি আছে; চৈতন্যদেবও অন্তর্ধান করেন জগন্নাথদেবের দেহে, অথবা টোটা গোপীনাথের জানুতে অথবা সম্মুখস্থ মহাসমুদ্রে: হিন্দু-মুসলমান ভক্তদের বিবাদ মেটাতে কবীর এবং গুরু নানকের আচ্ছাদিত মবদেহ ফুল হয়ে গিয়েছিল; তুকারাম (১৬০৮-১৬৫০ খ্রীঃ) নিকটস্থ নদীতে অন্তর্ধান করেন ব'লে কথিত আছে। সাধকদের নিয়ে এ ধরনের নানা কাহিনীও প্রচলিত আছে।

এ দেশে জৈন-বৌদ্ধদের অহিংসা তথা প্রেমধর্মের বাণী প্রচারিত হয়েছে কয়েক শতাব্দী ধরে: রামানুজ থেকে আরম্ভ ক'রে তুকারাম পর্যন্ত প্রায় সাত শতক ভক্তিবাদ বিশেষ ভাবে সমস্ত ভারতকে মাতিয়ে তুলেছে। জাত-পাতের বিরুদ্ধে, আচার-আচরণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন বহু সাধক। তার পরিচয় এখানে নেওয়া প্রযোজন।

জৈন ধর্মে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে অহিংসা এবং সত্যের ওপর: পার্থিব দ্রব্যের ওপর লোভ না করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে বিশেষভাবে (মা গৃধ কস্যচিৎ ধনং—উপনিষদ)। প্রেম ব্যতীত অহিংসা সম্ভব নয়। সুতরাং জৈনদের সব ব্যাপী অহিংসা সর্বব্যাপী প্রেমেরই নামান্তর। সমতাবোধের ওপরও জৈনরা বিশেষ জোর দিয়েছেন। সাংখ্য-যোগ এবং ভাগবতে যে সমতার কথা বলা হয়েছে গীতাকারও সেই সমতার কথা বলেছেন: গীতাকার 'সমদর্শী', 'সাম্য' কথাগুলো বারবার ব্যবহার করেছেন। জৈনদের 'আচারাঙ্গ'-সূত্রে এই সমতার কথাই বলা হয়েছে। গীতা সন্ন্যাসের কথা বাতিল ক'রে অর্জুনকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত করেছে: অপরদিকে 'আচারাঙ্গ সূত্র' বলতে চায় যে, তুমি ক্ষত্রিয় বীর হলে যুদ্ধ পরিত্যাগ করবে কারণ তুমি সমদর্শী মনোভাবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ। সন্ন্যাস নিয়ে অধ্যাত্ম জীবনের শত্রুর সঙ্গেই তোমার সংগ্রাম করা কর্তব্য। সমতাবোধ জৈনদের জাত-পাতের ঊর্ধ্বে নিয়ে গিয়েছিল। প্রেম ও সমতাবোধই ছিল জৈনদের মূল কথা।

বেদের মধ্যেও জাত-পাতের কথা নেই, সেখানে নারীরও যথেষ্ট মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বেদে যাগ-যজ্ঞের প্রাদুর্ভাব খুবই বেশী। বৌদ্ধ ধর্ম এই সব আচার-অনুষ্ঠানকে আক্রমণ করেছে: বোধি পাবার জন্য প্রস্তুতিপর্বে নানা নিয়ম ও আচারাদি পালন করতে হয়। এর মধ্যে দু'টো প্রধান বিষয় হলো মহামৈত্রী এবং মহাকরুণা। অপরের জন্য সর্বস্ব ত্যাগই মহামৈত্রী—সকলের প্রতি প্রগাঢ় প্রেমের অনুভূতিই মহাকরুণা। বৌদ্ধরা জাত-পাতকে অস্বীকার করেছেন, এ বিষয়ে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে তাঁদের বিশেষ জেহাদ ছিল। প্রেম-প্রীতিবোধের উদ্বোধন ঘটিয়েছে এ দেশের ধর্মচিন্তা প্রথম থেকেই। জাত-পাত বর্ণবিভেদহীন সমতাবোধও ছিল এ দেশের আকাশে-বাতাসে।

এ দেশের ভক্তিবাদীরাও সেই কথাই বলেছেন। সপ্তম থেকে নবম শতাব্দী পর্যন্ত আলোয়াররা ভক্তির গান গেয়ে বেড়িয়েছেন, যাঁরা সাধনা করেন ভগবান কেবল তাঁদেরই দেখা দেন এ কথা তাঁরা বিশ্বাস করতেন না—ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে পারলেই তাঁকে পাওয়া যায়: ঈশ্বরের করুণালাভের সহজতম পথ তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ—এই ছিল তাঁদের বিশ্বাস।

ত্রিবাঙ্কুর-এর এক শাসনকর্তা আলোয়ার কুলশেখর নিজেকে দশরথ ব'লে মনে করতেন—রামের সেই বনবাস যাত্রাকালের বিদায়কালীন অবস্থা তাঁর চিত্ত বিদীর্ণ করতো। প্রেম-ভক্তি ঈশ্বরকে একেবারে কাছে টেনে নিতে চায়। তাই এই দশরথ হ'য়ে ওঠা: আরাধ্যকে পুত্র ক'রে তোলা। তত্ত্বরূপে বাৎসল্য রসের সাধনার কথা প্রতিষ্ঠিত না হলেও অন্তরে বাৎসল্য রসের প্রবাহ ব'য়ে যাওয়া তো খুবই সম্ভব। ভাবের জগৎ এভাবেই প্রসারিত হয়।

ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করলেই মুক্তি সম্ভব; ভাগবত সে কথা শুনিয়েছে—

যেই জন বিষ্ণুপদে দেয় প্রাণ মন।
সমভাব তার প্রতি এই ত্রিভুবন॥ [পৃ. ১২৯]

ভাগবত আরও বলেছে যে, শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মই ভক্তের একমাত্র আশ্রয়, সেই পাদপদ্মে শরণ নিয়েই ভক্তরা ব্রহ্মলাভ করেন—

শরণ লইয়া সবে কৃষ্ণের চরণ।
পাদপদ্ম ধ্যান তাঁর করে অনুক্ষণ॥
যে পদযুগল সদা ভক্তের আশ্রয়।
সেই পাদপদ্মে গতি তাহাদের হয়॥
এইরূপে ব্রহ্মলাভ করে পঞ্চজন।
শুনি নির্মল পবিত্র কথা প্রেমে মত্ত মন॥ [পৃ. ৯১]

শাণ্ডিল্য-সূত্রও বলেছে যে, আত্মায় ভক্তি জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত জন্ম মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হবে, ভক্তি জাগ্রত হলেই হবে মুক্তি (৯৮)। শাণ্ডিল্য-সূত্র আরও বলেছে যে, ভক্তির আগুনে অহংবোধ ভস্মীভূত হয়—এতেই মোক্ষলাভ সম্ভব। নারদ সূত্রেও (৫৮-৬০) বলা হয়েছে যে, ভক্তিই মুক্তিলাভের শ্রেষ্ঠতম উপায়।

গীতা বলেছে—

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥ [৬ অ. ৪৭]

[সমস্ত যোগীর ভিতরেও যে আমাতে মন যুক্ত করিয়া আমাকে শ্রদ্ধাপূর্বক ভজন করে, উহাকে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী বলিয়া জানি।—গান্ধী ভাষ্য]

সুফীরাও বলেছেন, আল্লাহর সত্তা অসীম, মানুষের সত্তা সীমাবদ্ধ—এই অসম দুই সত্তার মিলন সেতু প্রেম। "সুফী সাধনায় তাই নানা বাধা বিপত্তির দেওয়াল টপকে, সমস্ত বন্ধুরতা ও কণ্টকাকীর্ণ পথ পেরিয়ে প্রেমাস্পদের দিকে ছুটে যায়। কোনো বন্ধনই তাকে থামাতে পারে না। বরং বাধা যত বেশি হয় তত তার প্রেমে গাঢ়তা দেখা

দেয়। পবিত্র কোরান শরীফে আল্লাহ্ বলেন, বিফর্ল্লাহ্ আকবর, অর্থাৎ আল্লাহ্কে স্মরণ করাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা" (ভারতের সূফী: মোবারক করীম জওহর, ১ম খণ্ড, ভূমিকা)।

সূফী শাহ লতিফ গেয়েছেন—

নামাজ রোজা—হ্যাঁ
নিশ্চয় তারও মূল্য আছে।
কিন্তু অন্য বর্তিকাও যে আছে
তার আলোতে আমি প্রিয়তমকে দেখি—
সে আলো, প্রেমের আলো।

ঈশ্বরকে প্রিয়তম বলে মনে করা সূফীদের সাধনায় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

মধ্যযুগে ভারতবর্ষে যে ভক্তি আন্দোলন আরম্ভ হয় তাতে ঈশ্বরের কৃপার স্থান ছিল অনেকখানি। জাত পাত, বর্ণবৈষম্য তাঁরা অস্বীকার করেছেন—আচার-অনুষ্ঠানেরও বিশেষ মর্যাদা দেন নি অনেকেই। রামানুজ দৃঢ়তার সঙ্গে বলতেন যে, ঈশ্বরেব কৃপা কোন বিশেষ বর্ণের মানুষের জন্য নির্দিষ্ট নয়, কারও প্রতি তাঁর পক্ষপাত নেই। রামানুজের পূর্ববর্তী শ্রীরঙ্গম মঠ-মন্দিরের প্রধান আলাভান্দার তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন, "সৌর জগতের প্রভু আমাদের জীবনের জীবন। যিনি ঈশ্বরের কাছে পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেন তিনিই ভক্ত।.... আমরা তাঁরই মধ্যে আছি এবং তিনি আছেন আমাদের মধ্যে। সেবা করার জন্যই আমাদের সৃষ্টি এবং মানবসেবাই সত্যকার আধ্যাত্মিকতা।" মধ্যযুগে এই মানবসেবা যথেষ্ট প্রাধান্য পেয়েছে।

রামানুজ প্রখ্যাত বৈদান্তিক গুরু যাদব প্রকাশকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করায় শ্রীরঙ্গমের শ্রীবৈষ্ণবরা তাঁকে বৈষ্ণব আন্দোলনের নেতৃত্বে বরণ করেন। চৈতন্যদেব পাণ্ডিত্যে নবদ্বীপ জয় করায় এবং দিগ্বিজয়ীকে পরাভূত করায় এবং সেই সঙ্গে গয়া থেকে ফিরে ভক্তি ভাবে আপ্লুত হয়ে পড়ায় নবদ্বীপের বৈষ্ণবরা তাঁকে বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রধানরূপে তাঁর অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

পূজা পদ্ধতিতে রামানুজ কঠিন নিয়ম-শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। সাধারণের বোধগম্য করার জন্য পুরাণের কাহিনী অবলম্বনে তিনি নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থাও করেন: মন্দির-কেন্দ্রিক কিছু কিছু উৎসবের ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন যাতে একঘেয়েমী বন্ধ হয়ে সাধারণ মানুষের মনে উৎসাহের সঞ্চার হয়। কান দিয়ে শোনার থেকেও চোখ দিয়ে দেখলে মনের মধ্যে তার ছাপ পড়ে বিশেষভাবে, সে কথা মনে রেখেই রামানুজ এ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

তিনি বিশ্বাস করতেন যে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই মুক্তির অধিকারী। যাঁরা আধ্যাত্মিক জগতে অগ্রসর হয়েছেন তাঁদের কাছে বর্ণবিভেদ মূল্যহীন বলে তিনি মনে করতেন। তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষদের মন্দিরে প্রবেশের অধিকার দেবার জন্য তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলেন: মহীশূরের তিরুনারায়ণ মন্দিরে অচ্ছুৎদের প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় তাঁরই প্রচেষ্টায়। কিন্তু শ্রীরঙ্গমে অত্যধিক গোঁড়ামী থাকায় এ

কার্য সেখানে সম্ভব হয় নি। ধর্মনেতাদের মধ্যে তিনিই প্রথম শিষ্যাদেরও গ্রহণ করেন, তাঁর মঠে বহু নারী থাকতেন। নারীপুরুষেও তিনি ভেদ করেন নি।

সমস্ত দক্ষিণ ভারতে তাঁর প্রচেষ্টায় বৈষ্ণব ধর্ম বিশেষ প্রসারলাভ করে। কিন্তু রামানুজ ঐশ্বর্য-প্রধান ভক্তির ওপরই জোর দেন—ভয়-শ্রদ্ধার দূরত্ব থেকে যায় তাঁর ভক্তিবাদে। কিন্তু একাদশ শতকে রামানুজের কিছুকাল পরের অন্ধ্রপ্রদেশে, নিম্বার্ক মাধুর্য-প্রধান ভক্তির কথা বলেন—এতে সখ্য এবং প্রেমের ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করা যায়। ধর্মের উৎপত্তি ভয়-শ্রদ্ধা থেকে হ'লেও ক্রমেই ভক্ত ও ভগবানে গভীর প্রেমের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তিনি আচার-অনুষ্ঠান পালনের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর শুদ্ধির কথাও বলেছেন। মুক্তির জন্য সন্ন্যাস গ্রহণের প্রয়োজন তিনি স্বীকার করেন নি। যুক্তি এবং ভাবাবেগের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছিলেন তিনি। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে অতিরিক্ত যুক্তিবাদ মানুষের অন্তর স্পর্শ করতে পারে না, আবার অতিরিক্ত ভাবাবেগও স্থায়ী হয় না।

রামানুজ এবং মধ্বাচার্যের (জন্ম ১১৯৭ খ্রীঃ) ব্রহ্ম নির্গুণাত্মক : নিম্বার্ক তাঁকেই সজীব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মনে করেন; তিনি কৃষ্ণ বা হরি। নিম্বার্ক এবং বল্লভাচার্য তাঁকে বলেছেন গোপাল (গোরক্ষক) কৃষ্ণ—রাধাও সেখানে বিরাজমানা। নিম্বার্কের ঈশ্বর মহিমান্বিত এবং মধুর—তিনি অসীম সৌন্দর্যের আধার, কৃপাময়-প্রেমময় এবং অপাপবিদ্ধ।

নিষ্কাম কর্ম, জ্ঞান, উপাসনা, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ এবং গুরুর নিকট আত্মনিবেদনকে নিম্বার্ক মোক্ষলাভের উপায় বলে নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে ঈশ্বরের সঙ্গে মানবের সম্পর্ক অন্তরঙ্গ এবং প্রেমপূর্ণ। তিনি মনে করেন যে, রাধা এবং গোপীদের সঙ্গে গোপাল কৃষ্ণের নিত্য লীলা চলেছে।

একাদশ শতকের নিম্বার্কের ন্যায় পঞ্চদশ শতকের বল্লভাচার্যও (১৪৭৩-১৫৩১ খ্রীঃ) ছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের ব্রাহ্মণ। তাঁর পরিবারেও গোপাল কৃষ্ণের ভজনা হ'ত। ভারতের বহু দেশ ভ্রমণ করে তিনি বহু ধর্মনেতার সঙ্গে মত বিনিময় করেন। বিজয়নগর রাজদরবার থেকে তিনি আচার্য বা শিক্ষাগুরু উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁর প্রবর্তিত পথকে ঈশ্বরের কৃপা লাভের পথ বা পুষ্টি মার্গ (শুদ্ধাদ্বৈত বাদ) বলা হয়। তাঁর পরম সত্তা ব্রহ্ম সৎ-চিৎ-আনন্দ ও রসময়। লীলার জন্যই তিনি বিশ্বসৃষ্টি করেছেন। পুষ্টি-পন্থীরা ঈশ্বরকে ভালবাসেন বলেই তাঁকে পূজা করেন। প্রেমাস্পদ ঈশ্বরকে গোপীজন-বল্লভ বলা হয়। পুষ্টিপন্থীরা তাই নিজেদের গোপী বলে মনে করেন। কৃষ্ণই তাঁদের একমাত্র স্বামী।

বল্লভাচার্য বহুদিন বৃন্দাবনে বাস করেন; তাঁকে সুরদাসের (১৪৭৮-১৫৮১/৮৬ খ্রীঃ) গুরু বলে অনেকে মনে করেন। মীরাবাঈয়ের (১৪৯৮-১৫৪৬/৪৭ খ্রীঃ) ওপরও তাঁর যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল বলে অনুমিত হয়। বল্লভাচার্য বাৎসল্য, দাস্য, সখ্য এবং মধুর ভাবের কথাও বলেছিলেন।

চৈতন্যদেবের বহু পূর্বেই মধুর ভাবের প্রচার করেছিলেন নিম্বার্ক। নিত্যানন্দ প্রভু,

অদ্বৈত আচার্য বা শ্রীরাম পণ্ডিতকে চৈতন্যদেব রসতত্ত্বের কোন শিক্ষা দেন নি। চৈতন্য-ভাগবতেও 'শ্রীরাধার ভাব-কান্তি করি অঙ্গীকার' চৈতন্যদেব পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এমন কথা পাওয়া যায় না। চৈতন্যচরিতামৃতে রায় রামানন্দের মুখেই প্রথম মধুর রসের কথা শোনা যায়; চৈতন্যদেবের প্রশ্নের পর প্রশ্নের জবাবে রামানন্দ রসতত্ত্ব শোনান। চৈতন্যদেব নিজের মনের কথা রায়ের জবানীতে বলিয়েছেন এ কথা মনে করার কারণ কি? নিত্যানন্দও চৈতন্যদেবের পূর্বে দক্ষিণ ভ্রমণ করেছিলেন। নিম্বার্ক-বল্লভাচার্যের কথা তাঁরও জানা থাকা সম্ভব। কিন্তু তাঁর সঙ্গে রসতত্ত্বের কোন আলোচনা চৈতন্যদেবের হয়েছিল, এমন কথা নিত্যানন্দ-অনুচর শ্রীরাম পণ্ডিতের কন্যা নারায়ণীর পুত্র বৃন্দাবন দাস কোথাও বলেন নি। সুতরাং তত্ত্বটির আমদানি যে দক্ষিণ দেশ থেকেই হয়েছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ভক্ত রায় রামানন্দ দক্ষিণ দেশের গজপতি প্রতাপরুদ্র অধিকৃত গোদাবরী তীরবর্তী স্থানের প্রশাসক ছিলেন। নিম্বার্ক এবং পরবর্তীকালের বল্লভাচার্যের চিন্তাধারার প্রভাব খুব স্বাভাবিকভাবেই ভক্তপ্রবর রামানন্দের ওপর এসে পড়তেই পারে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ জানিয়েছেন যে, রূপকে প্রয়াগে শিক্ষা দিয়ে বৃন্দাবনে পাঠিয়েছিলেন চৈতন্যদেব। কি শিক্ষা দিয়েছিলেন তা তিনি বলেন নি—তবে বৃন্দাবন থেকে যে তত্ত্বটি আসে তা কৃষ্ণদাস জানিয়েছেন—

রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।
রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই॥ [চৈ. চ., পৃ. ১৩]

এবং, প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনি অবতরি।
রাধা-ভাব-কান্তি দুই অঙ্গীকার করি॥ [তদেব., পৃ. ১৪]

বল্লভাচার্যের প্রভাবে পরবর্তীকালে এই তত্ত্বটি বৃন্দাবন থেকে বাঙ্গালী মনীষাকে অবলম্বন করে গৌড় দেশে প্রবর্তিত হয়েছিল এ কথা কি মনে করা ভুল হবে?

সুফী সাধকরা সাধারণের চিত্ত জয় করতেন মিষ্ট ব্যবহারের দ্বারা। ধনী এবং ক্ষমতাশালীদের থেকে তাঁরা থাকতেন দূরে—চৈতন্যদেবও বিষয়ীদের কাছ থেকে থাকতেন দূরে। ঈশক (প্রেম), রেজা (স্বর্গীয় ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ) এবং ওয়ারিয়া (সততা) প্রভৃতি ছিল তাঁদের মূলমন্ত্র। প্রেমিকা প্রেমাস্পদের সম্পর্কে সুফীরাও গণ্ডদেশ, চক্ষু, অধরের কথা বলেছেন বৈষ্ণবদের মতোই। সুফীরাও ভারতীয়দের ন্যায়ই ভক্ত প্রেমিককে প্রেমাস্পদ ঈশ্বর-সন্ধানী আবেগময়ী নারী রূপে কল্পনা করেছেন, অর্থাৎ তাঁদের ধ্যান-ধারণায়ও মাধুর্যরসের সন্ধান পাওয়া যায়। মধ্যযুগের এক সুফী-সাধক গেয়েছেন—

শুন সাহেলি পিতম কি বাত।
যুন মিল রহি জিম দুধ নাবাত॥ [Baba S. Farid, p. 95]

[আমার প্রেমের কথা শোন ওগো সুন্দরী মিতে।
আমি মিলেছি তাঁতে মিছরি যেমন মেলে দুধে॥]

ফরিদ লিখেছেন—

সান্ত্বনা কোথায় সে নারীর প্রভু হতে যে রহে দূরে ?
তাঁরই কৃপায় কেবল মিলিতে সে পারে। [পৃ. ১০০]

উত্তরকালের বৈষ্ণব পদাবলীর সুরও শোনা গেছে তাঁর কণ্ঠে—

কর্দমময় পথ যে ফরিদ—প্রিয়তমের গৃহ যে দূরে।
গভীরতর প্রেম যে আমার তাঁহারই তরে॥
বেরিয়ে পড়ি যদি, পরিধেয় যাবে গো ভিজে।
ঘরেই যদি রয়ে যাই, প্রেম হবে যে মিছে॥

সুতরাং দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে সুফী সাধকদের কণ্ঠেও মাধুর্য রসের কথা ধ্বনিত হয়েছে ভারতের মাটিতে।

উত্তর ভারতে মধ্যযুগে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক ছিলেন রামানন্দ (১২৯৯/১৩০০-১৪১১ খ্রীঃ ?)। তিনি নিজ শিষ্যদের মধ্যে বর্ণবৈষম্য ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন ; সমস্ত ভক্তকেই তিনি এক জাত, এক বর্ণের বলে মনে করতেন। চৈতন্যদেবও হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডালকে দ্বিজ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতেন। ভক্ত এবং পাষণ্ড (ভক্ত নয়) এই দুটো জাতে সাধকরা মানব সাধারণকে বিভক্ত করে ফেলেছিলেন। রামানন্দের যে সঙ্গীতটি গ্রন্থসাহেবে স্থান পেয়েছে তাতে তিনি বলেছেন যে, ভগবান আছেন অন্তরমাঝে ; জল-প্রস্তর যাই দেখি না কেন সব কিছুই তাঁর উপস্থিতিতে হয়েছে পূর্ণ। বেদের মধ্যে তাঁকে খোঁজা বৃথা ; গুরুই শত সহস্র কর্ম বন্ধন থেকে করেন মুক্ত। বেদের মধ্যে তাঁকে পাওয়া যায় না বলে রামানন্দ আচার অনুষ্ঠানের অসারত্বের কথাই বোঝাতে চেয়েছেন।

গীতায় শ্রীভগবানও বলেছেন—

সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ (১৮অঃ—৬৬)

[সকল ধর্ম ত্যাগ করিয়া এক আমারই শরণ লও। আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব। শোক করিও না।]

কবীর (পঞ্চদশ শতকে জীবিত ছিলেন) রামানন্দ এবং শেখ তকীর শিষ্য ব'লে কথিত। তিনি ছিলেন অদ্বৈতবাদী ; হিন্দু এবং মুসলমানের ধর্মের ভাল দিকগুলো তিনি মেলাতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বহু পর্যটন করেন—পুরীতেও তিনি গিয়েছিলেন ব'লে শোনা যায়। চৈতন্যদেবের সঙ্গে কোথাও তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল কিনা এ কথা জানা যায় নি। সুফী এবং বৈষ্ণবদের ভক্তিবাদের প্রভাব পড়েছিল তাঁর ওপর বিশেষভাবে। তাই নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়েও তিনি আত্মা-পরমাত্মার মধ্যে প্রেমিক প্রেমাস্পদের সম্পর্কের তুলনা করেছেন—'আত্মার মাঝে পরমাত্মার মিলে শুধু দরশন।'

আজ মেবে প্রীতম ঘর আয়ে
... ...
কহে কবীর, ধন্য ভাগ হামারা পরম পুরুষ বর পাউ॥

[ব্রহ্মসঙ্গীত : পৃ. ১০৬১]

অন্য অনেক সাধকের ন্যায়ই আচার-অনুষ্ঠানে কবীরের কোন আস্থা ছিল না—

আমারে কোথায় খুঁজিস বান্দা, আমি আছি পাশে তোরই।
নিবেদিত ছাগে অথবা মেষেতে—আমি নাহি বাস করি।
নাই আমি পশুচর্মে-পুচ্ছে অস্থি মাংসে, হায়,
নাই আমি (বলিদানের) খড়্গে (জাবেহর) ছুরিকায়।
নাই আমি রথে, নাই প্রতিমায়, নাই নির্জনবাসে
নাই মন্দিরে, নাই মসজিদে, নাই কাবা কৈলাসে।
নাই জপে, নাই ব্রতে উপবাসে ক্রিয়াকরমের স্থলে,
যোগে সন্ন্যাসে নাই আমি, নাই প্রাণে বা পিণ্ডতলে।
সৃষ্টি ব্যাপী ও মহাকাশে নাই,—গহন গুহার মাঝে,
সকল দেবীর শ্বাসের মাঝারে আমি কভু রহি না যে।
যে আমারে খোঁজে সত্যই পায় পলকে সে সন্ধান।
কহেন কবির, শোন সাধু, সে যে আমার প্রাণের প্রাণ। [কবীর, পৃ. ৫৩]

কবীরের মধ্যে দাস্য ও মাধুর্যরসের সন্ধান পাওয়া যায়—

ভকতজনের পরম পালক সে আমার প্রিয়তম—
তার সাথে কবে মিলন ঘটিবে মম ?
... ...
দাস কবীরের বিরহ দারুণ দহিতেছে তনুমন,
দেখা দাও, প্রিয, দাও তারে দরশন। [কবীর, পৃ. ৪৩]

ঈশ্বর-অনুভূতি সকল জীবের প্রতি সমভাব জাগ্রত করে; অন্যান্য সাধকের ন্যায় কবীরেরও সেই একই উপলব্ধি হয়েছিল—

প্রিয়ের সাথে মিলন হবে তোর,
খোল রে আগে মুখের আঁচল খানি।
সকল জীবে বিরাজ করেন প্রভু,
কাহারে তুই বলিস কটু বাণী। [তদেব, পৃ. ৪৬]

বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানকে কবীর নিরর্থক বলে মনে করতেন। স্নান-উপবাস, লোক-দেখানো মালা-ফেরানোকে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন—উচ্চস্বরে ভগবানের নাম উচ্চারণ অর্থহীন বলে তিনি মনে করেছেন—

মিনার চূড়ায় দাঁড়াইয়া কাজি—কেন দেন অত উচ্চ-হাঁকি
ভোরের আজান—আল্লা তাঁহার বধির নাকি ?

এই অর্থে তিনি সংকীর্তনেরও বিরোধী ছিলেন বলে অনুমান করা চলে।

সমকালীন রাজা-সুলতানদের বিরোধ, সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের স্বরূপ সম্বন্ধে সজাগ করে তুলেছিল কবীরকে। তিনি বুঝেছিলেন সমাজের অবস্থার ওপর ধর্ম বিশেষ নির্ভরশীল। গুহার অভ্যন্তরে সাধনারত সন্ন্যাসীর সাধনায় সামাজিক আলোড়ন কোন

ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে না পারলেও তাঁদের ন্যায় সংসারী অথবা সমাজ কল্যাণকামী সাধুদের তা যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি করে। কবীর গেয়েছেন—

সমবেত করি সৈন্যদল
পরের দুর্গ করা দখল—
দেখানো অপরে আপন বল
নৃপতির কাজ এই কেবল ?
বাদশাহ যবে মরণ হবে—
এ খেলার তার কি বাকী রবে ?

খুব স্পষ্ট করেই তিনি বলেছেন—

ক্ষুধার্তের ধর্মনিষ্ঠা পাবে না থাকিতে, ফিরে লও জপমালাখানি।
দুবেলা উদর পূর্তি লাগি আমি মাগি,—অর্ধসের শস্য দাও আনি॥

অন্নময় কোষকে সন্তুষ্ট না করে উচ্চতর মার্গে উত্তরণ সম্ভব নয়।

সাধকরা সমাজের সমস্যা এড়িয়ে চলেন এমন ভাবনা সঠিক নয়। সে যুগের অন্যতম জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ চৈতন্যদেব প্রেম-ভক্তির প্রাবল্য সত্ত্বেও বিশেষ সমাজ-সচেতন ছিলেন। তাই তো দক্ষিণ দেশে তাঁকে প্রথম যাত্রা করতে হয়েছিল। রামানুজ তিরুপতি মন্দিরের শঙ্খ-চক্র খুঁজে বের করেছিলেন, দেবমূর্তির সন্ধানে সুলতানের সভায় গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। চৈতন্যদেবের নির্দেশে বৃন্দাবন-মথুরার লুপ্ত ইতিহাস, মন্দির প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়েছিল। সমাজ-সচেতন ব্যক্তিত্বের তিনি অধিকারী ছিলেন এ কথা স্মরণে রেখেই তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সন্ধান করতে হবে।

গুরু নানক (১৪৬৯-১৫৩৯ খ্রিঃ) জাত-পাত, বর্ণভেদ মানতেন না; সৎভাবে জীবনযাপন, মূল্যবোধ প্রভৃতির ওপর তিনি বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। পবিত্র নদী বলে কোন কিছু আছে এ কথা তিনি বিশ্বাস করতেন না। সত্যবাদিতা এবং বিনয়কে তিনি জীবনে বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তিনি মূর্তিপূজা বিরোধী ছিলেন—তাঁর কাছে ভক্তি ছিল নিগুর্ণাত্মক। সন্ন্যাস গ্রহণকে তিনি মর্যাদা দেন নি। মানবসমাজের ঐক্যে ছিল তাঁর গভীর বিশ্বাস। আচার অনুষ্ঠানে বিশ্বাস না থাকলেও ভক্তের জীবনে শৃঙ্খলা আনার জন্য তিনি জপ করতে বলতেন; ভগবানের রূপ সম্বন্ধে গ্রথিত করার উদ্দেশ্যে সর্বদাই তিনি তাঁর নাম উচ্চারণ করতে বলতেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলছে—

কলির কলুষহারী শ্রীহরির নাম।
মুক্তিকামী জাহে তাহা শুনে অবিরাম॥
হরিনাম বিনা তার নাহি অন্য গতি।
হরিলীলানাম বিনা নহে শুদ্ধ মতি॥ [পৃ. ৩৪]

গুরু নানক সেই হরির নাম সর্বদা উচ্চারণ করতে বলেছেন। কবীরও বলেছেন—

তুমি তো শব্দ ছাড়া আর কিছু নহ।
... ...
শব্দ বচনে, শব্দ শ্রবণে থাকে,
শব্দই দেয় মূর্তি কল্পনাকে।

এই শব্দ নাম-এরই নামান্তর।

চৈতন্যদেবের কণ্ঠেও শোনা গেছে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ [চৈ. চ, পৃ. ৩১]

সুতরাং চৈতন্যদেবই নামের মাহাত্ম্য প্রথম প্রচার করেন এ কথা-ঠিক নয়। সমস্ত ভারতবর্ষে এখন ভাগবত ধর্মের প্রাধান্য, সর্বত্র প্রেম-ভক্তির প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নাম প্রচারও আরম্ভ হয়ে গেছে। মাধুর্য রসের কথাও শোনা গেছে একাদশ শতাব্দীতে নিম্বার্কের সময় থেকেই—দক্ষিণ ভারতের বল্লভাচার্যও চার প্রকার রসের কথাই বলেছেন।

মহীশূরে দ্বাদশ শতকের বীরশৈব বাসভান্না (বা বাসব) বালক বয়সেই মন্দিরের দেবতার সঙ্গে কথা বলতেন, নাচতেন, গান করতেন 'করতালি' দিয়ে—আবেগে একেবারে মত্ত হ'য়ে যেতেন তিনি। চৈতন্যদেবের ভাববিহ্বলতার সঙ্গে বাসভান্নার ভাবাবেগের অনেকটা মিল লক্ষ্য করা যায়। বাসভান্নার সমকালে অর্থাৎ দ্বাদশ শতকে কর্ণাটকের শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসিনী ছিলেন আক্কামহাদেবী। বালিকা বয়েস থেকেই ঈশ্বরের প্রতি তাঁর প্রেম জন্মে—যৌবনকালে তিনি নিজেকে ঈশ্বর পত্নী ব'লে মনে করতেন। ঈশ্বর-প্রেমে তিনি তাঁর স্বামীকে পরিত্যাগ করেন। পরবর্তীকালে বাসভান্না নিজ গৃহে আক্কামহাদেবীর সঙ্গে ভগবানের বিবাহ দেন। মাধুর্য রসের এই বাস্তব পরিচয় পাওয়া যায় বীরশৈবদের ধ্যান-ধারণাতেও। সাধনার প্রথম স্তরে বাসব ঈশ্বরকে প্রভু এবং নিজেকে দাস বলে মনে করতেন; পরবর্তী স্তরে তিনি ঈশ্বরকে স্বামী এবং নিজেকে পত্নী ব'লে ভাবতেন। বীরশৈব মতে প্রেমাস্পদ-ঈশ্বর এবং প্রেমিকা-ভক্তের কল্পনা আছে। মধুর রসের কথা কেবল বৈষ্ণব মতেই ছিল তা নয়—বীরশৈবদের মধ্যেও তার পরিচয় পাওয়া যায়। বাসব ঈশ্বরকে পিতা-মাতা ব'লেও সম্বোধন করেছেন।

বিজয়নগরের সম্রাট কৃষ্ণদেব রায়ের গুরু ব্যাসরায় (জন্ম ১৪৫৬ খ্রীঃ?) দাস গায়কদের পরিচালনা করেন। পুরন্দরদাস প্রভৃতি প্রেম-ভক্তির গান গেয়ে বেড়ান। দক্ষিণ ভারত পর্যটনরত চৈতন্যদেবের প্রভাবও পড়ে এই দাস গায়কদের ওপর। ব্যাসরায়ের সঙ্গে চৈতন্যদেবের যে মিলন হয়েছিল এ বিষয়টি তার সাক্ষ্য দেয়।

উত্তর ভারতেও মধুর রসের কথা বিভিন্ন সাধকের সঙ্গীতে, প্রচারে জানা যায়। মূর্তিতে বিশ্বাসী না হ'লেও অনেক সময় পুরন্দরের ব্রহ্ম যেন জীবন্ত হ'য়ে উঠেছেন—হয়েছেন মানবধর্মী—

'ওরে নববধূ, বিবাহের গান গা' রে, রাজা রাম মোর বর এল ঐ দ্বারে' অথবা, 'আমি শুধু রামের কুকুর'।

এই তো দাস্য ও মধুর ভাবের প্রকাশ!

গুরু নানকও ঈশ্বরের নাম মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন—৬৮ তীর্থে স্নানের থেকেও তা শ্রেষ্ঠতর। ভক্তির জগতে তিনি জাত-পাত বর্ণবিভেদকে অস্বীকার করেছেন। গুরু নানকের জন্মকালে ভারতে হিন্দু-মুসলমান, এমন কি, একই ধর্মের বিভিন্ন গোষ্ঠী শান্তিতে বসবাস করতে অক্ষম হয়ে পড়েছিল। সমাজ সচেতন নানক তাই বলেছিলেন—'সময়টা অস্ত্রে পরিণত হয়েছে এবং রাজারা হয়ে উঠেছেন কসাই'। তিনি আরও বলেছিলেন—

এই অন্ধকার রাত্রে সত্যের চাঁদ হয়েছে অদৃশ্য

. . ...

আঁধারে যায় না দেখা পথের লেশ।

কবীরের ন্যায় তিনিও ছিলেন সমাজ সচেতন, রাজনীতি সচেতন—এমনটিই দেখা গেছে চৈতন্যদেবের মধ্যেও। গুরুর শিক্ষা নতুন চেতনা জাগিয়ে তুলেছিল মানুষের মনে—অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তির উপায় সন্ধান করতে লাগল তারা। উপবীত এবং আচার-অনুষ্ঠানের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করলেন তিনি—উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি ভারতের প্রায় সর্বত্র এবং ভারতের বাইরেও বহু অঞ্চল ভ্রমণ করেন।

বাল্যকালে নানকের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল বলে তাঁর আত্মীয়স্বজন মনে করতেন। চৈতন্যদেবের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। ড. বিমানবিহারী মজুমদার দেখিয়েছেন যে, নানক এবং চৈতন্য উভয়েই পূর্ণিমার দিনে জন্মগ্রহণ করেন। গুরুর জন্ম হয় কার্তিকী পূর্ণিমায় (রাসলীলার দিন), চৈতন্যদেবের জন্ম ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে। এই সূত্রে তিনি স্মরণ করতে বলেছেন যে, বুদ্ধদেব এবং রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে।

ঈশ্বরদাসের চৈতন্যভাগবতে দেখা যায় যে, গুরু নানক পুরীতে চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ লাভ করেন। চৈতন্যদেবের ভাববিহ্বল নৃত্য দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে যান এবং নিজেও তাঁর সঙ্গে নৃত্য-গীতে যোগ দেন।

সমাজ-সচেতন, রাজনীতি-সচেতন এবং অত্যাচার দমনে বদ্ধপরিকর ধর্মনেতা গুরু নানকও মধুর রসের গান গেয়েছেন—এ সময়ে চৈতন্যদেবেরই ন্যায় তাঁর চোখ দিয়েও অশ্রুর ধারা প্রবাহিত হতো—

গহন বনে পথভ্রান্ত একেলা আমি।
ওগো প্রভু, শোন কথা মোর শোন স্বামী॥

... ... — ...

ওগো নানক! সৌভাগ্যবতী নারী তার প্রভুকে খোঁজে।
এবং এক হ'য়ে যায় তাহার মাঝে॥

উত্তর ভারতের রামানন্দ শিষ্য মুচি রবিদাস বা রুইদাসও জাত-পাত বর্ণভেদ অস্বীকার করেছেন—

জাতি পাঁতি পুছে নাহি কোই।
হরিকো ভজে সো হরিকো হোই॥

তিনিও নামের মাহাত্ম্য প্রচার করতেন : ঈশ্বরের নাম পাপতাপ দূর করে—

অনেক অধম জিব নাম গুণ উধরে
পতিত পাবন ভয়ে পরসি সার।
ভনত রৈদাস ররংকার গুণ গাওয়াতে।
সন্ত সাধু ভয়ে সহজ পার॥

মধুর রসের কথা তিনিও বলেছেন—

প্রভুজী! তুম্ স্বামী, হম্ দাসা।
এইসি ভক্তি করে রৈদাসা॥

বল্লভাচার্যের শিষ্য সুরদাস (১৪৭৮-১৫৮১/৮৫ খ্রীঃ) গান গাইতেন; অন্ধ সাধক ভক্তিরসে জারিয়ে গান রচনা করতেন। বল্লভাচার্য তাঁকে বৃন্দাবনের শ্রীনাথ মন্দিরের গায়ক নিযুক্ত করেন। গুরুর নিকট তিনি নবরসের শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর সঙ্গীতেও মধুর রসের সুস্পষ্ট পরিচয় আছে—

আমার হৃদয়ে স্থান আর নাই।
নন্দের নন্দন সেথা রয়েছে সদাই॥

অথবা, ওগো প্রিয়তম!
তব বাসভূমি হোক অন্তর মম।

এবং, তোমার বিরহ আমার কাছে;
অলঙ্ঘ্য পাহাড় সম যেন বিরাজে।

দাস্য ও মধুর ভাবের আকূতি দেখা যায় রাজস্থানের মীরা বাঈয়ের মধ্যে। বালিকা মীরাকে গিরিধারীলালের মূর্তি দেন জনৈক পর্যটক সন্ন্যাসী। কর্ণাটকের আক্কামহাদেবীর ন্যায়ই মীরাও সেই মূর্তিকে স্বামী ব'লে গ্রহণ করেন এবং তার জন্য নানা অত্যাচার সহ্য করেন। মীরার ভজনে তাঁর অন্তর জানা যায় পরিষ্কার রূপে—

হামারে জগমমরণকে সাথী
... ...
মীরাকে প্রভু পরম মনোহর, হরিচরণা চিতরাতী। (ব্রহ্মসঙ্গীত, ১০৬৪)

রামচরিতমানস রচয়িতা তুলসীদাস (আঃ ১৫৩২-১৬২৩ খ্রীঃ) মানব মনে বিশ্বাস এবং আশার সঞ্চার করেন। জাত-পাত, বর্ণবৈষম্যকে তিনি অস্বীকার করেছিলেন। তিনি ছিলেন পরিত্যক্ত শিশু—প্রথম জীবনে ভিক্ষাই ছিল তাঁর জীবন-ধারণের একমাত্র উপায়। রামানন্দ শিষ্য নরহরি দাস তাঁকে আশ্রয় দেন। রাম নাম কীর্তনই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। নিজেকে তিনি রামের দাস বলে প্রচার করতেন, তাঁর জীবনে দাস্য ভাবেরই প্রাধান্য। শিবের প্রতিও তাঁর ভক্তি ছিল অগাধ—তাঁর রাম শিব-বিরোধিতাকে নিজের বিরোধিতা বলে মনে করতেন। চৈতন্যদেবও শিবের প্রতি ভক্তিমান ছিলেন। তুলসীদাসও বিশেষ সমাজ-সচেতন ছিলেন—তিনি অনুভব করেছিলেন যে, দারিদ্র্যরূপী রাবণ পৃথিবীকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। তাই মানবসেবাকেই তিনি সর্বোচ্চ ধর্ম বলে

মনে করতেন। মানবসেবা এবং ঈশ্বরপ্রেম তাঁর কাছে এক হয়ে গিয়েছিল। বর্তমান কালের সাধকরাও সেই একই কথা বলেন—

জীবে প্রেম করে যেই জন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

মহারাষ্ট্রেও এসেছিলেন একদল সাধক—নামদেব, জনাবাই, মুক্তাবাই, একনাথ, তুকারাম প্রভৃতি। এঁরা সকলেই সাম্য এবং ভ্রাতৃত্বের বাণী প্রচার করেছেন। মুসলমানদেরও সকলের সঙ্গে এক সূত্রে গাঁথার চেষ্টা হয়েছে। তুকারামের (১৬০৮-১৬৫০) সময়ে শিবাজীর অভ্যুদয় ঘটে। মোগলরা এ সময়ে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হতে থাকে। তুকারামের গ্রামের আশেপাশে মোগল-পাঠানের যুদ্ধ চলে। মোগলরা ছিল সুন্নী এবং দক্ষিণের পাঠান মুসলমানরা ছিল সিয়া। এই সাম্রাজ্যবাদী বিরোধ সিয়া-সুন্নির বিরোধও বটে।

নামদেব গানের সাহায্যে গ্রামে গ্রামে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভক্তির কথা প্রচার করেন। তিনি আচার-অনুষ্ঠানকে করে তোলেন সহজতর। দান, দয়া, সহনশীলতা, মহত্ত্ব প্রভৃতি গুণগুলো মানুষের মনে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা চালালেন ভক্তিমার্গের সাধকেরা। ধর্ম ও রাজনীতি-চেতনা জাগিয়ে তোলার জন্য কীর্তনকে ব্যবহার করা হ'তো। জাত-পাত, বর্ণবৈষম্য দূর করে সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠার সাধনা করেছিলেন তাঁরা। এইসব সাধকরা সন্ন্যাস গ্রহণের বিরোধিতা করেছেন বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে।

এঁরা যে কতখানি সমাজ-সচেতন ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় তুকারামের লেখা থেকে। দারিদ্র্যের প্রভাব দেখে ঈশ্বরের ওপর ক্ষোভও প্রকাশ করেছেন তিনি—

লজ্জিত হচ্ছি নিজেকে তোমার ভৃত্য বলে পরিচয় দিতে
তুমি নিষ্ঠুর, তুমি উদাসীন ;
ক্ষুধার জ্বালায় ক্রন্দন করতে দিচ্ছ তুমি তোমার সন্তানদের।

এবং, যদি উদাসীনই থেকে যাও তুমি,
তোমার মহৎ নামে কলঙ্ক লেপিব আমি।

তুকারাম যশোদা বা দশরথ হয়ে ওঠেন নি—ঈশ্বরকে সম্বোধন করেছেন মাতা বলে। দাস্যভাব এবং বিপরীত বাৎসল্য ভাবের পরিচয় দেয় তাঁর লেখনী—

তু মাউলীহূনী মায়াল চন্দান্ডূলী শাতিল।
পানিয়াণ্ডূলী পাতল কণ্ডোল প্রেমাচা॥ [তুকারাম, পৃ. ৪৪]

অভিমান অনুযোগ সত্ত্বেও তাঁরই ওপর নির্ভরশীল তুকারাম—তাঁর মনোভাব কতকটা এই রকম—

যেখানেই যাই আমি তুমি চল সঙ্গে।
পথ দেখিয়ে হাত ধরে নিয়ে চল রঙ্গে॥

রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—

আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা
আমি যে পথ চিনি না।

দাদূর (ষোড়শ শতক ?) জন্মকাল এবং জন্মস্থান নিয়ে বিরোধ আছে। অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন বলেন, "বঙ্গের এক শ্রেণীর বাউলরা তাঁদের প্রণামে কবীর, দাদূ, নানক প্রভৃতির নাম করেন : "শ্রীগুরু, দাউদ বন্দি দাদূ যাঁর নাম"।

"তাহা হইলে দেখা যায় যে, কবীরের শিষ্য কমাল, কমালের শিষ্য দাদূ। দাদূর শিষ্য রুজ্জবজী—এই একটি সাধকের ধারা চলিয়া আসিতেছে যাঁহারা জন্মতঃ মুসলমান অথচ হিন্দুভাবের সহিত ঘনিষ্ঠতা যুক্ত। ইঁহারা সকল সম্প্রদায়ের অতীত সত্যের ও ভাবের সাধনায় ভরপুর।" [দাদূ, শ্রীক্ষিতিমোহন সেন, পৃ. ২০]

দাদূ বলেন, "আমি হিন্দুও বুঝি না মুসলমানও বুঝি না, এক তিনিই সকলের স্বামী, দ্বিতীয় আর তো কাহাকেও দেখি না।" (দাদূ, রাগ ভৈঁরো, পদ ৩৯৬) দাদূর গুরু কমলও মনে করতেন যে, ঈশ্বর সবারই স্বামী। স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্কের কথা কবীর সম্প্রদায়ে থাকবারই কথা।

আসামে শঙ্করদেবও (১৪৪৯-১৫৬৯ খ্রীঃ) জাত-পাত বর্ণবৈষম্যকে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে ভক্তির দ্বার শ্রেণীনির্বিশেষে সকলের জন্যই উন্মুক্ত, দ্বিজ ও অন্ত্যজের ধর্মীয় স্তর অভিন্ন ; তিনি ঘোষণা করেন—

চণ্ডাল পর্যন্ত করি
হরিভক্তি অধিকারী।

অদ্বৈত আচার্য চণ্ডালকে উদ্ধারের অনুরোধ জানিয়েছিলেন চৈতন্যদেবকে—

অদ্বৈত বলেন "যদি ভক্তি বিলাইবা,
স্ত্রী-শূদ্র আদি যত মূর্খেরে সে দিবা॥
চণ্ডাল নাচুক তোর নাম গুণ গায়্যা॥ [চৈ. ভা., পৃ. ১৩১]

চণ্ডালকে চৈতন্যদেব কেবল হরিভক্তির অধিকারী করেন নি, হরিভক্তি পরায়ণ চণ্ডালকে দ্বিজ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলেছেন।

সক্রিয় ব্রাহ্মণ এবং রাজাদের দীক্ষিত করতে অস্বীকার করতেন শঙ্করদেব, চৈতন্যদেবও বিষয়ীদের কাছ থেকে দূরে থাকতে চাইতেন, রাজা প্রতাপরুদ্রকে বহু পরে তিনি কৃপা করেন।

শঙ্করদেব বিধিবন্ধ আচার-অনুষ্ঠান বাতিল করেন। সংকীর্তন এবং প্রার্থনার ওপরই জোর দেন তিনি। চৈতন্যদেবও আচার-অনুষ্ঠানে বিশ্বাসী ছিলেন না, তথাপি তিনি অভ্যাসের দ্বারা নিষ্ঠাবান করে তোলার উদ্দেশ্যে ৩ লক্ষ বার নাম জপের উপদেশ দিতেন। শঙ্করদেব নামগানকে প্রাধান্য দিয়েছেন—তিনি দাস্য ভাবের উপাসক ছিলেন :

সেই তো আমার প্রভু হরি কথা যে করে প্রকাশ।
করে তাঁর নাম গান, স্মরে রূপ, আমি তার দাস॥

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সপ্তম শতাব্দী থেকে আলোয়াররা ভক্তি ভাবের প্রচার আরম্ভ করেন এবং একাদশ শতাব্দীতে নিঃস্বার্থ ভক্তিবাদে মধুর রসের তত্ত্ব যুক্ত করেন। ভারতের উত্তর দক্ষিণ সর্বত্রই প্রেম-ভক্তি এবং বিশেষ করে মধুর রসের কথাও ধ্বনিত হয়

বহু সাধকের কণ্ঠে; নামকীর্তনও প্রচার করেন সাধকেরা—আচার-অনুষ্ঠান, জাত-পাত, বর্ণভেদেরও বিরোধিতা করেন তাঁরা।

অধিকাংশ সাধকই তত্ত্বরূপে প্রেমভক্তি এবং মধুর রসের সাধনাকে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু চৈতন্যদেবের জীবনে তা সত্য হয়ে উঠেছিল। সাধকরা নিজ নিজ তত্ত্ব প্রচার করেছেন—যুক্তিগ্রাহ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন, ভাবের আবেগে কাব্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু চৈতন্যদেবের ক্ষেত্রে এর কোনটাই ঘটে নি। তিনি হয়ে উঠেছিলেন সজীব প্রেমমূর্তি—প্রচারের জন্য তিনি কারও কাছে যান নি, দলে দলে মানুষ ছুটে এসেছে তাঁর কাছে; পদরেণু নেবার জন্য পথের ধুলো নিয়ে কাড়াকাড়ি করেছে মানুষ, পথে গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। প্রেম-ভক্তি, মধুর রসের ধারা যেন প্রবাহিত হয়েছে তাঁর দেহ থেকে—'স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত'—কাঞ্চন বর্ণ দেহ যেন অমৃত হয়ে গলে পড়েছে প্রতিনিয়ত, জনগণ সেই অমৃতের লোভে তাঁর নিকটে এসে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এখানেই চৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য: এই স্বেদ-পুলক-কম্পের সাত্ত্বিক লক্ষণ কদাচিৎ লক্ষ্য করা গেছে অন্যত্র। গুরু নানক এই অমৃত-নিস্যন্দি রূপ দেখে নিজেও নৃত্য ক'রে উঠেছিলেন—চৈতন্যদেবের উপস্থিতিই তো মহা প্রচার! চৈতন্যদেবের চরণে আশ্রয় নেবার জন্যই তো লক্ষ লক্ষ লোক চলেছে তাঁর সঙ্গে—রামকেলি গ্রামে পৌঁছে—

তাঁহা নৃত্য করে প্রভু প্রেমে অচেতন।
কোটি কোটি লোক আইল দেখিতে চরণ॥
গৌড়েশ্বর যবনরাজ প্রভাব শুনিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু বিস্মিত হইয়া॥
বিনা দানে এত লোক যার পাছে ধায়।
সেই ত গোসাঞি ইহা জানিহ নিশ্চয়॥ [চৈ চ পৃ. ১০৪]

ভক্তের দল তাঁর পদধূলি নেবার জন্য তাঁর চলার পথের ধূলি মাখেন সর্বাঙ্গে—সমস্ত পথটাই গর্তে পরিণত হয়। পদ্মের ওপর যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ে মধুমক্ষিকা তেমনি তাঁর পাদপদ্মে বিভোর হয়ে থাকেন 'ভক্ত ভ্রমর দল'। এ যেন বিপরীত ব্যাপার; দীক্ষা দিতে তিনি বসেন নি—কোন অনুষ্ঠানের মধ্যে তিনি কাউকে টেনে আনার চেষ্টাও করেন নি, কিন্তু লক্ষ লক্ষ হিয়া মথিত হয়েছে তাঁর প্রেম-সুধা-রসে। চৈতন্যদেবের সঙ্গে এখানেই অন্যান্য সাধকদের পার্থক্য।

অথচ আশ্চর্য এই যে, আলোয়ারদের সময় থেকে অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত, এমন কি, বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রেম-ভক্তিধর্ম সমস্ত ভারতে প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও, বহু মহামানব সাধক জাত-পাত বর্ণ বৈষম্য দূর ক'রে সমস্ত মানবজাতিকে ঐক্যে, ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করার চেষ্টা করা সত্ত্বেও আজও ধর্ম-বিদ্বেষ, জাত-পাত, বর্ণ-বৈষম্যের প্রকোপ ভারতবর্ষে বিশেষ প্রশমিত হয়েছে বলে মনে হয় না। যে দক্ষিণ দেশে ব্রাহ্মণ চূড়ামণি রাজার কোষাধ্যক্ষ বাসভান্না দ্বাদশ শতকেই তাঁর উপবীত পরিত্যাগ করেছিলেন, যে দক্ষিণদেশে রামানুজ, নিম্বার্ক, ব্যাসরায়, বল্লভাচার্যের ন্যায় বহু মহামানব জন্মগ্রহণ করেছিলেন, বর্ণবৈষম্য সেখানে এখনও তীব্র রূপ ধরেই বিরাজমান। উত্তর ভারতেও রামানন্দ-কবীর-নানক-সুরদাস প্রভৃতি মহামানবের আনাগোনা সত্ত্বেও আজও সেখানে জাত-পাতের লড়াই অব্যাহত রয়েছে। বলা যেতে পারে যে, বঙ্গদেশে এর তীব্রতা

অনেক কম; উত্তর ভারত-দক্ষিণ ভারত থেকে উড়িষ্যাতেও ব্রাহ্মণের দৌরাত্ম্য অনেকটাই নিম্নগামী।

মধ্যযুগে ভারতের অবস্থা সর্বত্রই সমান ছিল না। গজনভীদের রাজত্বকালে বহু মুসলমান পাঞ্জাবে এসে বসবাস আরম্ভ করেন। মুসলমান সাম্রাজ্য প্রসারের প্রথম দিকে বহুদিন পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক খুব ভাল ছিল না। ধর্মের পার্থক্য যে মানব সমাজে পার্থক্য সৃষ্টি করে না এবং তা যে সত্যকার পার্থক্যও নয় এ কথা বোঝাবার জন্য মুসলমান সুফী সাধকরাও কম চেষ্টা করেন নি। ত্রয়োদশ শতকে জালালউদ্দিন রুমি সর্বধর্মের মানুষকে শুনিয়েছেন—

দীপগুলি ভিন্ন বটে—একই আলো জ্বলে সব দীপে,
সে আলো সুদূর হতে আসে
বিভিন্ন দীপের দিকে তুমি যদি শুধু রহ চাহি,
নষ্ট হবে, কূল পাবে না সে।
কেন না অনেক দীপে আনে সংখ্যা, বহুত্বের বোধ,
দীপে দীপে ভেদ বুদ্ধি আনে।
তুমি মুক্তি পাবে যদি দীপ হতে সরাইয়া আঁখি
দেখ চাহি আলোকের পানে।
... ...
মুসলিম য়িহুদী আর জরথুস্ত্রীয়ের মধ্যে যত
মতভেদ বিরোধ বিদ্বেষ।
অন্য দৃষ্টিকোণ লয়ে দেখিলে দেখিবে এ সংসারে
কোনোখানে নাহি দ্বন্দ্ব লেশ। [কবীর]

পরবর্তীকালে কবীর বললেন—

তুর্কের মসজিদে খুদা, হিন্দুর মন্দিরে রাম, রন অহরহ;
মন্দির মসজিদ যেথা কিছু নাই, সেথা কার আধিপত্য কহ! [কবীর]

কবীরের বক্তব্য গভীরতর সন্দেহ নেই; মন্দির-মসজিদকে তিনি প্রাধান্য দিতে চান নি। বাবর যখন সায়িদপুর (গুজরানওয়ালা জেলার আমিনাবাদ) আক্রমণ করেন তখন তাঁর সৈন্যদল হিন্দু-মুসলমান-রাজপুত প্রভৃতি সকল ধর্ম ও শ্রেণীর নারীদের ওপরই অত্যাচার করে। গুরু নানক ব'লে ওঠেন—'ঘাতকের ছুরিকার যুগ এটা—রাজারা হয়েছে কসাই।' গুরু নানক সে কালের হিন্দু-মুসলমান নারীর বেদনা প্রকাশ করেছেন বিদ্রোহের ভঙ্গীতে। অত্যাচারিতরা ঐক্যে বিধৃত হবেন সম্ভবত সেটাই ছিল তাঁর মনোভাব। অত্যাচারীর জাতধর্ম নেই—অত্যাচারিতরা তবে পৃথক থাকবেন কেন? হিন্দু-মুসলমান নারীর বেদনা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর লেখনীতে:

কাজী ও ব্রাহ্মণের কর্ম হয়েছে শেষ,
শয়তান পড়ে বিবাহের মন্ত্র বিশেষ।
মুসলিম নারী পড়িছে কোরান
আর্ত কণ্ঠে ডাকিছে আল্লা বলি, হে লাল্লু,
উচ্চ ও নিম্ন বর্ণের হিন্দু রমণীরও ঘটেছে একই ভাগ্যলিপি।

ধর্মচিন্তার সঙ্গে রাজনীতিক প্রয়োজনের সম্মেলন ঘটে পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে। বিজয়নগরে সালুভা নরসিংহের রাজত্বকাল থেকেই ধর্মনিরপেক্ষতার মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণদেব রায়ের সময়ে এ মনোভাব বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা পায়—সম্ভবত সেই কারণেই কৃষ্ণদেব রায়ের সাম্রাজ্য গৌরব এবং সমৃদ্ধির চরমে উঠতে পেরেছিল। বিজয়নগরে ধর্মের ক্ষেত্রে যে বোঝাপড়া এবং সহনশীলতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল সে সম্বন্ধে ডুয়ার্ট বারবোসা বলেছেন যে, রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের আমলে প্রত্যেকটি মানুষই নিজ নিজ রুচি এবং ধর্ম অনুযায়ী কার্য করার অধিকারী ছিল। নিজ নিজ ধর্মমত পোষণ করার জন্য কেউ কোনরূপ অসুবিধার সম্মুখীন হতো না। কে খ্রীস্টান, কে য়িহুদী, কে মুর অথবা কে অবিশ্বাসী এ কথাও কেউ জিজ্ঞাসা করতো না। পরিপূর্ণ সমতা পালিত হতো সে দেশে।

রাঢ়-গৌড়-বঙ্গে হাবসীদের আমলে দেশ ছিল অরাজক, কিন্তু হুসেন শাহ দেশে শান্তি স্থাপন করেন। তাঁর আমলে বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতি হলেও হিন্দুর মনে পূর্ণ শান্তি বজায় ছিল না। মন্দির ভাঙ্গতে সুলতান নিজেও কম দক্ষ ছিলেন না, 'হিন্দুয়ানি' দেখলে কাজীরা জাতি নিতে কিছুমাত্র ইতস্তত করতেন না। ষোড়শ শতকে হুসেন শাহের পরবর্তীকালেও হিন্দুদের মনে যে বিশেষ শান্তি ছিল না তার পরিচয় পাওয়া যায় মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে'ও। উড়িষ্যার বৌদ্ধদের সঙ্গে বিরোধ থাকলেও হিন্দু-মুসলমান বিরোধের কথা বিশেষ শোনা যায় না। চৈতন্যদেবের নীলাচলে আগমনের পর বৌদ্ধদের সঙ্গে বিরোধেরও অবসান ঘটে।

সুতরাং ভারতের সর্বত্র একইভাবে পরিবর্তন সম্ভব ছিল না। ধর্মনেতাদের প্রচেষ্টায় ধর্ম-বিরোধ বা বর্ণবিদ্বেষ দূর করা সম্ভবও হয় নি। এর কারণ অনুসন্ধান করা গবেষকদের বিশেষ কর্তব্য।

ভারতীয় বিদ্যাভবন প্রকাশিত 'হিস্টরি এণ্ড কালচার অব দি ইণ্ডিয়ান পিপ্‌ল্' গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডে 'ধর্ম' আলোচনা প্রসঙ্গে ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন যে, সে কালের ধর্মনৈতিক অবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বহুসংখ্যক ভক্তিবাদী সাধকের অভ্যুদয়—এঁদের চরিত্রে একটা বিশেষ মিলও লক্ষ্য করা যায়। ড মজুমদারের মতে এঁদের কেউ নিজ নিজ পৃথক গোষ্ঠী গঠন করেন নি; এঁরা কোন আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন না—কোন গোঁড়ামীও তাঁদের ছিল না। এঁদের অধিকাংশই মূর্তি পূজার বিরোধী ছিলেন।

সাহিত্য আকাদেমি প্রকাশিত 'তুকারাম' গ্রন্থে বালচন্দ্র নেমাড়ে বলেছেন, ভক্তিবাদ দক্ষিণের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে দ্রুত ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে; বিচিত্র আঞ্চলিক পূজা-পদ্ধতিও তাঁরা অঙ্গীভূত ক'রে নেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতের এই সাধকরা বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ ছিলেন এবং ছিলেন বিভিন্ন ভাষাভাষী; ব্রাহ্মণ্য মতের তাঁরা বিরোধিতা করতেন, শিক্ষিত সুবিধাভোগী কিছু মানুষই বেদপাঠের অধিকারী এ তত্ত্বেও তাঁরা বিশ্বাসী ছিলেন না; আচার-অনুষ্ঠানকেও তাঁরা ভাল চোখে দেখতেন না। এঁরা মানবের প্রতি প্রেমে উদ্বুদ্ধ হবার শিক্ষা দিতেন—এক ঈশ্বরের ভজনা করতে বলতেন তাঁরা। মুসলমান সাধকরাও হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রচেষ্টায় তাঁদের প্রচার আরম্ভ করেন। নেমাড়ে মনে করেন যে, ধর্মের ক্ষেত্রে মোটামুটি ঐক্য স্থাপিত হলেও সমাজে

ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। মহারাষ্ট্রে পেশোয়াদের আমলে ব্রাহ্মণরা পুনরায় ক্ষমতা ফিরে পান এবং ব্রাহ্মণ্য গোঁড়ামীও সমাজ প্রাঙ্গণ অধিকার ক'রে নেয়।

এসব ব্রাহ্মণরাই মুসলমান সুলতান এবং শাসনকর্তাদের দেওয়ান, দেশপাণ্ডে, কুলকার্নির পদ অধিকার ক'রে শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতাও লাভ করেন।

ড. মজুমদারের মত সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য নয়; ভক্তিমার্গের সাধকরা কেউ কেউ গোষ্ঠী গঠন করতে ইচ্ছুক না হলেও অনেকেই নিজ নিজ গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা ক'রে গেছেন। কারও কারও তিরোধানের অব্যবহিত পরেই তাঁর শিষ্যরা গোষ্ঠী গঠন করেন। গুরু নানকের শিষ্যগণ তো পরবর্তীকালে শিখ ব'লে পরিচিত হলেন—হিন্দুধর্মের বাইরেই যাবার বিশেষ প্রবণতা তাঁদের। কবীর-শিষ্যরা শেষ পর্যন্ত কবীরপন্থী ব'লে পৃথক হয়ে পড়লেন। রামানন্দের পরে তাঁর শিষ্যরাও সৃষ্টি করলেন নতুন এক গোষ্ঠী—এখানেও পুনরায় প্রাধান্য পেলেন ব্রাহ্মণরা; 'রুইদাসা' ব'লে পরিচিত হলেন রুইদাসের শিষ্যগণ। চৈতন্যদেবকে নিয়েও সেই প্রবণতা দেখা দিয়েছিল; বাঙলায় লেখা চৈতন্য-চরিতগ্রন্থ পাঠ করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, চৈতন্য তিরোধানের পর বৈষ্ণবদের মধ্যেও বিপ্রদের প্রাধান্য আবার বেড়ে ওঠে। কৌশলগত কারণে, বিপ্রদের সহযোগিতা লাভের তাগিদে চৈতন্যদেব সমাজকে আঘাত করতে চান নি সত্য, কিন্তু তাই ব'লে বিপ্রপাদোদক পান ক'রে তার মাহাত্ম্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কোন তোষামোদপ্রিয়তাও তাঁর মধ্যে ছিল না। বরং হরিদাসের পাদোদক পান করিয়ে ভক্তির এবং ভক্তের মাহাত্ম্য-কীর্তনই ছিল তাঁর পক্ষে অধিকতর স্বাভাবিক। চৈতন্যদেব কোন গোষ্ঠী গঠন করেন নি ব'লেই আজও দক্ষিণ দেশে 'বঙ্গাল বৈষ্ণব' এবং 'সাতানি'দের দেখা যায়। কবীরপন্থীরা সামান্য অঞ্চলেই রয়ে গেছেন, গুরু নানকের মতো ব্যক্তিত্বও পাঞ্জাবেই সীমাবদ্ধ হয়ে রইলেন।

ভক্তিমার্গের সাধকদের প্রচার সত্ত্বেও জাত-পাত বর্ণ-বিভেদ দূর হলো না। সাধকরা দেখালেন না যে, বেদে কোথাও জাত-পাতের কথা নেই। পরবর্তীকালে যখন বলা হলো যে, ভগবানের মাথা থেকে ব্রাহ্মণ এবং পা থেকে শূদ্র সৃষ্টি হয়েছে তখনও কেউ বুঝিয়ে দিতে পারলেন না যে, ভগবানের মাথা এবং পায়ে কোন পার্থক্য থাকতে পারে না; বললেন না যে, কোন মানুষই ভগবানের মাথায় প্রণাম জানায় না, পাদপদ্মেই প্রণাম করেন: অর্থাৎ, প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করলেও বলা চলে যে, প্রণাম সর্বদাই হয় শূদ্রের উদ্দেশ্যে, ভগবানের পাদপদ্মে।

অনেক সাধক-ভক্তের মুখ দিয়ে এমন কথা বলান হয়েছে যাতে মনে হয় সাধারণভাবে তাঁরাও বর্ণবৈষম্যে বিশ্বাসী ছিলেন। রামানন্দ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তিনি ভক্ত চণ্ডালের সঙ্গে ব'সে আহারে স্বীকৃত ছিলেন। তবে কি যারা ভক্ত নয় তাদের মধ্যে জাতিভেদ তিনি স্বীকার করতেন? চৈতন্যদেবকে দিয়ে বলান হয়েছে যে, ভক্ত চণ্ডাল ভক্তিমান নয় এমন দ্বিজ থেকেও শ্রেষ্ঠ। তবে কি তিনিও মনে করতেন যে, ভক্তির জগতের বাইরে বর্ণবিভেদ আছে?

নেমাড়ে সঠিকভাবেই বলেছেন যে, ভাষার পার্থক্য সর্বভারতে ভক্তিমার্গের সাধকদের কর্মপ্রচেষ্টাকে দানা বাঁধতে দেয় নি। তাঁদের কর্মধারা আঞ্চলিক সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টার অতিরিক্ত কিছু হয়ে উঠতে পারে নি। ব্রাহ্মণরা দৃঢ়বদ্ধভাবে বাধা দিলে ভক্ত সাধকরা পিছু হটে গেছেন এবং শেষ পর্যন্ত ভক্তদের নিজনিজ গোষ্ঠীতে আশ্রয় নিতে বলেছেন।

গোষ্ঠীর মধ্যে জাত-পাত বর্ণ-বিভেদ নেই, কিন্তু গোষ্ঠীর বাইরে বিরাট সমাজে ব্রাহ্মণদেরই প্রাধান্য। এই বিরাট সমাজের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের চাপে শেষ পর্যন্ত গোষ্ঠী-গুলোও আত্মরক্ষায় সমর্থ হতো না। সুতরাং বিভিন্ন অঞ্চলে বহুসংখ্যক ছোট-বড় ভক্তিমার্গের সাধকের অভ্যুদয় হলেও ব্রাহ্মণদের আঘাতকে প্রতিহত করা সম্ভব হয় নি। সাধকরা জোটবন্ধভাবে যদি বেদকেন্দ্রিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে বেদ-উপনিষদের সাহায্যে আঘাত করতে পারতেন তবে বর্ণবৈষম্য দূর হবার সম্ভাবনা ছিল।

বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ায় সাধকদের পক্ষে এ কার্য সাধন সম্ভব হয় নি। এই গোষ্ঠী বাঁধা সম্বন্ধে দাদু বলেছেন—"যত মানুষ তত সাধনার বৈচিত্র্য থাকিবে, আর থাকাও চাই। তবে দল বাঁধিয়া সাধনার একটা 'ক্রাউড' (crowd, ভীড়) করিয়া যে সম্প্রদায় গড়িয়া তোলা, ইহা হইল সত্য উপলব্ধির পথে একটা মহা অন্তরায়। সত্যকে ব্যক্তিগত বৈচিত্র্য দিয়া দেখ, সত্য জনে জনে অপরূপ, নবরূপ, সুন্দর, সরস ও গভীর হইবে। কিন্তু দলবন্ধী করিয়া সত্যকে খুঁজিলে সত্যকেই হারাই। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কমল ফোটে বলিয়াই প্রতি কমলের শতদল চমৎকার হইয়া বিকশিত হয়। সহস্র কমলকে যদি আঁটি বাঁধিয়া এক চাপে একভাবে ফুটাইবার চেষ্টা করা যায় তবে সব পিষিয়া পচিয়া ওঠে। প্রতি মানবই অনন্ত-দল-কমল; তাদেরও আবার দল বাঁধিবে?" [দাদু : ক্ষিতিমোহন সেন : পৃ. ২৫]।

রাঢ়-গৌড়-বঙ্গের ভক্তিরসের প্রাণপুরুষ প্রেমের জীবন্ত স্বরূপ হয়ে উঠেছিলেন, তাঁর একান্ত ঘনিষ্ঠ নিত্যানন্দ বিশেষ করে রাঢ় অঞ্চলকে মাতিয়ে তুলতে পেরেছিলেন এবং সমকালীন রাজনীতির অবস্থাও হিন্দুদের পরস্পরের সন্নিকটে এনে ফেলেছিল ব'লে এই অঞ্চলে বর্ণবৈষম্য ততখানি জোরদার হয়ে উঠতে পারে নি। নিত্যানন্দ কোন গোষ্ঠী গঠন করেন নি বলে বর্ণবিভেদের বিরোধটা এখানে বিশেষ মাথা চাড়া দেয় নি; রাঢ়ের বৈষ্ণব সমাজে বর্ণবৈষম্য দূরীকরণে ব্রাহ্মণরাও অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন প্রথম দিকে।

৩. সমকালীন আচার-আচরণ ও রীতি-নীতি

শ্রীচৈতন্যদেব সমকালীন মানুষের মনে শক্তি সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন। তাঁদের মনের অনেক ভ্রান্তি দূর ক'রে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এক আন্দোলনও সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু জমি তৈরি না ক'রে চাষ করতে যাওয়া যেমন ভ্রমাত্মক, তেমনি মনোভূমি তৈরি না ক'রে কোন আদর্শ প্রচারের চেষ্টাও ভ্রমাত্মক। প্রচারকের ওপর মানুষের বিশ্বাস জন্মে এটাও দেখতে হবে, প্রচারের বিষয় গ্রহণের উপযোগীও ক'রে তুলতে হবে সাধারণ মানুষকে : সামাজিক আন্দোলন সাধারণ মানুষকে নিয়েই, তাই সহসা অসাধারণ বৈপ্লবিক কিছু করতে যাওয়া উচিত নয়। তাতে বাহবা পাওয়া যেতে পারে কিন্তু সাফল্য লাভ করা যায় না।

এ দেশে বেদকে অস্বীকার ক'রে জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যুদয় ঘটেছিল। যাঁরা ঘটিয়েছিলেন তাঁরা দু'জনেই রাজপুত্র। তাই কিছুদূর পর্যন্ত সেই দুই ধর্মের ব্যাপ্তি ঘটেছিল। বুদ্ধদেবের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব এবং পরবর্তীকালে রাজচক্রবর্তী অশোকের প্রচেষ্টায় বৌদ্ধ ধর্ম বিশেষ প্রসার লাভ করে। কিন্তু এটাও ঠিক যে, শিক্ষিতও তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর মধ্যে সেই ধর্ম প্রবেশের বিশেষ পথ পায় নি। জাত-পাতের বিভেদে বিচ্ছিন্ন, হতাশায় জর্জরিত প্রায় অশিক্ষিত সাধারণ মানুষরা ওই ধর্মে একটা আশ্রয় পেয়েছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে তার ভেতরে তান্ত্রিকতা প্রবিষ্ট হলো—এ ব্যাপারে হিন্দু-বৌদ্ধ তান্ত্রিকরা প্রায় একই জায়গায় এসে দাঁড়াল। চৈতন্যদেব বুঝেছিলেন যে, স্পষ্টভাবে বেদ-বিরোধিতার জন্য শিক্ষিত মানুষেরা এই ধর্ম থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করেছেন এবং তারই ফলে শঙ্করাচার্যের পক্ষে বৌদ্ধ-ধর্ম বিরোধিতা করা সহজ হয়েছিল। জৈন তীর্থঙ্করদের এবং বুদ্ধদেবের আকস্মিক বৈপ্লবিক মনোভাবের প্রকাশ ঘটায় অপ্রস্তুত শিক্ষিত জনচিত্ত তা গ্রহণ করতে পারে নি বলেই এ দেশে ঐ দুটি ধর্মের প্রভাব শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয় নি। রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় কিছুদিন ঐ দুটি ধর্মকে সজীব রাখা সম্ভব হলেও তাদের ভিত্তিমূল সমাজে কোনদিনই দৃঢ়-প্রোথিত হতে পারে নি। ধীরে ধীরে মানুষের মনকে প্রস্তুত ক'রে নিতে পারলে তবেই কোন নবধর্মের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা সম্ভব। মনে হয়, চৈতন্যদেব এ কথা বুঝেছিলেন ব'লেই তৎকালে প্রচলিত সামাজিক আচার-আচরণ, রীতি-নীতিকে এক আঘাতে ভাঙতে চান নি। জীবনী গ্রন্থগুলো থেকে সামান্য কয়েকটি উদাহরণ এখানে উদ্ধৃত ক'রে দেখালেই চলবে। চৈতন্যের অর্থাৎ বিষ্ণুর আজ্ঞায় লীলা সহচর হবার জন্য দেবতারা জন্মগ্রহণ করতে আরম্ভ করলেন মর্ত্যভূমে। লোচনদাস বলছেন, "বলরাম জনম লভিলা এই ক্ষিতি"—কিন্তু বলরাম তো যেখানে-সেখানে আসতে পারেন না : মহেশ ঠাকুর জন্মেছেন অংশেতরূপে 'ব্রাহ্মণের কুলে', সেটাই নাকি 'যুগধর্ম'—তাই বলরামও জন্মগ্রহণ করলেন—

> ব্রাহ্মণের কুলে যুগধর্ম অনুরূপ।
> নিত্য আনন্দকন্দ সহজ স্বরূপ ॥ [চৈতন্যমঙ্গল : পৃ. ৩৩]

চৈতন্যদেবের অন্তর্ধানের (?) মাত্র ২০ বছর পরেই বৈষ্ণবের মুখে শোনা গেল যে দেবতারা 'যুগধর্ম অনুরূপ' ব্রাহ্মণের কুলেই জন্মগ্রহণ ক'রে থাকেন। চৈতন্যোত্তর

কালেও তাহলে এ ভাব টিঁকে ছিল। এক বিরাট ব্যক্তিত্ব জাত-পাতের ভেদ দূর ক'রে প্রেমে মানুষকে আবদ্ধ করা সত্ত্বেও মানুষের মনের সহজ সংস্কার থেকেই গিয়েছিল। এসব সংস্কার ভাঙ্গার জন্য চৈতন্যদেব কোন প্রচেষ্টা করতে গিয়ে অযথা বাধার সম্মুখীন হতে চান নি—নিজের জীবনের আচরণ দ্বারাই তিনি অপরের মনে আলোড়ন তুলতে চেয়েছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রায় এ ধরনের কথাই বলা হয়েছে—বশিষ্ঠাদি পিতা ব্রহ্মাকে বলেছেন—

মহতে করিলে কার্য নীচে তাহা করে।
এ হেন নিয়ম পিতা দেখি চরাচরে॥ [শ্রীমদ্ভাগবত : পৃ. ২২৬]

চৈতন্যদেবের হয়তো সেই আশাই ছিল। তাই একদল নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবকে তিনি একত্র করেছিলেন, যাঁদের মধ্যে ব্রাহ্মণ-বৈদ্যের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের আচবণের প্রভাব সমাজে পড়বেই এই ছিল তাঁর আশা। সমাজকে সোজাসুজি আক্রমণ করে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির বিড়ম্বনায় তিনি যেতে চান নি বলেই মনে হয়।

নিত্যানন্দ প্রভুকে অদ্বৈত প্রভু কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ ক'রে যে পরিহাস করেছিলেন তার মধ্যে সমকালীন সমাজের আচার-আচরণের যেমন পরিচয় আছে সেইরূপ পরিচয় আছে নিত্যানন্দের ব্যক্তিগত আচরণের—মহৎ নিত্যানন্দকে দেখে মানুষ তাঁরই তো অনুসরণ করবে—

দুয়ার ভাঙ্গিয়া আসি সান্ডাইলি কেনে।
সন্ন্যাসী করিয়া তোরে বোলে কোন জনে॥
হেন জাতি নাহি না খাইলা যার ঘরে।
'জাতি আছে' হেন কোন্ জনে বলে তোরে॥
বৈষ্ণব-সভায় কোন মহা মাতোয়াল।
ঝাট নাহি পলাইলে নহিবেক ভাল॥ [চৈতন্যভাগবত : পৃ. ২৩০]

সত্যিই বৈষ্ণবের কোন জাত নেই। মাতোয়ালের মত সর্বত্রই তাঁদের গতি। যাঁরা তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হবেন, তাঁরা তাঁদের মতোই আচরণ করবেন; তাঁদের কারও জাতি থাকবে না—যুগের আচরণের পরিবর্তন ঘটবে। তাই প্রেম ভক্তি বিলিয়ে শুধু নাম গানের সহজ উপায়ে যত অধিক সংখ্যক মানুষকে বৈষ্ণব করতে পারবে তত অধিক পরিবর্তন আসবে সমাজে।

রূপ-সনাতন হুসেন শাহের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী: সামাজিক দৃষ্টিতে উচ্চশ্রেণীর লোক নন, অন্য ধর্মাবলম্বীর সঙ্গেই তাঁদের কাজ করতে হয়। তাই যদিও তাঁদের দৈন্যপত্রী পেয়েই সন্ন্যাসী চৈতন্যদেব রামকেলিতে এসেছেন তবুও তাঁরা বলছেন—

নীচজাতি নীচসঙ্গী করি নীচ কাজ।
তোমারে অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ॥ [চৈ. চ. পৃ. ১০৫]

সমাজের রীতি অনুযায়ী ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসীর কাছে আসার অধিকারই তাঁদের নেই। সেই লজ্জা তাঁরা কি উপায়ে গোপন করবেন? এটা তো সমকালীন সামাজিক প্রথা! কিন্তু

শ্রীচৈতন্য কি করলেন ? তিনি প্রথার ধার দিয়েও গেলেন না, তিনি শুধু বললেন—

আজি হৈতে দোঁহার নাম রূপ-সনাতন।
দৈন্য ছাড় তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন ॥ [তদেব. পৃ. ১০৫]

পরবর্তীকালে দবীর খাস-সাকর মল্লিক তো কোন্ শূন্যে মিলিয়ে গেলেন—চিরস্থায়ী হয়ে রইলো রূপ-সনাতন নাম। বৃন্দাবনের রূপ-সনাতন-জীব গোস্বামীর জাতি নিয়ে, প্রথম জীবনের কর্ম নিয়ে আর কেউ ভাবে কি ? জাতি-কর্মের দৈন্য ছাড়তে বলেছেন মহামানব চৈতন্যদেব—জাতি নিয়ে দৈন্য প্রকাশে তাঁর মন বিচলিত হয়। পরোক্ষে তিনি জানিয়ে দিলেন যে, জাতিটা কিছুই নয় মনটাই আসল কথা, 'সেই পত্রীতে জানিঞাছি তোমার ব্যবহার।'

নিজেকে অপবিত্র মনে ক'রে সনাতন নীলাচলে জগন্নাথদেবের রথের চাকার তলায় আত্মবিসর্জন দিতে এসে হরিদাসের আশ্রয়ে উঠে তাঁর চরণ বন্দনা করলেন—হরিদাস তাঁকে করলেন আলিঙ্গন। সাধারণভাবে সমাজে যাই চলুক বৈষ্ণব সমাজের আচার-আচরণ পৃথক। এখানে হিন্দু-মুসলমান ব'লে কিছু নেই, সকলেই বৈষ্ণব, মানুষ হিসেবে সমান। হরিদাস জ্যেষ্ঠ, শ্রদ্ধেয় ; তাই সনাতন তাঁর চরণ বন্দনা করলেন—হরিদাস আলিঙ্গন করলেন তাঁকে। কিন্তু চৈতন্যদেব তো মহাগুরু—বৈষ্ণব সমাজেও অপবিত্র দেহ নিয়ে তাঁকে স্পর্শ করা চলে না মনে করলেন সনাতন। তাঁকে দেখে বিস্মিত আনন্দিত চৈতন্যদেব—

সনাতন দেখি প্রভু হইল চমৎকার ॥
সনাতন আলিঙ্গিতে প্রভু আগে হৈলা।
পাছে ভাগে সনাতন কহিতে লাগিলা ॥
মোরে না ছুঁইবে প্রভু পড়োঁ তোমার পায়।
একে নীচজাতি অধম আর কণ্ডুরসা গায় ॥
বলাৎকারে প্রভু তারে আলিঙ্গন কৈল।
কণ্ডু-ক্লেদ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল ॥
সব ভক্তগণে প্রভু মিলাইল সনাতন।
সনাতন কৈল সবার চরণবন্দনে ॥ [তদেব. পৃ. ৪৬৩]

হরিদাস অন্যতম বৈষ্ণব প্রধান হলেও প্রথম জীবনে মুসলমান ছিলেন। তাই সমকালীন সমাজ হিন্দুর সঙ্গে তাঁর একত্র আহার কিছুতেই বরদাস্ত করতো না। অদ্বৈত আচার্যের গৃহে চৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ, মুকুন্দ এবং হরিদাস উপস্থিত। চৈতন্যের অভ্যুদয়ের পূর্বে অদ্বৈত আচার্যের সঙ্গেই হরিদাসের পরিচয় হয়, তাই হরিদাসের মন তিনি জানতেন। সামাজিকদের মনে অযথা ক্রোধের সঞ্চার তিনি করতে চাইবেন না সুতরাং পংক্তি ভোজনে বসবেন না। তাই তিনজনের জন্য অদ্বৈত আসন পেতেছেন। স্পষ্ট বোধগম্য হয় না এই তিনজনের একজন মুকুন্দ কিনা—মুকুন্দ কায়স্থ, সুতরাং পাশাপাশি না হলেও কাছাকাছি বসতে পারেন—এ বিষয়ে সামাজিক বাধা খুব না থাকার সম্ভব। প্রত্যেকটি পিঁড়ির উপর যে ভাবে আসন বিছিয়ে খাদ্যাদি পরিপাটি করে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে তিনটি স্থানে তাতে মনে হয় যে, গৃহস্বামীর আসন তার মধ্যে ছিল না—অতিথি-অভ্যাগতের সঙ্গে গৃহস্বামীর ব্যবস্থা কিছু ঊন হয়েই থাকে, এখানে তা ছিল না

ব'লে মনে হয় তৃতীয় আসনটি মুকুন্দের জন্যই স্থির করা হয়েছিল। কিন্তু চৈতন্যদেব সকলকে গৃহের ভিতরে আহ্বান করলেও—

দুই ভাই আইলা তবে করিতে ভোজন ॥
মুকুন্দ হরিদাস দুই প্রভু বোলাইলা।
যোড়হাতে দুইজন কহিতে লাগিল ॥
মুকুন্দ কহে মোর কিছু কৃত্য নাহি সরে।
পাছে মুঞি প্রসাদ পামু তুমি যাহ ঘরে ॥ [তদেব. পৃ. ১২৫]

ঘরে প্রবেশ করে ভোজন করবেন না এ কথা কিন্তু মুকুন্দ বললেন না। তাঁর আসনে বসে না খাবার কারণ 'কিছু কৃত্য নাহি সরে'। কিন্তু হরিদাসের কারণ সামাজিক—

হরিদাস কহে মুঞি পাপিষ্ঠ অধম।
বাহিরে এক মুষ্টি পাছে করিব ভোজন ॥ [তদেব]

শুধু প্রসাদ গ্রহণ নয়, ভোজনই করবেন তবে 'বাহিরে'—ঘরের ভিতরে নয়।

হরিদাসের এরূপ মনোভাবের পরিচয় আরও অনেকবার পাওয়া গেছে। তিনি জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করেন নি, চৈতন্যদেবও তাঁকে সেখানে প্রবেশ করতে বলেন নি। বঙ্গদেশে হরিদাস অনেকটাই পরিচিত, অনেকেরই শ্রদ্ধার পাত্রও, চৈতন্যদেবের নিত্যসঙ্গীদের অন্যতম। কিন্তু উৎকলে তাঁরা সবাই নবাগত—এখানকার সমাজ কি রকম তাও জানা নেই। তাই হরিদাসকে শ্রীচৈতন্যও বলেছিলেন—

মন্দিরের চক্র দেখি করিবে প্রণাম।
এই ঠাঞি তোমার আসিবে প্রসাদান্ন ॥
নিত্যানন্দ জগদানন্দ দামোদর মুকুন্দ।
হরিদাসে মিলি সবে পাইল আনন্দ ॥ [তদেব. পৃ. ২৩৯]

সমস্ত বৈষ্ণব প্রধানদেরই একান্ত প্রিয় হরিদাস। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কখনও সামাজিক আচার-আচরণের পরিপন্থী কাজ করতে চান নি; চৈতন্যদেব এ মনোভাবকে বাধা দেন নি কিন্তু হরিদাসকে এবং সকল সমাজকে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, হরিদাস তাঁর আত্মার আত্মীয়—হরিদাস অনেক বড়—

হরিদাস কহে প্রভু না ছুঁইহ মোরে।
মুঞি নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে ॥
প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম নাহিক আমাতে ॥
... ...
দ্বিজ ন্যাসী হৈতে তুমি পরম পাবন ॥ [তদেব]

একেই বলে মানবতার পূজারী। সমাজ যাই বলুক, যাই ইচ্ছা করুক তিনি নিজ জীবনের আচরণের দ্বারা মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। নীলাচলে নিজ আবাস গম্ভীরার কাছাকাছি হরিদাসের সাধনপীঠ সিদ্ধবকুল—আজও তা মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করছে। পুরীর তীর্থযাত্রীরা এ স্থান স্পর্শ না ক'রে পবিত্র হতে পারেন না আজও। সেই অতীতেও শ্রীচৈতন্য স্বয়ং প্রতিদিন হরিদাসের ঘরে যেতেন তাঁর সঙ্গে মিলতে। কবি কর্ণপুরের কাব্যে আছে, 'জাতিকুলানপেক্ষায় হরিদাসায় তে

নম :—এই ব'লে বাসুদেব সার্বভৌম হরিদাসকে প্রণাম করছেন। এর পিছনে চৈতন্যের প্রেরণা অনুভব করা যায়।

সন্ন্যাসগ্রহণের আগের রাত্রে চৈতন্যদেব শয়ন করেছেন। শচীমাতা এবং মাত্র কয়েকজন ভক্ত বিশ্বম্ভরের সন্ন্যাস নেবার উদ্যোগের কথা জানেন, তাঁদের মধ্যে হরিদাস একজন। শুধু তাই নয় সেদিন হরিদাস চৈতন্যগৃহে—

ভোজন করিয়া প্রভু মুখ শুদ্ধ করি।
চলিলা শয়নগৃহে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
যোগনিদ্রা প্রতি দৃষ্টি করিলা ঈশ্বর।
নিকটে শুইলা হরিদাস গদাধর॥ [চৈতন্যভাগবত : পৃ. ২৪১]

যাত্রার কালে সাহায্যও করলেন তাঁরা। কিন্তু সন্ন্যাসগ্রহণের সময় গদাধর উপস্থিত থাকলেও হরিদাসকে দেখা গেল না। হয়তো সামাজিক আচার!

দক্ষিণ দেশে যাবেন চৈতন্যদেব। একাই যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নিত্যানন্দ তাঁকে একলা যেতে দেবেন না। তিনি বললেন—

তোমার দুই হস্ত বদ্ধ নামগণনে।
জলপাত্র বহির্বাস বহিবে কেমনে॥
প্রেমাবেশে পথে তুমি হবে অচেতন।
জলপাত্র বস্ত্রের কেবা করিবে রক্ষণ॥
কৃষ্ণদাস নামে এই সরল ব্রাহ্মণ।
ইহা সঙ্গে করি লহ ধর নিবেদন॥ [চৈ. চ. পৃ. ১৬৯]

কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ সঙ্গে গিয়েছিলেন, কি গোবিন্দ কর্মকার, অথবা দুজনেই, সে বিচারে এখন না গিয়ে কবিরাজ গোস্বামীর মনোভাবের প্রতি দৃষ্টি দিতে পারি। সমকালীন সমাজের কথা মনে ক'রে ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর সঙ্গে তিনি ব্রাহ্মণকেই পাঠিয়েছেন হয়তো বা। কেবল ব্রাহ্মণ সঙ্গী নয়, পর্যটন কালে চৈতন্যদেব ব্রাহ্মণের ঘরেই আতিথ্য নিয়েছেন, কোথাও আমরা শূদ্রের ঘরে তাঁকে আতিথ্য নিতে দেখি নি। বৃদ্ধকাশীতে শিব দর্শন করেও—

তাঁহা হৈতে চলি গেলা আর একগ্রাম।
ব্রাহ্মণ-সমাজে তাঁহা করিলা বিশ্রাম॥ [তদেব. পৃ. ১৯৭]

চৈতন্যদেব নিজেও ব্রাহ্মণ সমাজেই বিশ্রাম নিচ্ছেন, আতিথ্য গ্রহণ করছেনও সেখানে। ব্রাহ্মণদের বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত ক'রে জাতি-ভেদ দূর ক'রে মানব সমাজে সমতা আনতে চেয়েছিলেন শ্রীচৈতন্য। তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষরা তথাকথিত উচ্চবর্ণের নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা পাবার তাগিদেই তো বৈষ্ণব হতে পারেন। যেমন হয়েছিলেন একসময় বৌদ্ধ। শূদ্রের গৃহে আশ্রয় নিলে ব্রাহ্মণদের মধ্যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিত—বৈষ্ণব ধর্মের মাহাত্ম্য বিচার করতেও তাঁরা আসতেন না তা হলে। অথচ ব্রাহ্মণদের আকর্ষণ না করতে পারলে একদিকে দূরে রাখা হবে শিক্ষিত সমাজকে, অন্যদিকে জাতি-ভেদ বিরোধিতার ব্যাপারটাও কথার কথা হয়েই থাকবে। তাই চৈতন্যদেব এই সামাজিক আচার-আচরণ ইচ্ছাকৃত ভাবেই বজায় রেখেছিলেন বলেই মনে হয়। অথচ বৈষ্ণব সমাজে তিনি ব্রাহ্মণ-শূদ্র-মুসলমানেও কোন পার্থক্য করেন নি। হরিদাসের তিরোধানের পর তাঁর সেই ভাবটি অধিকতর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চৈতন্যদেবের জীবনী আলোচনার সময়

হরিদাস প্রসঙ্গ আসবে, সে সময় হরিদাস-তিরোধানে শ্রীচৈতন্যের মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যাবে।

বিষয়ী সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যের মনোভাব কেমন ছিল ?

যতি-সন্ন্যাসীদের কর্তব্য সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন—

গ্রামেতে প্রবেশ করি দিনেকের বেশি।
রাত্রিবাস না করিবে হইবে উদাসী॥
ভূমণ্ডল পর্যটন তাহাদের ব্রত।
একাকী ভ্রমণ তারা করিবে সতত॥
কৌপীন ও দণ্ড তারা করিবে ধারণ।
কোন স্থানে নাহি করে আশ্রয় গ্রহণ॥ [শ্রীমদ্ভাগবত : পৃ. ৫৫৪]

এর দ্বারা বেশ পরিষ্কার ক'রেই বলা হয়েছে যেন সন্ন্যাসীরা বিষয়ীদের সংস্পর্শে না আসে। শ্রীমদ্ভাগবতের সমস্ত বিধি চৈতন্যদেবকে মানতে দেওয়া হয় নি। অবধূত নিত্যানন্দ একাকী ভ্রমণ করেছেন, দৈবক্রমে অন্যান্য সন্ন্যাসীরা তাঁর সঙ্গী হলেও তিনি সঙ্গী নিয়ে ভ্রমণে বের হন নি। সেই অবধূত নিত্যানন্দই চৈতন্যদেবের দক্ষিণ ভ্রমণ কালে জলপাত্র এবং কৌপীনাদি বহন ক'রে নেবার জন্য সঙ্গী নিয়ে যেতে তাঁকে বাধ্য করেছিলেন ঃ শ্রীচৈতন্য মাঝে মাঝেই আবেশে অচেতন হয়ে পড়তেন তাই তাঁর সঙ্গীর প্রয়োজনও ছিল।

বিষয়ী সম্বন্ধে চৈতন্যদেবের বিচিত্র মনোভাব লক্ষ্য করা গেছে। দবীর খাস, সাকর মল্লিক, মুসলমান প্রশাসক, প্রতাপরুদ্র প্রভৃতির সঙ্গে তিনি এক প্রকার ব্যবহার করেন নি। কেন করেন নি, সে বিষয়ে আমাদের অনুমান কি সে কথা চৈতন্যদেবের জীবন-কথা আলোচনার সময় নির্ণয়ের চেষ্টা করবো। এই পরিচ্ছেদে কেবল ঘটনাগুলো উদ্ধৃত করে পার্থক্য লক্ষ্য করা হবে মাত্র।

হুসেন শাহ দুর্বার যবন রাজা—উড়িষ্যায় বহু দেবমূর্তি তিনি ভেঙ্গেছেন। সেই রাজার বিষয়ে সাবধান ক'রে দিয়ে গেলেন এক সু-ব্রাহ্মণ। ভক্তগণ চিন্তিত হলেন, তখন চৈতন্যদেব বললেন—

রাজা আমা চাহে মুঞি যাইমু আপনে॥ [চৈ. ভা. পৃ. ২৮৫]

বিষয়ীর মুখোমুখী হতে কিছুমাত্র দ্বিধা নেই তাঁর। যে ভীতি প্রদর্শন করতে পারে তাঁকে তিনি তুচ্ছ করেন। হিন্দুর দেব-দেবী-বিদ্বেষী রাজশক্তির মুখোমুখী হতে তিনি প্রস্তুত।

হুসেন শাহের পদস্থ হিন্দু কর্মচারী দবীর খাস এবং সাকর মল্লিক দেখা করতে এলেন চৈতন্যদেবের সঙ্গে। প্রথমে দেখা হলো নিত্যানন্দ-হরিদাসের সঙ্গে, পরে তাঁদের মাধ্যমে সাক্ষাৎ পেলেন তাঁরা শ্রীচৈতন্যের—

দুই গুচ্ছ তৃণ দোঁহে দশনে ধরিঞা।
গলে বস্ত্র বান্ধি পড়ে দণ্ডবৎ হঞা॥
দৈন্য করি রোদন করে আনন্দে বিহ্বল।
প্রভু কহে উঠ উঠ হইল মঙ্গল॥
উঠি দুই ভাই তবে দন্তে তৃণ ধরি।
দৈন্য করি স্তুতি করে করযোড় করি॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
পতিতপাবন জয় জয় মহাশয়॥ [চৈ. চ. পৃ. ১০৫]

এঁরা দুজনই মুসলমান রাজার প্রধান কর্মচারী। গ্রন্থের অন্যান্য স্থান লক্ষ্য করলে অনুমান করা চলে যে, কোন না কোন প্রধান হিন্দু কর্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে গৌড়েশ্বর হুসেন শাহ হিন্দু রাজ্য আক্রমণ ক'রে দেবমন্দির এবং মূর্তি ধ্বংস করতেন। তা সত্ত্বেও মুসলমান রাজার এই পদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে কোন দ্বিধা ছিল না শ্রীচৈতন্যের। বিষয়ী হলেও চৈতন্যদেব এঁদের উদ্ধার করতে স্বীকৃত হলেন অতি সহজেই। এঁরা দৈন্যপত্রী লিখেছিলেন বলেই কি? সে কথা পরে আলোচনা করা যাবে।

চৈতন্যদেব গৌড় হয়ে বৃন্দাবনে যাবেন। উড়িষ্যার সীমান্ত অঞ্চলের প্রশাসক দিন দুইচার তাঁর সেবা ক'রে পথের বিবরণ দিলেন—

মদ্যপ যবন রাজার আগে অধিকার।
তার ভয়ে পথে কেহ নারে চলিবার॥
পিছলদা পর্যন্ত সব তার অধিকার।
তার ভয়ে নদী কেহ হৈতে নারে পার॥
দিনকত রহ সন্ধি করি তাহা সনে।
তবে সুখে নৌকাতে করাইব গমনে॥ [তদেব পৃ. ৩০৭]

এক হিন্দু অনুচরের কাছে মদ্যপ যবনরাজ চৈতন্যদেবের মাহাত্ম্য শুনে নিজে থেকেই উড়িষ্যা সীমান্ত অধিকারীর কাছে সন্ধির বার্তা পাঠিয়ে শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ প্রার্থী হলেন। চৈতন্যদেব বিষয়ী যবন অধিকারীর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন: মদ্যপের চরিত্রে পরিবর্তন ঘটে গেল, তিনি নিজে কৃষ্ণনাম ক'রে দশ নৌকা সৈন্য সাজিয়ে চৈতন্যদেবকে পিছলদা পর্যন্ত পেঁছে দিলেন।

মদ্যপ বিষয়ী যবন অধিকারীর সঙ্গেও নিশ্চিন্ত মনে সাক্ষাৎ করলেন চৈতন্যদেব। বিষয়ী ব'লে তিনি তাঁকে তুচ্ছও করেন নি—নিজের চরিত্রে গ্লানি আসবে ব'লেও মনে করেন নি। কিন্তু মনে একটা প্রশ্ন জাগে। চৈতন্যদেব তো রামকেলি পর্যন্তও গিয়েছিলেন, হুসেন শাহ সে সংবাদ জানতেন। কিন্তু এখন তাঁর গৌড়ে যাবার জন্য হুসেন শাহেরই সীমান্ত অধিকারীর সঙ্গে সন্ধির কথাটা উঠলো কেন? রথযাত্রা উপলক্ষে গৌড় থেকে বহু ভক্তই তো প্রতি বৎসর আসছেন নীলাচলে. ফিরেও যাচ্ছেন স্বচ্ছন্দে। তবে চৈতন্যদেবের বেলায় একটু অন্য ব্যবস্থা কেন? মদ্যপ যবন অধিকারীকে বৈষ্ণব করার কাহিনী অবতারণা করা হলো কি চৈতন্যদেবের মহিমা প্রদর্শনের জন্য অথবা এর মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে মুসলমান রাজশক্তির বিরোধী ব'লে কোন রটনা হয়েছিল? অবশ্য বিবদমান দুই রাজ্যের সীমান্তে নিত্য পরিবর্তমান পরিস্থিতিও এর জন্য দায়ী হতে পারে।

দক্ষিণ যাত্রাকালে সার্বভৌম চৈতন্যদেবকে ব'লে দিয়েছিলেন রায় রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে—শূদ্র বিলাসী ব'লে তাঁকে যেন তিনি উপেক্ষা না করেন। প্রতাপরুদ্রের গোদাবরী তীরবর্তী সীমান্ত অঞ্চলের প্রশাসক রায় রামানন্দ। হস্তী-পৃষ্ঠে বহু

লোকজন সঙ্গে নিয়ে তিনি গোদাবরীতে স্নান করতে আসেন, বিলাসের প্রচুর আড়ম্বর তাঁর সঙ্গে। কিন্তু তিনি সত্যকার বৈষ্ণব তত্ত্বজ্ঞানীও বটেন। চৈতন্যদেব তাঁর সঙ্গে তত্ত্বের অনেক আলোচনা করলেন এবং প্রশাসকের কাজ ত্যাগ ক'রে চলে আসতে বললেন নীলাচলে। কাজে ইস্তফা দিয়ে চ'লেও এলেন রায় রামানন্দ। তাঁর সঙ্গে শুধু তত্ত্ব আলোচনার উদ্দেশ্যই কি ছিল চৈতন্যদেবের? নৃত্য-সংকীর্তনেই তো তাঁর অধিকাংশ সময় চ'লে যেতো—তত্ত্ব আলোচনার সময় ছিল কতটুকু? রামানন্দ নীলাচলে আসার পর কতটা সময় তিনি দিতে পেরেছেন তাঁকে? তবে কেন তাঁকে পদত্যাগ করিয়ে নিয়ে আসা?

বিষয়ী গজপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্রের রাজ্যে বাস ক'রেও কিন্তু চৈতন্যদেব সহজে তাঁকে কৃপা করেন নি। প্রতাপরুদ্র চৈতন্যদেবের কৃপা ভিক্ষার জন্য সার্বভৌম এবং রামানন্দকে অনেক অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু শ্রীচৈতন্য বারবার তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। রাজশক্তির সহায়তা পেলে তো ধর্ম প্রচারে যথেষ্ট সুবিধা হয়; চৈতন্যদেব সে সুবিধাও গ্রহণ করতে চান নি। তিনি জানতেন যে, রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা থাকলে সুবিধা-বাদীরা এসে হাজির হয়, তাতে আর যাই হোক ধর্মের সত্যরূপ থাকে না। কিন্তু প্রতাপরুদ্রকে বহু বিলম্বে কৃপা করার কারণ অন্যত্র।

প্রতাপরুদ্র শুধু শ্রীচৈতন্যের দর্শন লাভের জন্য সার্বভৌমকে অনুরোধ করেন—

শুনিনু তোমার ঘরে এক মহাশয়।
গৌড় হৈতে আইলা তেঁহো মহাকৃপাময়॥
তোমারে বহু কৃপা কৈলা কহে সর্বজন।
কৃপা করি করাহ মোরে তাঁহার দর্শন॥ [তদেব. পৃ. ২১৫]

দর্শন করান যাবে কিনা সে বিষয়ে ভট্টাচার্যের মনে যথেষ্ট সংশয় ছিল; তবে সে সময় চৈতন্যদেব দক্ষিণে গেছেন তাই সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনাও ছিল না—

ভট্ট কহে যে শুনিলে সেই সত্য হয়।
তাঁহার দর্শন তোমার ঘটন না হয়॥
বিরক্ত সন্ন্যাসী তেঁহো রহয়ে নির্জনে।
স্বপ্নেহ না করে তেঁহো রাজদরশনে॥
তথাপি প্রকারে তোমায় করাইতাম দর্শন।
সম্প্রতি করিল তেঁহো দক্ষিণে গমন॥ [তদেব]

দক্ষিণ থেকে ফিরলে কাশীমিশ্রের গৃহে থাকবেন চৈতন্যদেব রাজা সেই ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কয়েক বৎসর পর ফিরলেন শ্রীচৈতন্য নীলাচলে। বেশ কিছুকাল কাটার পরে সার্বভৌম অভয় ভিক্ষা ক'রে প্রতাপরুদ্রের নিবেদন জানালেন; তা শুনে—

কর্ণে হস্ত দিয়া প্রভু স্মরে নারায়ণ।
সার্বভৌম কহ কেন অযোগ্যবচন॥
সন্ন্যাসী বিরক্ত আমার রাজদরশন। [তদেব. পৃ. ২২৭]

চৈতন্যদেব আরও বললেন—

ঐছে বাত পুনরপি মুখে না আনিবে।
পুনঃ যদি কহ আমা এথা না দেখিবে॥ [তদেব. পৃ. ২২৮]

রায় রামানন্দ এসে জানালেন যে, তিনি পদত্যাগ ক'রে এসেছেন : চৈতন্যদেবের নির্দেশ শুনে রাজা পরম আনন্দে তাঁর পদত্যাগে সম্মতি দিয়েছেন : চৈতন্যদেবের নাম শুনেই রাজার 'হৈল মহাপ্রেমাবেশ'। দবীরখাস-সাকর মল্লিকের দৈন্যপত্রীর থেকে এটা কম কিসে ? রাজা অপেক্ষা ক'রে থাকবেন 'কোন জন্মে মোরে অবশ্য দিবেন দর্শন।' এ কথা শুনে অবশ্যই শ্রীচৈতন্য বললেন—

তোমাকে এতেক প্রীতি হইল রাজার।
এই গুণে কৃষ্ণ তাঁকে করিবেন অঙ্গীকার ॥ [তদেব. পৃ. ২২৯]

সার্বভৌমের নিকট চৈতন্যদেবের মন্তব্য শুনে প্রতাপরুদ্র অত্যন্ত ব্যথিত হলেন, অত্যন্ত অভিমানে তিনি বললেন—

পাপী নীচ উদ্ধারিতে তাঁর অবতার।
শুনি জগাই মাধাই তেঁহো করিলা উদ্ধার ॥
প্রতাপরুদ্র ছাড়ি করিবেন জগৎ উদ্ধার।
এই প্রতিজ্ঞা করি জানি করিয়াছেন অবতার ॥
তাঁর প্রতিজ্ঞা না করিব রাজদরশন।
মোর প্রতিজ্ঞা তাঁহা বিনা ছাড়িব জীবন ॥ [তদেব. পৃ. ২৩০]

হিন্দু-মুসলমান রাজার প্রশাসকের সঙ্গে, মুসলমান রাজার হিন্দু মন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দ্বিধা করেন নি যিনি, তিনি কেন প্রতাপরুদ্রকে কৃপা করলেন বহু সাধ্য সাধনার পর ?

এইসব প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তরের মধ্যেই চৈতন্যজীবনের একটা বিশেষ পরিচয় নিহিত আছে ব'লে আমাদের বিশ্বাস।

৪· নিজের আচরণ ও আদর্শ

প্রচারের স্বার্থে, বিশেষ করে ব্রাহ্মণ সমাজকে জাত-পাতহীন বৈষ্ণব ধর্মের আওতায় আনবার চেষ্টায় চৈতন্যদেব সমাজের আচার-আচরণকে সামাজিক ক্ষেত্রে অস্বীকার করেন নি। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের আচরণে সকলেই ছিলেন তাঁর কাছে সমান। তিনি নগর ভ্রমণে বেরিয়ে স্বচ্ছন্দে যেতেন তন্তুবায়ের গৃহে, গোয়ালাদের গৃহে—সকলের সঙ্গেই তাঁর আত্মীয়তা, গোয়ালারা তাঁকে অন্ন গ্রহণ করতেও অনুরোধ করতো, কাঁধে নিয়ে নৃত্য করতেও ছাড়তো না তাঁরা। স্বচ্ছন্দে যেতেন মালাকারের, গন্ধ বণিকের এবং তাম্বুলীর গৃহে। ধারে কিনে নিয়ে আসতেন বিভিন্ন সামগ্রী ঃ কোন প্রকার আদান-প্রদানেই কোন বাধা ছিল না। মস্ত বড় পণ্ডিত হয়েও থোড়-মোচাবেচা একান্ত দরিদ্র শ্রীধরের থোড়-মোচা নিয়ে কাড়াকাড়ি করেন : পরিহাস করে বলেন যে, 'হরি হরি' বললেও দারিদ্র্য তোর ঘোচে কই? শ্রীধরও আত্মীয় জ্ঞানেই পরিহাস ক'রে জবাব দেয় যে, সে না খেয়েও থাকে না, ছোট হলেও কাপড়ও তার জোটে : পর মুহূর্তে সে আক্রমণ ক'রেও বসে—

বয়স বাড়িলে লোক কোথা স্থির হয়ে।
তোমার চাপল্য আরো দ্বিগুণ বাড়য়ে॥ [চৈ. ভা. পৃ. ৬০]

তথাকথিত নীচ জাতি শ্রীধরের ফুটো লোহ পাত্রে জল পান করতেও দ্বিধা করেন না চৈতন্যদেব।

ভিক্ষোপজীবী শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। শুক্লাম্বরের নিজ হাতে রান্না ভিক্ষার অন্ন তিনি সাগ্রহে গ্রহণ করেন। শুক্লাম্বর নিজেকে হীন বলে মনে ক'রে সঙ্কুচিত হলেও কোন সঙ্কোচ ছিল না চৈতন্যদেবের মনে।

যবন হরিদাসের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ হয় অদ্বৈত আচার্যের : প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ হরিদাসের অপূর্ব কৃষ্ণভক্তি দেখে তাঁকে সঙ্গী করে 'ভাসেন গোবিন্দ-রস-সমুদ্র-তরঙ্গে' (তদেব. পৃ. ৭৯)। হরিদাস নিজেও ছিলেন সমদর্শী, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেও তিনি কোন পার্থক্য করতেন না। 'মুলুকের অধিপতি' স্থানীয় মুসলমান শাসনকর্তাকেও তিনি বলেছিলেন—

শুন বাপ! সভারই একই ঈশ্বর॥
নামমাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে।
পরমার্থে এক কহে কোরাণ-পুরাণে॥ [তদেব. পৃ. ৮১]

তাঁর এই সমদর্শী মনোভাবের জন্য, ভক্তির প্রবলতার জন্য তিনি চৈতন্যদেবের ঘনিষ্ঠদের অন্যতম প্রধান হয়ে উঠেছিলেন—

সত্য সত্য হরিদাস জগত-ঈশ্বর।
চৈতন্য চন্দ্রের মহা-মুখ্য অনুচর॥ [তদেব. পৃ. ৮২]

হরিদাসকে চৈতন্যদেবের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। মানব জগতে সমন্বয় এবং সমতা আনতে তাঁকে চৈতন্যদেব হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যোগসূত্র করতে চেয়েছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, হরিদাসের শক্তি দেখে মুসলমানদের মনও বিগলিত হয়েছিল : 'মুলুকের অধিপতি' তো তাঁকে পীর ব'লে স্বীকার ক'রে নিলেন —'সত্য সত্য জানিলাঙ তুমি মহাপীর।' অপরদিকে বিপ্রগণও তাঁর মহিমা দেখে পুলকিত—

হরিদাসে দেখি ফুলিয়ার বিপ্রগণ।

সভেই হইলা অতি পরানন্দ-মন ॥
হরিধ্বনি বিপ্রগণ লাগিলা করিতে।
হরিদাস লাগিলেন আনন্দে নাচিতে ॥ [তদেব. পৃ. ৮৩]

বৃন্দাবন দাস তো হরিদাসের সঙ্গে চৈতন্যদেবের জন্ম জন্মান্তরের সম্পর্ক স্থাপন ক'রে বলতে চেয়েছেন যে হরিদাস মুসলমান হয়ে জন্মেছিলেন 'জাতি-কুল' সবই যে নিরর্থক তাই বোঝাবার জন্য : মানুষই সত্য—জাতি-ধর্ম মিথ্যা আবরণ মাত্র—

ঈশ্বরের সঙ্গে জন্মে অবতারী ॥
... ...
'জাতি-কুল-সর্ব নিরর্থক বুঝাইতে।
জন্মিলেন নীচ কুলে প্রভুর আজ্ঞাতে ॥ [তদেব. পৃ. ৮৫. বসুমতী সং]

হরিদাসের প্রতি একান্ত প্রীতিতে চৈতন্যদেব বলেছিলেন—

প্রভু বোলে শুন শুন মোর হরিদাস।
... ...
তোমারে যে করে শ্রদ্ধা, সে করে আমারে।
নিরন্তর আছি আমি তোমার শরীরে ॥ [তদেব. পৃ. ১৫৪]

ব্রাহ্মণ হয়েও মুসলমানকে নিজ অঙ্গ ব'লে ঘোষণা করা সে যুগে ছিল অভাবনীয়। ব্যক্তিগত জীবনের আচরণের দ্বারা তিনি সমাজকে শেখাতে চেয়েছিলেন চণ্ডীদাসের সেই অমর বাণী—'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'

মুসলমান এবং ব্রাহ্মণ সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন ব'লেই বৈষ্ণবের মানবধর্ম প্রচারে হরিদাসকে নিযুক্ত করেছিলেন চৈতন্যদেব। হরিদাস পেয়েছিলেন নবদ্বীপের বৈষ্ণবদের দ্বিতীয় নেতা নিত্যানন্দের সমমর্যাদা! চৈতন্যদেবের অন্তরের প্রীতিধন্য ছিলেন হরিদাস—

একদিন আচম্বিতে হৈল হেন মতি।
আজ্ঞা কৈল নিত্যানন্দ হরিদাস প্রতি ॥
... ...
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ বোল, কর কৃষ্ণ শিক্ষা ॥ [তদেব. পৃ. ১৬৫]

সামাজিক আচার-আচরণের কথা ভেবেই হয়তো সন্ন্যাস গ্রহণ কালে চৈতন্যদেব হরিদাসকে সঙ্গী করেন নি : বিদায়ের দিনটির কথা যাঁদের জানাতে বলেছিলেন তার মধ্যেও হরিদাসের নাম পাওয়া যায় না, অথচ দেখা যাচ্ছে যে, বিদায়ের পূর্ব রাত্রে হরিদাস চৈতন্যদেবের গৃহেই ছিলেন। এটা সম্ভবত হরিদাসের জীবনে খুব স্বাভাবিকই ছিল—মনে হয় শ্রীচৈতন্যের কোন কিছুই তাঁর অজ্ঞাত ছিল না ; বিশেষ করে তাঁর নাম উল্লেখের কোন প্রয়োজনই তাই ছিল না মনে করলে ভুল নাও হতে পারে। যাঁদের সংবাদ দেবার কথা ছিল তাঁদের মধ্যে গদাধর অন্যতম। দেখা গেল সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বরাত্রে—

ভোজন করিয়া প্রভু মুখশুদ্ধি করি।
চলিলা শয়নগৃহে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥

যোগনিদ্রা প্রতি দৃষ্টি করিলা ঈশ্বর।
নিকটে শুইলা হরিদাস, গদাধর ॥ [তদেব. পৃ. ২৪৯]

পর্যটনের কালে শ্রীচৈতন্য ব্রাহ্মণদের গৃহে আশ্রয় নিলেও সন্ন্যাস গ্রহণের পর প্রথমেই এসে উপস্থিত হলেন 'হরিদাসের ফুলিয়া নগরে'। এখানে কিছুদিন থেকে পরে অদ্বৈত আচার্যের গৃহে থাকলেন কিছুদিন। সন্ন্যাসের পর প্রথমেই হরিদাসের স্থানে আশ্রয় গ্রহণ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ—ব্যক্তিগত আচরণে তিনি যে কতখানি উদার ছিলেন এটা তারই পরিচায়ক।

বৃন্দাবন দাস বলেছেন যে, লোক-ব্যবহার বা লোকাচারের কথা স্মরণ করেই চৈতন্যদেব অনেক আচরণ করেছেন বটে কিন্তু তাঁর জীবনের সত্য পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে স্বপ্নের মধ্য দিয়ে জানিয়েছেন জগন্নাথকে দিয়ে—

মোর জাতি মোর সেবকের জাতি নাঞি। [তদেব পৃ. ৩২৫]

চৈতন্যদেবের ব্যক্তিগত জীবনের আচরণে এই সত্যই প্রকাশিত—বৃন্দাবনদাস নানা ভাবে সেকথা শুনিয়েছেন।

জয়ানন্দ বলেছেন যে, জগাই মাধাই উদ্ধারের পর কয়েকটি স্থানের পূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছিলেন চৈতন্যদেব কয়েকজন প্রধান ভক্তের ওপর। নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-শ্রীনিবাসের সমপর্যায়ে স্থান পেয়েছিলেন হরিদাস ঠাকুর; নবদ্বীপের দায়িত্ব নিলেন স্বয়ং চৈতন্যদেব, শান্তিপুরের দায়িত্ব দেওয়া হলো অদ্বৈত আচার্যকে, নিত্যানন্দ ভার পেলেন খড়দহের এবং শ্রীনিবাস কুমারহট্টের—হরিদাস ঠাকুরকে দেওয়া হলো ফুলিয়া নবগ্রামের দায়িত্ব। সুতরাং হরিদাস ঠাকুর যে গৌরাঙ্গের বিশেষ প্রীতিভাজন ছিলেন সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

সমতাই ছিল চৈতন্যদেবের আদর্শ, আচার-অনুষ্ঠান-লোকাচার রক্ষার জন্য যাই করুন না কেন, নরনারী, উচ্চনীচ ভেদ তিনি কখনও মানেন নি। বিভিন্ন ভক্তপ্রধানের ওপর বিভিন্ন অঞ্চলের দায়িত্ব দিয়ে তিনি ব'লে দিয়েছিলেন—

বিধবা সধবা সবারে দেহ নাম।
নাম দিয়া দাসী পুত্রে করিয়া বিশ্রাম ॥ [জয়ানন্দ. চৈ.ম পৃ. ১০৫]

চৈতন্যদেবের মুখ দিয়ে জয়ানন্দ চারবর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বের কথা শুনিয়ে সুকৌশলে দেখিয়ে দিলেন যে, জাত-পাত অস্বীকারকারী বৈষ্ণবরাই শ্রেষ্ঠ—লোকাচারকে মেনেও এর দ্বারা তিনি নিজ জীবনের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করলেন—

শূদ্র জাতি শ্রেষ্ঠ বৈশ্য বৈশ্য শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র।
ক্ষেত্রিএ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ তার শ্রেষ্ঠ যতি ॥
যতিয়ে বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ সর্বশ্রেষ্ঠ হএ।
বৈষ্ণবের সমান পদ আর কেহো নয় ॥ [তদেব পৃ. ১১৬]

অর্থাৎ সামাজিক আচার আচরণে বর্ণভেদকে যে ভাবেই গ্রহণ করা হোক না কেন, জাত-পাত হীন বৈষ্ণব অপেক্ষা সমাজে বড় কেউ নয়। পরম বৈষ্ণব হিসেবে জীবনের আচরণে জাত-পাত মানতেন না ব'লেই চৈতন্যদেব 'আচণ্ডাল আদি সভারে দিল কোল' (তদেব. পৃ, ১৩৭)। জয়ানন্দ আরও শুনিয়েছেন—'বৈষ্ণবের জাতিভেদ নাহিক সংসারে'

(তদেব. পৃ. ১৫৯)। বহু স্থানেই বৈষ্ণবের আদর্শ জাতপাতের অসারতার কথা বলা হয়েছে—

ভক্ত চণ্ডালের দ্রব্য হাত পাতি নেন ॥
অভক্ত সন্ন্যাসী দ্বিজ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
তাহার দ্রব্য না নেন নারায়ণ ॥
... ...
কৃষ্ণভক্ত চণ্ডাল যবন যদি হএ।
অভক্ত সন্ন্যাসী মুনি তার সম নয় ॥ [তদেব. পৃ. ১৯৮]

লোচনদাস ঠাকুরও হরিদাসের প্রতি চৈতন্যদেবের প্রগাঢ় প্রীতির চিত্র এঁকেছেন। শ্রীবাসের গৃহে ভক্তদের নিয়ে সংকীর্তন নৃত্য ক'রে রজনী কাটাবার পর চৈতন্যদেব সকলকে ঘরে গিয়ে স্নানাদি করতে বললেন। ভক্তরা বিদায় নেবার উপক্রম করছেন এমন সময় সেখানে এলেন হরিদাস—

হেনই সময়ে মহাশয় হরিদাস।
কৃষ্ণনামে নিরন্তর অন্তর-উল্লাস ॥
... ...
আচম্বিতে নবদ্বীপে মিলিলা আসিয়া।
আইস আইস বলি' প্রভু সন্তোষে হাসিয়া ॥
নির্ভর প্রেমায় কৈল গাঢ় আলিঙ্গন।
আদেশিলা মহাপ্রভু বসিতে আসন ॥
চতুর সে হরিদাস পরণাম করে।
আপনে ঠাকুর তাব কর ধরি' তুলে ॥
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে লেপিল তাহার।
অঙ্গের প্রসাদি-মালা দিল আপনার ॥ [লোচনদাস : চৈ. ম. পৃ. ১১৪]

হরিদাস-ঈশ্বরপুরী প্রভৃতি কয়েকজনের অঙ্গেই চৈতন্যদেব হাত বুলিয়ে দিয়েছেন। এখানে তো চন্দন লেপনের কথা বলা হয়েছে। কেবল তাই নয়, প্রসাদ ভোজনও করিয়েছেন সম্মুখে বসিয়ে। বৃন্দাবনদাসের হরিদাস অদ্বৈতের ঘরে এসে ভোজন করতে চান নি—দ্বারের বাইরে ব'সে অন্ন গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু লোচনের চৈতন্যদেব শ্রীবাসের গৃহে দেবতার ঘরের সম্মুখেই হরিদাসকে দিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করালেন—

ভোজন করিতে আজ্ঞা দিলেন ঠাকুর।
ভোজন করিল মহাপ্রসাদ প্রচুর ॥ [তদেব]

'ভোজন' কথাটা ফল-মূলাদির অধিক কিছুর ইঙ্গিত করে। চৈতন্যদেব এখানে যেন প্রীতির জোরে লোক ব্যবহারকেও অতিক্রম ক'রে গেছেন ব'লে মনে হয়।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন যে, কাশীর সন্ন্যাসীরা সর্বদাই চৈতন্যদেবের নিন্দা করতেন তিনি সন্ন্যাসীর আচারাদি মানেন না ব'লে। কাশীর সন্ন্যাসীরা ছিলেন শঙ্করশিষ্য—তাঁদের নেতা ছিলেন প্রকাশানন্দ। চৈতন্যদেব কাশী হয়ে মথুরা এবং সেখান থেকে ফিরলেন কাশীতে, থাকলেন শূদ্রের গৃহে, আহার করতেন ব্রাহ্মণের ঘরে—

কাশীতে লেখক শূদ্র চন্দ্রশেখর।
তার ঘরে রহিলা প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥
তপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা-নির্বাহণ।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে নাহি মানে নিমন্ত্রণ॥ [চৈ চ. পৃ. ২৯]

এক ব্রাহ্মণের একান্ত আগ্রহে তিনি কাশীর সন্ন্যাসীদের সঙ্গে একত্র হতে স্বীকার ক'রে তাঁর গৃহে এসে দেখলেন মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের। সকলকে নমস্কার করে বসলেন দূরে একস্থানে। তাঁর রূপ-জ্যোতি দেখে প্রকাশানন্দ তাঁকে নিকটে আহ্বান করলেন—

ইহাঁ আইস ইহাঁ আইস শুনহ শ্রীপাদ।
অপবিত্র স্থানে বৈস কিবা অবসাদ॥
প্রভু কহেন আমি হীন সম্প্রদায়।
তোমা সবার সভায় বসিতে না জুয়ায়॥ [তদেব. পৃ. ৩০]

প্রকাশানন্দ আরও জানতে চাইলেন—'হীনাচার কর কেন কি ইহার কারণ' (পৃ. ৩১)। সত্যকার মায়াবাদীর কাছে 'পবিত্র' 'অপবিত্র' কি? আচারেরই বা মূল্য কি? যিনি পবিত্র তাঁকে অপবিত্র করে কে? অপবিত্র স্থানের স্পর্শে চৈতন্যদেব অপবিত্র হন না—অপবিত্র যা তাই চৈতন্য স্পর্শে পবিত্র হয়ে ওঠে। মহতের কোন আচারই হীনাচার নয়, আচার-অনুষ্ঠানের কোন প্রয়োজনই ছিল না চৈতন্যদেবের ব্যক্তিগত জীবনে—লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যেই তিনি কিছু আচার পালন করতেন মাত্র।

মুসলমান হলেও এবং সামাজিক আচার-আচরণের ক্ষেত্রে যাই হোক না কেন, হরিদাসের একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল চৈতন্যদেবের জীবনে। তিনি যখন বৃন্দাবন যেতে গিয়ে রামকেলি গ্রামে এসে উপস্থিত হলেন তখন নিত্যানন্দ-হরিদাসের অনুমতি ব্যতীত চৈতন্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাতের অধিকার পেতেন না কেউ। রূপ-সনাতনকেও তাই করতে হয়েছিল—

অর্ধরাত্রে দুই ভাই আইলা প্রভুর স্থানে।
প্রথমে মিলিলা নিত্যানন্দ হরিদাস সনে॥ [তদেব. পৃ. ১০৫]

মাধবেন্দ্র পুরীকে কেন্দ্র ক'রে মহোৎসব করেছিলেন চৈতন্যদেব, হরিদাসের সিদ্ধি প্রাপ্তি-দিবসকেও কেন্দ্র ক'রে তেমনি মহোৎসব করেছিলেন চৈতন্যদেব। মাধবপুরীর ন্যায় মহা-ভক্তের সম-মর্যাদা দিয়েছিলেন তিনি হরিদাসকে—

হরিদাসের সিদ্ধি-প্রাপ্তি অদ্ভুত সে সব।
আপনি মহাপ্রভু যার কৈল মহোৎসব॥ [তদেব. পৃ, ১০৯]

অস্পৃশ্য কাকে বলে সে কথা সার্বভৌমকে বুঝিয়ে বলেছেন চৈতন্যদেব—

শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেই তো পাষণ্ডী।
অদৃশ্য অস্পৃশ্য সেই হয় যমদণ্ডী॥ [তদেব. পৃ. ১৬১]

অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহ যিনি মানেন তিনি অস্পৃশ্য হতেই পারেন না। সুতরাং চৈতন্যদেবের জাতিভেদ শ্রীবিগ্রহ মানা-না-মানার ওপর নির্ভর করে। সামাজিক দিক দিয়ে উচ্চশ্রেণীর

হলেও শ্রীবিগ্রহ না মানলে তাদের নিম্নবর্ণের মানুষ ব'লে মনে করতেন চৈতন্যদেব; এই সব মানুষকে উদ্ধার করার ব্রতই গ্রহণ করেছিলেন তিনি।

অস্পৃশ্য শূদ্র এবং শূদ্রাধম বিষয়ী রামানন্দ রায়কে তিনি আলিঙ্গন করেছিলেন—নীলাচলে নিজের পার্শ্বচর ক'রে রেখেছিলেন তাঁকে, তাঁকে তিনি সকল কর্মের অধিকারী ব'লে মনে করতেন। রায় চৈতন্যদেবকে বলেছেন—

সার্বভৌমে তোমার কৃপা তার এই চিহ্ন।
অস্পৃশ্য স্পর্শিলে হঞা তাঁর প্রেমাধীন॥ [তদেব পৃ. ১৭৯]

সার্বভৌমের প্রেমাধীন হয়েই যে তিনি রামানন্দকে স্পর্শ করেছিলেন তা ত' সঠিক কথা নয়। চৈতন্যদেবের নিকটে কোন ভক্তই যে অস্পৃশ্য নন। রামানন্দ আরও বলেছেন—

কাঁহা মুঞি রাজসেবী বিষয়ী শূদ্রাধম॥
মোর স্পর্শে না করিল ঘৃণা বেদভয়॥ [তদেব পৃ. ১৮০]

বিগ্রহ যে মানে না সে চৈতন্যদেবের দৃষ্টিতে পতিত শূদ্র, এমন ব্যক্তি বিষয়ী হলে নিশ্চয়ই শূদ্রাধম কিন্তু রামানন্দ খুবই উচ্চশ্রেণীর ভক্ত ছিলেন তাই তিনি বিষয়ী এবং শূদ্র হলেও চৈতন্যদেবের বক্ষে স্থান পাবার যোগ্য—বহুবার তিনি তাঁকে আলিঙ্গন করেছেনও। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি রায়কে শুনিয়েছেন—

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥ [তদেব পৃ. ১৮৪]

শূদ্র বিষয়ী রামানন্দ তাঁরও গুরু হবার যোগ্য।

হরিদাসকেও গভীর প্রীতিভরে আলিঙ্গন করেছেন চৈতন্যদেব: শূদ্র বিষয়ী রামানন্দকে তিনি গুরুর মর্যাদা দিয়েছেন, হরিদাসের ন্যায় কৃষ্ণভক্ত নেই এ কথাও অকপটে স্বীকার করেছেন তিনি; হরিদাসকে স্পর্শ ক'রে তিনি পবিত্র হতে চান—

হরিদাস কহে প্রভু না ছুঁইহ মোরে।
মুঞি নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে॥
প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম নাহিক আমাতে॥
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান॥
নিরন্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজ ন্যাসী হৈতে তুমি পরম পাবন॥ [তদেব পৃ. ২৩৯]

অর্থাৎ হরিদাসকে স্পর্শ করলে সর্বতীর্থে স্নানের ফল পাওয়া যায়, পাওয়া যায় যজ্ঞ তপ দানের ফল—চারিবেদ অধ্যয়নেরও আর প্রয়োজন হয় না। চৈতন্যদেব যে কতখানি অনুষ্ঠান বিমুখ ছিলেন তার পরিচয় রয়েছে এখানে—ভক্তের হৃদয়ের থেকে বড় কিছু নেই: পতিত উদ্ধারে হরিদাস সর্বোত্তম। দ্বিজ এবং সন্ন্যাসীর থেকেও চৈতন্যদেবের নিকটে যবন হরিদাস ছিলেন অনেক বড়!

নতুন স্থান উড়িষ্যা, এখানে আরও নিষ্ঠার সঙ্গে সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে উদ্যোগী হলেন হরিদাস : জগন্নাথ-মন্দিরে তিনি প্রবেশ করেন নি কখনও, পুষ্পোদ্যানে বাসা পেলেন তিনি—সেখান থেকেই মন্দিরের চক্র দেখে প্রণাম জানাতেন তিনি জগন্নাথ দেবকে। সনাতনের কথাতেও হরিদাসের প্রতি চৈতন্যদেবের গভীর প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়—

সনাতন কহে তোমা সম কেবা আছে আন।
মহাপ্রভু-গণে তুমি মহা ভাগ্যবান॥
অবতার কার্য প্রভুর নাম প্রচারে।
সেই নিজ কার্য প্রভু করেন তোমা দ্বারে॥ [তদেব. পৃ. ৪৬৮]

হরিদাসকে দিয়েই চৈতন্যদেব নাম-মহিমা কীর্তন করান। বল্লভ ভট্টের অহংবোধ আছে বুঝে চৈতন্যদেব অতি বিনয়ে বলেছিলেন—

হরিদাস ঠাকুর মহা ভাগবত প্রধান।
দিন প্রতি লয় তিঁহ তিন লক্ষ নাম॥
নামের মহিমা আমি তাঁহার ঠাঁই শিখিল।
তাঁহার প্রসাদে নামের মহিমা জানিল॥ [তদেব পৃ. ৫০৭]

প্রীতির গভীরতা কত অধিক হলে এ ধরনের মন্তব্য করা সম্ভব। হরিদাস মুসলমান হলেও গুরুতুল্য, যে নাম-প্রচার তাঁর অন্যতম লক্ষ্য তার শিক্ষাদাতাও একজন যবন! ধর্ম এবং জাতপাতের বহিরাবরণকে চৈতন্যদেব যে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ক'রে দিয়েছিলেন সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

চৈতন্যদেব নীলাচলে বসবাসের উদ্যোগ করলে হরিদাস ব্যাকুল হয়ে উঠলেন, নীলাচলে জগন্নাথের নিকটে কি মুসলমানের থাকা সম্ভব হবে? তিনি নিবেদন করলেন 'নীলাচল যাইতে মোর নাহিক শকতি' তাহলে তো আর 'তোমার না পাইব দরশন' : তাঁর ব্যাকুলতা দেখে চৈতন্যদেব সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—

প্রভু কহে কর তুমি দৈন্য সংবরণ।
তোমার দৈন্যে আমার ব্যাকুল হয় মন॥
তোমা লাগি জগন্নাথে করিব নিবেদন।
তোমা লৈয়া যাব আমি শ্রীপুরুষোত্তম॥ [তদেব পৃ. ১৩৪]

চৈতন্যদেবের মনেও সন্দেহ ছিল; উড়িষ্যার গজপতি প্রতাপরুদ্রদেবের সঙ্গে গৌড়-বঙ্গের সুলতান হুসেন শাহের বিরোধ তো লেগেই আছে। এ রকম অবস্থায় একেবারে নীলাচলে কোন মুসলমানের উপস্থিতি উড়িষ্যার মানুষ সহজে মেনে নেবে কি? কিন্তু তিনি ছিলেন দৃঢ়চিত্ত মহামানব। আত্মিক শক্তির জোরে সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের বিরোধকে তিনি অতিক্রম করবেনই—পুরুষোত্তমে তাঁকে নিয়ে যাবেনই।

হরিদাসের স্থান হলো নীলাচলে, কিন্তু তিনি গুণ্ডিচা গৃহের বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন; চৈতন্যদেবের ইচ্ছায় ভক্তরা এসে বললেন, 'প্রভু তোমায় মিলিতে চাহে চলহ

স্মরিতে'। কিন্তু হরিদাস লোকাচারকে অস্বীকার করেন না, বললেন—

হরিদাস কহে মুঞি নীচজাতি ছার।
মন্দির-নিকটে যাইতে নাহি অধিকার॥
নিভৃতে টোটামধ্যে যদি স্থান খানিক পাঙ।
তাঁহা পড়ি রহোঁ একা কাল গোয়াঙ॥ [তদেব. পৃ. ২৩৭]

এ কথা শুনে চৈতন্যদেব 'মনে সুখ বড় পাইল'—তিনি বুঝলেন যে, হরিদাস সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন। নীলাচলকে প্রেমধর্ম প্রচারের কেন্দ্রভূমি করতে চান তিনি। তাই সতর্ক পদক্ষেপ চাই। ভক্তদের মনে হরিদাস সম্বন্ধে প্রগাঢ় ভক্তির সঞ্চার করাতে পারলেও নতুন এই স্থানে ওড়িয়া মহলে কি প্রতিক্রিয়া ঘটবে তা তিনি জানতেন না : হঠকারিতায় উদ্দেশ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চান নি তিনি। তাই শেষ পর্যন্ত তিনি হরিদাসের জন্য স্থানের ব্যবস্থা করলেন। রাজার আদেশে বৈষ্ণবদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা হলো, রাজকর্মচারীর কাছ থেকে তিনি নিজের জন্য চেয়ে নিলেন পুষ্পোদ্যানের ঘরটি—

আমার নিকটে এই পুষ্পের উদ্যানে।
একখানি ঘর আছে পরম নির্জনে॥
সেই ঘরে আমাকে দেহ আছে প্রয়োজন।
নিভৃতে বসিয়া তাঁহা করিব স্মরণ॥ [তদেব. পৃ. ২৩৮]

নিজের জন্য চেয়ে নেওয়া এই ঘ'রে তিনি নিজে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেন হরিদাসকে, বললেন—

এই স্থানে রহ কর নাম সঙ্কীর্তন।
প্রতিদিন আসি আমি করিব মিলন॥ [তদেব. পৃ. ২৩৯]

কেবল নিজ বাসস্থানের নিকটে হরিদাসের বাসস্থান নির্দেশ করেই হলো না—প্রতিদিন তিনি যাবেন হরিদাসের সঙ্গে মিলতে। সামাজিক আচার-আচরণ যাই হোক না কেন, নিজের জীবনের আচরণ দিয়ে তিনি সমস্ত পার্থক্য ঘুচাবার পণ করেছিলেন।

সমতাবোধ চৈতন্যদেবের জীবনচর্যা ছিল। প্রয়োজন হলে ভগবানের নাম ক'রে তিনি বুঝিয়ে দিতেন যে, সৎ মানুষ মাত্রেই মহৎ—তাদের মধ্যে নেই কোন পার্থক্য। ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য গোবিন্দ তার প্রমাণ; গোবিন্দকে পুরী পাঠিয়েছিলেন চৈতন্যদেবের সেবার জন্য—পুরীকে গুরু ব'লে মনে করতেন তিনি। গোবিন্দকে আলিঙ্গন ক'রে নিজ-অঙ্গ সেবার অধিকার দিলেন তাঁকে : সার্বভৌমের মনে জিজ্ঞাসা দেখা দিল, গোবিন্দের কথা শুনে—

এত শুনি সার্বভৌম প্রভুরে পুছিলা।
পুরীগোসাঞি শূদ্র-সেবক কাঁহাতে রাখিলা॥ [তদেব. পৃ. ২২৩-২২৪]

চৈতন্যদেব ঈশ্বরের আচরণের কথা উল্লেখ করলেন সার্বভৌমের প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ—

ঈশ্বরের কৃপা জাতি-কুলাদি না মানে।
বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করিলা ভোজনে॥ [তদেব. পৃ. ২২৪]

প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের ভক্ত ব'লে যাঁরা নিজেদের জাহির করেন তাঁরাই ঈশ্বরের

আচরণকে অস্বীকার করেন। অন্ধ গোঁড়ামী আচ্ছন্ন করে সত্যদৃষ্টিকে। ঈশ্বরের পা থেকে যদি শূদ্র সৃষ্টি হয়ে থাকেন তবে তাঁরা ছোট হবেন কোন্ যুক্তিতে? ঈশ্বরের পদদ্বয় কি তাঁর মস্তকের তুলনায় হীন? ঈশ্বর বিশ্বাসী তো তাঁর পাদপদ্মেই প্রণাম জানান—সেই পাদপদ্মেই যদি শূদ্রের জন্মস্থান হয়ে থাকে তবে তো সমস্ত প্রণামই তাদের প্রাপ্য? ব্রাহ্মণের সৃষ্ট লোকাচারকে প্রতি পদে পদে মেনে সত্যভ্রষ্ট হয়ে পড়েছেন মনুষ্য-সমাজ। চৈতন্যদেব সত্যদ্রষ্টা, তাই সৎ মানুষ মাত্রই তাঁর দৃষ্টিতে ছিল এক জাতি—অসৎ পাপিষ্ঠদের অন্তরে পরিবর্তন ঘটিয়ে সমস্ত মানুষকে এক জাতিতে, এক অখণ্ড ঐক্যে বিধৃত করাই ছিল তাঁর সাধনা।

ব্যক্তিগত আচরণে হরিদাস ছিলেন চৈতন্যদেবের আত্মার আত্মীয়। কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন। তাই সুযোগ পেলেই তিনি তাঁর গুণ কীর্তন করতেন—

তবে মহাপ্রভু নিজ ভক্ত-পাশে যাইয়া।
হরিদাসের গুণ কহে শতমুখ হইয়া॥
ভক্তের গুণ কহিতে প্রভুর বাঢ়য়ে উল্লাস।
ভক্তগণ শ্রেষ্ঠ তাতে শ্রীহরিদাস॥ [তদেব. পৃ. ৪৫১]

বিমর্ষ সনাতন রথচক্রে প্রাণ বিসর্জন দিতে এসেছিলেন নীলাচলে। জিজ্ঞাসা করে ক'রে প্রথমেই তিনি এলেন হরিদাসের আবাসে। সেখানে এসেই, 'হরিদাসের কৈল তেঁহো চরণ-বন্দন'—হরিদাসও আলিঙ্গন করলেন তাঁকে। এতে হরিদাসের মাহাত্ম্যের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রধান ভক্ত বলেই সনাতন তাঁর চরণ বন্দনা করলেন; হরিদাস যে মুসলমান ছিলেন তা এখানে নিতান্তই গৌণ ব্যাপার। সনাতনের তখন 'কণ্ডুরসা গায়', তা সত্ত্বেও জোর ক'রে চৈতন্যদেব তাঁকে আলিঙ্গন করলেন—'কণ্ডু-ক্লেদ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল'। 'পিণ্ডার উপরে' বসলেন তিনি ভক্তদের নিয়ে, ঠিক 'পিণ্ডার তলে' স্থান পেলেন হরিদাস-সনাতন। সামাজিক আচার আচরণ না ভাঙ্গলেও বলিষ্ঠ ভাবেই নিজ জীবনের আচরণের দ্বারা তার অসারতা প্রদর্শন করতেন তিনি।

সামাজিকতা পালনকে চৈতন্যদেব 'মর্যাদা রক্ষণ' ব'লেই মনে করতেন। একদিন জ্যৈষ্ঠ মাসে দ্বিপ্রহরে তিনি সনাতনকে ডেকে পাঠালেন, সনাতন এলেন সমুদ্রকূলের তপ্ত বালুকার ওপর দিয়ে। চৈতন্যদেব তাঁকে সিংহদ্বারের পথে না আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে জানালেন যে, সে পথে জগন্নাথদেবের সেবকরা যাতায়াত করেন, তাঁর স্পর্শে অনাচার হবার সম্ভাবনা। শুনে সন্তুষ্টচিত্তে বললেন চৈতন্যদেব—

যদ্যপি তুমি হও-জগৎ-পাবন।
তোমা স্পর্শে পবিত্র হয় দেব-মুনিগণ॥
তথাপি ভক্তস্বভাব মর্যাদারক্ষণ।
মর্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ॥ [তদেব. পৃ. ৪৭০]

অর্থাৎ সনাতন যতই নিজেকে নীচজাতি, নীচকর্মে লিপ্ত ব'লেই মনে করুন না কেন চৈতন্যদেবের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন 'জগৎ পাবন'।

হরিদাস দেহ রাখলেন। তখন চৈতন্যদেব—

হরিদাসের তনু প্রভু কোলে উঠাইয়া।
অঙ্গনে নাচেন প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥ [তদেব. পৃ. ৫৪৭]

সমস্ত ভক্তই সেই সঙ্গে সংকীর্তন-নৃত্য করতে লাগলেন। সমুদ্র-জলে হরিদাসের দেহ স্নান করান হলো, চৈতন্যদেব বললেন, 'সমুদ্র এই মহাতীর্থ হৈল'। হরিদাসের পাদোদক পান করালেন সকলকে। দেহ বালির ওপর শুইয়ে চৈতন্যদেব তার ওপর নিজে বালুকা দিলেন—'তাঁরে বালু দিয়ে উপরে পিণ্ডা বান্ধাইল'। তারপর সকলকে নিয়ে স্নান ক'রে হরিদাসের সমাধি প্রদক্ষিণ করে সোজা চ'লে এলেন জগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারে।

সমস্ত সামাজিক আচার-আচরণকে অতিক্রম ক'রে জ্বল জ্বল ক'রে উঠলো চৈতন্যদেবের মনোভাব। জাত-পাত ধর্মের বহিরাবরণ মিথ্যা—মানুষই সর্বাপেক্ষা বড়, সমস্ত মানুষই এক। বলিষ্ঠতার সঙ্গে চৈতন্যদেব শুনিয়েছেন—

আমি ত সন্ন্যাসী আমার সমদৃষ্টি ধর্ম।
চন্দন-পঙ্কেতে আমার জ্ঞান হয় সম ॥ [তদেব. পৃ, ৪৭৩]

মনুষ্য সমাজেও সেই সমতা আনার সাধনা করেছিলেন তিনি।

৫• চরিতকাব্যে চৈতন্যদেবের মহিমা খর্ব হয়েছে

বিভিন্ন চৈতন্য জীবনীকাররা এমন অনেক কথা বলেছেন যা চৈতন্য-জীবনের মূল আদর্শ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। যে বিশ্বম্ভর শৈব-গায়েনের পিঠে চ'ড়ে আনন্দে নৃত্য করতেন, সেই বিশ্বম্ভরের দ্বিতীয় দেহ, সংকর্ষণের অবতার নিত্যানন্দকে দিয়ে যে কাজ করিয়েছেন বৃন্দাবনদাস, তা অত্যন্ত নিন্দাজনক। সেন-বর্মণদের আমলে বৌদ্ধদের ওপর যথেষ্ট অত্যাচার হয়েছিল; দেশে বৌদ্ধদের সংখ্যা তখন খুবই বেশি—প্রজাদের একটা বড় অংশ বিরূপ থাকার ফলে উপরোক্ত দুটো বংশই অনেকদিন রাজত্ব করতে পারে নি। চৈতন্যদেব ইতিহাসের এই শিক্ষাকে গ্রহণ ক'রে জাত-পাতের বিরোধী হয়ে উঠেছিলেন। অথচ তাঁর দ্বিতীয় দেহ নিত্যানন্দ কি করলেন—

> তবে নিত্যানন্দ গেলা বৌদ্ধের ভবন।
> দেখিলেন প্রভু বসি আছে বৌদ্ধগণ॥
> জিজ্ঞাসেন প্রভু কেহো উত্তর না করে।
> ক্রুদ্ধ হই প্রভু লাথি মারিলেন শিরে॥
> পলাইল বৌদ্ধগণ হাসিয়া হাসিয়া।
> বনে ভ্রমে নিত্যানন্দ নির্ভয় হইয়া॥ [চৈ. ভা. পৃ. ৪৪]

'লাথি শিরে' মারা সত্ত্বেও বৌদ্ধরা 'হাসিয়া হাসিয়া' পলায়ন করলেন। বৌদ্ধদের সম্বন্ধে গভীর অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন বৃন্দাবনদাস। পরম আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বৌদ্ধদের অবজ্ঞার চক্ষে দেখলেও নারায়ণের বিভিন্ন অবতারের কথা বলতে গিয়ে সেই বৃন্দাবনদাসই বলেছেন—

> রামচন্দ্ররূপে কর রাবণ-সংহার।
> হলধররূপে কর অনন্ত বিহার॥
> বুদ্ধরূপে দয়া-ধর্ম করহ প্রকাশ॥
> কল্কিরূপে কর ম্লেচ্ছগণের বিনাশ॥ [তদেব পৃ. ১৪]

বুদ্ধদেব যদি নারায়ণের অবতারই হন তবে তাঁর শিষ্যদের এ ভাবে অপমানিত করলেন কেন হলধরের অবতার চৈতন্যদেবের দ্বিতীয় দেহ নিত্যানন্দ?

যে চৈতন্যদেব সমস্ত ধর্মের মধ্যে সত্যকে দেখেছেন—সমস্ত মন্দিরে মন্দিরে ভ্রমণ করেছেন তাঁর মুখ দিয়ে অপর ধর্মগুরু সম্বন্ধে যা বলিয়েছেন তাও শোভন নয়—

> কাশীতে'পড়ায় বেটা পরকাশানন্দ।
> সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড॥ [তদেব. পৃ. ১১৫]

এ ভাষা প্রেম-ভক্তির সাধক চৈতন্যদেবের মুখে বসিয়ে বৃন্দাবনদাস তাঁকে ছোটই করেছেন।

গীতায় ভগবান বলেছেন-যে, ধর্ম সংস্থাপনের জন্য তিনি বার বার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন: ধর্মনিষ্ঠদের উদ্ধার এবং দুষ্কৃতকারীদের দমনের জন্যই তিনি আসেন। চৈতন্য-অবতারে তিনি কাদের দমন করবেন? প্রেম-ভক্তির অবতার কি সংহার করতে পারেন?

সংহার না করলে যে গীতার বাণীও সার্থক হয় না। তাই ইতস্তত করে তাত্ত্বিক কৃষ্ণদাস বললেন—

পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার।
পাষণ্ডী সংহারি ভক্তি করিমু প্রচার॥ [চৈ. চ. পৃ. ৮৫]

তত্ত্বজ্ঞ অবশ্যই গোপাল-চাপালের ব্যাপারে সামলিয়ে নিয়ে বললেন, 'সেই পাপী দুঃখ ভোগে না যায় পরাণ' (তদেব.)।

ক্রুদ্ধ নিমাইয়ের যে পরিচয় দিয়েছেন জীবনীকাররা তাতে তাঁকে অতিমানব করতে গিয়ে অমানব ক'রে ফেলা হয়েছে। নিমাই ঘরের দ্রব্যসামগ্রীই কেবল ভাঙ্গচুর করেন নি—ঘরদ্-বারও ভেঙ্গেছেন। বৃন্দাবনদাস আশার বাণী অবশ্যই শোনাবার চেষ্টা করেছেন। নিমাইয়ের মহত্ত্ব এই যে, তিনি মাতাকে আঘাত করেন নি—'তথাপিহ জননীরে না মারিল গিয়া' (চৈ. ভা. পৃ. ৩৯)। লোচনদাস এবং জয়ানন্দ নিমাইকে দিয়ে জননীর মাথায় 'ইষ্টক' মারিয়েছেন। এ ধরনের কিছুই পাওয়া যায় না তাত্ত্বিকের লেখায়। এই সমস্ত প্রায় পরস্পর বিরোধী কল্পিত কাহিনী পরিবেশন করার কারণ কিছুই বোধগম্য হয় না। চৈতন্যদেবের এরূপ আচরণ কিন্তু কল্পনার অতীত।

বঙ্গদেশে যাবার কালে যিনি লক্ষ্মীদেবীকে নিজের গলার উপবীতটি দিয়ে গিয়েছিলেন, যিনি জাত-পাতের পার্থক্য ঘুচিয়ে বৈষ্ণবরূপে সকলকে একাকার করে দিয়েছিলেন, তাঁকে ব্রাহ্মণ্যগৌরবে গৌরবান্বিত করার চেষ্টায় দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়েছিলেন জীবনীকাররা। বৃন্দাবনদাস চৈতন্যদেবকে বিপ্র বলে গৌরবান্বিত করতে চাইলেন—

জয় জয় দ্বিজকুলদীপ গৌরচন্দ্র।
... ...
জয় অধ্যাপক-শিরোরত্ন বিপ্ররাজ॥ [চৈ. ভা. পৃ. ৬২]

চৈতন্যচরিতামৃত প্রণেতা তাত্ত্বিক কবিরাজ গোস্বামী পর্যন্ত চৈতন্যদেবের দক্ষিণ ভ্রমণ যাত্রার সময় এক সঙ্গী নিয়ে যাবার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন; সেই সঙ্গীর প্রধান গুণ এই যে, তিনি ছিলেন কুলীন ব্রাহ্মণ—

কৃষ্ণদাস নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ।
যাঁরে সঙ্গে লৈয়া কৈল দক্ষিণ ভ্রমণ॥ [চৈ. চ. পৃ. ৫৩]

গোপ গৃহে যখন বিশ্বম্ভর উপস্থিত হলেন তখন তাকে ব্রাহ্মণ দেখে গোপেরা সম্ভ্রমে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন। বৃন্দাবনদাস সে সময়ে যে বিশ্বম্ভরের পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি তো ব্রাহ্মণ্যগর্বে গর্বিত ছিলেন না—

বসিলেন মহাপ্রভু গোপের দুয়ারে।
ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধে প্রভু পরিহাস করে॥
প্রভু বোলে "আরে বেটা! দধি-দুগ্ধ আন।
আজি তোর ঘরের লইব মহাদান॥" [চৈ. ভা. পৃ ৫৭]

যিনি জাত-পাতকে অস্বীকার করেছেন তিনিও কি ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য জাতের শিষ্য গ্রহণ করতেন না? মুকুন্দ দত্ত তো তাঁর সহপাঠী ছিলেন। বৈদ্য মুরারি গুপ্তও ছিলেন তাঁর সতীর্থ—সুতরাং অধ্যাপকরা বিভিন্ন জাতির মানুষদের যে পড়াতেন সে

বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বৃন্দাবনদাসের কথায় বিশ্বম্ভর সম্বন্ধে অন্য কথা মনে হয়—বিশ্বম্ভর বঙ্গদেশে গেছেন, খবর পেয়ে আসছেন পড়ুয়ার দল—

ভাগ্যবন্ত যত আছে সকল ব্রাহ্মণ।
উপায়ন-হস্তে আইলেন সেই-ক্ষণ॥ [তদেব. পৃ. ৬৯]

হরিদাসের কৃষ্ণভক্তির কথা স্মরণ করিয়ে বৃন্দাবন দাস নিজেই বলেছেন—

'জাতি-কুল-সর্ব নিরর্থক' বুঝাইতে।
জন্মিলেন নীচ-কুলে প্রভুর আজ্ঞাতে॥
অধম-কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
তথাপি সেই সে পূজ্য, সর্বশাস্ত্রে কয়॥
উত্তমকুলেতে জন্মি শ্রীকৃষ্ণ না ভজে।
কুলে তার কি করিবে নরকেতে মজে॥ [তদেব. পৃ. ৮৫]

সেই বৃন্দাবন দাসই দেখিয়েছেন ব্রাহ্মণকে কি ভাবে প্রাধান্য দিয়েছেন বিশ্বম্ভর। গয়ার পথে বিশ্বম্ভরের জ্বর হলো। জ্বর উপশমের ঔষধের ব্যবস্থা তিনি নিজেই করলেন—

তবে প্রভু ব্যবস্থিলা ঔষধ আপনে।
সর্ব-দুঃখ খণ্ডে বিপ্রপাদোদক পানে॥
বিপ্রপাদোদকের মহিমা বুঝাইতে।
পান করিলেন প্রভু আপনে সাক্ষাতে॥
বিপ্রপাদোদক পান করিয়া ঈশ্বর।
সেইক্ষণে সুস্থ হৈলা, আর নাহি জ্বর॥ [তদেব. পৃ. ৮৯]

ব্রাহ্মণের মহিমা প্রদর্শন যিনি করলেন তিনি সর্বজাতিকে এক করার সাধনা গ্রহণ করলেন কি কারণে? চৈতন্যদেবের মূল চিন্তার পরিপন্থী এই 'বিপ্রপাদোদকের মহিমা' প্রদর্শন। বৃন্দাবনদাস চৈতন্যদেবের মহিমা ক্ষুণ্ণ করেছেন বিপ্রপাদোদকের মহিমা প্রদর্শন করতে গিয়ে। চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরে কয়েক বৎসরের মধ্যেই যে, বৈষ্ণব গোষ্ঠী সমূহের ব্রাহ্মণ নেতারা পুনরায় ব্রাহ্মণ্য মহিমা প্রতিষ্ঠায় ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন তার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলোর মধ্যে। এ কথা স্বীকার করা যেতে পারে যে, বিপ্লবী মনোভাব সত্ত্বেও চৈতন্যদেব তৎকালে প্রচলিত সামাজিক আচার-আচরণকে ধূলিসাৎ করে নূতন চিন্তার বিরুদ্ধে একটা বড় আকারের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে চান নি, কিন্তু নিজ জীবনের আচরণে তিনি এমন কাজও করতে চান নি যা তাঁর মূল আদর্শকে ব্যাহত করে। ব্রাহ্মণদের সামাজিক মর্যাদা তিনি ক্ষুণ্ণ করতে না চাইলেও তাঁদের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করার কোন উদ্দেশ্যও তাঁর ছিল না।

আশ্চর্য এই যে, যে বৃন্দাবনদাস বিশ্বম্ভরকে দিয়ে বিপ্রপাদোদকের মহিমা কীর্তন করিয়েছেন সেই বৃন্দাবনদাসই ব্রাহ্মণ-বিষয়ক দুটো শ্লোক উদ্ধার ক'রে কলিযুগে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের অধঃপতিত রূপ প্রকাশ ক'রে দিয়েছেন—

"রাক্ষসেরা কলিযুগে অবলম্বন করিয়া বিপ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করে; আর সেই বিপ্রকুলে জন্মিয়া কালপ্রভাবে যাহাদিগের সংখ্যা কৃশ বা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে সেই শ্রোত্রিয়কুলকে বাধা প্রদান করিতে থাকে।" (বরাহপুরাণে মহেশ-বাক্যম্)। এবং—

"এ বিষয়ে অধিক আর কি বলিব, ব্রাহ্মণ হইয়াও যাহারা অবৈষ্ণব, প্রমাদনিবন্ধনও তাহাদের সম্ভাষণ ও স্পর্শন বিসর্জন করিবে।" (পদ্মপুরাণে মহেশ-বাক্যম্)

চৈতন্যদেব নিজেও বলেছিলেন যে, নিজে ধর্ম আচরণ ক'রে তিনি অন্যকে শেখাবেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন—

আপনি করিব ভক্তিভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সবারে ॥
আপনি না কৈলে ধর্ম শিখান না যায়। [চৈ চ পৃ. ৭]

সুতরাং নিজের জীবনের আচরণে বিপ্র মহিমা কীর্তন বিশ্বম্ভরের পক্ষে অসম্ভব। জীবনীকাররা সমকালীন ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে চৈতন্যদেবকে ছোট ক'রে ফেলেছেন।

বালক-যুবক বিশ্বম্ভরকে দিয়ে কয়েকবার নারায়ণ রূপে দর্শন করিয়েছেন জীবনীকাররা। বাল-গোপাল ভক্ত বিপ্রকে প্রথমে স্বরূপ দেখান বালক নিমাই। বৃন্দাবনদাস বলেছেন—

সেই ক্ষণে দেখে বিপ্র পরম অদ্ভুত।
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, অষ্টভুজ-রূপ ॥ [চৈ. ভা পৃ. ২৪]

রূপ তো দেখালেন কিন্তু সেই সঙ্গে সাবধান বাণীও উচ্চারণ করলেন—এই গোপনকথা যেন কেউ না জানে—

যাবত থাকে মোর এই অবতার।
তাবত কহিলে কারে করিব সংহার ॥ [তদেব. পৃ. ২৫]

দর্শন দেওয়াই বা কেন, সংহারের ভয় দেখানই বা কেন? প্রেম-ভক্তির অবতার ব'লে যাঁকে প্রতিষ্ঠিত করার বাসনা তাঁর মনে সংহারের প্রেরণাই বা জাগে কেন? প্রেম বিলাতে যিনি এসেছেন তাঁকে কি ছোট করা হলো না?

দিগ্বিজয়ীর পরাজয়ের পর সরস্বতী তাঁকে দর্শন দিয়ে নিমাইয়ের সত্য পরিচয় দিয়ে বললেন—

সরস্বতী বোলেন "শুনহ বিপ্রবর।
বেদ-গোপ্য কহি এই, তোমার গোচর ॥
কারো স্থানে ভাঙ্গ যদি এ সকল কথা।
তবে তুমি শীঘ্র হবে অল্পায়ু সর্বথা ॥ [তদেব পৃ. ৬৫]

কেবল সরস্বতীর কথাই নয়, বিশ্বম্ভর নিজেও দিগ্বিজয়ীকে বললেন—

যে কিছু তোমারে কহিলেন সরস্বতী।
তাহা পাছে বিপ্র! আর কহ কাহা প্রতি ॥
বেদগুহ্য কহিলে হয় পরমায়ু ক্ষয়।
পরলোকে তার মন্দ জানিহ নিশ্চয় ॥" [তদেব. পৃ. ৬৭]

পরকালেও বিপদ হতে পারে তা জানিয়ে দেওয়া হলো। দেবতার বাক্য শোনাবার জন্যও ভয় দেখাতে হয়! প্রেম-ভক্তি কি ভীতি প্রকাশের ওপর নির্ভরশীল!

জগাই-মাধাই উদ্ধারের ক্ষেত্রেও জীবনীকাররা চৈতন্যদেবের প্রেম-ভক্তির জয় ঘোষণা

করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং সেই মহামানবের ব্যক্তিত্বকে ছোট ক'রে ফেলেছেন। বৃন্দাবন-দাস বলেছেন—

অবধূত নাম শুনি মাধাই কুপিয়া।
মারিল প্রভুর শিরে মুটুকী তুলিয়া ॥ [তদেব. পৃ. ১৭০]

নিত্যানন্দের মস্তক থেকে রক্তের ধারা প্রবাহিত হলো। চৈতন্যদেব তা দেখে—"চক্র! চক্র! চক্র!" প্রভু ডাকে ঘনে ঘনে,' (তদেব.)। প্রেম-ভক্তির জয় হলো কি? 'মেরেছিস্ কলসীর কানা তাই ব'লে কি প্রেম দেব না?'—এটাই তো সঠিক কথা হতো। চক্রকে আহ্বান করিয়ে চৈতন্যদেবের আদর্শ ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে।

বৃন্দাবন দাসের সুদর্শন চক্র কেউ দেখতে পান নি, সুতরাং চৈতন্যদেবের দিক দিয়ে প্রেম-ভক্তির অপমৃত্যু ঘটালেও জগাই-মাধাই ভীতিবশতঃ পরিবর্তিত হয়েছেন একথা বলা চলে না। কিন্তু লোচনের সুদর্শন জগাই মাধাইয়ের দৃষ্টিগোচর হলো— তারা ভীত-ত্রস্ত হয়ে পড়লেন—

দেখিলেন জগাই মাধাই সুদর্শন।
কাঁপিতে লাগিল অঙ্গ—ত্রাসিত মন ॥ [লোচন দাস, চৈ. ম. পৃ. ১২0]

অবশ্যই লোচনের নিত্যানন্দ সবদিক রক্ষা করেছেন: প্রেমের জয় ঘটিয়েছেন—

কি কারণে ভগবান্ ঐশ্বর্য প্রকাশে ॥
করুণাতে উদ্ধার করিব ত্রিভুবন।
দীনহীন পাতত পামর দুষ্টজন ॥
... ...
পতিত পাবন নামের মহিমা রাখিব ॥ [তদেব]

কবিরাজ গোস্বামী বৃন্দাবনদাসের ওপর বরাত দিয়ে এ বিষয়ে আর অগ্রসর হন নি।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাঁর গ্রন্থে বিশ্বম্ভরকে মুক্তার ঝালর যুক্ত সোনার পালঙ্কে শয়ান দেখিয়ে একটি মহান ব্যক্তিত্বকে বিলাসী ক'রে অনেক নীচে নামিয়েছেন সাধারণ মানুষের চোখে। ঐশ্বর্যে মুড়ে দিলেই মানুষ ভগবানের নিকটবর্তী হন এ প্রকার অদ্ভুত ধারণা কি ক'রে ভক্তদের হয়!

সোনার পালঙ্কে শয়ন করার মতো ঐশ্বর্য পেলেন কোথায় বিশ্বম্ভর? জগন্নাথ মিশ্র তো আমাদের পূর্বেই শুনিয়েছেন—

সাক্ষাতেই এই কেনে না দেখ আমাত।
পড়িয়াও আমার ঘরে কেনে নাহি ভাত ॥ [চৈ. ভা. পৃ. ৩৩]

পরবর্তীকালে বহু শিষ্য পেয়েছেন আর তার ফলে প্রচুর উপার্জন হয়েছে? প্রচুর শিষ্য পেয়েছেন সত্য কিন্তু বিত্তবান হয়েছিলেন কি? বঙ্গদেশে যাবার পূর্ব পর্যন্ত দেখা যায়—

ঘরে কিছু নাহি আই চিন্তে মনে মনে।
কুড়ি সন্ন্যাসীর ভিক্ষা হইবে কেমনে? [তদেব. পৃ. ৬৮]

বিশ্বম্ভরের দ্বিতীয় বিবাহের সময় বিবাহের ব্যয় নির্বাহ করেছেন বুদ্ধিমন্ত খান প্রভৃতি ভক্ত বন্ধু ও শিষ্যগণ। সাধারণ অবস্থার একটি দম্পতির জন্য সোনার খাটের ব্যবস্থা করে ভক্তরা নিজেদের মনোবাসনা চরিতার্থ করলেও ভক্তির পাত্রকে সম্মানিত করা হয় না।

বিশ্বম্ভরের অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিতে গিয়ে বৃন্দাবনদাস একটি হাস্যকর বিষয়ের অবতারণা করেছেন যা কখনই কোন ব্যক্তিত্বের জীবন-পদ্ধতি বলে স্বীকৃত হতে পারে না—তখনও বিশ্বম্ভরের বিবাহ হয় নি, সংসার চলে না—মাঝে মাঝেই তিনি কোথা থেকে এক তোলা, দুই তোলা সোনা নিয়ে এসে জননীর হাতে দেন : শচীদেবী ভাবেন—

কিবা ধার করে, কিবা কোন্ সিদ্ধি জানে।
কোন্ রূপে কার সোনা আনে বা কেমনে ॥" [তদেব. পৃ. ৪০]

সংসার চালান গেল, কিন্তু যাঁকে অবতার প্রমাণ করতে বসেছেন জীবনীকাররা তাঁর ব্যক্তিত্বের, উদ্দেশ্যের মর্যাদা রক্ষা করা গেল না।

সম্ভবতঃ অনবধানবশতঃ বৃন্দাবনদাস এমন একটি মারাত্মক ভ্রম করেছেন যাতে চৈতন্যদেবের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ধূলিসাৎ করা হয়েছে—জগাই-মাধাই তখন রাত্রিবেলা চৈতন্যদেবের গৃহের বাইরে দাঁড়িয়ে কীর্তন শোনেন এবং মদ্যপান করেন। ভক্তরা ভয়ে থাকেন, কিন্তু স্বয়ং চৈতন্যদেবও— ? জগাই-মাধাই বলেন—

প্রভুরে দেখিয়া বোলে "নিমাঞি পণ্ডিত !
করাইলা সম্পূর্ণ মঙ্গলচণ্ডী-গীত ॥
গায়েন সব ভাল মুঞি দেখিবারে চাঙ।
সকল আনিঞা দিব যথা যেই পাঙ ॥
দুর্জন দেখিয়া, প্রভু দূরে দূরে যায়।
আর-আর পথ দিয়া সভেই পালায় ॥ [তদেব. পৃ. ১৭০]

দুর্জন দেখে দূরে দূরে থাকলে চৈতন্যদেবের আর থাকবে কি !

দেখা যাচ্ছে যে, যুগে যুগেই ভক্তরা ভক্তির পাত্রদের নীচে নামিয়ে আনেন। রাজনীতি, সমাজনীতি এবং ধর্মনীতির সকল ক্ষেত্রেই ওই একই কথা প্রযোজ্য।

সমস্ত জীবনীগ্রন্থ থেকেই আরও প্রচুর উদাহরণ দেওয়া চলে। বৃন্দাবনদাসকেই এখানে প্রধান উপজীব্য করা হয়েছে এই কারণে যে, আদিলীলার তিনিই ছিলেন 'ব্যাস'। নবদ্বীপের ভক্তদের মনোভাব জানার সম্ভাবনা তাঁরই ছিল সর্বাপেক্ষা অধিক। ভক্তদের সেই মনোভাবই ঘটনাকে প্রয়োজন মত বিকৃত করেছে মনে হয়। ভক্তির আতিশয্যে চরিত্রকে যে আদর্শচ্যুত করা হচ্ছে সে কথাটাও তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক।

৬. চৈতন্যচরিতে ভাগবতের অনুকরণ

মহৎ মানুষদের, বিশেষ ক'রে ধর্ম প্রবক্তা সাধকদের ঈশ্বরের অবতার রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে সব দেশের মানুষই খুশি হন। অবশ্যই ভারতে এই প্রবণতা অত্যধিক। এ দেশে সাধুসন্তের সংখ্যা নির্ণয় অসম্ভব; ধর্মমতেও আছে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পার্থক্য। যাঁরাই ধর্মমত প্রচারে পথ পরিক্রমা করেছেন, মা'তয়ে তুলেছেন অজস্র মানুষকে, তাঁরাই এদেশে ঈশ্বরের অবতার ব'লে পূজিত হয়েছেন। তাঁদের নিজেদের জোরালো অস্বীকৃতি-কেও গ্রাহ্য করা হয় নি। নানক, দাদু, চৈতন্যদেব প্রভৃতি সকলেই নিজেদের মানুষ বলেই পরিচিত করতে চেয়েছেন কিন্তু ভক্তরা তা মেনে নিতে পারেন নি।

ভক্তদের এই বিশ্বাসের জোর যে কতো বেশী, তা লক্ষ্য করা যায় বুদ্ধদেবের ক্ষেত্রে। বেদকে অস্বীকার ক'রেও বুদ্ধ নারায়ণের অবতার, বৈদান্তিক শঙ্করাচার্য পৃথিবীকে শূন্য ক'রে দিয়েও মহাদেবের অবতার: বুদ্ধের শূন্যবাদ ও শঙ্করের মায়াবাদকে যুক্তি খড়্গে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করেও চৈতন্য মহাপ্রভু নারায়ণের অবতার। বুদ্ধ এবং চৈতন্যদেব একই নারায়ণের অবতার! এরূপ অপূর্ব সমন্বয় সম্ভব কি প্রকারে? ভক্তদের কাছে [illegible]—বিশ্বাস দিয়েই তাঁরা কাজ সারেন এবং নিতান্ত অসুবিধায় পড়লে বলেন, 'ঈশ্বরের মায়ায় সবই সম্ভব'। বর্তমান যুগেও ভক্তের দৃষ্টি বেশ জোরালোই আছে, অপরদিকে একটা যুক্তিবাদী মনোভাবের প্রবণতাও বেশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও দেবতাদের বিশেষ প্রাধান্য। রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদকদের স্বীকৃতি পাবার কোন অসুবিধা ছিল না; বাল্মীকি-ব্যাসের প্রতিষ্ঠা সম্ভবতঃ কোন দিনই হ্রাস পাবে না, তাই তাঁদের গ্রন্থের অনুবাদকারীরা আসলের সঙ্গে স্ব-কল্পিত কাহিনীর সন্নিবেশ করতে পেরেছেন বেশ নিশ্চিত হয়েই। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের কবিরা সকলেই স্বপ্নাদিষ্ট—কাব্যের স্বীকৃতির জন্য দেবতাদের আদেশের একান্তই প্রয়োজন ছিল। ধর্মমঙ্গল তো একেবারেই অপাংক্তেয়: পংক্তিতে স্থান পাবার জন্য কবিদের স্বপ্ন দেখতেই হয়েছে। দেবতাদের নিয়ে কাব্য হলেও তার স্বীকৃতির জন্য স্বপ্ন দেখার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। দেবতা ছাড়া সে সময়ে কিছু করার উপায় ছিল না।

চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের অবতার: শ্রীকৃষ্ণের দেহ-বর্ণের সঙ্গে তাঁর কিছুমাত্র মিল ছিল না। এই অমিল দূর করার জন্য রূপ গোস্বামী বললেন, কৌতুকী শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রণয়ী (গোপীদের) দেহজ্যোতি প্রকটিত ক'রে নিজের শ্যামকান্তি আবৃত ক'রে চৈতন্য-আকার ধারণ করেছেন (স্তবমালা ২/৩)। কর্ণপুর বললেন, গোপীদের সঙ্গে অঙ্গমর্দনের ফলেই শ্যাম হলেন গৌর (কর্ণপুর-কাব্য, প্রথম শ্লোক); নরহরি সরকার ঠাকুর বললেন—

অন্তরেতে শ্যাম-তনু বাহিরে গৌরাঙ্গ জনু
অদভুত চৈতন্যের লীলা।
রাই সঙ্গে খেলাইতে কুঞ্জরায় বিলাইতে
অনুরাগে গৌরতনু হৈলা॥ [২২৫৯ সংখ্যকপদ, পদকল্পতরু।]

শ্রীজীব গোস্বামী ভাগবতের (১০/৮/২৩) শ্লোক উদ্ধার ক'রে বললেন, সত্যযুগে ভগবানের শুক্লবর্ণ, ত্রেতায় রক্তবর্ণ, দ্বাপরে 'কৃষ্ণবর্ণ, সুতরাং 'শুক্লো রক্তস্তথা পীত

ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ'—এই শ্লোকার্ধে উল্লেখিত চারবর্ণের মধ্যে বাকি রইল পীতবর্ণ —অর্থাৎ কলিযুগে ভগবান পীতবর্ণ তা প্রমাণ হলো। উদ্ধৃত শ্লোকে 'ইদানীং কৃষ্ণতাং গত' বলায় যে সাম্প্রতিকতম বর্ণই কৃষ্ণ প্রতিপন্ন হয়, শ্রীজীব এ দিকটি ইচ্ছাকৃত ভাবে উপেক্ষা করেছেন। শ্রীরূপ গোস্বামী কিন্তু লঘুভাগবতামৃতে কলিতে কৃষ্ণবর্ণের ক্রমটিই রক্ষা করেছেন—

কথ্যাতে বর্ণনামভ্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ।
রক্তশ্যামক্রমাৎকৃষ্ণস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলৌ ॥

অবতারের প্রতিষ্ঠা ঘটাতে হলে উভয়ের কার্যকলাপে কিছু কিছু মিল দেখাতেই হয়। তাই লোচনের চৈতন্যমঙ্গল রচনার পর বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যমঙ্গলকে 'চৈতন্য ভাগবত' নাম দিয়ে তৃপ্ত হলেন সে কালের ভক্তগণ। লৌকিক দেবতাদের নিয়ে রচিত হয়েছে মঙ্গলকাব্য। কিন্তু যিনি গোলোকবিহারী তাঁকে নিয়ে তো রচিত হবে ভাগবত যেমনটি রচনা ক'রে গেছেন ব্যাসদেব। শ্রীকৃষ্ণের জীবনকথা 'ভাগবত'—তাই ব্যাসদেব রচনা করেছিলেন শ্রীমদ্ভাগবত—চৈতন্যদেবের জীবনী নিয়েও সেরূপ বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত'।

অবতারগণ পৃথিবীকে উদ্ধার করতে পৃথিবীতে আসেন তাই তাঁদের জন্মমুহূর্তে দেবতাদের আনন্দ-উল্লাসের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। মহাপ্রভুর জন্মমুহূর্তেও সেরূপ ঘটতেই হবে। ব্রহ্মাপুত্র কর্দম—তাঁর পুত্র কপিল ছিলেন নারায়ণের অবতার। তাঁর জন্মকালে স্বর্গের দেবদেবীরা অদৃশ্যরূপে উপস্থিত হয়েছিলেন। অদিতির গর্ভে বামন অবতারের জন্মের পর—

স্বর্গ হতে অবিরত পুষ্পবৃষ্টি হয়।
আনন্দে গর্জন করে মেঘ সমুদয় ॥
অকালে বহিত হয় মলয় পবন।
পক্ষিগণ আনন্দেতে করিল কূজন ॥
ফল ফুলে সুশোভিত হ'ল উপবন।
ধরিল বিচিত্র শোভা এ তিন ভুবন ॥ [শ্রীমদ্ভাগবত, সুবোধ, পৃ.৫৯১]

দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন নারায়ণ : তাতেই স্বর্গ-মর্ত্যে নানা ঘটনা ঘটলো—

ইচ্ছিলেন দেবকীতে নিজ প্রকাশন ॥
আনন্দে করিল স্বর্গে পুষ্প বরিষণ।
জলদ-নিচয় হাসে করিয়া গর্জন ॥
একধারে শশী হাসে ল'য়ে কুমুদিনী।
সাগর-সলিল হাসে বেড়িয়া মেদিনী।
সাধুজন মেঘ চন্দ্র একত্র দেখিয়া।
ভাবিল অদ্ভুত কাল ঘেরিল আসিয়া ॥
সেই কালে ভগবান্ ধর্ম রক্ষা তরে।
প্রবিষ্ট হলেন আসি দেবকী-উদরে ॥ [সুবোধ, তদেব. পৃ.৬৬০]

[যীশুর জন্মকালে আকাশের তারা দেখে বিস্ময়ে পথ-চালিত ম্যাগীদের আচরণের অস্পষ্ট আভাস আছে 'সাধুজন'-এর বিস্ময়ে।]

চৈতন্যদেবের জন্মকালেও দেবদেবীদের আনন্দ-উল্লাসের কথা বলেছেন তাঁর জীবনীকাররা—কপিল-বামন-কৃষ্ণের ন্যায় চৈতন্যদেবও তো নারায়ণের অবতার! সুতরাং মিল অবশ্যম্ভাবী। মুরারি-কাব্যে আছে, ব্রহ্মাদি দেবগণ চৈতন্য আবির্ভাবের সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হয়ে শচীর বন্দনা করছেন—

'নমামি ত্বাং সদাগর্ভাক্ষিদিতিং জননীং হরে।' [শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতং প্রথম প্রক্রম/৫সর্গ/৮]

চৈতন্য ভাগবত লিখছেন—

চতুর্দিগে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ।
জয়-শব্দে দুন্দুভি বাজয়ে অনুক্ষণ॥
হেন সময়ে সর্ব-জগত-জীবন।
অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশচীনন্দন॥ [চৈ. ভা. : পৃ. ১৫]

এবং

চৈতন্য অবতার, শুনিঞা দেবগণ রে
উঠিল পরম মঙ্গল রে।
সকল-তাপ-হর, দেখি শ্রীমুখচন্দ্র,
আনন্দে হইল বিহ্বল রে॥
অনন্ত, ব্রহ্মা, শিব, আদি করি যত দেব,
সভেই নররূপ ধরি রে।
গায়েন হরি হরি, গ্রহণ ছল করি,
লখিতে কেহো নাহি পারে॥ [তদেব.]

দেবগণের অলক্ষিতে আগমনের সুবিধা ক'রে দিতেই যেন তাঁরই লীলায় সেদিন গ্রহণ লেগেছিল। গ্রহণ থাকায় হাজার হাজার মানুষ হরিসংকীর্তন সহ গঙ্গাস্নান করলেন।—জন্মগ্রহণের মুহূর্তটি ঈশ্বর নিজের ইচ্ছাতেই যেন এভাবে সাজিয়ে নিয়েছেন—

ঈশ্বরের কর্ম বুঝিবার শক্তি কায়।
চন্দ্র আচ্ছাদিল রাহু ঈশ্বর-ইচ্ছায়॥ [তদেব. পৃ. ১৪]

লোচনদাস আরও একধাপ এগিয়ে গেছেন। জন্মের পূর্বেই তিনি অদ্বৈত আচার্যকে দিয়ে প্রথমে এবং ব্রহ্মা আদি দেবতাদের দিয়ে পরে শচীগর্ভের বন্দনা করিয়েছেন—

শচী-প্রদক্ষিণ করি করে পরনাম।
চমকিত শচীদেবী দেখি অবিধান॥ [লোচনদাস : চৈ. ম. পৃ. ৩৭]

অবিধান তো বটেই : আচার্যদেব যে জগন্নাথ মিশ্রেরও প্রণম্য। সাতবার প্রদক্ষিণের পর প্রণাম জানিয়ে তিনি চলে গেলেন। বিস্মিত জগন্নাথের প্রশ্নের উত্তরে তিনি শুধু জানিয়ে গেলেন, "জানিবে সকল পাছে"। শচী সমস্তই সুধাময় দেখছেন—

সব সুধাময় দেখে—না দেখয়ে দুঃখ।
সব দেবগণ দেখে আপনা-সম্মুখ॥
ব্রহ্মা-শিব- সনকাদি যত দেবগণ।
উদর সম্মুখ করি করয়ে স্তবন॥ [তদেব. পৃ. ৩৭]

দেবতাগণও প্রদক্ষিণ করলেন শচীদেবীকে—চতুর্মুখ ব্রহ্মাকে দেখে তিনি চমকিত হলেন। বৃন্দাবনদাসের ন্যায় লোচনদাসও ওই গ্রহণ কালের বিশেষত্বের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন— সমস্ত নবদ্বীপে শোনা যাচ্ছে হরিধ্বনি, আর তার সঙ্গে—

চৌদিগ ভরল আর দিব্য চারুগন্ধ।
পরসন্ন দশদিগ—বায়ু মন্দ মন্দ॥
ষড় ঋতু উদয় ভৈ গেল সেইকালে।
প্রভু-শুভজন্ম পৃথিবীতে হেন বেলে॥
অন্তরীক্ষে দেবগণ দিব্য-যানে চাহে।
গৌর-অঙ্গ দেখিবারে অনুরাগে ধাএ॥ [তদেব. পৃ. ৩৮]

কবি কর্ণপূরের অনুসরণে চরিতামৃত রচয়িতা তাত্ত্বিক কবিরাজ গোস্বামী শোনালেন --বিশেষ মুহূর্তে জন্মগ্রহণের জন্য মহাপ্রভু যেন অপেক্ষা ক'রে ছিলেন। ব্যাসপুত্র শুকদেব শ্রীমদ্ভাগবতের প্রবক্তা—তিনি মায়ার সংসারে জন্মগ্রহণে অনিচ্ছুক ছিলেন ব'লে মাতৃগর্ভে কয়েক বৎসব অবস্থান করেন। মহাপ্রভুও উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন যেন—

হৈতে হৈতে হৈল গর্ভ ত্রয়োদশ মাস।
তথাপি ভূমিষ্ঠ নহে মিশ্রের হৈল ত্রাস॥
নীলাম্বর চক্রবর্তী কহিলেন গণিয়া।
এই মাসে পুত্র হইবে শুভক্ষণ পাঞা॥
চৌদ্দশত সাত শকে মাস যে ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ॥
সিংহরাশি সিংহলগ্ন উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়্‌বর্গ অষ্টবর্গ সর্বসুলক্ষণ॥
অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন॥
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন প্রয়োজন॥ [চৈ. চ. পৃ. ৬৯]

পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ—সমস্ত নবদ্বীপে তখন কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি হরি ধ্বনি, উপযুক্ত পরিবেশে, বিশেষ মুহূর্তে জন্মগ্রহণ করলেন গৌরহরি।

গৌরাঙ্গের জন্মকালে স্বর্গেও আনন্দ দেখা দিল। প্রকৃতি হয়ে উঠলো হাস্যোজ্জ্বল—

হরি বলি নারীগণ দেয় হুলাহুলি।
স্বর্গে বাদ্য নৃত্য করে দেব কুতুহলী॥
প্রসন্ন হইল দশদিক্ প্রসন্ন নদীজল।
স্থাবর-জঙ্গম হৈল আনন্দে বিহ্বল॥ [তদেব. পৃ. ৬৯]

কোন সংবাদ না পেলেও ঘরে বসেই গৌরহরির ভূমিষ্ঠ হবার কথা অন্তরে উপলব্ধি করলেন অদ্বৈত আচার্য—হরিদাসকে নিয়ে তাঁর নৃত্য শুরু হলো—"কেনে নাচে কেহ নাহি জানে"। [তদেব. পৃ. ৬৯]

স্বর্গে কেবল বাদ্য সহযোগে নৃত্যই হলো তা নয়। দেবীরা নেমে এলেন মর্ত্যে, রাজ-সন্দর্শনে যাবার সময় যেমন নানা ভেট নিয়ে যেতে হয় এখানেও তাই দেখা গেল—

সাবিত্রী গৌরী সরস্বতী শচী রম্ভা অরুন্ধতী
আর যত দেবনারীগণ।
নানা দ্রব্য পাত্র ভরি ব্রাহ্মণীর বেশ ধরি
আসি সবে করে দরশন॥
অন্তরীক্ষে দেবগণ গন্ধর্ব-সিদ্ধ-চারণ
স্তুতি নৃত্য করে বাদ্য গীত॥ [তদেব. পৃ. ৭০]

নারায়ণ চৈতন্যরূপে নবদ্বীপেই অবতীর্ণ হলেন কেন? গোকুলের মতই কি নবদ্বীপের অবস্থা হয়েছিল তখন? পাপে পূর্ণ গোকুলের অবস্থা দেখেই তো শ্রীকৃষ্ণ সেখানে জন্মেছিলেন: শ্রীমদ্ভাগবতে মান্ধাতা-পুত্র রাজা মুচুকুন্দ পৃথিবীর অবস্থা দেখে শঙ্কিত হয়েছিলেন—

বৃক্ষ আদি পশু যত ক্ষুদ্রের আকার।
তাহা দরশনে রাজা করিল বিচার॥
পৃথিবী পাপেতে পূর্ণ হইল নিশ্চয়।
এথানে রহিতে আর যুক্তি যুক্ত নয়॥ [শ্রীমদ্ভাগবত]

বৃন্দাবনদাস বলছেন নবদ্বীপে তখন জ্ঞানবান অধ্যাপকের সংখ্যা গণনা করা না গেলেও প্রেম-ভক্তির চিহ্নমাত্র দেখা যেত না। বিলাসের প্রাচুর্য ছিল সেখানে—

লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়॥
... ...
কৃষ্ণনাম-ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
... ...
'ধর্মকর্ম' লোক, সভে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তল করয়ে কেহো দিয়া বহুধন॥
ধন নষ্ট করে পুত্র-কন্যার বিভায়।
এইমত জগতের ব্যর্থ কাল যায়॥
... ...
যেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী।
তা সভার মুখেতেও নাহি হরিধ্বনি॥
... ...
গীতা ভাগবত যে যে জনেতে পড়ায়।
ভক্তির বাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥ [চৈতন্যভাগবত, পৃ. ১১]

কবিরাজ গোস্বামী সমকালীন অবস্থাটা দেখিয়েছেন অন্য ভাবে। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত প্রেম বন্যায় যাদের ভাসাতে পারলেন না গৌরহরি, সমাজে তখন এ ধরনের লোকের সংখ্যা ছিল প্রচুর; তাদের উদ্ধারের জন্যই তো সন্ন্যাস গ্রহণ। এখানেই পাতকীর সংখ্যা এবং গুরুত্ব সহজেই অনুমান করা যায়—

মায়াবাদী কর্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ।
নিন্দক পাষণ্ডী যত পড়ুয়া অধম ॥
সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল।
সে বন্যা তা সবারে ছুঁইতে নারিল ॥ [চৈতন্যচরিতামৃত. পৃ. ২৮]

পাষণ্ডী প্রধান গোপাল চাপাল শ্রীবাসের বহির্দ্বারে ভবানীপুজোর দ্রব্য সামগ্রী, মদ্য-ভাণ্ড রেখে যায়—এ থেকে সেকালের দুর্বিনীতদের সাহস এবং সংখ্যা সহজেই অনুমান করা চলে।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন, 'আদি জ্যোতির্বিদ' গর্গ ঋষিকে গোপনে বসুদেব সব কাহিনী ব'লে নন্দালয়ে প্রেরণ করলেন : কৃষ্ণ-বলরামকে দেখে গর্গ ধ্যানে তাদের নারায়ণ বলেই জানলেন—

গর্গের সম্মুখে নন্দ আনিল তখন ॥
নারায়ণ-রূপে দোঁহে হেরি তপোধন।
গণনার ছলে ধ্যান করেন তখন ॥
মনে মনে বলে ঋষি তুমি ভগবান্।
কি সাধ্য বুঝিব তোমা আমি ক্ষুদ্রপ্রাণ ॥
অবশেষে ছল করি নন্দ প্রতি কয়।
সুলক্ষণ যুক্ত বটে উভয় তনয় ॥
পূর্বজন্ম পরজন্ম করিনু বিচার।
পূর্বেতে ছিলেন দোঁহে দেবতা আকার ॥
বহু পুণ্য ফলে পাও এ হেন সন্তান।
এই দুই পুত্র হয় অতি ভাগ্যবান্ ॥ [শ্রীমদ্ভাগবত. পৃ. ৬৭৪].

জ্যোতির্বিদ দুই বালকের সম্বন্ধে ব'লে চললেন—

জ্যেষ্ঠের অদৃষ্টগুণ অতি সুলক্ষণ ॥
... .
এই বালকের হবে অতিশয় বল।
.. ..
আর এক মহাকর্ম করিবে কুমার।
যাদব-বিপদ যত করিবে উদ্ধার ॥
.. .. ..
কনিষ্ঠ যে দেখি পুত্র তোমার তনয়।
নানা-রূপে এর জন্ম প্রতিযুগে হয় ॥
. .. .
পূর্বজন্ম কথা নৃপ কে বুঝে অন্তরে।
অধর্ম বিনাশি পুত্র ধর্ম রক্ষা করে ॥
এই হেতু হয় পুত্র যেন নারায়ণ।
নির্ভয়ে করিও তুমি লালন-পালন ॥
... ...

নারায়ণ-রূপী এই তোমার কুমার।
বিপদ হইতে সবে করিবে উদ্ধার ॥
পূর্ব কালে যবে দস্যু করে অত্যাচার
সাধুদের রক্ষা করে হ'য়ে অবতার ॥
গর্গের বাক্যের অর্থ নন্দ মহামতি।
বিষ্ণুর মায়াতে কিছু না বুঝে সম্প্রতি ॥ [তদেব]

জ্যোতির্বিদকে দিয়ে গণনা করিয়ে তার ফল নন্দ যদি বুঝতেই না পারলেন তবে লাভ কি হলো? পাঠকদেরই শুধু জানান হলো যে শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের অবতার। চৈতন্য মহাপ্রভুর ক্ষেত্রেও সেই গণনার ব্যাপারটা আছে। এখানে গণনা করেছেন শচীদেবীর পিতৃদেব নীলাম্বর চক্রবর্তী। বৃন্দাবনদাস শোনালেন—

শচীর জনক—চক্রবর্তী নীলাম্বর।
প্রতি লগ্নে অদ্ভুত দেখেন বিপ্রবর ॥
মহারাজ-লক্ষণ সকল লগ্নে কহে।
রূপ দেখি চক্রবর্তী হইলা বিস্ময়ে ॥
'বিপ্ররাজা গৌড়ে হইবেক' হেন আছে।
বিপ্র বোলে 'সেই বা জানিব তা পাছে ॥'
মহা-জ্যোতির্বিৎ বিপ্র সভার অগ্রেতে।
লগ্ন-অনুরূপ কথা লাগিলা কহিতে ॥
"লগ্নে যত দেখি এই বালক মহিমা।
রাজা হেন, বাক্যে তাঁরে দিতে নারি সীমা ॥
বৃহস্পতি জিনিঞা হইব বিদ্যাবান্।
অল্পেই হইব সর্ব গুণের নিধান ॥
সেইখানে বিপ্ররূপে এক মহাজন।
প্রভুর ভবিষ্যকর্ম করয়ে কথন ॥
বিপ্র বোলে, "এ শিশু সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ইহা হইতে সর্বধর্ম হইবে স্থাপন ॥
ইহা হইতে হইবেক অপূর্ব প্রচার।
এ শিশু করিবে সর্ব-জগত উদ্ধার ॥
ব্রহ্মা, শিব, শুক যাহা বাঞ্ছে অনুক্ষণ।
ইহা হৈতে তাহা পাইবেক সর্বজন ॥

[চৈতন্যভাগবত, পৃ. ১৬]

লোচনের কাব্যে এই ভবিষ্যৎ গণনার কথা পাওয়া যায় না।

চৈতন্যচরিতামৃত বলছেন যে, নীলাম্বর চক্রবর্তী গোপনে জামাতা জগন্নাথ মিশ্রকে জানালেন—

লগ্ন গণি হর্ষমতি নীলাম্বর চক্রবর্তী
গুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে।

মহাপুরুষের চিহ্ন লগ্নে অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন
দেখি এই তারিবে সংসারে ॥
ঐছে প্রভু শচীঘরে কৃপায় কৈল অবতারে
ইহা যেই করয়ে শ্রবণ। [পৃ. ৭২]

চৈতন্য চরিত গ্রন্থগুলিতে দেখা যাচ্ছে যে, নারায়ণ তাঁর পার্ষদদের নিয়েই পৃথিবীতে আসেন। গুরুজনদের আগে পাঠিয়ে নিজে আসেন সমবয়সীদের নিয়ে; নানা স্থানে তাঁরা জন্মগ্রহণ করেন। সূত্রাকারে এই ধারণাটি পাওয়া যায় শ্রীমদ্ভাগবতে। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, চৈতন্যচরিতকাররা সেই সূত্রটিকেই অবলম্বন ক'রে বিশদ ভাবে তা প্রকাশ করেছেন—শ্রীমদ্ভাগবত বলছেন—

সহস্র মস্তকধারী অনন্ত সুজন।
হরির আশ্রয়-মাত্র বেদের বচন ॥
অগ্রে তিনি না আসিলে লইয়া আশ্রয়।
কেমনে বিষ্ণুর জন্ম এ সংসারে হয় ॥ [পৃ. ৬৫৭]

বিষ্ণুর জন্মের পূর্বে অনন্তনাগকে আসতেই হবে—প্রলয়ের পরে তাঁরই আশ্রয়ে তো তিনি ভাসমান থাকেন। এই সূত্র অবলম্বন ক'রে বৃন্দাবনদাস মহাপ্রভুর প্রধান প্রধান লীলাসঙ্গীকে বিষ্ণুর পার্ষদ রূপে উপস্থাপিত করলেন—

কলিযুগে সংকীর্তন-ধর্ম পালিবারে।
অবতীর্ণ হৈলা প্রভু সর্বপরিকরে ॥
প্রভুর আজ্ঞায় আগে সর্বপরিকর।
জন্ম লভিলেন সভে মানুষ-ভিতর ॥
কি অনন্ত, কি শিব, বিরিঞ্চি, ঋষিগণ।
যত অবতারের পারিষদ আপ্তগণ ॥ [চৈতন্যভাগবত, পৃ. ১০]

কবিরাজ গোস্বামী স্পষ্ট ক'রে কিছু না বললেও যথেষ্ট আভাস দিয়েছেন। তাত্ত্বিককে তত্ত্বের কথা মনে ক'রে অস্পষ্ট ভাবেই কথা বলতে হয়—

এইমত চৈতন্যপ্রভু একলে ঈশ্বর।
আর সব পারিষদ কেহ বা কিঙ্কর ॥
গুরুবর্গ নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য।
শ্রীনিবাসাদি আর যত লঘু সম আর্য ॥
সর্ব-পারিষদ সবে লীলার সহায়।
সবা লঞা নিজকার্য সাধে গৌররায় ॥ [চৈতন্যচরিতামৃত, পৃ. ১৯]

কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভুর কথা বলতে এসে তাঁকে স্পষ্ট ক'রেই বলতে হলো—

শ্রীচৈতন্য সেই কৃষ্ণ নিত্যানন্দ রাম।
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম ॥ [তদেব]

শ্রীমদ্ভাগবতে পূতনা বধ প্রভৃতি আছে—এ যুগে সেটা কিছুতেই সম্ভব নয়। চরিতকাররা তাই 'বধের' দিকে যান নি। কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতের ব্যাস বৃন্দাবনদাস 'হরণ'টিকে কাজে লাগিয়েছেন। হয়তো তিনি মনে করেছিলেন যে কৃষ্ণ চরিত্রের এ দিকটা

একেবারে উপেক্ষা করা ঠিক হবে না। তাই শ্রীমদ্ভাগবতের তৃণাবর্তের ব্যাপারটা তিনি আংশিকভাবে কাজে লাগিয়েছেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলছেন—

হেনকালে কংসদূত তৃণাবর্ত নামে।
প্রবেশ করিল সেই নন্দরাজ-ধামে॥
মহাবলী সেই দৈত্য ঝটিকার প্রায়।
তুলিয়া লইয়া শিশু আকাশে পলায়॥ [শ্রীমদ্ভাগবত, পৃ ৬৭২]

এই অংশটুকু গ্রহণে অসুবিধা নেই। তৃণাবর্ত বধের ব্যাপারটা বাদ দিয়ে বৃন্দাবনদাস অপহরণের ব্যাপারটা সাজালেন—লেখাব সময় তিনি খুবই সতর্ক ছিলেন মনে হয়, মিলটা গোপন করার জন্য এক তৃণাবর্তের বদলে দুই চোরকে আমদানী করেন—গৌরহরি তখন পথে পথে ঘুরে বেড়ান, তিনি আর শিশুটি ন'ন—

এক দিন প্রভুরে দেখিয়া দুই চোরে।
যুক্তি করে, "কার শিশু বেড়ায় নগরে॥"
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দেখি দিব্য অলঙ্কার।
হরিবারে দুই চোরে চিন্তে পরকার॥
"বাপ! বাপ!' বলি এক চোরে লৈল কোলে।
"এতক্ষণ কোথা ছিলে?" আর চোর বোলে॥
"ঝট্ ঘরে আইস বাপ!" বোলে দুই চোরে।
হাসি বোলে প্রভু "চল চল যাই ঘরে।"
আস্তে-ব্যস্তে দুই চোরে কোলে করি ধায়।
লোকে বোলে "যার শিশু সেই লই যায়"॥ [চৈতন্যভাগবত, পৃ. ২০]

বৃন্দাবনদাস শিশু নিমাইকে অন্যান্য সাধারণ শিশুর সঙ্গে এক পর্যায়ে ফেললেন কি ক'রে? জন্ম মুহূর্তে নিমাইকে দেখবার জন্য হাজার হাজার নরনারী এসেছিলেন জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে: তাঁর সঙ্গীর সংখ্যাও প্রচুর; আজানুলম্বিত বাহু কমললোচন প্রদীপ্ত গৌর দেহ নবদ্বীপের কে না জানত? 'যার শিশু সেই লই যায়'—স্বচ্ছন্দ চিত্তে লোকেরা সে কথা ভাবল কেন? নিমাই তখন নগরে ঘুরে বেড়ায়, পথ ঘাট সবই তার চেনা—চোর দু'জন সম্পূর্ণ অপরিচিত। তবু তাদেরই একজনের কাঁধে চেপে বসলো কেন? এ লীলার অর্থ কি? শ্রীমদ্ভাগবতের সঙ্গে যে কোন উপায়ে মিল দেখাতেই হবে?

ঘরে প্রাচুর্য থাকলেও শ্রীকৃষ্ণ গোপদের গৃহে গিয়ে ননী-মাখন চুরি করে খেত, শুধু তাই নয় তাদের দুধের ভাণ্ডও ভেঙ্গে দিয়ে আসত—এর জন্য কত অভিযোগই না হয়েছে—

শুন শুন যশোমতী কর অবধান।
বড় দুষ্ট হইয়াছে তোমার সন্তান॥
কেহ বলে যশোমতী করহ শ্রবণ।
ভাঙ্গিল দুগ্ধের ভাণ্ড তোমার নন্দন॥
আর জন বলে সতী কি বলি তোমায়।
বাছুরে খুলিয়া কৃষ্ণ দুগ্ধ যে পিলায়॥
... ...

তাহার দৌরাত্ম্যে মোরা হইনু অস্থির।
তোমার নিকটে শিশু রহে শান্ত ধীর ॥ [শ্রীমদ্ভাগবত, পৃ. ৬৭৬]

বৃন্দাবন দাসের বালক নিমাইও নিকটস্থ বন্ধুদের ঘরে চুরি করে খায়। যেখানে কিছু না পায় সেখানে 'হাঁড়ি ভাঙ্গে' ঃ কিন্তু এঁরা কেউ অভিযোগ করেন না, হাসেন, স্নেহ করেন—নিমাইয়ের রূপ দেখে 'দর্শনমাত্রে সর্ব বৃত্তি চিত্ত হরে'। অভিযোগ করেন নিত্য গঙ্গাস্নানে অভ্যস্ত বিপ্রগণ, গঙ্গাতীরে পূজারত বালিকারা—

না পাইয়া প্রভুর নাগালি বিপ্রগণে।
সভে চলিলেন তাঁর জনকের স্থানে ॥
"শুন শুন ওহে মিশ্র পরম বান্ধব।
তোমার পুত্রের অপন্যায় কহি সব ॥
ভালমতে করিতে না পারি গঙ্গাস্নান।
কেহ বোলে "জল দিয়া ভাঙ্গে মোর ধ্যান।" [চৈতন্যভাগবত, পৃ. ২৭

এবং বালিকারা—

শচী সম্বোধিয়া সভে বলেন বচন।
"শুন ঠাকুরানি! নিজ পুত্রের করণ ॥
বসন করয়ে চুরী, বোলে বড় মন্দ।
উত্তর করিলে জল দেয়, করে দ্বন্দ্ব ॥
ব্রত করিবারে যত আনি ফুল-ফল।
ছড়াইয়া ফেলে বল করিয়া সকল ॥ [তদেব, পৃ. ২৮]

শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণ-বলরাম মালাকারের পূজা গ্রহণ করেছেন। চৈতন্যভাগবতেও মালাকারের গৃহে চৈতন্যদেবকে পাই—

উঠিলেন গিয়া প্রভু মালাকারের ঘরে ॥
পরম অদ্ভুত রূপ দেখি মালাকার।
সাদরে আসন দিয়া করে নমস্কার ॥
প্রভু বোলে "ভাল মালা দেহ মালাকার।
কড়ি-পাতি লগে কিছু নাহিক আমার ॥"
সিদ্ধ-পুরুষের প্রায় দেখে মালাকার।
মালী বোলে "কিছু দায় নাহিক তোমার ॥"
এত বলি মালা দিল প্রভুর শ্রীঅঙ্গে।
হাসে মহাপ্রভু সর্ব পঢ়ুয়ার সঙ্গে ॥
মালাকার-প্রতি প্রভু শুভদৃষ্টি করি।
উঠিলা তাম্বুলী-ঘরে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ [তদেব, পৃ. ৫৭-৫৮]

চৈতন্যচরিতামৃত স্বয়ং মহাপ্রভুকেই মালাকার ক'রে দিয়েছেন—"এত চিন্তি লৈলা প্রভু মালাকার ধর্ম।" [পৃ. ৪১]

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণকে জগতের মূল বলে ঘোষণা করেছেন : বসুদেব স্বয়ং কৃষ্ণ-বলরামকে বলেছেন—

জগতের মূল তোমা জানিয়াছি মনে।
বিশ্ববীজ হও দেব জানে জীবগণে ॥
তোমাদের হতে হয় সংসার পালন।
তোমাদের হতে হয় বিশ্বের সৃজন ॥
... .
জগতে পূজিত তুমি অনন্ত অজ্ঞেয়।
গুণের সাগর দোঁহে গুণে অপ্রমেয় ॥ [শ্রীমদ্ভাগবত, পৃ. ১০০৩]

চৈতন্যচরিতকাব্য গুলোতে চৈতন্যদেব সম্বন্ধে এই ভাবের প্রকাশ বহুস্থানে দেখা গেছে। শচী-জগন্নাথ দোলায়িত চিত্ত হয়ে পড়েছিলেন ঃ লেখকরা নিজ নিজ বক্তব্যে একথা ঘোষণা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ যেমন নিজস্বরূপ দেখিয়েছেন—চৈতন্যদেবও তেমনি ষড়ভুজ দর্শন করিয়েছেন। তবে মায়ার দ্বারা অনেককে দর্শন করিয়েও আবার ভুলিয়ে দিয়েছেন। এ ব্যাপারেও চৈতন্য চরিতকাররা সযত্নে শ্রীমদ্ভাগবতকে স্মরণে রেখেছেন। লোচনদাস তো নারদকে দিয়ে বৈকুণ্ঠ কৈলাস ভ্রমণ করিয়ে চৈতন্য অবতারের কথা শুনিয়ে দিয়েছেন—

বৈকুণ্ঠ-উপরি স্থান, গোলোক যাহার নাম
শ্রীগৌরসুন্দর তাহে রাজা।
লখিমী-আদিক নারী, একহু পুরুষ হরি,
সুখময় সকল পরজা। [শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল, পৃ. ২৭]

লোচন জানাচ্ছেন, সেই গোলোকের রাজা শ্রীহরি গৌরসুন্দর নিজেই বলেছেন—

জনম লভিব নিজ প্রেম প্রকাশিতে ॥
... ...
নবদ্বীপে জন্ম মোর শচীর উদরে।
গঙ্গার সমীপে জগন্নাথমিশ্র-ঘরে ॥
আর অবতার হেন অবতার নহে।
... ...
এবে সর্বজন সেই হৃদয় আসুরি।
খড়্গ-ছেদ্য নহে—অস্ত্রবলে কিবা করি ॥
নাম, গুণ, সংকীর্তন—বৈষ্ণবের শক্তি।
প্রকাশ করিব আর নিজ প্রেম ভক্তি। [তদেব, পৃ. ৩১]

সুতরাং লোচন পূর্ব থেকেই প্রস্তুত হয়েছিলেন—শ্রীমদ্ভাবতের সঙ্গে মিলিয়ে চৈতন্য-চরিত প্রদর্শনের কোন প্রয়োজনও তাঁর ছিল না। কৃষ্ণও গোলোকপতি, গৌরসুন্দর ও তাই। চরিত-কথা লিখবার আগেই নিশ্চিন্ত লোচনদাস!

বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে মূলাধার মনে করলেও পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর অভিষেকের প্রয়োজন ছিল; সে অভিষেক অবশ্যই যাকে তাকে দিয়ে করালেও হবে না। তাই শ্রীমদ্ভাগবত সুরভিকে নিয়ে এলেন এবং তার পবিত্র দুগ্ধ মন্দাকিনী-জলে মিশ্রিত করে অভিষেক করালেন স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রকে দিয়ে—

এত বলি স্তন দুগ্ধ সুরভি লইয়া।
মন্দাকিনী-জলে লয় একত্র করিয়া॥
সাগরের জল আনি মিলায় তখন।
আইল অনেক তথা সিদ্ধ ঋষিগণ॥
সুরগণ ঋষিগণ একত্র হইল।
সবে মিলি কৃষ্ণ অঙ্গ বিধৌত করিল॥
কুবের বরুণ আদি লোকপাল দলে।
অভিষেক করে কৃষ্ণে সাগরের জলে॥
প্রফুল্ল অন্তরে সবে অভিষেক করে।
কৃষ্ণেরে গোবিন্দ নাম দিল তদন্তরে॥
নারদ প্রসন্ন মনে কৃষ্ণগুণ গায়।
সুরনারীগণ নাচে আনন্দে সেথায়॥
সুরগণ বিধিমতে করয়ে স্তবন।
মহানন্দে করে সবে পুষ্প বরিষণ॥
অভিষেক করে ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণে তখন।
সুরভি সহিত বন্দে গোবিন্দ চরণ॥ [শ্রীমদ্ভাগবত, পৃ. ৭৫৭]

চৈতন্যভাগবতে দেখা গেল মহাপ্রভু প্রথমে অদ্বৈত আচার্যকে দিয়ে নিজের পূজা করালেন। আচার্য তখন প্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক এবং বৈষ্ণব, সাধক-সকলের গুরুজন। তাঁকে দিয়ে পূজা করিয়ে তিনি প্রথমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তারপর একদিন নিত্যানন্দকে সঙ্গে নিয়ে এলেন শ্রীনিবাস পণ্ডিতের ঘরে, সেখানে অন্যান্য ভক্তরা আগমন করলে তিনি গিয়ে বসলেন বিষ্ণু খট্টার ওপরে, সেখানে বসে আদেশ করলেন—

আজ্ঞা হৈল "বোল মোর অভিষেক গীত।"
... ...
সর্ব-ভক্তগণ বহি আনে গঙ্গাজল।
আগে ছাঁকিলেন দিব্য বসনে সকল॥
শেষে কর্পূর-চতুঃসম আদি দিয়া।
সজ্জ করিলেন সবে প্রেমযুক্ত হৈয়া॥
মহা জয় জয় ধ্বনি শুনি চারিভিতে।
অভিষেক মন্ত্র সভে লাগিলা পড়িতে॥
সর্বাগ্রে শ্রীনিত্যানন্দ জয় জয় বলি।
প্রভুর শ্রীশিরে জল দিয়া কুতূহলী॥
অদ্বৈত-শ্রীবাসাদি যতেক প্রধান।
পড়িয়া পুরুষ সূক্ত করায়েন স্নান॥

সমস্ত ভক্ত মিলে 'অষ্টোত্তর শত ঘট জল' ঢাললেন মহাপ্রভুর শিরে। প্রধান প্রধান সমস্ত দেবতা অভিষেক করে শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণের—এখানেও প্রধান প্রধান বৈষ্ণব নেতৃত্বের স্বীকৃতি দিলেন চৈতন্যদেবকে।

শ্রীচৈতন্যদেবের সহপাঠী মুরারি গুপ্ত—তিনি চৈতন্যের আদিলীলা সূত্ররূপে গ্রন্থন

করেছিলেন : 'আদিলীলা-মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত। সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিলা গ্রথিত ৷৷ [চৈতন্য চরিতামৃত : (আদি/ ১৩/১৫) ।] আধুনিককালে মুরারি গুপ্তের নামে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছে। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, মুদ্রিত গ্রন্থের বারোআনাই পরবর্তীকালের সংযোজন—মুরারি গুপ্ত নিজে তা রচনা করেন নি। এই গ্রন্থের ২য় প্রকল্পের ৩য় সর্গে ২০-২৪ শ্লোকে পাওয়া যায় যে, নবদ্বীপে বৈষ্ণবদের কীর্তনের সুবিধার জন্য বিশ্বম্ভর মেঘ নিবারণ করেছিলেন, যেমন করে বৃন্দাবনে বৃষ্টিপাত থেকে বৃন্দাবনবাসীদের রক্ষা করার জন্য গোবর্ধন ধারণ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ [ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ। ২৫ অধ্যায়]।

চৈতন্যদেবকে শ্রীকৃষ্ণের সমান করার উদ্দেশ্য নিয়েই এসব কাহিনী উদ্ভাবিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের যমলার্জুন-ভঞ্জন (ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ১০ অধ্যায়) এবং শ্রীরামচন্দ্রের সপ্ততালভেদ (রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ১১-১২ সর্গ) লীলার ছায়ায় রচিত হয়েছে শ্রীচৈতন্যের সপ্ততাল বিমোচন লীলা ; ভারততীর্থ পর্যটন কালে শ্রীচৈতন্য—

'ঋষ্যমূক গিরি আইলা দণ্ডকারণ্যে ॥
সপ্ততালবৃক্ষ দেখে কানন-ভিতর।
অতি বৃদ্ধ অতিস্থূল অতি উচ্চতর ॥
সপ্ততাল দেখি প্রভু আলিঙ্গন কৈল।
সশরীরে সপ্ততাল অন্তর্ধান হৈল ॥
শূন্যস্থল দেখি' লোকের হৈল চমৎকার।
লোকে কহে' এ সন্ন্যাসী রাম-অবতার ॥
সশরীরে তাল গেল শ্রীবৈকুণ্ঠধাম।
ঐছে শক্তি কার হয়, বিনা এক রাম ॥

[চৈতন্যচরিতামৃত মধ্য, ৯/৩১১-১৫]

চৈতন্য কর্তৃক শ্রীবাসের মৃত পুত্রকে জীবিতকরণ ব্যাপারটিও ভাগবত-অনুকারী। ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধ, ১৬ অধ্যায়ে আছে শূরসেন দেশের রাজা চিত্রকেতুর একমাত্র পুত্রসন্তান মারা গেলে "দেবর্ষি নারদ, শোকপরায়ণ বন্ধুগণের সমক্ষে মৃত রাজনন্দনকে প্রত্যক্ষ করাইয়া কহিলেন, "অহে জীবাত্মন ! তোমার মঙ্গল হউক, আপন পিতামাতাকে অবলোকন কর।…" জীব কহিল, 'এই সকল ব্যক্তি কোন্ জন্মে আমার পিতামাতা হইয়াছিলেন ? আমি ত কর্ম সকল দ্বারা দেব, পশু ও মনুষ্যযোনিতে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতেছি।…যতদিন যাহার সহিত যাহার সম্বন্ধ থাকে ততদিন তাহার সহিত তাহার মমতা থাকে ; বাস্তবিক অভিমান শূন্য নিত্যজীব উৎপন্ন শরীর হইয়া যতদিন যাহার নিকটে থাকে, ততদিনই ঐ জীবের উপর তাহার স্বত্ব'।…ঐ জীব এই প্রকার কহিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।" [শ্রীমদ্ভাগবত, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত]

বৃন্দাবনদাস লিখেছেন—'একদিন নাচে প্রভু শ্রীবাস-মন্দিরে।
সুখে শ্রীনিবাস-আদি সংকীর্তন করে ॥
দৈবে ব্যাধিযোগে গৃহে শ্রীবাসনন্দন।
পরলোক হইলেন দেখে নারীগণ ॥
আনন্দে করেন নৃত্য শ্রীশচীনন্দন।
শ্রীবাসের গৃহে মহা উঠিল ক্রন্দন ॥

শ্রীবাস এসে সবাইকে প্রবোধ দিলেন এবং ঠাকুরের নৃত্যসুখভঙ্গ হবার আশঙ্কায় কলরব করতে নিষেধ ক'রে আবার গিয়ে কীর্তনে যোগ দিলেন। নৃত্য ও কীর্তন শেষ হলে অন্যান্য ভক্তদের মুখে সব শুনে—

'প্রভু বোলে "হেন সঙ্গ ছাড়িব কেমতে?"
এত বলি মহাপ্রভু লাগিলা কান্দিতে ॥
"পুত্রশোক না জানিল যে মোহোর প্রেমে।
হেন সব সঙ্গ মুঞি ছাড়িব কেমনে ॥"

এ পর্যন্ত অবাস্তব বা অস্বাভাবিক কিছু নেই। কিন্তু এরপর—

মৃত শিশু প্রতি প্রভু জিজ্ঞাসে আপনে।
"শ্রীবাসের ঘর ছাড়ি যাহ কি কারণে?"
শিশু বোলে "প্রভু! যেন নির্বন্ধ তোমার।
অন্যথা করিতে শক্তি আছয়ে কাহার ॥"
মৃত-পুত্র উত্তর করয়ে প্রভু সনে।
পরম অদ্ভুত শুনে সর্বভক্তগণে ॥
শিশু বোলে "এ দেহেতে যতেক দিবস।
নির্বন্ধ আছিল ভুঞ্জিলাঙ সেই রস ॥· ·
কে বা কার বাপ প্রভু! কে কার নন্দন।
সভে আপনার কর্ম করয়ে ভুঞ্জন ॥
যতদিন ভাগ্য ছিল পণ্ডিতের ঘরে।
আছিলাঙ, এবে চলিলাঙ অন্য পুরে ॥
সপার্ষদ তোমার চরণে নমস্কার।
অপরাধ না লইহ বিদায় আমার ॥"
এত বলি নীরব হইলা শিশু-কায়।
এমত কৌতুক করে শ্রীগৌরাঙ্গ রায় ॥ [চৈতন্য ভাগবত, মধ্য ২৫/২৪-৬৫]

নিঃসন্দেহে এখানে বৃন্দাবনদাসের বল্গাহীন কল্পনা ভাগবতের পূর্বোক্ত কাহিনী দ্বারা অনুপ্রাণিত।

চৈতন্য জীবনীরচনায় এই আত্যন্তিক ভাগবত-নির্ভরতা আধুনিক কালের পাঠকের ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসাকে ক্ষুণ্ণ করতে বাধ্য। চৈতন্য জীবনকাহিনী বর্ণনায় যেমন, চৈতন্য তিরোভাব প্রসঙ্গেও তেমনি তথ্যকে চেপে দিয়েছে তত্ত্ব।

ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

"রামের (বলরামের) নির্বাণ দর্শন করিয়া ভগবান দেবকীনন্দন শোকে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্বক অশ্বত্থ বৃক্ষতলে উপস্থিত হইলেন। · গলে বনমালা, মূর্তিমান স্বীয় অস্ত্র সকল দ্বারা বেষ্টিত স্বীয় দক্ষিণ ঊরুতে কোকনদ সদৃশ রক্তবর্ণ বামপদ রাখিয়া উপবেশন করিলেন। জরা নামে এক ব্যাধ—যে মুষলের অবশিষ্ট লৌহখণ্ড দ্বারা বাণ নির্মাণ করিয়াছিল,—তৎকালে সে তথায় আগমন করিল এবং তদীয় চরণ মৃগমুখাকৃতি দেখিয়া মৃগ ভ্রমে তাহা বিদ্ধ করিল। (২৬-৩৩ একাদশ স্কন্ধ। ত্রিংশ অধ্যায়)··· প্রভু ভগবান ···আত্মাতে আত্ম-যোজনা করিয়া কমলনয়নযুগল মুদ্রিত করিলেন এবং

আগ্নেয়ী যোগধারণা দ্বারা নিজ দেহকে দগ্ধ না করিয়াই স্বীয় ধামে প্রবিষ্ট হইলেন।"
[একাদশ স্কন্ধ/একত্রিংশ অধ্যায়/১-৯ : পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত]

সম্ভবতঃ এই কাহিনী দ্বারা প্রভাবিত হয়েই জয়ানন্দ শ্রীচৈতন্যের বাম পায়ে প্রাণঘাতী আঘাতের কথা বলেছেন—

"আষাঢ় বঞ্চিতা (পঞ্চমী ?) রথ বিজয় নাচিতে।
ইটাল বাজিল বাম পায় আচম্বিতে ॥···
চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠি দিবসে।
সেই লক্ষে টোটা এ শয়ন অবশেষে ॥
পণ্ডিত গোসাঞিকে কহিল সর্বকথা।
কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্বথা।···
মায়া শরীর থাকিল ভূমে পড়ি।
চৈতন্য বৈকুণ্ঠ গেলা জম্বুদ্বীপ ছাড়ি ॥

[উত্তর খণ্ড, পৃ. ১৪৪-৫১]

'মায়া শরীর থাকিল ভূমে পড়ি'—একথা বলে জয়ানন্দ নীরব হয়ে গেলেন। কি হলো সেই মায়া শরীরের ? এই বাস্তব প্রশ্নটিকে এড়িয়ে গিয়ে লোচন আশ্রয় নিলেন তত্ত্বের—

জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে ॥
গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে প্রভুর হৈল অদর্শন ॥
সাক্ষাতে দেখিল গৌর প্রভুর মিলন।

[শেষখণ্ড, পৃ. ৩১৪ ১৬ রাধানাথ কাবাসী সম্পাদিত]

অধিকাংশ ওড়িয়া জীবনীকারও জগন্নাথ-চৈতন্য সমীকরণের অংকটি মিলিয়ে দিয়ে বাস্তব তথ্যকে চাপা দিয়েছেন। অনেক অপ্রীতিকর প্রশ্নের মুখ চাপা দেওয়া গেল এই সমীকরণ তত্ত্ব দিয়ে।

বৃন্দাবনদাস, কৃষ্ণদাস গোস্বামী কেউই চৈতন্যদেবের তিরোধানের কথা বলেন নি। তাঁরা এক অজ্ঞেয়-অন্ধকার সৃষ্টি ক'রে গেছেন। জয়ানন্দ তাঁর চৈতন্যমঙ্গলে ইষ্টকের আঘাতের ফলে চৈতন্যদেবের দেহত্যাগের কথা ব'লে কোন কোন মহলে অপাংক্তেয় হয়ে গেলেন। নারায়ণ জগতে লীলা করতে এসে জাগতিক সমস্ত ব্যাপারকেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন কিন্তু অন্ত্যকালে তিনি দেহীর দেহরক্ষার বিধিকে অস্বীকার করবেন কেন ? জল, অগ্নি, বিষ, শস্ত্র, ক্ষুৎ, ব্যাধি এবং পতন—এদেরই কোন একটাকে অবলম্বন ক'রেই দেহী প্রাণত্যাগ ক'রে থাকেন। কিন্তু চৈতন্যচরিতকাররা একেবারে মৌন অবলম্বন করলেন কেন ? অন্ত্যকালের কথা বলতে কিসের বাধা ছিল ? চরিত রচনাকালে যাঁরা শ্রীমদ্ভাগবতকে সামনে রেখেছিলেন তাঁরা এ বিষয়টা এড়িয়ে গেলেন কেন সেটা নিশ্চিতরূপেই এক বড় জিজ্ঞাসা।

মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের নানা কাহিনী ছড়িয়ে আছে। কেহ বলেন, তিনি জগন্নাথদেবের দেহে মিলিয়ে যান ; কেহ মনে করেন মহাপ্রভু টোটা গোপীনাথে গোপীনাথদেবের জানুর ভিতরে প্রবেশ করেন এবং মূর্তির জানুতে সেই চির-খাওয়া দাগটা নাকি আজও বর্তমান আছে ; আবার কারও কারও মতে মহাপ্রভু সমুদ্রে মিলিয়ে যান।

স্বাভাবিকভাবেই একটা প্রশ্ন জাগে—মহাপ্রভু কি নশ্বর দেহ সমেত জগন্নাথ বা

গোপীনাথের দেহে মিলিয়ে যান? অথবা সমুদ্র কি তাঁর দেহটা কোথাও ফিরিয়ে দেয় নি? যাঁরা বিশেষভাবে অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী তাঁরা ওই কথা বিশ্বাস করতে পারেন: কিন্তু গোঁড়া বৈষ্ণবরাও নিশ্চয়ই মনে করবেন যে, মহাপ্রভু দেহ ফেলে রেখে আত্মিক সত্তার সাযুজ্য ঘটিয়েছিলেন। তবে তাঁর দেহের কি হলো? নীলাচলেও তো তাঁর পার্ষদের সংখ্যা কম ছিল না—ছিলেন ক্ষমতাশালী সার্বভৌম ভট্টাচার্য, রায় রামানন্দ এবং স্বয়ং মহারাজা গজপতি প্রতাপরুদ্র এবং সেই সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় অগণিত ভক্তবৃন্দ যাঁরা :মহাপ্রভুকে চলমান জগন্নাথ ব'লে মনে করতেন।

কবিরাজ গোস্বামী। চরিতামৃতে চৈতন্যদেব ভাবাবেগে একবার সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন—

এই মত মহাপ্রভু ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
আইটোটা হৈতে সমুদ্র দেখে আচম্বিতে॥
. . ..
যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাইয়া চলিলা।
অলক্ষিতে যাই সিন্ধুজলে ঝাঁপ দিলা॥ [পৃ. ৫৯৯]

মহাপ্রভুর পক্ষে ভাবোন্মাদ অবস্থায় সমুদ্রকে যমুনা মনে ক'রে জলে ঝাঁপ দেওয়া অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। কিন্তু তিনি যখন দিব্যোন্মাদ অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিলেন তখন তাঁর পার্ষদরা কি তাঁকে চোখে চোখে রাখতেন না? টোটা থেকে সমুদ্র হয়তো তখন অনেক দূরে ছিল না, কিন্তু একেবারে পাশে পাশে থাকলে 'আচম্বিতে' দেখার কথাও ওঠে না। বেলাভূমির অনেকটা পেরিয়ে তবেই সমুদ্র। মহাপ্রভুকে সকলেই জানতেন। সমুদ্রের দিকে তিনি উম্মাদের ন্যায় দৌড়ে গেলেন, কারও নজরে পড়লো না? এটা মানতে হলে তাঁর পার্ষদদের ছোট করা হয়। চৈতন্যদেবকে গোপীগণ সঙ্গে জলকেলির লীলা আস্বাদনের সুযোগ ক'রে দিয়েছেন চরিতামৃত রচয়িতা—

যমুনাতে জল কেলি গোপীগণ সঙ্গে।
কৃষ্ণ করে মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে॥ [তদেব. পৃ ৬০০]

চৈতন্য তিরোভাব প্রসঙ্গ যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচিত হবে। এখানে কেবল বলবার কথা এই যে, কোন কিছু প্রমাণের উদ্দেশ্য নিয়ে জীবনচরিত রচনা সম্ভব নয়, তাতে অনেক গোলে পড়তে হয়। শ্রীমদ্ভাগবত সামনে রেখে শ্রীকৃষ্ণের লীলার সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে চৈতন্যচরিত রচনা করতে গিয়ে চৈতন্য জীবনীকাররা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। তাই তাঁদের চিত্রণের অনেকটাই বর্জন ক'রে চৈতন্যচরিতের সত্য নির্ধারণ করতে হবে।

উদ্দেশ্যমূলক ও আরোপিত অলৌকিকতার অংশগুলি বর্জন করলে এই মহৎ চরিত্রের যে ঐতিহাসিক ও মানবিক দিকগুলি পরিস্ফুট হয়ে উঠবে, বলাবাহুল্য তারও আধার ও উৎস সেকালের ওই চৈতন্যচরিতগ্রন্থগুলিই। চৈতন্যবিষয়ক গ্রন্থগুলির তুলনামূলক পাঠ ও যুক্তিনিষ্ঠ ব্যাখ্যা এবং ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে যাবতীয় তথ্যের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণেই একাজটি সম্ভব হতে পারে।

৭· অবতার

আমরা দেখেছি যে চৈতন্যজীবনীকাররা চৈতন্যদেবকে অবতার রূপে স্থির ক'রে নিয়ে তাঁর জীবনলীলার সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ-লীলাকে অনেকটা মিলিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। অবতার প্রতিপন্ন করতে গিয়েও যে তাঁরা বিশেষ সাফল্য লাভ করেছেন এমন কথা বলা যায় না। অবতার দু'ধরনের হয় বলে হিন্দুরা মনে করেন—(১) স্বয়ং ভগবান বিশেষ কর্মসাধনের জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হন এবং (২) মানুষ তাঁর মহান কার্যের দ্বারা ভগবানের পর্যায়ে উন্নীত হন। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অবতার সম্ভবতঃ যুক্তির যুগে কল্পিত। প্রথম শ্রেণীর অবতারের কথা গীতায় আছে। অবতারের আগমনের কাল এবং কারণ সম্বন্ধে সেখানে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

> যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
> অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানম্ সৃজাম্যহম্ ॥৭
> পরিত্রাণায় সাধুনাম্, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
> ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৮ [গীতা, ৪র্থ অধ্যায়]

[ধর্মের গ্লানি হলে, অধর্মের অভ্যুদয় হলে আমি নিজেকে সৃষ্টি করি। সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কৃতকারীদের দমনের জন্য এবং ধর্মসংস্থাপনের নিমিত্ত আমি যুগে যুগে আগমন করি।]

শ্রীমদ্ভাগবত বলছেন—

> পরমাত্মা বলি যাঁর দিনু পরিচয়।
> মায়াবশে সেই জন অবতার হয় ॥
> বহু অবতার তিনি হন এ ভুবনে।
> কতেক বিখ্যাত মাত্র শাস্ত্রের বচনে ॥ [পৃ· ১৪২]

'ভবিষ্যৎদ্রষ্টা' শাস্ত্রকাররা চৈতন্যদেবের নাম কেউ উল্লেখ করেন নি—তবে কি চৈতন্য-অবতার বিখ্যাত নয়? কিন্তু চৈতন্যজীবনীকাররা তো তাঁকে স্বয়ং নারায়ণ বলেছেন! বুদ্ধ অবতারের নাম পাওয়া যাচ্ছে এবং তারপরে আছে কল্কি অবতার। কলি যুগে কল্কি অবতার এবং তিনি হবেন অশ্বারোহী। যে সব পুরাণকার এই সব অবতারের কথা লিখেছেন তাঁরা বুদ্ধদেবের পরবর্তীকালে অবতীর্ণ হয়েছিলেন সন্দেহ নেই: বুদ্ধদেবের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব এবং সর্বভারতে তাঁর প্রভাব দেখে তিনি বেদ-বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে অবতারের পর্যায়ে না ফেলে উপায় ছিল না। আশ্চর্য এই যে, বেদ উদ্ধারের জন্য যে ভগবান অবতার হয়েছিলেন, সেই ভগবানই বেদ-বিরোধিতা ক'রে বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হলেন! অবতার সত্য হোক আর নাই হোক, ভারতবর্ষ যে সমন্বয়ের সাধনা করেছে এটা তার একটা বিশেষ প্রমাণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বস্তুতঃ অবতার তালিকায় চৈতন্যের অন্তর্ভুক্তিও হয়েছে চৈতন্যের পরবর্তী কালে। অশ্বারোহী কল্কির সঙ্গে উদ্বাহু চৈতন্যের সমন্বয় হয় নি, কলিকলুষ নাশে চৈতন্য

অবতারের কথা যাঁরা বলেছেন, তাঁরা কল্কির কথা আর তোলেন নি। লোচন ব্রহ্মপুরাণ থেকে চৈতন্য অবতারের প্রমাণ বার করেছেন—ড. বিমানবিহারী মজুমদারের মতে ব্রহ্মপুরাণের ঐ অংশ বোধ হয় প্রতাপরুদ্রের সময়ে লিখিত হয়েছিল ; যথা—

বিষ্ণু কাত্যায়নী সনে সংবাদ ব্রহ্মপুরাণে
উৎকলখণ্ডেতে পরকাশ।
রাজা সে প্রতাপরুদ্র সর্বগুণের সমুদ্র
ব্যক্ত কৈল পরম উল্লাস ॥

[চৈতন্যচরিতের উপাদান, পৃ. ২৫৩]

মুরারি চৈতন্যকে বলেছেন 'যুগাবতার' (১/৪)। লোচনের মতে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ ও কলিতে শ্রীচৈতন্য পূর্ণ অবতার। লোচন নিজের বক্তব্যের সমর্থনে ভবিষ্যপুরাণ, জৈমিনি ভারত ইত্যাদির দোহাই দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বিমানবিহারীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—"ভবিষ্যপুরাণ, জৈমিনিভারত ও ব্রহ্মাপুরাণের প্রমাণ মুরারি গুপ্তের সময়ে কল্পিত হয় নাই। কবি কর্ণপুর বা বৃন্দাবনদাস এগুলির কথা লেখেন নাই, যদিও তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা প্রমাণ করবার জন্য লোচন অপেক্ষা কম আগ্রহশীল ছিলেন না। সনাতন গোস্বামী সমস্ত পুরাণের পুঁথি ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত গ্রন্থের সাহায্যে শ্রীজীব গোস্বামী ষট্ সন্দর্ভ লেখেন। শ্রীজীবের ন্যায় পণ্ডিত এ-সমস্ত শ্লোক খুঁজিয়া যখন পান নাই তখন মনে হয় এগুলি পরবর্তীকালে রচিত হইয়াছে।" [তদেব. পৃ. ২৫৪]

বিশ্বাসীদের কাছে একথা স্বীকৃত যে, দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালনের জন্যই অবতার। শ্রীমদ্ভাগবত অবতারদের সেই কার্যকলাপ বিশদ ক'রে দেখিয়েছেন, তারই সামান্য কিছুটা এখানে উদ্ধার করা হলো—

প্রলয়ে যখন বিশ্ব গেল রসাতল।
সকলি সলিলময় নাহি মাত্র স্থল ॥
উদ্ধারিতে সে ধরারে করিয়া বিচার।
ধরেন অনন্তদেব বরাহ আকার ॥
ভীষণ উভয় দংষ্ট্রা রক্তিম নয়ন।
অগ্নিময় তেজ তাঁর ভীষণ দর্শন ॥
দৈত্য হিরণ্যাক্ষ ছিল সমুদ্র মাঝারে।
দন্ত দিয়া বিদারণ করিল তাহারে। [পৃ. ১৪৩]

দুষ্কৃতকারীদের দমন অবতারের অন্যতম কাজ : কিন্তু যুগে যুগে দুষ্কৃতকারীদের রূপও তো বদলেছে। সাধুদের পরিত্রাণ করেন অবতার—সাধু কথাটার তাৎপর্যও পরিবর্তনশীল। রামচন্দ্র এসেছিলেন ঋষিদের সাধনায় বিঘ্নকারী রাক্ষসদের এবং সর্বোপরি দেবতাদের রমণী ও সীতা অপহরণকারী রাক্ষসরাজ রাবণকে বধের জন্য। এই দুষ্কৃতকারী রাবণ কিন্তু কারও রাজ্য অধিকারের চেষ্টা করেন নি। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু অন্যের রাজ্য দখলের চেষ্টা দূরে থাক কোন কিছু অপহরণের ব্যাপারেও লিপ্ত ছিলেন না। তাঁর অপরাধ তিনি ভগবানকে অস্বীকার করেছিলেন এবং অশেষ অত্যাচারে জর্জরিত করেছিলেন নিজের ভগবৎ ভক্ত পুত্র প্রহ্লাদকে।

শ্রীকৃষ্ণ এসেছিলেন দুষ্কৃতকারী কংস বধের জন্য এবং অত্যাচারিত দেবকী, বসুদেব ও দেশবাসীদের রক্ষার নিমিত্ত এবং অন্যের মাধ্যমে দুষ্কৃতকারী দুর্যোধনকে দমন ক'রে পাণ্ডবদের রক্ষার কারণে। শ্রীমদ্ভাগবত সে কথা শুনিয়েছেন—

তবে দেব নারায়ণ করেন চিন্তন।
সঙ্গে হলধর আর যত যদুগণ ॥
হরণ করিতে হরি অবনীর ভার।
কলহ উৎপন্ন মনে করি সবাকার ॥
মহাদৈত্যগণে সব করিয়া নিধন।
অবনীর মহাভার করেন হরণ ॥
কপট দ্যূতের ক্রীড়া করে বৈরিগণ।
দ্রৌপদীর কেশ তারা করে আকর্ষণ ॥
এইরূপ হীন কার্য করি অবিরত।
কৌরবেরা পাণ্ডবেরে ক্রুদ্ধ করে কত ॥
শত্রুর বিস্তার দেখি দেব নারায়ণ।
হইলেন একেবারে ক্রোধযুত মন ॥
নিমিত্তের ভাগী করি পাণ্ডু কুরু দলে।
অবনীর ভার হরি হরিলেন ছলে ॥ [পৃ. ১০২৪]

কংস কেবল নিজ ভগিনী এবং ভগিনীপতিকেই কারারুদ্ধ করেছিলেন তাই নয় তাঁদের সমস্ত কিছু অধিকার ক'রেও নিয়েছিলেন। দুর্যোধন পাশা খেলার জোরে দ্রৌপদীকে অপমান করেছিলেন এবং খুল্লতাত ভ্রাতাদের ন্যায্য প্রাপ্য রাজ্য থেকে বঞ্চিত করার প্রচেষ্টাও করেছিলেম—'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী'।

বামন অবতারে নারায়ণ বলি রাজার অহঙ্কার দমন করেছিলেন ঃ দানশীল ব'লে যে দর্প ছিল দৈত্যরাজ বলির তা চূর্ণ করেন দর্পহারী।

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, দুষ্কৃতকারীদের দুষ্কর্মের রূপ বার বার পরিবর্তিত হয়েছে। সাধু বলতে পূর্বে দেবতা-মুনি-ঋষিদের বোঝাত, ক্রমে তা সাধারণ মানুষদেরও বোঝাচ্ছে। সুতরাং এই অর্থে সমাজের আবহাওয়া যারা নষ্ট করছে, যারা শক্তিদম্ভে নিপীড়িত করছে দুর্বলদের, তারাই দুষ্কতকারী—অগণিত জনসাধারণ যারা হচ্ছে নিষ্পেষিত, তারাই সাধুজন।

কোন্ দুষ্কৃতকারীদের দমনের নিমিত্ত এবং কি ধরনের সাধুদের পরিত্রাণের কারণে শ্রীচৈতন্য অবতার? পঞ্চদশ শতকের ভারতবর্ষ তথা গৌড় বঙ্গের অবস্থাটাই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে।

চৈতন্য-জীবনীকাররা যাঁরা তাঁকে অবতার স্থির ক'রে নিয়েই জীবনী রচনা আরম্ভ করেছিলেন তাঁরা চৈতন্যের অবতার রূপে আগমনের কি কারণ নির্দেশ করেছেন সেটা দেখে নেওয়া দরকার। আমরা এ বিষয়ে বাঙ্গালী এবং ওড়িয়া চৈতন্য জীবনীকারদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবো।

চৈতন্যদেবের সহপাঠী মুরারি গুপ্ত চৈতন্য জীবনের কিছু কিছু কাহিনী লিখে

রাঘবেন্দ্র। তাঁর নামে প্রচলিত গ্রন্থের বহু স্থানেই চৈতন্যদেবকে স্বয়ং ভগবান বলা হয়েছে।

১ম প্রক্রম ১ম সর্গ ২য় শ্লোকে দেখা যায়—জগন্নাথনন্দন জগৎপতি, তিনি জগতের আর্তি হরণ করেন; তিনি স্বয়ং বিভু। কলিভয়হারী তিনি নিজ ভক্তিযোগ বহন ক'রে শচীগর্ভে জাত হলেন। ওই প্রক্রমের ৩য় সর্গে বলা হয়েছে যে, নারদমুনি বৈকুণ্ঠে গিয়ে হরির নিকট কলি-কলুষ নাশের আবেদন জানালেন এবং তারই ফলস্বরূপ চৈতন্য-অবতার। ওই একই প্রক্রমের ৪র্থ সর্গের ২৬ শ্লোকে বলা হয়েছে যে, কলিযুগে কীর্তনই শ্রেয় ধর্ম জেনে সর্বশক্তিময় পরমানন্দদায়ক ভগবান স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য রূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলেন—

'জাতঃস্বয়ং পৃথিব্যাস্তু শ্রীচৈতন্যোমহাপ্রভুঃ'।

এই গ্রন্থে অদ্বৈত প্রভু শ্রীচৈতন্যকে 'ভগবান' ব'লে সম্বোধন করেছেন, মুরারি নিজেও সম্বোধন করেছেন 'নাথ' বলে।

২য় প্রক্রমে ১৮ সর্গে ১৪ সংখ্যক শ্লোকে সন্ন্যাস দেবার আগে কেশবভারতী বলেছেন, "ভবান কৃষ্ণ ঈশ্বরো নাত্র সংশয়ঃ।"

যদি চৈতন্যদেবকে অবতার ব'লেই মনে করতেন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন নবদ্বীপে নবকলেবর ধারণ ক'রে, তবে মুরারি বিশ্বম্ভরকে এড়িয়ে চলতেন কেন? নবদ্বীপের পণ্ডিত অধ্যাপকরাই বা কেন দূরে থাকতে চাইতেন চৈতন্যদেবের থেকে?

কবি কর্ণপুর মুরারির মূল কড়চাকে অনুসরণ ক'রে তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃত' কাব্য রচনা করেন। অতি বাল্যে কর্ণপুর চৈতন্যদেবের কৃপা পেয়েছিলেন। কবি কাব্যের সুললিত ভাষায় বলেছেন যে, বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গী গোপীদের অঙ্গমর্দনে গৌরাঙ্গ হয়ে নবদ্বীপে বিরাজ করছেন (১ম সর্গ ১ম শ্লোক)। ২য় সর্গে ৩-৪ শ্লোকে তিনি ধরিত্রীর মানসিক অবস্থা উদ্ঘাটিত করেছেন—প্রভু ধরায় অবতীর্ণ হবেন শুনে হর্ষোৎফুল্লা মেদিনী চিন্তা করতে লাগলেন প্রভু কবে নবদ্বীপে উদয় হবেন, কবেই বা এই নবদ্বীপ মথুরার মত ভগবানের পাদপদ্মের স্পর্শে পবিত্র ব'লে লোকে কীর্তন করবে।

কবি কর্ণপুর তাঁর কাব্যের ৮ম সর্গে ৫৬-৬০ শ্লোকে লিখেছেন যে, গৌরাঙ্গ শ্রীবাসকে বললেন—শ্রীবাস আমার বেণু কোথায়? শীঘ্র আমার বেণু দাও। শ্রীবাস হেসে বললেন, প্রভু গোপীরা আপনার বেণু গোপন করে রেখেছে।

বর্তমান কালের পাঠকের কানে শ্রীবাসের উক্তি খুব গাম্ভীর্যপূর্ণ ব'লে মনে হবে না। একটু যেন কৌতুকের সুর তার মধ্যে তাঁরা শুনতে পাবেন।

বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবতে অবতারের কয়েকটি কারণ নির্ণয় করেছেন। প্রথমেই তিনি ব'লে নিতে চেয়েছিলেন যে, লীলাময়ের অবতারের কারণ নির্ণয় দুঃসাধ্য—

কোন্ হেতু কৃষ্ণচন্দ্র করে অবতার।
কার শক্তি আছে তত্ত্ব জানিতে তাঁহার? [চৈ. ভা. পৃ. ৯]

কিন্তু বৃন্দাবনদাস তো তাত্ত্বিক ছিলেন না। গীতা-শ্রীমদ্ভাগবতকে তিনি সামনে রেখেছিলেন; তাঁরাও তো অবতারের কারণ দর্শিয়েছেন, তবে তিনি তা না করবেন কেন? সেকথাটা অবশ্য ব'লে নিলেন—

তথাপি শ্রীভাগবতে গীতায় যে কহে।
তাহা লিখি যে নিমিত্তে অবতার হয়ে॥ [তদেব]

অধর্মের প্রবণতা দেখে 'সাধুজন-রক্ষা দুষ্ট-বিনাশ কারণে' ব্রহ্মা আদি প্রভুর পায়ে নিবেদন করলে—

তবে প্রভু যুগধর্ম স্থাপন করিতে।
সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ হন পৃথিবীতে॥
কলিযুগে ধর্ম হয় হরি-সংকীর্তন।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন॥
এই কহে ভাগবতে সর্বতত্ত্বসার।
কীর্তন নিমিত্ত গৌরচন্দ্র অবতার॥ [তদেব]

এ তো হলো চৈতন্যদেবের ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডের কথা। কিন্তু ভাগবত-গীতার সেই দুষ্কৃতকারীদের কোন কথা তো এখনও শোনা গেল না ; বৃন্দাবনদাস সে বিষয়ে নিশ্চয়ই সচেতন ছিলেন, তাই বললেন—

সংসার তারিতে শ্রীচৈতন্য অবতার।
আপনে শ্রীমুখে করিয়াছেন অঙ্গীকার॥ [তদেব. পৃ. ১০]

আবার অবতীর্ণ হবার পূর্বে

অতএব সর্বদেশে নিজ ভক্তগণ
অবতীর্ণ কৈলা শ্রীচৈতন্য নারায়ণ॥ [তদেব.]

বেশ আঁট-ঘাট বেঁধেই নারায়ণ অবতীর্ণ হলেন, এর থেকে মনে হয় না কি যে বেশ দুরূহ কাজ নিয়েই এই অবতারের আগমন? শ্রীকৃষ্ণ এসেছিলেন বলরাম এবং যাদবদের নিয়ে—দুরূহ কর্মও সমাধান ক'রে গেছেন তিনি। সংকীর্তন প্রচার কি খুব দুরূহ কর্ম ছিল চৈতন্যদেবের সমকালে? বাধা ছিল কোথায়? এই বাধাদানকারী দুষ্কৃতকারী কারা?

শ্রীচৈতন্যের মুখ দিয়ে বৃন্দাবনদাস বলিয়েছেন—

ডাকিয়া বোলয়ে প্রভু, "আরে শ্রীনিবাস।
এত দিন না জানিস্ আমার প্রকাশ॥
তোর উচ্চসংকীর্তনে নাঢ়ার হুঙ্কারে।
ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ আইলুঁ সর্ব-পরিবারে॥
নিশ্চিন্তে আছহ তুমি আমারে আনিয়া।
শান্তিপুরে গেল নাঢ়া আমারে এড়িয়া॥
সাধু উদ্ধারিমু দুষ্ট বিনাশিমু সব।
তোর কিছু চিন্তা নাই পড় মোর স্তব॥ [তদেব. পৃ. ১১২]

এখানেও দুষ্টের কোন পরিচয় নেই। অন্য ধর্মাবলম্বী হলেই কিছু দুষ্ট হয় না। এখানে আরও একটি কথা না ব'লে পারা যায় না—প্রভুরূপী নারায়ণ যেন হতাশায় অস্থির হয়ে আছেন মনে হয়। শ্রীবাস তো কৃষ্ণআরাধনাই করছিলেন, তাঁর পূজামন্দিরে লাথি মেরে ধ্যান ভেঙ্গে স্তব পড়তে বলা দেবোচিত হয়েছে ব'লেও মনে হয় না।

"ঘরে ঘরে করিমু কীর্তন পরচার" চৈতন্যদেবের একথার উত্তরে অদ্বৈত আচার্য প্রার্থনা জানালেন—

অদ্বৈত বোলেন "যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রী-শূদ্র আদি যত মূর্খেরে সে দিবা ॥ [তদেব. পৃ. ১৩১]

বৃদ্ধ অদ্বৈত আচার্যের প্রগতিশীল মনের পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। ভেদ-বুদ্ধি দূরে ক'রে চৈতন্যদেব মানব সমাজে সমতা আনবেন এটাই তো স্বাভাবিক কথা। কিন্তু যে দুষ্টের দমনের জন্য এত তোড়জোর সে দুষ্টের সন্ধান তিনি দেন নি, হয়তো দিতে চান নি। চৈতন্য অবতারের কারণ হিসেবে তাঁর কাছ থেকে এটুকুই জানা গেল যে, সমস্ত মানুষকে কৃষ্ণ-প্রেম দান এবং সংকীর্তন প্রচারই ছিল এই অবতারের লক্ষ্য।

লোচনদাস তাঁর 'শ্রীশ্রী চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থে বলেছেন—

দামোদর-পণ্ডিত পুছিলা গুপ্ত-স্থানে।
কহ শুনি—কি লাগি গৌরাঙ্গ-অবতার ॥
... ...
শুনিয়া মুরারি কহে—শুনহ পণ্ডিত।
এই সব তত্ত্ব তো করিব বিদিত ॥
. ...
কলি যুগে এক অংশ ধর্মের বিচারে ॥
অধর্ম বাড়িল—ধর্ম হইল যে হীন।
স্বধর্ম ছাড়িল-বর্ণ আশ্রম-বিহীন ॥
. . . .
ধর্মহীন দেখিয়া নারদ মহামুনি।
কলি তারিবারে দয়া করিলা আপনি ॥
ভাবিলেন—কলিসর্প গিলিল সবারে।
মনে হৈল—ধর্মসংস্থাপন করিবারে ॥
কৃষ্ণ বিনু ধর্ম কেহো না পারে স্থাপিতে।
অবশ্য আনিব কৃষ্ণ কালতে তুরিতে ॥
ভক্ত-ইচ্ছা গোবিন্দেব হয় সর্বকাল।
বেদাগমশাস্ত্রে ইহা আছয়ে বিচার ॥
. . ...
সব-অবতার-সার—গোরা অবতার।
এমন করুণা কভু নাহি হয়ে আব ॥ (চৈ. ম. সূত্রখণ্ড, পৃ. ৮)

শ্রীকৃষ্ণ গোরা-অবতার হবেন বোঝা গেল—এটাও জানা গেল যে গোবা-অবতারের করুণার ন্যায় করুণা আর কোন অবতাবে দেখা যায় নি। করুণাব অর্থ এক্ষেত্রে প্রেম। অর্থাৎ প্রেমময় গোরাচাঁদ রূপে অবতীর্ণ হবেন নারায়ণ। কিন্তু কলিযুগে চার ভাগের তিন ভাগই অধর্ম, এই অধর্মের উৎস সন্ধান করা গেল না।

বৈকুণ্ঠে রুক্মিণী-নারায়ণ বসেছিলেন—রুক্মিণী রাধার কথা স্মরণ করিয়ে দিলে ভাববিহ্বল হয়ে পড়লেন নারায়ণ। এমন সময় মহামুনি নারদ এসে পৃথিবীর দুঃখের কথা জানালে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

ভুঞ্জিব প্রেমার সুখ-ভুঞ্জাইব লোকে।

দীন ভাব প্রকাশ করিব কলিযুগে ॥
ভকত জনের সঙ্গে ভকতি করিয়া
নিজপ্রেম বিলাইব ঈশ্বর হইয়া ॥
নিজ-গুণ-সংকীর্তন প্রকাশ করিব।
নবদ্বীপে শচীগৃহে জনম লভিব ॥ [তদেব. পৃ ১১]

এখানে লোচন একটু নূতন কথা শুনিয়েছেন। রাধার কথা স্মরণ ক'রে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের আবেশ দেখা দিয়েছে: তিনি প্রেমের সুখ অনুভব করবেন, সকলকে করাবেন। চৈতন্য রূপে জন্মগ্রহণ ক'রে তিনি নিজ-প্রেম বিলোবেন, নিজ-গুণ কীর্তন করবেন। 'শ্রীরাধার ভাব-কান্তি করি অঙ্গীকার' কথাটা অবশ্য এখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি, তবে সেই রূপটি ধ্যানের মধ্যে এসেছে নিশ্চয়ই।

শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠেই চৈতন্য রূপ ধারণ করলেন; অভিভূত নারদকে বললেন—

শত শত শাখা—ভক্তিপথে নাহি সীমা।
একমুখ হউক লোক—প্রচারিব প্রেমা ॥ [তদেব. পৃ. ১২]

চৈতন্যদেব কি কোন গোষ্ঠী তৈরি করতে চেয়েছিলেন? বিভিন্ন ভক্তি পথের যাত্রীদের একমুখ করার কথা থেকে তাই মনে হয় না কি? বৃন্দাবনদাসের কাছে একথা আমরা শুনি নি। লোচনদাস অধর্ম বলতে গিয়ে একটা কথা ব'লে ফেলেছিলেন—'স্বধর্ম ছাড়িল': তবে কি তিনি হিন্দুদের ধর্মত্যাগের কথা বলতে গিয়েছিলেন? যাঁরা বুঝে ধর্ম পরিবর্তন করেন তাঁদের সম্বন্ধে কিছু বলার নেই; কিন্তু জোর ক'রে যাদের ধর্মত্যাগ করান হচ্ছে বা যারা সুবিধা সুযোগ লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মত্যাগ করছেন, তাদেরই সম্ভবত ইঙ্গিত করেছেন লোচনদাস। যে রাজশক্তি এই অন্যায়কে প্রশ্রয় দিচ্ছে তাকে দমন করার জন্যই অবতার? গোলোকে বসেই লোচনের শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

যুগে যুগে জন্ম মোর পৃথিবীর মাঝে।
সাধুজন-ত্রাণ ধর্ম রাখিবার কাজে ॥
. . ... .
কলি ঘোর অন্ধকার—নাহি ধর্মলেশ।
করুণা বাঢ়ল দেখি সর্বজনক্লেশ ॥
অধর্ম-বিনাশ হেতু মোর অবতার।
অধর্ম বাঢ়য়ে পুনঃ কি কাজ আমার।
ঐছন জানিঞা দয়া উপজিল চিতে।
জনম লভিব নিজ প্রেম প্রকাশিতে ॥
এমত দুর্লভ প্রেমভক্তি প্রকাশিয়া।
বুঝাইব লোকে ধর্মাধর্ম বিচারিয়া ॥
নবদ্বীপে জন্ম মোর শচীর উদরে।
গঙ্গার সমীপে জগন্নাথমিশ্র-ঘরে ॥
আর অবতার হেন অবতার নহে।
অসুর-সংহার-হেতু পৃথিবী বিজয়ে ॥

মহাকায়, মহাসুর, মহা-অস্ত্র-ঘোর।
মহারণে সংহার করিয়া করো চুর ॥
এবে সর্বজন সেই হৃদয় আসুরি।
খড়্গ-ছেদ্য নহে—অস্ত্রবলে কিবা করি ॥
নাম, গুণ, সংকীর্তন—বৈষ্ণবের শক্তি।
প্রকাশ করিব আর নিজ প্রেমভক্তি ॥ [তদেব. পৃ. ৩১]

জনে জনে প্রেমভক্তি বিলিয়ে, ঘরে ঘরে সংকীর্তন করে মানব হৃদয়ে যে অধর্ম প্রবেশ করেছে তাকেই দূর করার অর্থ অধর্ম-বিনাশ—আর এই অধর্ম বিনাশ হওয়ার অর্থই ধর্ম-সংস্থাপন। চৈতন্যদেব সংকীর্তনে দেশকে মাতিয়েছিলেন, প্রেমভক্তি প্রচার করেছিলেন এই বিষয়টাকে সামনে রেখে বিজ্ঞানের **back calculation** ক'রে অবতারের কারণ নির্দেশ ক'রে দিলেন লোচনদাস। স্বয়ং গোলকপতির মুখের কথা তুলে দেওয়ায় অবতার না হবার আর কোন ভাব-সঙ্গত কারণ রইল না।

এবার দেখা যাক চৈতন্যদেবের শ্রেষ্ঠ জীবনীকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এ সম্বন্ধে কি বলেন। তিনি প্রথমে কৃষ্ণ বলরামের আগমন বার্তা শোনালেন—

ব্রজে যে বিহরে পূর্বে কৃষ্ণ বলরাম।
কোটি সূর্য-চন্দ্র জিনি দোঁহার নিজধাম ॥
সেই দুই জগতেরে হইয়া সদয়।
গৌড়দেশে পূর্বশৈলে করিলা উদয় ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রকাশে সর্বজগৎ আনন্দ ॥ [চৈ. চ., পৃ. ৩]

শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের আগমনবার্তা দিয়ে কবিরাজ গোস্বামী কাজের কথাটারও সূত্রপাত করলেন—

যুগধর্ম প্রবর্তাইমু নামসংকীর্তন।
চারিভাবে ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন ॥
আপনি করিব ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সবারে ॥
আপনি না কৈলে ধর্ম শিখান না যায়।
এই ত সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায় ॥ [তদেব. পৃ. ৭]

এতক্ষণে আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের একজন তাত্ত্বিক জীবনীকারকে পেলাম ; তিনি প্রথমেই শুনিয়ে দিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ এবার চৈতন্য রূপে দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য এবং শৃঙ্গার এই চারটি ভাবের উদ্বোধন দ্বারা মানুষকে ওই চারি রস আস্বাদন করাবেন। তা যদি করতে হয় তবে তো আর চক্র-গদার প্রয়োজন নেই। লোচনদাসের মতোই তিনি বললেন—

অন্য অবতারে সব সৈন্য-শস্ত্র সঙ্গে।
চৈতন্যকৃষ্ণের সৈন্য অঙ্গ-উপাঙ্গে ॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ চৈতন্যের দুই অঙ্গ।
অঙ্গের অবয়বগণ কহিয়ে উপাঙ্গ ॥
অঙ্গোপাঙ্গ তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রভুর সহিতে।

সেই সব অস্ত্র হয় পাষণ্ড দলিতে ॥ [তদেব পৃ. ৯]

সুতরাং কৃষ্ণদাসের মতে চৈতন্য অবতারের উদ্দেশ্য চারি রস আস্বাদন করান এবং তার দ্বারাই সাধুদের উদ্ধার এবং পাষণ্ড দলন দ্বারা দুষ্টের দমন। পাষণ্ড কারা ? বৌদ্ধ তান্ত্রিকরাই সেকালে পাষণ্ডী ব'লে পরিচিত ছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ জগাই-মাধাই বা মদ্যপ ভবানী পূজকদের কথাও ব'লে থাকতে পারেন। যারা হিন্দুয়ানীর বিরোধী ছিল তারাও কি পাষণ্ড নয় ? এ কথাটা কৃষ্ণদাসও পরিষ্কার ক'রে বলেন নি।

এইবার তাত্ত্বিক কবিরাজ গোস্বামী আরও একটু এগিয়ে গেলেন। পাষণ্ডী দলন তো 'এহো বাহ্য' : গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের তত্ত্ব তাতে প্রকাশ পাচ্ছে কই—তাই অবতারের মূল কারণটি এবার তিনি প্রকাশ করে বললেন—

আনুষঙ্গ কর্ম এই অসুর মারণ।
যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ ॥
প্রেমরসনির্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ ॥
রসিকশেখর কৃষ্ণ পরমকরুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম ॥ [তদেব. পৃ. ১১ ১২]

এবং রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি ॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্যগোসাঞি।
রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই ॥ [তদেব. পৃ. ১৩]

এবার তত্ত্বের চরমে এসে পৌঁছলেন কবিরাজ গোস্বামী—

প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনি অবতরি।
রাধা-ভাব-কান্তি দুই অঙ্গীকার করি ॥ [তদেব পৃ. ১৪]

দেখা যাচ্ছে যে, তিন বাঙালী জীবনীকার চৈতন্যদেবের অবতার সম্বন্ধে একমত নন। বৃন্দাবনদাস বঙ্গদেশেই থাকতেন, চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ লীলার সঙ্গী শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতা শ্রীরাম পণ্ডিতের কন্যা নারায়ণীর পুত্র—বাল্যকাল থেকেই প্রভু নিত্যানন্দের অনুচর। সুতরাং মূলতঃ রূপ-সনাতন-জীব গোস্বামী প্রচারিত এবং কিছুটা রায় রামানন্দের ধ্যান-ধারণা-জাত তত্ত্বের কথা তাঁর জানা ছিল না। তিনি প্রভু নিত্যানন্দ, দাদামশায় শ্রীরাম পণ্ডিত এবং শ্রীবাস পণ্ডিতের কাছে যা শুনেছেন তাই লিখেছেন : মাতা নারায়ণীও এ বিষয়ে তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করে থাকবেন। সুতরাং তত্ত্বের জারক রসে তাঁর চৈতন্যভাগবত জারিত হতে পারে নি—সরল বিশ্বাসে তিনি তাঁর বক্তব্য বলেছেন। অধর্ম এবং দুষ্কৃতকারীদের কথা বললেও তিনি সম্ভবতঃ রাজশক্তির বিরুদ্ধে কিছু বলতে সাহস করেন নি যেহেতু সে সময়েও মুসলমান শাসনই চলছিল বঙ্গদেশে।

লোচনদাসের মূল উপজীব্য ছিল মুরারি গুপ্তের চৈতন্যচরিত এবং গুরু নরহরি সরকার ঠাকুরের মুখে শোনা কাহিনী। নরহরি লিখেছেন—'মনে করি অনুমান শ্যাম হইলা গৌরাঙ্গ/রাধাকৃষ্ণ-তনু তার সাখী'. (পদকল্পতরু ২২৫৯), তাই লোচনের কাব্যে আমরা দেখেছি যে, শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে রাধা ভাবে ভাবিত হয়ে পড়লেন এবং 'প্রভু গৌর তনু হৈলা' (পৃ. ১৯)। লোচনদাসে দুষ্কৃতকারীদের কথা আছে—অধর্ম ত্যাগের কথা

ব'লে বিশেষ ইঙ্গিত করাও হয়েছে, সেই সঙ্গে তাঁর শ্রীচৈতন্য অবতার কিছুটা তত্ত্বের ধার ঘেঁষে গেছে।

কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃত বৃন্দাবনে রচিত, ইসলামধর্মীয় ভারত সম্রাটদের কাছাকাছি ব'সে 'অধর্ম' বিনাশ' কথাটাকে এড়িয়ে যেতেই হয়েছে তাঁর। তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব রস-তত্ত্বের আবরণে সম্পূর্ণরূপে মুড়ে দিয়েছেন তাঁর অবতারকে।

'অবতারের' কারণ সম্বন্ধেই লেখকরা একমত যখন নন তখন অবতার বলার প্রয়োজনটা কি? পূর্ব থেকেই কতগুলো সিদ্ধান্ত স্থির ক'রে নিয়ে স্বাধীনভাবে কাব্য রচনা করতে গিয়ে জীবনীকাররা বুঝিয়ে দিলেন যে তাঁদের সিদ্ধান্তটাই ভ্রমাত্মক।

এবার উৎকল দেশীয় কোন কোন লেখকের সামান্য কিছু বক্তব্য জেনে নেওয়া যেতে পারে। শ্রীচৈতন্যদেবের সমকালীন পঞ্চ সখাদের অন্যতম অচ্যুতানন্দ তাঁর 'শূন্য সংহিতা' ২য় ভাগে লিখছেন—

সত্যযুগে নাথ হিরণ্যদইত পৃথিবীকি হেল সল।
নৃসিংহ রূপরে বিনাশিণ তারে পৃথিবভার উদ্ধারিল ॥
ত্রেতা যুগরে নাথ হেলা রঘুনাথ রাবণ কল নিহত।
যাগ যজ্ঞ হোম করিল স্থাপন লীলা কবিল ব্যকত ॥
দ্বাপরে শ্রীহরি কৃষ্ণ রূপ ধবি কংস আদি দৈত্য গণ।
শ্রীমহাভারত করিণু রচিত দুষ্টংকু কল নিধন ॥
এ কলি যুগবে গৌর অবতাবে নামংকু বিখ্যাত কল।
প্রেমলীলা করি ভক্তংকু উদ্ধারি নিজ ধামে চলি গেল ॥
.. ..
বৌদ্ধ রূপরে শ্রীনীলাচলবে করিঅছি নাথ খেলা ॥
অনুগ্রহ করি হে কমলাবর ফিটাঅ ভব বন্ধন।
পামর অচ্যুত তো ভৃত্যর ভৃত্য পাদপদ্মে দিঅ স্থান ॥

অচ্যুতানন্দ অন্যান্য অবতাবে অসুর নিধনের কথা বললেও চৈতন্য অবতারে অসুরের সন্ধান পেলেন না: নীলাচলের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তরা কোন দুষ্কৃতকারীব কথা বলেন নি, সুতবাং পঞ্চ সখার একজন হয়ে তিনি সে কথা বলবেন কি করে? পঞ্চ সখা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে নিজেদেব যুক্ত করেন নি। সুতরাং তাঁদের লেখায় গৌড়ীয় তত্ত্বের প্রকাশ হবার সম্ভাবনাও ছিল না। অধ্যাপক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'মধ্যযুগে উড়িষ্যার বৈষ্ণব ধর্ম' গ্রন্থে বলেছেন যে, 'অচ্যুতানন্দ চৈতন্যদেবের নিত্যসঙ্গীদের অন্যতম ছিলেন (পৃ. ৮৩)।' তাহলে তো তাঁর পক্ষে অনেক কথাই জানা সম্ভব। উড়িষ্যায় বৌদ্ধধর্ম ডুবতে ডুবতেও একেবারে ডুবে যায় নি হয়তো অথবা বৌদ্ধ ধর্মের অবলুপ্তির পরেও বুদ্ধের ব্যক্তিসত্তার প্রভাব ভুলে যাওয়া হয়তো অসম্ভব ছিল। তাই অচ্যুতানন্দ দাস নীলাচলে বুদ্ধের লীলার সঙ্গে চৈতন্যলীলাকে মিলিয়েছেন। উড়িষ্যায় কোন কোন মহলে এই বিশ্বাসও ছিল যে শ্রীকৃষ্ণই জগন্নাথ হলেন এবং জগন্নাথেরই অবতার বুদ্ধদেব এবং চৈতন্যদেব (তদেব. ৭ম অধ্যায়)।

ভক্ত কবি ঈশ্বরদাস তাঁর 'চৈতন্য ভাগবত' (রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দীর শেষ অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ) গ্রন্থের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণে জগন্নাথের সগুণ নির্গুণ উভয় ভাবের স্তুতি করেছেন। অরূপ চিন্ময় ভগবান, ধর্মের সংস্থাপন ও অধর্মের বিনাশের

জন্য যুগে যুগে সংসারে অবতীর্ণ হন। গ্রন্থকার এ গ্রন্থে ভগবান বিষ্ণুর সাধারণতঃ প্রচলিত নবম অবতার বুদ্ধের স্থলে চৈতন্যদেবকে গ্রহণ করেছেন। চৈতন্যচন্দ্র নদীয়া নগরীতে অবতীর্ণ হয়ে জনসাধারণকে পশুজন্ম থেকে উদ্ধার করেছিলেন। গ্রন্থরচনার জন্য ঈশ্বরদাস বিষ্ণু কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হন। ভগবান চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়ে নিজের নাম নিজে গান ক'রে জগৎকে উদ্ধার করেছেন এবং চৈতন্য স্বয়ং জ্ঞানভক্তির স্বরূপ—

পাষণ্ড নিস্তারিবা পাই॑। মানব রূপ ভাব গ্রাহী॥
আপনা নাম হৃদে চিন্তি। মুখে গোবিন্দগুণ গান্তি॥
নিস্তার কলে পশুজন্ম। সদয়ে হরি শ্রীচৈতন্য।
তুম্ভে যে পতিত উদ্ধার। শরণ পশুছি ঈশ্বর॥ [প্রথম অধ্যায়]

ঈশ্বরদাস চৈতন্যদেবকে স্বয়ং অবতার রূপে দেখেছেন—নৃত্যরত চৈতন্যের মধ্যে দশ অবতারকে লক্ষ্য করেছেন তিনি—

সকল লোকে দেখুছান্তি। শচীনন্দন শিরীপতি॥
মীন স্বরূপ রূপে হরি। নাচন্তি চৈতন্য শ্রীহরি॥
কূর্মরূপে চৈতন্য। ডাকন্তি চিন্তি ভক্তিজ্ঞান॥
শূকররূপে নৃত্য করি। উচ্চে ডাকন্তি বোল হরি॥
নৃসিংহ রূপে ভগবান। নাচন্তি ত্রৈলক্য মোহন॥
বামন রূপে শিরীপতি। গড়ন্তি পড়ি যে ক্ষিতি॥
ধনুরাম রূপে ব্রাহ্মণ। নাচন্তি আদি নারায়ণ॥
শ্রীরাম রূপে শরাসন। নাচন্তি শচীনন্দন॥
কৃষ্ণ স্বরূপে রসকেলি। নাচন্তি প্রভু বনমালী॥

এ একেবারে অদ্ভুত পরিকল্পনা! বুদ্ধ-চৈতন্য তো ঈশ্বরদাসের কাছে এক হয়ে গেছেন। বাঙ্গালী জীবনীকারদের সঙ্গে উৎকলের লেখকদের পার্থক্য বিশেষ লক্ষণীয়।

দিবাকর দাস তাঁর শ্রীজগন্নাথ চরিতামৃতে বলছেন—

জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন। সন্ন্যাসী গউর রূপেণ॥
ভক্তেশ ভক্ত অবতার। তো পদে করে নমস্কার॥
কলিরে শ্রীকৃষ্ণ যে জাত। গউর রূপরে বিখ্যাত॥

সকলেরই সঙ্গে একমত হয়ে দিবাকর দাস মেনে নিয়েছেন যে শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য। এ মেনে নেওয়া ছাড়া উপায়ও তো নেই—প্রায় সমস্ত উৎকলই সে সময়ে চৈতন্যদেবকে চলন্ত জগন্নাথ ব'লে মেনে নিয়েছে। উৎকলের পঞ্চ সখার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে গ্রহণ করা হয় অতি বড় জগন্নাথ দাসকে। তাঁর জীবনীকার দিবাকর দাস কি করেন? যদিও জীব গোস্বামীর নামে প্রচারিত এক নকল গ্রন্থে জগন্নাথ দাসকে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে সমান ক'রে দেখান হয়েছে—সেখানে বলা হয়েছে যে জগন্নাথ দাস মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে অষ্টভুজ দেখিয়েছিলেন তথাপি সে দিকে না গিয়ে দিবাকর দাস অতি বড় জগন্নাথ দাসকে রাধার প্রতিরূপ ক'রে দেখিয়েছেন—

শ্রীবৈকুণ্ঠ নিত্যধামে। শ্রীরাধাকৃষ্ণ একপ্রেমে॥
একাত্মা ভাবরেণ ছন্তি। কোটিযুগে ভঙ্গ নুহন্তি॥
শ্রীরাধা মুখ চাহিঁ হরি। মন্দ-মধুর হাস্য করি॥

যে হাস্য মধুর অমৃত। তহিঁ চৈতন্য হেলে জাত ॥
যেনু দুহিঙ্ক একভাব। রাধা হ্যাসিলে তহিঁ লব ॥
যে হাস্য জন্মিলে তুরিত। শ্রী অতি বড় জগন্নাথ ॥

দিবাকর দাস বোধ হয় দেখাতে চেয়েছেন যে, শ্রীরাধার অনুসন্ধান করতে করতেই চৈতন্যদেব নীলাচলে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। যে যেমন ইচ্ছা তাই ব'লে গেছেন। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে বিশ্বাসের বিস্তৃত প্রান্তর পড়েছিল—মহাপুরুষদের কেন্দ্র ক'রে তাঁদের জীবনীকাররা সেই বিশ্বাসকে সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগিয়েছেন। তিনি অবশ্য একথাও মনে করেছেন যে, লোকত্রাণের জন্য, শূদ্রের বৃত্তিধারী ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণবিদ্বেষী শূদ্রদের উদ্ধারের জন্য এবং প্রেমভক্তি বিতরণের জন্য শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। শূদ্র এবং ব্রাহ্মণদের কেন্দ্র ক'রে এখানে আবার একটা নূতন কথাও এসে গেল—

এ কলি মাদযুক্ত নর। পাপ কর্মবে তৎপর ॥
মহাপাতকে ছন্তি পুরি। বেদ ব্রাহ্মণ নিন্দাকারী ॥
কলিরে শাপগ্রস্ত জন। ছাড়িন বেদের বিধান ॥
ব্রাহ্মণ করে শূদ্রবৃত্তি। শূদ্র ব্রাহ্মণদ্বেষী হন্তি ॥
এ পরি দেখি নারায়ণ। করুণাময় জনার্দন ॥
প্রাণীঙ্ক তারিবার পাইঁ। মর্ত্যে জন্মিলে দেহ বহি ॥
অতি পবিত্র গঙ্গাতীরে। নবদ্বীপ নামক পুরে ॥
সন্ন্যাসী রূপকু ধরিণ। জনম হেলে চইতন্য ॥

চৈতন্যদেবের কর্মধারা থেকে একটু সরে দাঁড়ানো হলো না কি? বেদ ও ব্রাহ্মণের নিন্দাকারী অথবা শূদ্রবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মেণবিদ্বেষী নিয়ে তিনি মাথা ঘামান নি। জাত-পাতকে শূন্যে মিলিয়ে দিয়ে তিনি এক অখণ্ড মানবজাতি গড়তে চেয়েছিলেন।

অধিকাংশ জীবনীকারই চৈতন্যদেবকে অবতার ধ'রে নিয়ে তার কারণ ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন এবং তা করতে গিয়ে ইচ্ছামত কারণ দেখিয়েছেন। এর ফলে সত্যকার চৈতন্য-জীবন অন্ধকারে রয়ে গেছে।

অনেক জীবনীকারই বলেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতার রূপে জন্মগ্রহণের কালে তাঁর স্বর্গের পারিষদবর্গকেও সঙ্গে ক'রে এনেছিলেন—কেউ আগে কেউ পরে এসেছেন। লীলার কারণেই এই সঙ্গে নিয়ে আসা। সমভাবাপন্নরাই তো লীলার সহায়ক হ'তে পারেন। এ বিষয়ে বিভিন্ন জীবনীকাররা কি বলেছেন তা দেখার পূর্বে শ্রীমদ্ভাগবত এ বিষয়ে কিছু বলেছেন কিনা তা দেখে নেওয়া কর্তব্য।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন—

সহস্র মস্তকধারী অনন্ত সুজন।
হরির আশ্রয় মাত্র বেদের বচন ॥
অগ্রে তিনি না আসিলে লইয়া আশ্রয়।
কেমনে বিষ্ণুর জন্ম এ সংসারে হয় ॥ [পৃ. ৬৫৭]

ভাগবতের আরও এক স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে—

তবে দেব নারায়ণ করেন চিন্তন।
সঙ্গে হলধর আর যত যদুগণ ॥ [পৃ. ১০২৪]

হলধর ও তো নারায়ণের অংশই—বসুদেব সেকথা ভাগবতেই শুনিয়েছেন তা আমরা আগেই দেখেছি। তবে যাদবদেরও বৈকুণ্ঠ থেকে মর্ত্যে লীলার জন্য এনেছিলেন কিনা সঙ্গে ক'রে, সে কথা স্পষ্ট নয়। কিন্তু দেখতে পাই যে, গোলোকে যাবার আগে তিনি কৌশলে যদুবংশ ধ্বংস ক'রে ফেলেন। স্বভাবতঃই মনে হয় যে, যাদের সঙ্গে এনেছিলেন তাদের পাঠিয়ে দিয়ে তবে তিনি গেলেন। যাদব অর্থই গোপ-গোপিনীরা, তার মধ্যে শ্রীদাম-সুদাম প্রভৃতি বিশিষ্ট সখারাও আছেন।

বৃন্দাবনদাস ভাগবতের কথা স্মরণ ক'রেই প্রথমে জানিয়ে দিলেন—

এবে প্রভু যুগধর্ম স্থাপন করতে।
সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ হন পৃথিবীতে॥ [চৈ. ভা. : পৃ. ৯]

সাঙ্গোপাঙ্গরা বৈষ্ণবরূপেই জন্মগ্রহণ করলেন : এ জন্মে ত্রাণকার্য হবে সংকীর্তনের দ্বারা—তাই বৈষ্ণবরূপে জন্মগ্রহণ শ্রেয়—

অতএব সর্বদেশে নিজ ভক্তগণ।
অবতীর্ণ কৈলা শ্রীচৈতন্য নারায়ণ॥ [তদেব. পৃ. ১০]

সকলদেশে বলতে বঙ্গদেশ, আসাম, উৎকল কিনা তা স্পষ্ট হলো না। কোন্ কোন্ ভক্ত তাঁর দ্বারা প্রেরিত হয়ে এসেছেন একথাও জানা গেল না। শ্রীকৃষ্ণ লীলায় প্রয়োজন হয়েছিল যাদবদের—যদুবংশ বলেই সেখানে শ্রীমদ্ভাগবতকার শেষ করেছেন এবং ওই যাদবদের মধ্যেই শ্রীদাম-সুদাম প্রভৃতিকে পাওয়া গেছে। এখানেও লীলাসঙ্গী বৈষ্ণবদের কথা বলা হলো—যাঁদের নাম বিভিন্ন স্থানে চৈতন্যভাগবতকার বলেছেন স্বভাবতঃই তাঁরা 'সাঙ্গোপাঙ্গে'র মধ্যে পড়েন। মনে রাখতে হবে তার মধ্যে উৎকলের পঞ্চসখার নাম নেই, তাঁরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের অন্তর্ভুক্ত হন নি ব'লেই হয়তো তাঁরা অপাংক্তেয় ছিলেন। অথচ শ্রীজীব গোস্বামী তাঁর 'সর্বসংবাদিনী'র প্রথমেই বলেছিলেন, কোটি কোটি মহাভাগবত যাঁরা বহির্দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভগবত্তা বারবার নিশ্চয় করেছেন, তাঁদের মধ্যে গৌড়-বরেন্দ্র-বঙ্গ-সুহ্ম ও উৎকল বা কলিঙ্গ দেশবাসী উল্লেখযোগ্য—"গৌড়বরেন্দ্র বঙ্গ সুহ্মাৎ কলিঙ্গাদি দেশীয়ানাং মহাপ্রসিদ্ধেঃ"।

এরপর বৃন্দাবন দাস কয়েকটি নাম বললেন। বড়ই সন্তর্পণে তিনি এগিয়েছেন মনে হয় : যাঁদের নাম করলেন তাঁরা সবাই নবদ্বীপবাসী—

'অদ্বৈতের কারণে চৈতন্য অবতার।'
সেই প্রভু কহিয়াছেন বার বার॥
সেই নবদ্বীপে বৈসে পণ্ডিত শ্রীবাস।
যাঁহার মন্দিরে হৈল চৈতন্য-বিলাস॥
সর্বকাল চারি ভাই গায় কৃষ্ণনাম।
ত্রিকাল করয়ে কৃষ্ণপূজা গঙ্গাস্নান॥
নিগূঢ়ে অনেক আরো বৈসে নদীয়ায়।
পূর্বেই জন্মিল সভে ঈশ্বর-আজ্ঞায়॥
শ্রীচন্দ্রশেখর গোপীনাথ জগদীশ।
শ্রীমান্ মুরারি শ্রীগরুড় গঙ্গাদাস॥

একত্রে বলিতে হয় পুস্তক-বিস্তার।

কথার প্রস্তাবে নাম জানিবা সভার ॥ [তদেব· পৃ· ১১-১২]

বৃন্দাবনদাস কিছু নাম শুনিয়ে ভবিষ্যতের ওপর বরাত দিয়ে রাখলেন। মোট কথা তিনি বলতে চাইলেন গ্রন্থে যে-সব নাম পাওয়া যাবে সেই সব বৈষ্ণবরাই বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর পারিষদ—তাঁরাই মর্ত্যে নেমে এসেছেন 'ঈশ্বর আজ্ঞায়' তাঁর লীলাসঙ্গী পরিচয় রূপে। কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈত প্রভু এবং গর্ভধারিণী শচীদেবী এবং ঈশ্বরপুরীর নাম তো করতেই হয় গ্রন্থ বিস্তারের আশঙ্কা সত্ত্বেও—

অবতরিবারে প্রভু করিলা উদ্‌যোগ।

ঈশ্বর-আজ্ঞায় আগে শ্রীঅনন্তধাম।

রাঢে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ রাম ॥ [তদেব· পৃ· ১২]

জানা গেল যে, নিত্যানন্দই বলরাম। কিন্তু শ্রীদাম-সুদাম প্রভৃতির কথা জানা গেল না —বৃন্দাবনদাস সেকথা বলেন নি।

লোচনদাসের নারদ পৃথিবীর দুঃখে দুঃখ বোধ ক'রে বিষ্ণুকে মর্ত্যে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন; সেই সঙ্গে আনবেন অন্যান্য দেবতাদের যাঁরা হবেন বিষ্ণুর লীলা সঙ্গী—

আনিব সকল দেবগণ তার সঙ্গে।

অস্ত্র-পারিষদাদি সকল সাঙ্গোপাঙ্গে ॥

ব্রহ্মা আদি দেবগণ নারদাদি মুনি।

পৃথিবী জনম লৈল দেবী কাত্যায়নী ॥

দ্বারকায় আর যত ছিল যদুবংশে।

পৃথিবী জনম লইল নিজ নিজ অংশে ॥ [তদের পৃ· ৮]

স্বর্গলোকেই সমস্ত ব্যবস্থা করা হলো। কে কোন্ রূপে, কোন্ নাম নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেন সে কথা জানা গেল না। এটুকু বোঝা গেল যে, গৌর লীলার সঙ্গীরাও সব এলেন স্বর্গলোক থেকে। দ্বারকার যদু বংশ তো শ্রীকৃষ্ণ কৌশলে ধ্বংস ক'রেই এসেছেন—সুতরাং দ্বারকার যদুবংশ বলতে নিশ্চয়ই লেখক বোঝাতে চেয়েছেন যে, দ্বারকায় যে যাদবরা কৃষ্ণের সঙ্গে লীলা করেছেন—এঁরাও সকলে আবার জন্মগ্রহণ করলেন। এবারের ব্যবস্থাটা মনে হয় কিঞ্চিৎ অধিক। কংসবধ কালে বলরাম এবং যাদবরাই এসেছিলেন: এবার সঙ্গে দেবতা এবং মুনিদেরও আগমন হলো। এবারের দৈত্য কি কংসের থেকেও শক্তিশালী ?

এবারের লীলাসঙ্গীরা কঠিন কাজ করার জন্য প্রস্তুত হয়েই আসছেন, সেকথাটা লোচন শুনিয়েছেন—

যদি পাপী ছাড়ি ধর্ম দূর দেশে যায়।

মোর সেনাপতি ভক্ত যাইবে তথায় ॥ [তদেব· পৃ· ৩১]

বিষ্ণুর আজ্ঞায় নারদ সর্বত্র সংবাদ দিতে চললেন; বলরামের শ্বেতদ্বীপে এসে তিনি তাঁকে বিষ্ণুর ইচ্ছা জানালেন—

সাঙ্গোপাঙ্গে পারিষদে, জনমহ পৃথিবীতে

স্বনাম ধরহ 'নিত্যানন্দ'। [তদেব· পৃ· ৩৫]

বলরামও তাঁর 'নিজজন'দের পৃথিবীতে যাবার নির্দেশ দিলেন। যাই হোক, এপর্যন্ত

লোচনের কাছে নিত্যানন্দের নামটা পাওয়া গেল। লোচনদাস আরও কিছু কিছু পারিষদের পরিচয় দিয়েছেন—

মহেশঠাকুর সর্ব-আগে আগুয়ান।
ব্রাহ্মণের কুলে জন্ম—কমলাক্ষ-নাম॥
পঢ়িয়া শুনিয়া গুণে পরবীণ হৈল।
'অদ্বৈত-আচার্য' বলি পদবী লভিল॥ [তদেব]

কাত্যায়নী জন্মালেন সীতা রূপে (অদ্বৈতের পত্নী)। এর পরে তিনি অনেক নাম করেছেন [পৃ. ৩৪-৩৫]। উৎকল দেশের একমাত্র রায় রামানন্দ ও কাশী মিশ্রের নাম তাতে পাওয়া যায়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে যে পঞ্চসখা নীলাচলে চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ ছিলেন তাঁদের কারও কথা বলা হয় নি। বলা হয় নি বাসুদেব সার্বভৌমের কথাও।

চৈতন্যচরিতামৃতকার কি বলেন? তিনি প্রথমেই বললেন—

অদ্বৈত আচার্য প্রভুর অংশ অবতার
... ..
নিত্যানন্দরায় প্রভুর স্বরূপপ্রকাশ॥ [চৈ ১ পৃ. ১]
. .. .
নিত্যানন্দগোসাঞি সাক্ষাৎ হলধর।
অদ্বৈত আচার্যগোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর॥
শ্রীবাসাদি পারিষদ সঙ্গে লঞা।
দুই সেনাপতি বুলে কীর্তন করিয়া॥ [তদেব. পৃ. ৯]

অন্যত্র বলেছেন, 'গুরুবর্গ নিত্যানন্দ-অদ্বৈতআচার্য। শ্রীনিবাসাদি আর যত লঘু সব আর্য॥' [পৃ. ১৯] এঁরা ব্যতীত বাকি সব পারিষদ অথবা কিঙ্কর। এঁরা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন কিনা সেকথাটাও বলেন নি কবিরাজ গোস্বামী। তিনি পূর্বেও শুনিয়েছেন—

কৃষ্ণ যদি পৃথিবীতে করেন অবতার।
প্রথমে করেন গুরুবর্গের সঞ্চার॥
পিতা মাতা গুরু আদি যত মান্যগণ।
প্রথমে করেন সবার পৃথিবীতে জনম॥
মাধব ঈশ্বর পুরী শচী জগন্নাথ।
অদ্বৈত আচার্য প্রকট হৈলা সেই সাথ॥ [তদেব. পৃ. ১০]

কবিরাজ গোস্বামী অদ্বৈত-নিত্যানন্দ, মাধবপুরী-ঈশ্বরপুরী এবং শচী-জগন্নাথের নাম মাত্র করেছেন যাঁরা ঈশ্বর-আজ্ঞায় লীলার সাহায্যে তাঁর কিছু পূর্বে পৃথিবীতে এসেছেন। আরও অনেকেই এসেছেন নিশ্চয়ই কিন্তু তাঁদের কারও নাম করেন নি।

এখানেও বাঙ্গালী লেখকরা একমত নন। স্বর্গ থেকে যে সব পারিষদ নেমে এসেছেন সকলকেই সেখানে নিশ্চয়ই চিহ্নিত করা হয়েছিল—তাহলে সকলের কাছেই একই নাম পাওয়া যেতো। তা না ক'রে লেখকরা নিজ নিজ খুসীমতই কথা বললেন। লোচন

দাসের উচ্ছ্বাসটাই খুব বেশি দেখা গেছে—সবচেয়ে সংযম দেখিয়েছেন তাত্ত্বিক কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

মনে হয়, শ্রীমদ্ভাগবত অনুসরণ ক'রেই পারিষদদের কল্পনা করা হয়েছে। এ সব চৈতন্য সমকালে নিশ্চিতরূপেই স্বীকৃত ছিল না।

এবার উৎকলের লেখকদের বক্তব্য কি দেখা যাক। চার সখা ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভগবানের লীলাসহচর রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তাঁরা কে কি হয়েছিলেন সে কথা লিখেছেন পঞ্চম সখা-চৈতন্যদেবের সমকালীন অচ্যুতানন্দ দাস—

সুবল সখা অটন্তি বলরাম দাস।
সুবাহু সখা যে যশোবন্ত পরকাশ ॥
দাস সখা অনন্ত যে শিশু পুণ জান।
সুদাম সখা সে পরে অচ্যুত মুঁ পুণ ॥
অনন্ত শিশু নারদ মুনি সত্যে হোই।
যশোবন্ত······যে মুনি বোলি কহি ॥
মারকণ্ড ঋষি বলরাম দাস হোই।
অচ্যুত দাস যে কৃপাজল ঋষি হুঁই ॥
ত্রেতয়া যুগরে রামচন্দ্র সঙ্গে জাত।
বলরাম দাস যে সুসেন হোই খ্যাত ॥
জাম্বব হোইন যশোবন্ত হেলে নাম।
অনন্ত শিশু ধইলে নীল বোলি নাম ॥
নল বলি অচ্যুত যে নাম হোএ তহিঁ।
চারি যুগে চারি অবতার আব হোই ॥
সত্যে নারায়ণ ত্রেতয়াবে রামচন্দ্র।
দ্বাপররে নাম হোএ শ্রীকৃষ্ণ যে চন্দ্র ॥
শ্রীচৈতন্য কলিযুগে কৃষ্ণ হেলে জাত।
তাঙক সঙ্গে চারি সখা হোইল যে জাত ॥
অনন্ত যে শিশু অভিরাম পুণ হোই।
গউরীদাস পণ্ডিত বলবাম কহি ॥
সুবাহু অটন্তি পুণ উদ্ধব যে দণ্ড।
সুন্দরানন্দ যে মুহি অটই অচ্যুত ॥ [শূন্যসংহিতা, ২য় ভাগ]

অচ্যুতানন্দ চার সখার কথাই বলেছেন, কারণ পঞ্চসখার জগন্নাথ দাস তো চৈতন্যদেবের সমান হয়ে অষ্টভুজ প্রদর্শন করেছেন। অন্ততপক্ষে তিনি রাধার অবতার তো বটেই! অচ্যুতানন্দ চারযুগই অধিকার ক'রে নিয়েছেন। সবচেয়ে আশ্চর্য, চৈতন্যসমকালে নবদ্বীপলীলার পার্ষদ অভিরাম সুন্দরানন্দ প্রভৃতি নীলাচললীলায় চারসখারূপে আবির্ভূত হয়েছেন—অচ্যুতানন্দের এই ঘোষণা—

'শ্রীচৈতন্য কলিযুগে কৃষ্ণ হেলে জাত। তাঙক সঙ্গে চারিসখা হোইলু যে জাত।
অনন্ত যে শিশু অভিরাম পুণ হোই। গউরীদাস পণ্ডিত বলরাম কহি।
সুবাহু অটন্তি পুণ উদ্ধব যে দণ্ড। সুন্দরানন্দ যে মুহি অটই অচ্যুত। ৩৬-৩৮
[গুরুভক্তি গীতা : প্রথম খণ্ড, দ্বাত্রিংশ ছান্দ]

পারিষদবর্গ নিয়ে বাঙ্গালী লেখকদের মধ্যে মিল নেই; ওড়িয়া লেখকদের পারিষদ-তালিকার সঙ্গে বঙ্গীয় তালিকারও মিল নেই। ঈশ্বরদাসের চৈতন্যভাগবতে প্রদত্ত তালিকাটি নিম্নরূপ :—

মহেশ—উদ্দত্ত। রাধা—অদ্বৈত। ব্রহ্মা—হরিদাস। পবন—অভিরাম। বৎস—গোপাল। কুবের—সুন্দরানন্দ। অর্জুন—গৌরদাস পণ্ডিত। ইন্দ্র—পুরুষোত্তম দাস। বিশ্বকর্মা—লবঙ্গ। বরুণ—পরমেশ্বর দাস। সূর্য—বিশ্বম্ভর দাস। চন্দ্র—সিদ্ধবল। অগ্নি—সারঙ্গ ব্রহ্মা। মার্কণ্ড—বক্রেশ্বর। গাগ্রব—বৃন্দাবন। কৃপাচার্য্য—বংশীবদন। নারদ—শ্রীনিবাসাচার্য্য। জনক—গদি দাস। সনাতন—রাঘো পণ্ডিত। হনুমান—মুরারি দাস। গরুড়—শঙ্কর ঘোষ। ব্যাস—সার্বভৌমাচার্য্য। বলরাম—নিত্যানন্দ।

পঞ্চসখা : দাম—অনন্ত। সুদাম—অচ্যুত। সুবাহু—যশোবন্ত। সুবল—বলরাম। শ্রীবৎস—জগন্নাথ।

কবি কর্ণপুরের 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' মতে শ্রীদাম—অভিরাম। সুদাম—সুন্দর ঠাকুর। রঘুদাস—ধনঞ্জয় পণ্ডিত। সুবল—গৌরীদাস পণ্ডিত। মহাবল—কমলাকর পিপ্পলাই। সুবাহু—উদ্ধারণ। মহাবাহু—শ্রীমান সাহস পণ্ডিত।

স্পষ্টতঃ নবদ্বীপলীলার এই 'গোপাল' বা সখাদের পাশাপাশি অচ্যুতানন্দ ও ঈশ্বরদাস নীলাচললীলার সখাদের তালিকা স্বতন্ত্রভাবে নির্মাণ করেছেন। অচ্যুতানন্দ একেবারে অন্যদিকে গিয়েছেন। চৈতন্যদেবের অন্তর্ধানের কিছু পরেই কি উৎকল এবং বঙ্গীয় বৈষ্ণবদের সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল ?

অবতারের কারণ এবং তাঁর স্বর্গ থেকে নেমে আসা পারিষদবর্গ নিয়ে যে অমিল, তা থেকে একথা মনে করার কারণ আছে যে, এই সমস্ত পরিকল্পনাই পরবর্তীকালের। তারই ফলে লেখকদের ইচ্ছামত পৃথক পৃথক সিদ্ধান্ত দেখছি আমরা।

এবার শ্রীচৈতন্যের আচার-আচরণ কার্যকলাপ এবং বক্তব্য থেকে কি পাওয়া যায় তা বিচার ক'রে দেখা যাক। বৃন্দাবনদাসকে দিয়েই আরম্ভ করা যাক। তিনি জানাচ্ছেন যে একদিন গোপাল মন্ত্রের উপাসক এক ব্রাহ্মণ এলেন জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে—তখন নিমাইও শিশু। এই বিপ্র যতবার গোপালের উদ্দেশ্যে ভোগ নিবেদন করেন, ততবারই নিমাই এসে সেই ভোগ খেতে আরম্ভ করেন—নিমাইকে দুয়ার বন্ধ ক'রে ঘরে রাখা সত্ত্বেও ভোগ নিবেদন করা মাত্র এসে খেতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে নিমাই বিপ্রকে নিজ স্বরূপ প্রদর্শন করলেন—

সেই ক্ষণে দেখে বিপ্র পরম অদ্ভুত।
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, অষ্টভুজ-রূপ ॥
এক হস্তে নবনীত, আর হাতে খায়।
আর দুই হস্তে প্রভু মুরলি বাজায় ॥ [চৈ. ভা. পৃ. ২৪-২৫]

অষ্টভুজ মূর্তি দেখালেন বটে, সেই সঙ্গে সাবধান ক'রে দিলেন—

কহিলাঙ তোমারে সকল গোপ্য কথা।
কারো স্থানে ইহা নাহি কহিব সর্বথা ॥

যাবত থাকয়ে মোর এই অবতার।
তাবত কহিলে কারে করিব সংহার॥ [তদেব. পৃ. ২৫]

মুরারি কাব্যে তৈর্থিক বিপ্রের অন্ন গ্রহণের উল্লেখ মাত্র আছে—
তীর্থ ভ্রমণ শীলস্য দ্বিজস্যান্নং জনার্দনঃ।
ভুক্ত্বা তং স্মারয়ামাস নন্দগেহকুতূহলম্॥ [১।৬।৮]

অষ্টভুজ রূপের কোন উল্লেখ নেই। একমাত্র বৃন্দাবন দাসই একথা শুনিয়েছেন। স্বভাবতঃ প্রশ্ন উঠবে, অষ্টভুজ-রূপ দেখানই বা কেন, দেখালে আবার সংহার করার ভয় প্রদর্শন কেন? তাছাড়া এই গোপ্য কথা বিপ্র তো কাউকে বলেন নি। বৃন্দাবনদাস তা জানলেন কি ক'রে?

এ ধরনের কাহিনী সৃষ্টিতে উৎকলের ঈশ্বরদাস অনেককেই ছাড়িয়ে গেছেন। মধ্যযুগের উড়িষ্যার বৈষ্ণবদের যোগাদি পদ্ধতির সঙ্গে নাথদের কিছু কিছু মিল ছিল। অতএব তিনি এক নতুন কাহিনী উপস্থিত করলেন—গোরক্ষনাথ বিড়ালের রূপ ধরে শিশু চৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন নবদ্বীপে। চৈতন্যের ভুক্তাবশেষ আস্বাদন করাই ছিল তাঁর ইচ্ছা। অন্তর্যামী মহাপ্রভু সবই জানিতে পেরে বিড়ালটিকে তাঁর ভোজ্যান্ন খেতে দিলেন। গোরক্ষনাথ তার এক অংশ নিজে খেয়ে বাকী অংশ অন্যান্য সিদ্ধদের জন্য নিয়ে গেলেন, (ওড়িয়া চৈতন্যভাগবত, একাদশ অধ্যায়)। এ ধরনের বিচিত্র কাহিনীর সমাবেশ ক'রে চৈতন্যদেবকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন অবতার রূপে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করতে গিয়ে জীবনীকাররা তাঁর প্রকৃত চরিত্রের মহিমা ম্লান ক'রেই ফেলেছেন।

সমস্ত জীবনীকাররাই বলেছেন যে তিনি ভাবাবেশে বিষ্ণুখট্টায় গিয়ে বসতেন। কিন্তু তাঁর বিরাট দেহের কথাও সর্বজন স্বীকৃত—
দৈর্ঘ্য-বিস্তারে যেই আপনার হাতে।
চারি হস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাতে॥ [চৈ. চ. পৃ. ৮]

জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই লোচনদাস নবজাতকের যে দেহ বর্ণনা দিয়েছেন তা নিশ্চিতরূপে অবিশ্বাস্য—বিশ্বম্ভরের যৌবনের দেহ বর্ণনা এসে গেছে নবজাতকের মধ্যেই—
সিংহ-গ্রীব গজ-স্কন্ধ বিশাল হৃদয়।
আজানুলম্বিত ভুজ তনু রসময়॥
বিশাল নিতম্ব—উরু-কদলীর যেন। [চৈ. ম. পৃ. ৩৮]

ভাবের আবেশে সকলের অলক্ষিতে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়াটা কাল্পনিক হলেও চৈতন্য-দেবের দেহের বর্ণনায় জালয়ার বিস্ময়টি লক্ষণীয়—

কিবা ব্রহ্মদৈত্য কিবা ভূত কহনে না যায়।
দর্শনমাত্রে মনুষ্যের পৈশে সেই কায়॥
শরীর দীঘল তার হাত পাঁচ সাত।
এক এক হস্তপদ তার তিন তিন হাত॥ [চৈতন্য চরিতামৃত]

এমন বিরাট পুরুষটিকে বিষ্ণুখট্টায় বসিয়ে দেওয়া সম্ভব কি? বৈষ্ণবদের ঘরে ঘরে যে বিষ্ণুখট্টা থাকে তাতে কি কোন শিশুও বসতে পারে এ সবই কি মায়া? বিষ্ণুখট্টায়

বসতে যেতেই মচ্‌মচ্‌ শব্দ ওঠে। নিত্যানন্দ তাড়াতাড়ি ধরতে যান। ভগবান মায়ার দ্বারা না হয় খট্টায় বসলেন, কিন্তু তাঁকে অবতার জেনেও নিত্যানন্দের ভয়টা কি?

মড়-মড় করে খট্টা বিশ্বম্ভর-ভরে।
আথে-ব্যথে নিত্যানন্দ খট্টা স্পর্শ করে॥ [চৈ. ভা. ঃ পৃ. ১৪৪]

এ ধরনের বহু বিষয় আছে যা স্বতঃবিরোধী।

শচী-জগন্নাথ ঘরে নূপুরের ধ্বনি শোনেন—পুত্রের পায়ে তো নূপুর নেই, তবে?

মিশ্র বোলে "কোথা শুনি নূপুরের ধ্বনি?"
চতুর্দিকে চাহে দুই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী॥
আমার পুত্রের পায়ে নাহিক নূপুর।
কোথায় বাজিল বাদ্য নূপুর মধুর॥ [তদেব ঃ পৃ. ২]

দেখা যাচ্ছে শচী-জগন্নাথ নিমাইকে শ্রীকৃষ্ণ অথবা কোন মহাপুরুষ ব'লে মনে করেছেন—

এথা শচী জগন্নাথ মনে মনে গণে॥
... .
এ বুঝি মনুষ্য নহে শ্রীবিশ্বম্ভর।
মায়া-রূপে কৃষ্ণ বা জন্মিলা মোর ঘর॥
কোন মহাপুরুষ বা কিছুই না জানি।
হেনমতে চিন্তিতে আইলা দ্বিজমণি॥ [তদেব ঃ পৃ. ২৯]

অথচ দেখা যাচ্ছে নানা জনের কাছে অভিযোগ শুনে পিতা পুত্রকে তাড়না করেছেন। বিশ্বরূপের ন্যায় পাছে সংসার ত্যাগ ক'রে যায় সেই ভয়ে বিদ্যালয়ে যাওয়াই দিচ্ছেন বন্ধ ক'রে। তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে, গোপাল-উপাসকের নিবেদিত ভোগ খাওয়া সত্ত্বেও, নিজ বক্ষে ব'সে শিশু নিমাই জগদীশ পণ্ডিত এবং হিরণ্য ভাগবতের বিষ্ণুর জন্য সাজান নৈবেদ্য দেখতে পেয়ে তা খেতে চাইলেও, ঘরে নূপুরের শব্দ শুনলেও, গঙ্গাস্নানের পর তার কোন চিহ্ন দেহে বা বস্ত্রে না থাকা সত্ত্বেও, শচী-জগন্নাথের কাছেও অবতার হয়ে উঠতে পারেন নি নিমাই, রয়ে গেছেন মানবসন্তান।

নবদ্বীপবাসীদের কাছেও তিনি অবতার রূপে যে সমকালে পরিচিত ছিলেন না তার পরিচয় দেবে তাঁর জীবনী গ্রন্থগুলো। ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে নবদ্বীপে প্রথম সাক্ষাতের পর এবং লক্ষ্মীপ্রিয়ার সঙ্গে বিবাহের পর নিমাই পণ্ডিত হুঙ্কার-গর্জন আরম্ভ করেন। বৃন্দাবনদাস তাকে 'আপনা প্রকাশ প্রভু করে বায়ু ছলে' বললেও নিমাইয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সহপাঠীরা, যাঁরা নিজেরাও তখন অধ্যাপক, তাঁর বায়ু কুপিত ব'লে 'বিষ্ণু তৈল দেন শিরে' [তদেব ঃ পৃ. ৫৬]। নবদ্বীপবাসীরা মনে করলেন—

কেহো বোলে "হইল দানব অধিষ্ঠান।"
কেহো বোলে "হেন বুঝি ডাকিনীর কাম॥"
কেহো বোলে "সদাই করেন বাক্য ব্যয়।
অতএব হৈল বায়ু জানিহ নিশ্চয়॥"
এইমত সর্বজনে করেন বিচার। [তদেব]

আমাদের সর্বজনের মনোভাবটাই প্রয়োজন। তাঁরা আর যাই মনে করুন, নিমাই পণ্ডিতকে

অবতার ব'লে মনে করেন নি। লোচনদাস জনসাধারণের কথা বিশেষ বলেন নি: অদ্বৈত আচার্যের মুখে পাষণ্ডীর কথা শোনা গেছে [চৈ. ম. পৃ: ১০৪]। আর একবার দেখা গেল ক্রন্দনরত জনগণকে। নাচতে নাচতে গোরাচাঁদ শ্রীবাসকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছেন, তখন—

সবজন উপজিল অন্তরে ত্রাস।
কান্দয়ে সকল লোক গুণয়ে হুতাশ ॥
ভূমিতে লোটাঞা কান্দে—স্থির নাহি বান্ধে।
নদীয়ার লোক সব গুণ ঝুরি কান্দে ॥ [তদেব : পৃ. ১১৫]

কিন্তু এ ক্রন্দন অবতার বোধ থেকে নয়: অবতার ব'লে বিশ্বাস থাকলে অদৃশ্য হওয়ার জন্য ক্রন্দনের কোন কারণই থাকতো না। জগাই-মাধাইয়ের আক্রমণে যখন নিত্যানন্দর মাথা দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়তে থাকে তখন গৌরহরির 'সর্ব নিজগণ হাহাকার করে' [তদেব : পৃ. ১১৯]—কিন্তু গৌরহরিকে অবতার ব'লে মনে করলে হাহাকার করার কারণ কি?

চৈতন্যচরিতামৃতে শেষপর্যন্ত স্বরূপ গোঁসাঞি চৈতন্যদেবকে রাত্রে পাহারা দেবার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর মুখের ক্ষত দেখে স্বরূপ স্থির থাকতে পারেন নি। মনে মনে তিনি তাঁকে অবতার ভাবতে পারেন কিন্তু সাধারণ মানব হিসাবেই তাঁকে না দেখে পারেন নি। বিশ্বাস এক জিনিস আর প্রেমের প্রকাশ অন্য প্রকার।

চৈতন্যদেব যদি তাঁর প্রকটকালে সর্বতোভাবে অবতার রূপেই পরিচিত থাকতেন তবে তাঁর কোন প্রকার নিন্দা হওয়াই সম্ভব নয়—সব কিছুই অবতারের লীলা ব'লেই লোকে মনে করতো। কিন্তু নীলাচলে অবস্থিতি কালে শ্রীচৈতন্যের অন্যতম প্রিয় পার্ষদ দামোদর পাণ্ডতের কথায় তা মনে হয় না। দামোদর তাঁর 'ঈশ্বরের' জন্য চিন্তিত পাছে কেউ নিন্দা করে, তার জন্য ভাবিত। মনে হয় তাঁর উদ্বেগের কারণ ঘটেছিল। কিন্তু বিষয়টা এমনই যা অবতারের পক্ষে উদ্বেগের কারণ হওয়া উচিত নয়। চৈতন্যচরিতামৃত বলছেন—

পুরুষোত্তমে এক উড়িয়া ব্রাহ্মণকুমার।
পিতৃশূন্য মহাসুন্দর মৃদু ব্যবহার ॥
প্রভুস্থানে নিত্য আইসে করে নমস্কার।
প্রভুসনে বাত কহে প্রভু প্রাণ তার ॥
প্রভুতে তাহার প্রীতি প্রভু দয়া করে।
দামোদর তার প্রীতি সহিতে না পারে ॥ [চৈ. চ. : পৃ. ৪৪৬]

ব্রাহ্মণকুমারের প্রতি দামোদরের এটা ঈর্ষার পরিচয় নয়—এটা 'প্রভু'র নিন্দার সম্ভাবনার জন্য উদ্বেগ: দামোদর নিজের মনোভাব গোপন করলেন না—

সহিতে না পারি দামোদর কহিতে লাগিলা ॥
অন্যোপদেশে পণ্ডিত কাহাঁ গোসাঞির ঠাঞি।
গোসাঞি গোসাঞি এবে জানিব গোসাঞি ॥ [তদেব]
এবে গোসাঞির গুণ সব লোকে গাইবে।
গোসাঞির প্রতিষ্ঠা সব পুরুষোত্তমে হৈবে ॥

শুনি প্রভু কহে কাঁহা কহ দামোদর।
দামোদর কহে তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥
মুখর জগতের মুখ পার আচ্ছাদিতে।
স্বচ্ছন্দ আচার কর কে পাবে বলিতে ॥
পণ্ডিত হইয়া মনে কেন বিচার না কর।
রাণ্ডী ব্রাহ্মণীর বালকে প্রীতি কেনে কর ॥
যদ্যপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতী।
তথাপি তাহার দোষ সুন্দরী যুবতী ॥
তুমিহ পরম যুবা পরম সুন্দর।
লোক-কাণাকাণি বাতে দেহ অবসর ॥ [তদেব : পৃ. ৪৪৭]

লোক-কাণাকাণি কি আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল? না, দামোদর পণ্ডিতের মনে সন্দেহ জেগেছিল যে, লোক-কাণাকাণি হতে পারে? কাণাকাণি অথবা সম্ভাব্য কাণাকাণির ভয় কোনটাই চৈতন্যদেবকে অবতারের প্রতিষ্ঠা দেয় না।

অর্থাৎ চৈতন্যের প্রকটকালে তাঁর ভক্ত অনুরাগীরা তাঁর দিব্য মানবীয় মূর্তিটি প্রত্যক্ষ ক'রেই মুগ্ধ হয়েছিলেন, তাঁকে তাঁরা বাস্তবের মানুষ হিসাবেই দেখেছিলেন, অবতারত্বের অলৌকিক মহিমার চেয়ে সেই বাস্তব সংস্পর্শজনিত সৌভাগ্যের মহিমা কম ছিল না।

আর একটি প্রসঙ্গের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ ক'রে এ প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানতে চাই। আমরা দেখেছি যে, স্ত্রী-শূদ্র সকলকেই উদ্ধার করতে চৈতন্যদেবকে অনুরোধ করেছিলেন অদ্বৈত আচার্য। চৈতন্যদেব সেই কার্যেই জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এ কাজ সাধন করার জন্য কাউকে অবতার হয়ে উঠতে হয় না। নবদ্বীপবাসীরা সাধারণভাবে চৈতন্যদেবকে অবতার ব'লে না মনে করলেও বৈষ্ণব অনুরাগীরা সে কথা মনে করতে পারেন। কিন্তু এ বিষয়েরও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং চৈতন্যচরিতামৃতে অনেক বৈষ্ণব প্রধানের কথাবার্তা-আচার থেকে মনে হয় যেন তাঁরা শ্রীচৈতন্যকে উচ্চবর্ণের কুলীন ব্রাহ্মণ রূপেই দেখেছেন। প্রথমেই আমরা হুসেন শাহের কর্মচারী রূপ-সনাতনের কথায় আসি। রামকেলিতে প্রথম সাক্ষাতে তাঁরা বলছেন—

নীচজাতি নীচসঙ্গী করি নীচ কাজ।
তোমারে অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ ॥ [তদেব : পৃ. ১০৫]

দুই ভাই-ই চৈতন্যদেবকে দৈন্যপত্রী লিখেছিলেন ব'লে তিনি এসেছিলেন রামকেলিতে। অবতারের কাছে নীচজাতি বা নীচ কর্ম করার তো কোন অপরাধ নেই—অবতার ব'লে বিশ্বাস করলে এ প্রকার কথা বলা সম্ভব নয়। হতে পারে যে চৈতন্যদেবের অবতারত্বের সংবাদ তখনও তাঁদের কাছে গিয়ে পৌঁছয় নি—তাহলে বুঝতে হবে যে, সন্ন্যাস নেবার পরেও তাঁর অবতার রূপে ধরাতলে আগমনের কথা বঙ্গদেশের মানুষ জানতো না। নীলাচলেও একবার চৈতন্যদেবের সঙ্গে সনাতনের সাক্ষাৎ হয় সেখানেও তিনি বলেন—

মোরে না ছুঁইবে প্রভু পড়োঁ তোর পায়।
একে নীচজাতি অধম আর কণ্ডুরসা গায় ॥ [তদেব : পৃ. ৪৬৩]

'কণ্ডুরসা গায়' ব'লে বাধা দিতে পারেন, কিন্তু নিজেকে নীচজাতি অধম ব'লে

অবতারকে স্পর্শ করতে বাধা দেওয়া চলে কি? সাধক যবন হরিদাসও চৈতন্যদেবকে বলেছেন—

হরিদাস কহে মুঞি পাপিষ্ঠ অধম।
বাহিরে এক মুষ্ঠি পাছে করিব ভোজন॥ [তদেব ঃ পৃ. ১২৫]

অবতার ব'লে স্বীকৃতির লক্ষণ এখানেও তো দেখা গেল না। সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে তো চৈতন্যদেব নিজের শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ঐশ্বর্য মূর্তি দেখিয়েছেন কিন্তু তাঁরই বা বিশ্বাস কোথায়? দক্ষিণ ভারতের পথে যখন শ্রীচৈতন্য যাত্রা করেন তখন তিনি তাঁকে ব'লে দেন গোদাবরী তীরবর্তী স্থানের গজপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্রের প্রশাসক রায় রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে—

শূদ্র বিষয়ী জ্ঞানে তারে উপেক্ষা না করিবা।
আমার বচনে তারে অবশ্য মিলিবা॥ [তদেব ঃ পৃ. ১৭১]

'বিষয়ী জ্ঞানে' পর্যন্ত হলে চলতো। কিন্তু সার্বভৌম ইচ্ছাকৃত ভাবেই 'শূদ্র' কথাটা ব্যবহার করেছেন ঃ 'শূদ্র' কথাটা বাদ দিলে পদের পংক্তির সম অক্ষর অর্থাৎ চৌদ্দ অক্ষর ঠিক বজায় থাকে। সেই মিলকে তুচ্ছ ক'রেও কবিরাজ গোস্বামী 'শূদ্র' কথাটার ব্যবহার করেছেন—'অবতার' বিষয়ীর থেকে দূরে থাকতে পারেন, কিন্তু শূদ্রের কাছ থেকে কখনও নয়। তত্ত্বজ্ঞানী রায় রামানন্দের মুখেই বা কি শোনা গেল?—

সার্বভৌমে তোমার কৃপা তার এই চিহ্ন।
অস্পৃশ্য স্পর্শিলে হঞা তাঁর প্রেমাধীন॥ [তদেব ঃ পৃ. ১৭৯]

হরিদাসের মুখে আরও একবার শোনা গেল—

হরিদাস কহে প্রভু না ছুঁইহ মোরে।
মুঞি নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে॥ [তদেব ঃ পৃ. ২৩৯]

কৃষ্ণদাস কবিরাজের সংকালে চৈতন্য প্রচারিত জাতিভেদহীন বৈষ্ণবতার সঙ্গে সামাজিক মর্যাদা তথা ব্রাহ্মণ্য কৌলীন্যের যে একটা অদ্ভুত মিশ্রণ ঘটেছিল, এ সব হয়ত তারই প্রমাণ।

কিন্তু কৃষ্ণদাসের কাব্যেই দেখা যায়, এই পরমকুলীন ব্রাহ্মণ সন্তানটি অবতার রূপে পূজিত হতে চান নি। তিনি যে এই পূজার আড়ম্বরের বিরোধী ছিলেন, তার প্রমাণ আছে চৈতন্যচরিতামৃতেই—ভক্তবৃন্দের উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে তর্ক সৃষ্টি করা তাঁর রুচিতে নিশ্চয়ই বাধতো, তা সত্ত্বেও তিনি যথেষ্ট বিরক্তি প্রকাশ করেছেন—

'একদিন শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
মহাপ্রভুর গুণ গাঞা করেন কীর্তন॥
শুনি ভক্তগণে প্রভু কহে ক্রোধমনে।
কৃষ্ণনাম-গুণ ছাড়ি কি কর কীর্তনে॥ [তদেব ঃ পৃ. ১১০]

আর একবার, চৈতন্য বৃন্দাবনে এসেছেন, শুনলেন কালিয়দহে রাত্রিবেলা কৃষ্ণ দেখা দিচ্ছেন—

লোক কহে—কৃষ্ণ প্রকট কালিদহের জলে।
কালি শিরে নৃত্য করে ফণি রত্ন জ্বলে॥ [চৈ. চ. ঃ পৃ. ৩০৫].

সঙ্গী বলভদ্র ভট্টাচার্য 'কৃষ্ণ' দেখতে যাবার অনুমতি চাইল। চৈতন্য তাকে চাপড় মেরে বললেন, 'মূর্খের বাক্যে মূর্খ হৈলা পণ্ডিত হঞা'। পরদিন সকালেই প্রকৃত তথ্য জানা গেল—

লোক কহে রাত্র্যে কৈবর্ত্ত্য নৌকাতে চড়িয়া।
কালিদহে মৎস্য মারে, দেউটি জ্বালিয়া॥ [তদেব]

ভ্রান্তি দূর হলে লোকেরা চৈতন্যকে বলল, 'বৃন্দাবনে হৈলে তুমি কৃষ্ণ অবতার'। তখন—

প্রভু কহে বিষ্ণু বিষ্ণু ইহা না কহিহ।
জীবাধমে কৃষ্ণজ্ঞান কভু না করিহ॥
সন্ন্যাসী চিৎকণ জীব কিরণকণ মম।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম॥ [তদেব : পৃ. ৩৩৬]

শ্রীচৈতন্যের এই উপদেশে তাঁর ভক্তরা কর্ণপাত করেন নি। কিন্তু চৈতন্যের জীবৎকালে তাঁর সাধারণ অনুরাগীরা যে তাঁকে মানুষ হিসাবেই দেখেছে, তার প্রমাণ এখানে আছে। বৃন্দাবন ভ্রমণের সঙ্গী বলভদ্র চৈতন্যকে 'কৃষ্ণ' জ্ঞান করলে তাঁর কাছেই 'কৃষ্ণ' দেখতে যাবার অনুমতি চাইতেন না।

চৈতন্যদেবের সমকালে তিনি যে অবতার ব'লে পরিচিত ছিলেন না তার আরও অনেক পরোক্ষ প্রমাণ আছে চরিত গ্রন্থগুলোতেই। বিশ্বম্ভর আবেশ বশে বহুস্থানেই নিজেকে 'মুঞি সেই' ব'লে দাবী করেছেন: আবিষ্ট অবস্থায় তাঁর মুখে কয়েকবার শোনা গেছে—

"মুঞি কলিযুগে কৃষ্ণ, মুঞি নারায়ণ।
মুঞি রামরূপে কৈল সাগরবন্ধন॥
শুতিয়া আছিলুঁ ক্ষীরসাগর-ভিতরে।
মোর নিদ্রা ভাঙ্গিলেক নাঢার হুঙ্কারে॥
প্রেমভক্তি বিলাতেই মোহোর প্রকাশ। [চৈ. ভা. : পৃ. ২০৯]

এ সব কথা প্রমাণ করে না যে, বিশ্বম্ভরের অবতার-খ্যাতি সেকালে প্রচারিত হয়েছিল: প্রচারিত হলে বিশ্বম্ভরের মুখে এ সব কথা বলাবার প্রয়োজনও হতো না। পাষণ্ডীদের আচরণে সে কালে বৈষ্ণবরা খুবই ক্ষুব্ধ ছিলেন; তাঁদের উদ্ধারের জন্য শ্রীকৃষ্ণ-অবতার হবেই এমন বিশ্বাস তাঁদের মধ্যে জন্মান খুবই স্বাভাবিক ছিল। চৈতন্য-পূর্ব নবদ্বীপের বৈষ্ণব নেতা অদ্বৈত আচার্য তাই ভক্তদের আশ্বাস দেবার জন্য বলেছিলেন—

"শুন শ্রীনিবাস! গঙ্গাদাস! শুক্লাম্বর!
করাইব কৃষ্ণ সর্ব-নয়ন-গোচর॥
সভা উদ্ধারিব কৃষ্ণ আপনে আসিয়া।
বুঝাইব কৃষ্ণভক্তি তোমা সভা লৈয়া॥ [তদেব : পৃ. ১২]

আর যদি কৃষ্ণকে অবতার রূপে পৃথিবীতে না আনতে পারেন তবে আচার্য নিজেই কৃষ্ণমূর্তি ধারণ ক'রে পাষণ্ডী দলন করবেন—

যবে নাহি পারো তবে এই দেহ হৈতে।
প্রকাশিয়া চারি ভুজ, চক্র লইমু হাতে॥
পাষণ্ডীরে কাটিয়া করিমু স্কন্ধ-নাশ।
তবে কৃষ্ণ প্রভু মোর মুঞি তাঁর দাস॥ [তদেব]

নারায়ণের অবতার না হয়েও অবতার হওয়া তাহলে কি সম্ভব! আচার্যের এই বক্তব্যের তাৎপর্য অন্যভাবে গ্রহণ করা যেতে পাবে। এই পৃথিবীতে ইচ্ছাশক্তির জোরে মানুষ দুর্জয় শক্তিব অধিকারী হতে পারেন—উঠতে পারেন মানব-কল্পিত ভগবানের পর্যায়ে!

বিশ্বম্ভর যখন পিতৃপিণ্ড দানের উদ্দেশ্যে গয়ায় গেছেন তখনও তাঁর কোন অলৌকিক কার্য নবদ্বীপে প্রচারিত হয় নি—বৈষ্ণবমহলও তাঁকে অবতাব ব'লে প্রচার করেন নি। বৈষ্ণব মহলে অবতার ব'লে প্রচার থাকলে গয়াতে কি ঈশ্বরপুরী তাঁকে 'পণ্ডিত' ব'লে সম্বোধন করতে পারতেন?—

বোলেন ঈশ্বরপুরী "শুনহ পণ্ডিত!
তুমি যে ঈশ্বর-অংশ অতি সুনিশ্চিত॥
যে তোমার পাণ্ডিত্য, যে চরিত্র তোমার।
সেহো কি ঈশ্বর-অংশ বই হয় আর? [তদেব : পৃ. ৮৯]

একালেও এ ধরনের পাণ্ডিত্য দেখা গেলে বলা হয় 'জিনিয়াস' (প্রতিভা)—ঈশ্বর প্রদত্ত গুণে। তার অর্থ ঈশ্বর হওয়া নয়। ঈশ্বরকে মানুষ সর্ব বিষয়ে 'চরম' এবং 'পরম' ব'লে কল্পনা করেছে ব'লেই মহৎ ভাবের প্রকাশে ঈশ্বরের উপমা দেওয়া হয়ে থাকে। বিশেষ, ভক্ত-সন্ন্যাসী ঈশ্বর-পুরীর পক্ষে এর থেকে সুন্দরতম উপমা আর কি দেওয়া সম্ভব ছিল।

অভিষেক অন্তে বৈষ্ণব সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণের পর, জগাই-মাধাই এবং কাজী-দমনের পরেও চৈতন্যদেবের অবতার-ব্যক্তিত্ব প্রচারিত হয় নি তারও প্রমাণ আছে প্রধান চরিত গ্রন্থে। বৃন্দাবনদাস বলেছেন যে, চৈতন্যদেব একসময় গোপী ভাবে আবিষ্ট হয়ে তাঁদেব বেদনা দেবার জন্য কৃষ্ণের ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। কৃষ্ণকে তিনি দস্যু ব'লে নিন্দা করলেন, রামকে বললেন অন্যায়কারী। জনৈক পড়ুয়া তাঁকে কৃষ্ণনাম করতে বলায় তিনি তাকে দণ্ড হাতে তাড়িত করেন: ভক্তরা শান্ত করলেন তাঁকে—পড়ুয়া গিয়ে উপস্থিত হলো অন্য পড়ুয়াদের নিকটে, তার কথা শুনে—

কেহো বোলে "এত বা সম্ভ্রম কেনে করি।
আমরা কি ব্রাহ্মণের তেজ নাহি ধরি॥
তেঁহে সে ব্রাহ্মণ, আমরা কি বিপ্র নহি।
তেঁহে মারিতে বা আমরা কেনে নহি॥ [তদেব : পৃ. ২৩৬]

কৃষ্ণদাস কবিরাজও এই কাহিনীর কথা বলেছেন। শিষ্যটির কথা শুনে অন্যান্য শিষ্যরা চৈতন্যদেবের নিন্দা করতে লাগলো—

সভে মেলি তবে করে প্রভুর নিন্দন॥
সব দেশ ভ্রষ্ট কৈল একলা নিমাই।

ব্রাহ্মণ মারিতে চাহে ধর্মভয় নাই ॥
পুন যদি ঐছে করে মারিব তাহারে।
কোন বা মানুষ হয় কি করিতে পারে ॥ [চৈ. চ. ঃ পৃ. ৯৬]

অবতার ব'লে প্রচার থাকলে বিশ্বম্ভরের পড়ুয়া বা শিষ্যরা এরূপ বাক্য প্রয়োগ করতে পারতো ? চৈতন্যচরিতামৃতে শিষ্যরা তো 'মানুষ' কথাটা স্পষ্ট রূপেই উল্লেখ করেছে।

সে যুগে চৈতন্যদেবকে যে অবতার ব'লে সমস্ত বৈষ্ণব সমাজও গ্রহণ করেন নি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণও আছে চৈতন্যভাগবত এবং চৈতন্যচরিতামৃতে। অলৌকিক এবং অতি বিশ্বাস-জাত কাহিনীগুলো বাদ দিলে চৈতন্যভাগবতকে মোটামুটি তথ্যনিষ্ঠ বলা যেতে পারে। চৈতন্যভাগবতকার বেদনার সঙ্গেই জানিয়েছেন যে, অদ্বৈত ভক্তরা দুটো ভাগে বিভক্ত ছিলেন—এক গোষ্ঠি অদ্বৈতকে ভক্তি করার সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যদেবকেও ভক্তি করতেন কিন্তু অপর গোষ্ঠি কেবল অদ্বৈতকেই মানতেন, চৈতন্যদেবকে তাঁরা স্বীকার করেন নি—

এইমত অদ্বৈতের চিত্ত না বুঝিয়া।
বোলায় 'অদ্বৈতভক্ত'—চৈতন্য নিন্দিয়া ॥
না বোলে অদ্বৈত কিছু স্বভাব-কারণে।
না ধরে বৈষ্ণববাক্য মরে ভাল মনে ॥
যাহার প্রসাদে অদ্বৈতের সর্ব-সিদ্ধি।
হেন চৈতন্যের কিছু না জানয়ে শুদ্ধি ॥
ইহা বলিতেই আইসে ধাইয়া মারিবারে।
অহো মায়া বলবতী !—কি বলিব তারে ॥
প্রভুর যে অলঙ্কার—ইহা নাহি জানে।
অদ্বৈতের প্রভু গৌর—ইহা নাহি মানে ॥ [চৈ. ভা. ঃ পৃ. ১৫৬]

অদ্বৈতের ওপরও সম্ভবতঃ কেউ কেউ সন্দিহান ছিলেন ; বৃন্দাবনদাস সে সন্দেহ অপনোদন করতেও চেয়েছেন—

'সভার ঈশ্বর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর'।
এ কথায় অদ্বৈতের প্রীতি বহুতর ॥
অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ সকল কথা।
ইহাতে সন্দেহ কিছু না কর সর্বথা ॥ [তদেব]

একদিন আচম্বিতে চৈতন্যদেব নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে প্রচারে বের হবার জন্য আদেশ দিলেন—এ আদেশ অমান্য করার সাধ্য ছিল না কারও। বৃন্দাবনদাস ব'লে বসলেন, "ইহাতে অপ্রীত যার, সে সুবুদ্ধি নহে।" [তদেব ঃ পৃ. ১৬৫]। তবে কি 'অপ্রীত' ছিলেন কেউ কেউ ? ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই বৃন্দাবনদাস বললেন—

করয়ে অদ্বৈত-সেবা চৈতন্য না মানে।
অদ্বৈতেই তারে সংহারিব ভাল মনে ॥ [তদেব ঃ পৃ. ১৬৫]

অদ্বৈত আচার্যকে প্রচারের দায়িত্ব না দিয়ে নিত্যানন্দকে সে ভার দেওয়ায় অদ্বৈত ভক্তগণ ক্ষুব্ধ হতে পারেন। অদ্বৈত আচার্য নিজেই এ সমস্যা সমাধান ক'রে দেবেন

এ বিশ্বাস যে, বৈষ্ণব ভক্তদের ছিল তাও বোঝা যায় বৃন্দাবনদাসের কথায়। তা সত্ত্বেও স্পষ্ট বোধগম্য হলো যে অদ্বৈত ভক্তদের একটা অংশ শ্রীচৈতন্যকে মানতেন না।

তাত্ত্বিক কৃষ্ণদাস কবিরাজের কাছেও আমরা এ সংবাদ পেয়েছি। কৃষ্ণদাস বলেছেন—

বৃক্ষের দ্বিতীয় স্কন্ধ আচার্য গোসাঞিঞ।
তাঁর যত শাখা হৈল তার লেখা নাঞিঞ॥
প্রথমে ত একমত আচার্যের গণ।
পাছে দুই মত হৈল দৈবের কারণ॥ [চৈ. চ.: পৃ. ৫৮]

কবিরাজ গোস্বামীর কথা থেকে এখনও স্পষ্ট হলো না যে, আচার্যের জীবৎকালেই এই 'দুইমত' হয়েছিল কিনা এবং অপর মতটাই বা কি? কিন্তু কিছু পরেই আবার তিনি লিখেছেন—

মালীদত্ত জল অদ্বৈতস্কন্ধ যোগায়।
সেই জলে জীয়ে শাখা ফুলফল পায়॥
ইহার মধ্যে জানি পাছে কোন শাখাগণ।
না মানে চৈতন্য মালী দুর্দৈব কারণ॥
যে জন্মাইল জীয়াইল তাঁরে না মানিল।
কৃতঘ্ন হইল তারে স্কন্ধ ক্রুদ্ধ হইল॥
ক্রুদ্ধ হঞা স্কন্ধ তারে জল না সঞ্চারে।
জলাভাবে কৃশ শাখা শুখাইয়া মরে॥ [তদেব: পৃ. ৬২]

এবাবে অনুমান করা যেতে পারে যে, অদ্বৈতের জীবৎকালেই তাঁর গোষ্ঠির এক অংশ চৈতন্য বিরোধিতা আরম্ভ করেছিলেন এবং আচার্যের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন তাঁরা।

কবিরাজ গোস্বামী আরও লিখেছেন—

চৈতন্যরহিত দেহ শুষ্ক কাষ্ঠ সম।
জীয়ন্তেই মরা সেই দণ্ডে তারে যম॥
কেবল এ গণ প্রতি নহে এই দণ্ড।
চৈতন্য-বিমুখ যেই সেই ত পাষণ্ড॥
কি পণ্ডিত কি তপস্বী কিবা গৃহী যতী।
চৈতন্য-বিমুখ যেই তার এই গতি॥ [তদেব: পৃ. ৬৩]

অর্থাৎ সেকালে চৈতন্য-বিমুখদের মধ্যে অদ্বৈতের 'গণ'-এর একটা অংশ মাত্রই ছিলেন তা-ই নয়, পণ্ডিত-তপস্বী-যতিদেরও একটা অংশ ছিলেন। বৃন্দাবনদাস এবং কৃষ্ণদাসের মন্তব্য থেকে এটাও অনুমিত হয় যে, তাঁদের সমকাল পর্যন্ত চৈতন্য-বিরোধী তপস্বী-পণ্ডিতের অভাব ছিল না। নারায়ণের অবতার ব'লে যদি চৈতন্যদেব বিশেষ পূজিত হতেন তবে এটা সম্ভব হতো কি? সকল বৈষ্ণবও তাঁকে স্বর্গ থেকে নেমে আসা অবতার ব'লে যে, স্বীকার করেন নি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এর ফলে চৈতন্যদেবের মহত্ত্ব বৃদ্ধিই পেয়েছে। বৈকুণ্ঠের ঈশ্বর তো সবই করতে পারেন—চৈতন্যদেব বৈকুণ্ঠের ঈশ্বর হলে তাঁর কর্মকাণ্ডের কোন বিশেষ তাৎপর্য

থাকতো না। হিন্দুরা আর এক প্রকার অবতারে বিশ্বাসী—তাঁরা মনে করেন যে, মহৎ কার্যের দ্বারা মানুষ কল্পিত ভগবানের পর্যায়ে উন্নীত হন। এও হিন্দুর দৃষ্টিতে অবতারই বটে! চৈতন্যদেবকে সেই ধরনের অবতার বলা যেতে পারে। নিজের দূরদৃষ্টি, নেতৃত্ব এবং সমাজ সচেতনতা তাঁর হৃদয়ে যে সর্বব্যাপী প্রেমের সঞ্চার করেছিল, তাই ছিল তাঁর কর্মকাণ্ডের মূল প্রেরণা। তার এই কর্মকাণ্ডই তাঁকে ঈশ্বরের পর্যায়ে উন্নীত করেছিল এবং সেই অর্থেই তিনি অবতার!

আমরা মহামানব যুগন্ধর পুরুষ চৈতন্যদেবের মহান কর্ম-প্রচেষ্টাকে অনুধাবন করতে চাই। সেই আজানুলম্বিত বাহু, বিশাল হৃদয়, নিজ হাতের চার হাত পরিমাণ দীর্ঘ দেহ, সিংহগ্রীব সিংহরাশি এবং সিংহ লগ্নে জাত ব্যক্তিত্বের সন্ধান করতে চাই।

দুই বাহু তুলে নৃত্যরত গৌর-নিতাইয়ের যে চিত্র দেখতে আমরা অভ্যস্ত, সেই চিত্র আমাদের চিত্তকে বিভ্রান্ত করেছে—সেই বিরাট দেহী তেজস্বী মানুষটিকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি। বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ বাঙালীকে আচ্ছন্ন করেছে—কিন্তু যে শ্রীকৃষ্ণ হেলায় কংসবধ করেছিলেন, মহাভারতের সেই রাজনীতি-দক্ষ উষ্ণশির শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ না করলে অর্ধেক শ্রীকৃষ্ণকে জানা হবে। আমরা অর্ধেক চৈতন্যকেও জানতে চাই না। পরিপূর্ণ মানুষটিকে জানাই সত্য জানা।

বীর্যবান মহামানব চৈতন্যদেব সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ যা বলেছিলেন সে কথা এখানে স্মরণ করি—

"একবার মাত্র এক মহতী প্রতিভা সেই 'অবিচ্ছিন্ন পরিচ্ছেদক' জাল ছেদন করিয়া উত্থিত হইয়াছিলেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। একবার মাত্র বঙ্গের আধ্যাত্মিক তন্দ্রা ভাঙ্গিয়াছিল। কিছুদিনের জন্য উহা ভারতের অপরাপর প্রদেশের ধর্ম জীবনের সহভাগী হইয়াছিল।"

এই আধ্যাত্মিক তন্দ্রা ভাঙ্গাবার জন্য বিধর্মী রাজশক্তির ধর্মের ওপর আক্রমণকেও প্রতিহত করার প্রচেষ্টা চালাতে হয়েছে সেই মহামানবকে। মুসলমান রাজশক্তির অনাচারের সঙ্গে মুসলমান সুফীদের প্রেম প্রচার, হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য স্থাপনের প্রাণপাত প্রচেষ্টা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। ধর্মে ধর্মে বিরোধ নেই, মানুষে মানুষে বিরোধ নেই, বিরোধ সৃষ্টি করে শক্তির দম্ভ এবং তারই উস্কানী। এই শিক্ষাকে সম্মুখে রেখে কর্মে অবতীর্ণ হয়েছিলেন শ্রীচৈতন্য।

সে বিষয়ে কিছু ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করা হবে এই গ্রন্থে। ভবিষ্যৎ গবেষকরা সত্যের অনুসন্ধান করবেন এটাই আমাদের বিশ্বাস। সে যুগ ভারতের গৌরবের যুগ—উত্তর ভারত এবং পঞ্জাবে রামানন্দ, কবীর, নানক, রবিদাস, দাদু, রজ্জব মীরাবাঈ প্রভৃতি, বঙ্গে শ্রীচৈতন্য এবং আসামে শঙ্করদেব যে ধ্বনি তুলেছিলেন তা মানবতা প্রতিষ্ঠার ধ্বনি, ঐক্যের ধ্বনি—ভারতের জনচিত্ত উদ্বুদ্ধ করার ধ্বনি। ভারত ব্যাপী সেই ধ্বনির স্পষ্টরূপ আবিষ্কার করার দায়িত্ব গবেষকদের—এ দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া মহাপাপ।

৮. বিশ্বরূপ ঃ বৈষ্ণবদের সমস্যা

অগ্রজ বিশ্বরূপের সামনে বিশ্বম্ভরের সমস্ত ক্রোধ শান্ত হয়ে যায়। অপূর্ব সুন্দর দর্শন তিনিও, সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত—কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ। চৈতন্যভাগবত বলেন—

প্রভুর অগ্রজ—বিশ্বরূপ ভগবান্।
আজন্ম বিরক্ত সর্ব-গুণের নিধান॥
সর্বশাস্ত্রে সভে বাখানে বিষ্ণু-ভক্তি।
খণ্ডিতে তাঁহার ব্যাখ্যা নাহি কারো শক্তি॥
শ্রবণে, বদনে, মনে, সর্বেন্দ্রিয়গণে।
কৃষ্ণভক্তি বিনে আর না বোলে না শুনে॥ [চৈ. ভা. ঃ পৃ. ৩০]

এ হেন বিশ্বরূপ, বিশ্বম্ভরের আচার-আচরণ দেখে তাকে বালগোপাল-এর ন্যায় মনে করেন—

অনুজের দেখি অতি বিলক্ষণ রীত।
বিশ্বরূপ মনে গণে হইয়া বিস্মিত॥
এ বালক কভো নহে প্রাকৃত ছাওয়াল।
রূপে আচরণে যেন শ্রীবালগোপাল॥ [তদেব]

যে বালক ঘর-দোর ভাঙে, দুর্বিনীত আচরণ করে তাকে বালগোপাল মনে করার কারণ কি? শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালে ননী-সর চুরি করেছে বটে কিন্তু ঘর-দ্বার ভাঙে নি। বয়স্কদের গায়ে 'কুল্লোল' দেয় নি কখনো।

বিশ্বরূপ অদ্বৈতের গৃহে যেতেন কৃষ্ণকথা আলোচনা করতে। আলোচনায় এমনই মগ্ন হয়ে যেতেন তিনি যে, আহারের কথাও যেতেন ভুলে। তাঁর ব্যাখ্যা শুনতে অন্যান্য বৈষ্ণবরা খুব ভালবাসতেন। তাই তাঁরাও ছাড়তে চাইতেন না তাঁকে। তাই প্রতিদিনই আহারের সময় শচীমাতা তাঁকে ডেকে আনতে পাঠিয়ে দিতেন নগ্ন দেহ বিশ্বম্ভরকে—

দিগম্বর সর্ব অঙ্গ ধূলায় ধূসর।
হাসিয়া অগ্রজ প্রতি বলেন উত্তর॥
"ভোজনে আইস ভাই! ডাকয়ে জননী!"
অগ্রজ বসন ধরি চলয়ে আপনি॥ [তদেব ঃ পৃ. ৩১]

অপরূপ রূপবান দুই ভ্রাতার গমনপথের দিকে ভক্তগণ চেয়ে থাকেন। অপূর্ব দৃশ্যই বটে! মনে মনে অদ্বৈত আচার্য ভাবেন—

মনে মনে চিন্তয়ে অদ্বৈত মহাশয়।
"প্রাকৃত মানুষ কভু এ বালক নয়।
সর্ব-বৈষ্ণবের প্রতি বলিলা অদ্বৈত।
"কোনো বস্তু এ বালক জানিহ নিশ্চিতে॥ [তদেব]

গৌরাঙ্গের রূপ দেখে আশাবাদী অদ্বৈতের এ ভাব হতে পারে ঃ সুতরাং বিশ্বম্ভরের

এ বয়স পর্যন্ত এমন কোন কার্য লক্ষ্য করা সম্ভব নয় যাকে অলৌকিক বলা চলে। তৈর্থিক ব্রাহ্মণ, হিরণ্য ভাগবত প্রভৃতি ঘটনা যে কল্পিত, তা একালে অদ্বৈত মনের সন্দেহ থেকেও বোধগম্য হয়।

বিশ্বরূপ সংসারে বিরত ছিলেন। তাই নিজের বিবাহের কথা কাণাঘুষা হতেই তিনি সংসার ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস নিলেন। জানা গেছে যে, এই সন্ন্যাস জীবনে তাঁর নাম হয় শংকরারণ্য। তিনি অবতার কল্পনায় একটা সমস্যা সৃষ্টি করেছেন। শ্রীচৈতন্য যদি শ্রীকৃষ্ণ হন, তবে বলরামের অবতীর্ণ হওয়া উচিত ছিল বিশ্বরূপ রূপে। শচীমাতা তো যুগে যুগে অবতারের মাতা রূপেই এসেছেন ধরাধামে। জগন্নাথ মিশ্র সম্বন্ধেও কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—

জগন্নাথ মিশ্রবর পদবী পুরন্দর।
নন্দ-বাসুদেবরূপ সদ্‌গুণসাগর।। [চৈ. চ. : পৃ. ৬৭]

সুতরাং সহজ হিসাবে বিশ্বরূপকে বলরাম না ব'লে উপায় কি? অন্যদিকে, বলরাম শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই ছিলেন সমগ্র লীলায় কিন্তু বিশ্বরূপ তো চলে গেছেন—সে স্থান অধিকার করেছেন নিত্যানন্দ। তাই অবতার প্রমাণের উদ্দেশ্য যে-জীবনীকারদের, তাঁরা সমস্যায় পড়ে গেলেন। তাত্ত্বিক কৃষ্ণদাস কবিরাজকে বলতেই হলো শচী জগন্নাথের সঙ্গে মিলিয়ে—

পুত্র লাগি আরাধিলা বিষ্ণুর চরণ।।
তবে পুত্র উপজিলা বিশ্বরূপ নাম।
মহাগুণবান্ তেঁহো বলদেবধাম।।
বলদেব-প্রকাশ পরব্যোম সঙ্কর্ষণ।
তেঁহো বিশ্বের উপাদান-নিমিত্ত কারণ।।
তাঁহা বিনা বিশ্বে কিছু বস্তু নাহি আর।
অতএব বিশ্বরূপ নাম যে তাঁহার।।
অতএব প্রভুর তেঁহো হৈল বড় ভাই।
কৃষ্ণ বলরাম দুই চৈতন্য নিতাই।। [তদেব : পৃ. ৬৮]

কবিরাজ গোস্বামীর কাছে বিশ্বরূপ তো বলরাম হয়ে উঠেছেন। তাহলে নিত্যানন্দ কি হবেন? চৈতন্যভাগবতও স্পষ্ট ক'রেই বলেছেন—

অবতরিবারে প্রভু করিলা উদ্যোগ।।
ঈশ্বর-আজ্ঞায় আগে শ্রীসঙ্কর্ষণ।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ নাম।। [চৈ. ভা : পৃ. ১২]

বৃন্দাবন দাস অন্যত্র বলেছেন—সহস্রেক ফণধর প্রভু বলরাম [তদেব : পৃ. ২] এবং—

'দ্বিজ' 'বিপ্র' 'ব্রাহ্মণ' যেহেন নাম-ভেদ।
এইমত 'নিত্যানন্দ' 'অনন্ত' 'বলদেব'।। [তদেব : পৃ. ৫]

বৃন্দাবনদাস এবং কবিরাজ গোস্বামীকে মেলালে মনে হয় যে, যিনি বিশ্বরূপ তিনিই নিত্যানন্দ। নিত্যানন্দ আবার সহস্রফণা অনন্ত নাগ—প্রলয় কালে এই অনন্ত নাগ বা

শেষ নাগে ভাসমান থাকেন বিষ্ণু। অনন্ত অর্থাৎ যার সীমা নেই—যা চিরকালীন। পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার পরও তা টিঁকে থাকে, সেটাই শেষ বা অবশিষ্ট। এই চিরকালীন অবশিষ্ট বস্তু থেকে আবার নূতন সৃষ্টি হয়। সর্পকে বস্তুর প্রতীক বলা হয়। প্রলয়ের পর বিশ্বে আর কোন বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না। সুতরাং তা বিশ্বরূপও বটে। বৈষ্ণব ভক্তরা বিশ্বরূপকেই নিত্যানন্দ ক'রে ফেলেছেন। অন্যথায় সমস্যা দেখা দিত।

লোচনদাসও অনন্ত নাগকে বলরামের অংশ রূপেই দেখিয়েছেন—

সেই প্রভু বলরাম, নিজ অংশে তিন ঠাম,
রহি করে কৃষ্ণের পীরিতি।
আদ্য, মধ্য আর অন্ত, যার অংশ অনন্ত,
এক-ফণার ধরি রহে ক্ষিতি ॥ [সূত্রখণ্ড : চৈ. ম. পৃ. ৩২]

মুরারি গুপ্তও তাঁর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের ১ম প্রক্রম ৪র্থ সর্গে নিত্যানন্দকে বলদেব বলেছেন।

কি উপায়ে শঙ্করারণ্য নিত্যানন্দ হলেন তা বোধগম্য হলো না। অথচ বিশ্বরূপকে নিত্যানন্দের থেকে আলাদা ক'রে ফেললে অবতার প্রতিষ্ঠায় অসুবিধা সৃষ্টি হয়। তাই প্রধান জীবনীকাররা স্পষ্ট না ক'রে নিজেদের প্রয়োজন সাধন করেছেন। কোন রকমে মিলিয়ে দেবার চেষ্টায় বৃন্দাবনদাস যা বলেছেন তাও বোধগম্য হয় নি—

হেনমতে বিশ্বরূপ হইলা বাহির।
নিত্যানন্দ স্বরূপের অভেদ শরীর ॥ [চৈ. ভা. : পৃ. ৩২]

বিশ্বরূপের সন্ন্যাস গ্রহণের পর : বিদ্যারম্ভ—দুরন্তপনা :

নিত্য সঙ্গী, জীবনের আদর্শ দাদার সন্ন্যাস গ্রহণের বেদনা বিশ্বম্ভর সহ্য করতে পারে নি—

ভাইর বিরহে মূর্চ্ছা গেলা গৌর-রায় ॥
সে বিরহ বর্ণিতে বদনে নাহি পারি। [তদেব]

জগন্নাথ-শচীর অবস্থাও হয় শোচনীয়। বন্ধুরা আশ্বাস দিয়ে বললেন সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে বিশ্বরূপ বংশ উদ্ধার ক'রে গেছেন—

গোষ্ঠিয়ে পুরুষ যার করয়ে সন্ন্যাস।
ত্রিকোটি-কুলের হয় শ্রীবৈকুণ্ঠ বাস ॥ [তদেব]

শচী-জগন্নাথকে বিশ্বম্ভরের ওপর নির্ভর করতে বললেন সবাই—"ইহা হৈতে সর্ব-দুঃখ ঘুচিবে তোমার" [তদেব]।

লোচনদাস বলেছেন, বিশ্বরূপের সন্ন্যাস গ্রহণের ফলে শচী-জগন্নাথ মূর্ছিত হন, পরে জগন্নাথ মিশ্র নিজেকে সংযত ক'রে শচীদেবীকে সংযত হবার উপদেশ দিয়ে বলেন—

শোক না করিহ অকারণ।
একটি সন্ন্যাস করে, কোটি কুল নিস্তারে,
বিশ্বরূপ পুরুষরতন ॥ [চৈ. মা. : পৃ. ৫৫]

লোচনের বিশ্বম্ভর মূর্ছিত হয় নি ঃ বালক কিছু অনুমান ক'রে বিষাদাচ্ছন্ন জননীর কোলে এসে বসেছে। আশ্বাস দিয়েছে পিতা-মাতাকে—

বিশ্বম্ভর হেনকালে, বসিয়া মায়ের কোলে,
নেহারয়ে বাপের বয়ান।
কতি গেলা মোর ভ্রাতা, শুন শুন পিতা মাতা,
আমি তোর করিব পালন ॥ [তদেব]

বৃন্দাবনদাসে দেখা যায় যে, বিশ্বরূপের সন্ন্যাস গ্রহণের পরি বিশ্বম্ভর কিছুটা সুস্থির হয়ে লেখাপড়ায় মন দিল—

খেলা সংবরিয়া প্রভু যত্ন করি পড়ে।
তিলার্ধেকো পুস্তক ছাড়িয়া নাহি নড়ে ॥
একবার যে সূত্র পড়িয়া প্রভু যায়।
আরবার উলটিয়া সভারে ঠেকায় ॥ [চৈ. ভা. ঃ পৃ. ৩৩]

পুত্রের গুণ দেখে মাতা সুখী হলেও পিতা চিন্তিত হলেন। অত্যধিক বিদ্যার্জনের ফলেই তো বিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করেছেন, শেষ অবলম্বন বিশ্বম্ভরের তাহলে লেখা-পড়ায় কাজ কি ? জগন্নাথ পুরন্দর নিমাইকে জানিয়ে দিলেন—

মিশ্র বোলে "শুন বাপ ! আমার উত্তর ॥
আজি হইতে আর পাঠ নাহিক তোমার।
ইহাতে অন্যথা কর, শপথ আমার ॥ [তদেব ঃ পৃ. ৩৪]

শচীর আপত্তি সত্ত্বেও বিশ্বম্ভরের পড়া বন্ধ করলেন জগন্নাথ। লোচনে ঠিক বিপরীত কথা আছে। শচীদেবী বলছেন, "না পড়ুক পুত্র মোর হউক মুরুখ"—সক্রোধে জগন্নাথ মিশ্র উত্তর দিলেন, "মুরুখ হইলে পুত্র জীবেক কেমনে"। [চৈ. ম. ঃ পৃ. ৫৭] পুত্রকে পড়াশুনা করার জন্য মিশ্র অনেক উপদেশ দিলেন ; রাত্রে অলৌকিক স্বপ্ন দেখলেন, স্বপ্নে জানলেন যে, বিশ্বম্ভরই ভগবান। এই স্বপ্ন-কাহিনী চৈতন্যভাগবতে অন্য সূত্রে আছে। সেখানে দেখা যায় যে, পিতা পুত্রকে ধর্ম উপদেশ দেবার পর রাত্রে এইরূপ স্বপ্ন দেখেন।

পিতা লেখাপড়ায় উৎসাহ দেবেন এটাই স্বাভাবিক, সেদিক থেকে লোচনদাসই অধিকতর গ্রহণযোগ্য হলেও পরবর্তী ঘটনাগুলো বৃন্দাবনদাসের বক্তব্যের সঙ্গে মেলে। তাই বৃন্দাবন দাসকেই আমরা গ্রহণ করলাম।

পড়া বন্ধ হওয়ায় নিমাইয়ের দুর্দান্ত এবং দুর্বিনীত স্বভাব প্রকাশ পেল, রাত্রে অনেক সময় সে গৃহেও ফিরতো না তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। তারপর উচ্ছিষ্ট হাঁড়ির ওপর বসে সে তার পড়াশুনার দাবী স্বীকার করিয়ে নিয়েছে ; হাঁড়ির সিংহাসন থেকে নামার শর্ত—

প্রভু বোলে "যদি মোরে না দেহ পড়িতে।
তবে মুঞি নাহি যাও কহিলুঁ তোমাতে ॥" [চৈ. ভা. ঃ পৃ. ৩৫]

প্রতিবেশী নারীরাও তাড়না করলেন শচীমাতাকে—

সভে বোলে "কেনে নাহি দেহ পড়িবারে ?
যত্ন করি কেহ নিজ বালক পড়ায়।

কত ভাগ্যে আপনে পাঢ়িতে শিশু চায় ॥
কোন্ শত্রু হেন বুদ্ধি দিল বা তোয়ারে।
ঘরে মূর্খ করি পুত্র রাখিবার তরে ?" [তদেব]

জেদী ছেলেরই জয় হলো শেষ পর্যন্ত। এই জেদ, এই দৃঢ়তা উত্তরকালে চৈতন্য-চরিত্রে সর্বত্র প্রতিফলিত হয়েছে। রাজশক্তির বিরোধিতা করাও তাই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। বর্তমান কালের রাজনৈতিক আন্দোলনে যে, ধর্মঘট-অবস্থান-অনশন সমস্ত করা যায় তা নিমাইয়ের উচ্ছিষ্ট হাঁড়ির সিংহাসনে বসে অসহযোগ আন্দোলন থেকেই শক্তি গ্রহণ করেছে।

যাই হোক, নিমাই খুশী হলেন, পিতা তার পড়ার দাবী মেনে নিয়েছেন—

পঢ়িতে পাইলা প্রভু বাপের আদেশে।
হইলেন মহাপ্রভু আনন্দ-বিশেষে ॥ [তদেব]

পড়ার সুযোগ পাবার পর বেশ একটা পরিবর্তন দেখা গেল বিশ্বম্ভরের জীবনে। জ্ঞান আহরণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি পড়লো তার। ঠিক এই সময় উপনয়ন হলো নিমাইয়ের —শুভ দিনে যজ্ঞ সূত্র ধারণ করলো সে। একেই বলে দ্বিজ হওয়া, অর্থাৎ দ্বিতীয় বার জন্ম গ্রহণ—উচ্চলোকে যাত্রার ব্যবস্থা।

রীতিমত বিদ্যাভ্যাসের জন্য মিশ্র নিমাইকে নিয়ে গেলেন বৈয়াকরণ গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে। শিষ্যের রূপ দেখে গঙ্গাদাস আগ্রহের সঙ্গে তাকে বিদ্যা দিতে লাগলেন। নিমাই দ্রুত শিখে চললো, কিছুদিনের মধ্যে গুরুকেও ডিঙিয়ে গেল—

গুরুর যতেক ব্যাখ্যা করেন খণ্ডন।
পুনর্বার সেই ব্যাখ্যা করেন স্থাপন ॥ [তদেব ঃ পৃ. ৩৬]

সেকালের গুরু সন্তুষ্ট হলেন—শ্রেষ্ঠ ছাত্রের সম্মান পেল বিশ্বম্ভর।

লোচনদাস বলেছেন যে, জগন্নাথ মিশ্রের দেহত্যাগের পর শচীদেবী পুত্রকে বিভিন্ন পণ্ডিতের হাতে সমর্পণ করেন জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে—

একদিন শচী করে ধরি গৌরহরি।
পঢ়িতে গৌরাঙ্গ দিলা নিয়োজিত করি ॥
সকলপণ্ডিত স্থানে পুত্র সমর্পিয়া।
বোলয়ে কাতরে দেবী বিনয় করিয়া ॥
পঢ়াইও মোর পুত্রে তোমরা ঠাকুর!
রাখিবে আপন কাছে—না রাখিবে দূরে ॥ [চৈ. ম. ঃ পৃ. ৬৩]

কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বৃন্দাবনদাসকে অনুসরণ ক'রেই বলেছেন—

পৌগন্ড-বয়সে প্রভুর মুখ্য অধ্যয়ন।
গঙ্গাদাস-পন্ডিত স্থানে পড়ে ব্যাকরণ ॥ [চৈ. ম. ঃ পৃ. ৭৮]

বৃন্দাবনদাস এবং লোচনদাস উভয়ের কথাই সত্য ব'লে মনে করা যেতে পারে। লোচনদাস আরও দুজন অধ্যাপকের নাম করেছেন যাঁদের কাছে নিমাই পড়তে যেতেন—

তবে আর কথোদিনে প্রভু বিশ্বম্ভর।
পঢ়িবারে গেলা বিষ্ণুপণ্ডিতের ঘর ॥

সুদর্শন আর গঙ্গাদাস যে পণ্ডিতে।
পঢ়িলা জগত-গুরু তা সভার হিতে ॥ [চৈ. ম. ঃ পৃ. ৬৩-৬৪]

জয়ানন্দও সুদর্শন পণ্ডিত এবং গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কথা বলেছেন—

আর দিন প্রভাতে বালক সব সঙ্গে।
সুদর্শন পাত্রের বাড়ি গেলা নিজ রঙ্গে ॥ [চৈ ম. ঃ পৃ. ২২]
মিশ্র পুরন্দর গৌরচন্দ্র হাথে ধরি।
গঙ্গাদাস পণ্ডিতেরে সমর্পণ করি ॥ [তদেব ঃ পৃ. ২৪]

বিশ্বম্ভর সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হয়েছিলেন, সুতরাং একাধিক পণ্ডিত-অধ্যাপকের কাছে পাঠ গ্রহণ করেছিলেন একথা বিশ্বাস করাই স্বাভাবিক।

বিশ্বম্ভর অল্পদিনেই পণ্ডিত হয়ে উঠলেন। একবার পড়লেই তাঁর সব জানা হয়ে যায় ঃ টীকা-ব্যাখ্যায় সে সকলকে ছাড়িয়ে গেল। গুরুর ব্যাখ্যাও সহজেই সে খণ্ডন করে এবং স্থাপন করে।

বিভিন্ন গুরুর অসংখ্য শিষ্য পড়াশুনা অন্তে প্রতিদিন গঙ্গাস্নানে যায়। বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত শিষ্যদের মধ্যে কলহ বাধে, গুরুদের নিয়েও কটাক্ষ চলে। নিমাই তো সব ব্যাপারেই প্রথম সারির নেতা—কলহের অন্যতম পাণ্ডা। ছেলের দলের মারামারি, কাদা ছোঁড়া-ছুঁড়িতে গঙ্গার জল যায় ঘোলাটে হয়ে। নারীরা জল নিতে পারেন না; বয়স্ক ব্রাহ্মণদের পক্ষে স্নান করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

দুঃসাহসী বিশ্বম্ভর গঙ্গার ঘাটে ঘাটে সাঁতরে বেড়ায়; তর্কাতর্কি, বিবাদ এমন কি ধাক্কাধাক্কি করতে তার খুবই মজা লাগে—আবার হঠাৎ ডুব সাঁতারে চলে যায় বহু দূর : সেকালের প্রশস্ত গঙ্গা পারাপার করে নিঃশঙ্ক চিত্তে।

একদিন নৈবেদ্য এবং পান খেয়ে অচেতন হয়ে পড়ে বালক—অনেক চেষ্টার পর মাতা-পিতা তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনেন। উঠে বসে বিশ্বম্ভর স্বপ্নের কথা বলে, দাদা বিশ্বরূপ তাকে সন্ন্যাস নিতে বলছিলেন কিন্তু সে যেতে চায় নি, গৃহে থেকে মাতা পিতার সেবা করবে সে ঃ সেকথা শুনে মাতাকে প্রণাম জানিয়ে চলে যান বিশ্বরূপ।

এ ব্যাপারটাকে অলৌকিক ভাববার কারণ নেই। বর্তমান কালের মনস্তাত্ত্বিক ফ্রয়েড বলেন, অবদমিত চিন্তা স্বপ্নের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায়। ইয়ুংও বলেছেন, স্বপ্নের ভিতর দিয়ে অনেক সময়েই মানুষ তার ভবিষ্যৎ দেখে। সুতরাং এই স্বপ্ন বিশ্বম্ভরের মনের কথাই প্রকাশ করেছে এবং তার ভবিষ্যৎ জানিয়েছে।

জগন্নাথ মিশ্রও একদিন নিমাই-এর সন্ন্যাস গ্রহণের স্বপ্ন দেখলেন। এই স্বপ্ন নিশ্চয়ই তাঁর মনের ভিতরকার গোপন ভয়েরই প্রকাশ। মিশ্র পুরন্দর আর বেশীদিন বাঁচলেন না। শচীদেবীর আশ্বাস সত্ত্বেও মিশ্রের মনে হয়তো পুত্র বিরহ বেদনা জেগে উঠেছিল, তাই পৃথিবী ছেড়ে বিদায় নিলেন তিনি। চৈতন্য-জীবনীকাররা খুব অল্প কথায় জগন্নাথ-তিরোধানের সংবাদ জানিয়েছেন। লোচনদাস বলেছেন—

ঘরেরে আইলা জগন্নাথ দ্বিজমণি ॥
দৈবনির্বন্ধে তার জ্বর আইল দেহে।
বিপরীত জ্বর দেখি তরাস উঠায়ে ॥
শচীর কান্দনা অতিব্যাকুল দেখিয়া।
প্রবোধ করেন প্রভু তত্ত্ব বুঝাইয়া ॥ [চৈ. ম. ঃ পৃ. ৬২]

যে তত্ত্ব নিমাই বোঝালেন সে তত্ত্ব সকলেই জানে। অবতার প্রমাণের জন্য জীবনীকাররা যে-কোন সুযোগ গ্রহণ করতে চান।

চৈতন্যচরিতামৃত একটি পংক্তিতে জগন্নাথ মিশ্রের তিরোধানের সংবাদ জানিয়েছেন এবং আর তিনটি পংক্তিতে শ্রাদ্ধক্রিয়া পর্যন্ত শেষ ক'রে দিয়েছেন—

কত দিন রহি মিশ্র গেলা পরলোক।
মাতা-পুত্র দোঁহার বাড়িল বড় শোক ॥
বন্ধু বান্ধব আসি দোঁহা প্রবোধিল।
পিতৃক্রিয়া বিধিমতে, ঈশ্বর করিল ॥ [চৈ. চ. : পৃ. ৭৯]

লোচন বলেছেন, মিশ্রের অন্তর্ধানে শচীদেবী শোকাভিভূত হয়ে পড়লে বিশ্বম্ভর তাঁকে তত্ত্ব বোঝান—বৃন্দাবনদাস বলেছেন জগন্নাথের দেহরক্ষার ফলে বিশ্বম্ভর অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়ে—শচীদেবী জীবনরক্ষা করেন পুত্রের মুখ চেয়ে; কোন তত্ত্ব কথাই শোনা যায় নি বিশ্বম্ভরের মুখে—

হেনমতে কথোদিন থাকি মিশ্রবর।
অন্তর্ধান হইলা নিত্য-সিদ্ধ কলেবর ॥
মিশ্রের বিজয়ে প্রভু কান্দিলা বিস্তর। [চৈ. ভা. : পৃ. ৩৮ [

জীবনীকারদের মধ্যে বহু পার্থক্য দেখা যায়। গৌর-পারিষদ বা ভক্তদের কাছ থেকেও একপ্রকার সংবাদ জানা যায় নি। সুতরাং তাঁরা যে অনেক ভুল সংবাদ পরিবেশন করেছেন এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

পুত্র যৌবনে পদার্পণ করেছে; শচীমাতা স্বভাবতই তার বিয়ের কথা ভাবতে লাগলেন। বৃন্দাবনদাস বলেছেন—

কিছুমাত্র দেখি আই পুত্রের যৌবন।
বিবাহের কার্য মনে চিন্তে অনুক্ষণ॥ [চৈ. ভা. ঃ পৃ. ৪৮]

কিন্তু অনুক্ষণ চিন্তা করলেও শচীমাতা কি নিজে থেকে লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে পুত্রের বিয়ে দেবার বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন? বিয়ের চিন্তা অনুক্ষণ করলে বনমালী আচার্যের আনা সম্বন্ধটির বিষয়ে এমন নীরস ভাবটি দেখালেন কেন তিনি? বৃন্দাবন-দাসের কথায়—

তান কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়া রূপে শীলে মানে।
সে সম্বন্ধ কর যদি ইচ্ছা হয় মনে।।" [তদেব ঃ পৃ. ৪৯]

শচীমাতা কি উত্তর দিলেন?

আই বোলে "পিতৃহীন বালক আমার।
জীউক পড়ুক আগে তবে কার্য আর।।" [তদেব]

শচীদেবীর কথায় কোন রস পেলেন না ঘটক বনমালী আচার্য। পুত্রের বিবাহেব জন্য অনুক্ষণ ভাবনা এবং বনমালীকে দেওয়া উত্তর মিলিয়ে দুটো সিদ্ধান্ত করা চলে—(১) লক্ষ্মীর সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দেবার ইচ্ছা ছিল না মাতার, (২) পুত্রের কাছ থেকেই এ বিয়েব ইঙ্গিত তিনি আশা করছিলেন। এই দুই বিপরীত মনোভাবের থেকেও একই সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, বাল্যকাল থেকেই লক্ষ্মী ও নিমাই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট ছিল এবং সে সংবাদ খুব অজানাও ছিল না। প্রায় সমস্ত জীবনীকারের বক্তব্যই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে সাহায্য করে। পাঁচশত বৎসর পূর্বে পাঁচশত বৎসর পরবর্তীকালের যুগমানস নিয়ে একটি বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব জন্মগ্রহণ করেছেন ভাবতেও বিস্মিত হতে হয়।

বহু পুরাকালে স্বয়ম্বর সভায় স্বামী বেছে নেবার প্রথা ছিল। কিন্তু সেটা ছিল শৌর্য-বীর্য-রূপের গলায় মালা দিয়ে বরণ; কিন্তু এক্ষেত্রে কেবল রূপের প্রতি আকর্ষণ মাত্র নয়—এ দুরন্ত-দুর্জয়-মেধাবী বালকের প্রতি একটি বালিকার স্বাভাবিক আকর্ষণ এবং দুরন্ত-দুঃসাহসী বালকের শান্তশ্রীর প্রতি মুগ্ধ দৃষ্টির ফলশ্রুতি।

কবিরাজ গোস্বামী একটি ইঙ্গিত করেছেন—

পৌগণ্ড-বয়স যাবৎ বিবাহ না কৈল।
বিবাহ করিলে হৈল নবীন যৌবন॥ [চৈ. চ. ঃ পৃ. ৬৫]
[বিবাহ করিল হৈলে নবীন যৌবন (?)]

'বিবাহ হৈল' না ব'লে কৃষ্ণদাস 'করিল' কথাটি প্রয়োগ করেছেন। এতে সন্দেহ হয় যে, বিবাহে নিমাইয়ের নিজস্ব কিছু করণীয় ছিল।

বিভিন্ন জীবনীকার লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে নিমাইয়ের বিবাহ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন চিত্র অঙ্কিত করলেও বিবাহে যে উভয়েরই একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল তা কেউ গোপন রাখেন নি অথবা রাখতে পারেন নি। কৃষ্ণদাস কবিরাজ যা বলেছেন তা আমরা পূর্বে আলোচনা

করলেও আর একবার এই বিশেষ ক্ষেত্রে তা স্মরণ করা যেতে পারে। গঙ্গার ঘাটে পূজারত বালিকাদের প্রতিদিনই বিরক্ত করতো নিমাই—সকলেরই নৈবেদ্য খেয়ে ফেলত সে, সন্তুষ্ট হলে ইচ্ছামত বর দান করতো; কাউকে আবার বিয়ে করার কথাও ব'লে বসতো। কিন্তু লক্ষ্মীদেবীর কাছে সে ছিল বেশ সংযত; লক্ষ্মীও তাকে স্বচ্ছন্দ মনেই গ্রহণ করেছিল—অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় ঘটনাটা সম্ভবত একদিনের মাত্র—

একদিন বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মী নাম।
দেবতা পূজিতে আইলা করি গঙ্গাস্নান॥
তারে দেখি প্রভু হৈল সাভিলাষ মন।
লক্ষ্মী প্রীতি পাইল পাই প্রভুর দর্শন॥
প্রভু কহে আমা পূজ আমি মহেশ্বর।
আমাকে পূজিলে পাবে অভীপ্সিত বর॥
লক্ষ্মী তাঁর অঙ্গে দিল সপুষ্প চন্দন।
মল্লিকার মালা দিয়া করিল বন্দন॥ [তদেব : পৃ. ৭৬]

লক্ষ্মীর এই প্রীতিলাভ এবং নিমাইকে বন্দনা করা নিছক আকস্মিক ব্যাপার ব'লে মনে হয় না।

পরবর্তী পর্যায়ে কৃষ্ণদাস বলেছেন—পিতৃশ্রাদ্ধের পর (অবশ্যই গয়া গমনের পূর্বে) বিশ্বম্ভর ভাবলেন—

কতদিনে প্রভু চিত্তে করিলা চিন্তন।
গৃহস্থ হইলাম (হইবাম ?) এবে চাহি গৃহধর্ম॥
গৃহিণী বিনা গৃহধর্ম না হয় শোভন।
এত চিন্তি বিবাহ করিতে হৈল মন॥
দৈবে একদিন প্রভু পড়িয়া আসিতে।
বল্লভাচার্যের কন্যা দেখে গঙ্গাপথে॥
পূর্বসিদ্ধ ভাব দোঁহার উদয় করিল।
দৈবে বনমালী ঘটক শচী স্থানে আইল॥
শচীর ইঙ্গিতে সম্বন্ধ করিল ঘটন।
লক্ষ্মীকে বিবাহ কৈল শ্রীশচীনন্দন॥ [তদেব : পৃ. ৭৯]

বৃন্দাবনদাস বা লোচনের শচীদেবী যে ইতস্তত ভাবটি দেখিয়েছেন কবিরাজ গোস্বামীর শচীমাতা তা করেন নি।

বৃন্দাবনদাস লক্ষ্মী-বিশ্বম্ভরের সাক্ষাৎ ঘটিয়েছেন যে কালে সে কালে বিশ্বম্ভর অধ্যাপনা করছেন। কৃষ্ণদাস উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটিয়েছেন বাল্যে কিন্তু বিবাহ দিয়েছেন বিশ্বম্ভরের যৌবনে। বৃন্দাবনদাসের বক্তব্যকে কৃষ্ণদাসের বক্তব্যের দ্বিতীয় পর্যায় ব'লে ধরে নিলে ধারাবাহিকতা থাকে। বাল্যে উভয়ের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ (কৃষ্ণদাস) —বিশ্বম্ভরের যৌবনে এবং লক্ষ্মীর কৈশোরে পুনরায় সাক্ষাৎ (বৃন্দাবনদাস)—

দৈবে লক্ষ্মী এক দিন গেলা গঙ্গা স্নানে।
গৌরচন্দ্র হেনই সময়ে সেই স্থানে॥

নিজ লক্ষ্মী চিনিয়া হাসিলা গৌরচন্দ্র।
লক্ষ্মীও বন্দিলা মনে প্রভু পাদদ্বন্দ্ব॥
হেনমতে দোঁহে চিনি দোঁহা ঘরে গেলা।
কে বুঝিতে পারে গৌরসুন্দরের খেলা॥ [চৈ. ভা. পৃ. ৪৮]

বৃন্দাবনদাস আরও জানাচ্ছেন যে, সেদিনই ঘটক বনমালী পণ্ডিত লক্ষ্মীর সঙ্গে সম্বন্ধ নিয়ে গেলেন শচীদেবীর নিকটে। কিন্তু শচীদেবীর কথায় রস না পেয়ে ফিরলেন তিনি দুঃখিত অন্তরে। পথে তাঁর দেখা হলো গৌরসুন্দরের সঙ্গে; বলা যেতে পারে যে, লেখক এক নাটকীয় মুহূর্ত তৈরি করলেন। বনমালীর কাছে সব শুনে গৃহে ফিরে বিশ্বম্ভর মাকে বললেন—

জননীরে হাসিয়া বোলেন সেইক্ষণে।
আচার্যেরে সম্ভাষা না কৈলে ভাল কেনে? [তদেব. পৃ. ৪৯]

শচীদেবী যেন পুত্রের নিকটে এ প্রকার কথাই শুনতে চাইছিলেন। আমরা পূর্বে যে সিদ্ধান্ত করেছি তার দ্বিতীয়টিই সঠিক ব'লে মনে হচ্ছে। পুত্রের কথায় মাতা আনন্দিত হলেন—

পুত্রের ইঙ্গিত পাই শচী হরষিতা।
আর-দিনে বিপ্রে আনি কহিলেন কথা॥
শচী বোলে "বিপ্র! কালি যে কহিলা তুমি।
শীঘ্র তাহা করাহ, বলিল এই আমি॥" [তদেব : পৃ. ৪৯]

আর বিলম্ব হলো না, বিবাহের ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল।

এ বিষয়ে লোচনদাস বলেছেন যে, বনমালী পণ্ডিতের (আচার্যের) ঘরে গেলেন বিশ্বম্ভর; তাঁর হাত ধরে কথা বলতে বলতে পথে বের হলেন দুজনে। এমন সময়—

হেনকালে বল্লভ সে আচার্যের কন্যা।
রূপে, গুণে, শীলে সেই ত্রিজগত-ধন্যা॥
গঙ্গাস্নানে যায় সেই সখীর সহিতে।
বিশ্বম্ভর হরি তারে দেখে আচম্বিতে॥
একদৃষ্টে চাহে প্রভু সস্মিত আনন।
দেখিয়া জানিল তার জন্মের কারণ॥
লক্ষ্মী ঠাকুরাণী তাহা ইঙ্গিতে বুঝিল।
প্রভুপাদপদ্ম দেবী শিরে করি নিল॥ [চৈ. ম. : পৃ. ৬৪]

এর পরের ঘটনা প্রায় বৃন্দাবনদাসের অনুসারী। চতুর বনমালী বিশ্বম্ভরের মনের কথা বুঝে উপস্থিত হলেন শচীদেবীর কাছে কিন্তু ফিরে এলেন তাঁর নীরস কথা শুনে—

তবে শচীদেবী শুনি আচার্য-বচন।
এ অতি বালক মোর পড়ুক এখন॥
পিতৃশূন্য পুত্র মোর পড়ুক কথোদিন।
তাহাতে করহ যত্ন—হউক প্রবীণ॥ [তদেব]

বিশ্বম্ভর মাতাকে জানালেন বনমালী আচার্যকে সম্ভাষণ করতে। শচীদেবী ছত্রের ইঙ্গিত বুঝলেন—বিবাহের ব্যবস্থা পাকা হলো।

জয়ানন্দ বিবাহের সময়টি অনেক পরবর্তী কালে নিয়ে গেছেন। গয়া থেকে বিশ্বম্ভরের ফেরার পর এ ব্যাপারটি ঘটে ব'লে তিনি জানান। তাঁর বক্তব্যটিও নতুন—

একদিন গৌরচন্দ্র গেলা গঙ্গাতটে।
লক্ষ্মী শঙ্কর পুজা করে করপুটে।।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ মাল্য চন্দন।
শঙ্খ ঘণ্টা দর্পণ চামর ব্যঞ্জন ॥
পুন পুন দণ্ডবৎ স্তুতি ভক্তি করি।
প্রদক্ষিণ হয়্যা বর মাগে ধ্যান করি ॥
আমার মানস সিদ্ধ কর ত্রিলোচন।
নবদ্বীপচন্দ্র করু পাণিগ্রহণ ॥
হেনকালে বামচক্ষু নাচিতে লাগিল।
নবদ্বীপচন্দ্র লক্ষ্মী সম্মুখে দেখিল ॥ [জয়ানন্দ ঃ চৈ.ম. ঃ পৃ. ৫৭]

লক্ষ্মীর প্রেম-মুগ্ধ অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায় এই চিত্রকল্পটি থেকে—এও বোঝা যায় যে পূর্বেও লক্ষ্মী দেখেছেন নবদ্বীপচন্দ্রকে। জয়ানন্দ আরও বলেছেন—

হাসি বলে গৌরচন্দ্র দয়ানিধি।
এতদিনে তুমারে প্রসন্ন হইল বিধি ॥
এ রূপলাবণ্য কেশ-ভ্রমর গুঞ্জরে।
... ...
চলহ মন্দিরে লক্ষ্মী মনের সন্তোষে।
বিধি অনুকূল তোর বিভা এই মাসে ॥ [তদেব]

বিশ্বম্ভর বনমালী আচার্যকে বিবাহের ব্যবস্থা করতে বললেন। বনমালী গেলেন লক্ষ্মীর পিতা-মাতার নিকট। সংবাদ জেনে লক্ষ্মীর মাতা গেলেন শচীদেবীর নিকট; শচীমাতাকে নিজ কন্যার মনোভাবের কথা জানালেন তিনি—

উপহাস করি তারে বাপ জিজ্ঞাসে।
কেমন বরে বিভা দিব ইহা শুনি হাসে ॥
বলে ভাল ঘরে সুন্দর বরে কুলের পণ্ডিতে।
আবেলে বএশ যুবা জগতে পুজিত ॥
ঠাকুর পণ্ডিত সঙ্গে রঙ্গ নিরন্তর।
চন্দন চর্চিত জার দীর্ঘ কলেবর ॥
দীর্ঘ লোচন জার দীর্ঘ ভুরু জোড়া।
সেই বর রমণীবিনোদ প্রাণপোড়া ॥
দিব্য ধৌত কৃষ্ণবলি বস্ত্র জে পরে।
অনুপম মদনমোহন বেশী ধরে ॥
সেই জে কীর্তনে নাচে শ্রমজলে ভাসে।
তারে বিভা দিয় মোরে ইহা বলি হাসে ॥ [তদেব ঃ পৃ. ৫৮-৫৯]

লক্ষ্মীর মনোবাসনা শুনে শচীদেবী আনন্দিত হলেন। বিবাহের ব্যবস্থা হলো।

বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে বিশ্বম্ভরের বিবাহের ব্যাপারে কোন প্রেমের পরিচয় নেই। এ বিবাহের উদ্যোক্তা শচীমাতা নিজেই। বৃন্দাবনদাস বলেছেন—

হেনমতে বিদ্যা-রসে আছেন ঈশ্বর।
বিবাহের কার্য শচী চিন্তে নিরন্তর॥
সর্ব-নবদ্বীপে শচী নিরবধি মনে।
পুত্রের সদৃশ কন্যা চাহে অনুক্ষণে॥
সেই নবদ্বীপে বৈসে মহা ভাগ্যবান্।
দয়াশীল-স্বভাব—শ্রীসনাতন নাম॥
... .
তাঁর কন্যা আছেন পরম-সুচরিতা।
মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী প্রায় সেই জগন্মাতা॥ [চৈ. ভা. ঃ পৃ. ৭৪]

পিতা-মাতার বিষ্ণুভক্তি পেয়েছে এই কন্যা, শিশুকাল থেকেই দু'তিন বার গঙ্গা স্নান করে—গঙ্গার ঘাটে শচীদেবীকে দেখলেই প্রণাম করে। সুতরাং শচীদেবীই উদ্যোগী হয়ে পুত্রের সঙ্গে তার বিবাহ দিলেন। বিবাহের ব্যয়ভার বহন করেন বন্ধুরা। বিশেষ করে বুদ্ধিমন্ত খাঁ। বিষ্ণুপ্রিয়া-নিমাই লক্ষ্মী-নারায়ণ সদৃশ হয়ে উঠলেন সকলের চক্ষে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ এ বিবাহ নিয়ে অনেক কথা বলেন নি, তাঁর বলার কিছু হয়তো ছিলও না। দ্বিতীয় বিবাহটি হয়তো অবতারবাদীদের অসুবিধায় ফেলেছিল।—সে কালে ব্যাপারটা সহজ হলেও কবিরাজ গোস্বামী সম্ভবত সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। তাই দিগ্বিজয়ী-জয়ের সঙ্গে এক নিশ্বাসে বিষয়টা প্রকাশ ক'রে যেন দায় সেরেছেন—

তবে বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর-পরিণয়।
তবে ত করিল প্রভু দিগ্বিজয়ি-জয়॥ [চৈ. চ. ঃ পৃ. ৮১]

লোচনদাসও শচীমাতাকেই পুত্রের দ্বিতীয় বিবাহে উদ্যোগী করেছেন। গৃহ শূন্য দেখে মাতার মনে শান্তি ছিল না। জীবনীকার জানালেন—

শচীর হৃদয়ে দুঃখ ভেল আচম্বিতে॥
বধূশূন্য গৃহ দেখি' বড় পাইল চিন্তা।
বিশ্বম্ভর-বিভা দিব—এই মনঃকথা॥
মনে অনুমান করি করিল নিশ্চয়।
আছে একখানি কন্যা—যদি ভাগ্যে হয়॥ [চৈ. ম. ঃ পৃ. ৭৮]

শচীদেবী বিবাহের সম্বন্ধ করতে পাঠালেন কাশীনাথ পণ্ডিতকে কন্যার পিতা সনাতন পণ্ডিতের কাছে। বিবাহ স্থির হয়ে গেল।

জয়ানন্দ উদ্যোগী করেছেন 'রাজ পণ্ডিত' সনাতনকেই। তিনি স্বপ্নে দেখেছেন জগন্নাথ মিশ্রকে। তাঁরই আজ্ঞায় এ বিবাহ—

স্বপ্নে সিন্ধুতটে বট নিকটে জগন্নাথ।
দেখে জগন্নাথ (সনাতন ?) মিশ্র করি জোড় হাথ॥
জগন্নাথের আজ্ঞা বিষ্ণুপ্রিয়া তুমার দাসী।
এই স্তুতি শুনি গৌরচন্দ্র ঈষৎ হাসি॥
কন্যা বিভা দিবে কেবল জগন্নাথ প্রীতে।
জগন্নাথের আজ্ঞা আমি লঙ্ঘিব কেমন্তে॥

... ...

শচী ঠাকুরাণী বলে বিভা লগ্ন কর।
এই মাসে বিভা দিব তুমার বাক্য ধর॥

[জয়ানন্দ : চৈ. ম. : পৃ. ৭০-৭১]

আশ্চর্য এই যে, জীবনীকাররা যাঁকে অবতার ব'লে বোঝাবার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা করেছেন তাঁরাও তাঁর জীবনের প্রধান ঘটনাগুলো সম্বন্ধে একমত নন। জন্মের প্রথম থেকেই নিমাইকে কেন্দ্র ক'রে তাঁরা যে সব ঘটনার কথা বলেছেন তা আংশিক ভাবে সত্য হলেও নবদ্বীপবাসীরা তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহী হতেন এবং তাঁর জীবনের প্রধান প্রধান কাহিনী লোকমুখে বিভিন্ন রূপ ধারণ করতো না। বিস্ময়ের বিষয় এই যে শ্রীবাস-শ্রীরাম-নারায়ণী এবং নিত্যানন্দের নিকটে যে কথা শুনেছেন বৃন্দাবনদাস তার সঙ্গে মিল নেই মুরারির অনুসরণকারী লোচনদাসের অথবা বৃন্দাবনের গোস্বামীদের নিকটে শ্রুত কাহিনী অনুসরণকারী কবিরাজ গোস্বামীর। ড. বিমানবিহারী মজুমদারের মতে চৈতন্যদেবের তিরোধানের সময় জয়ানন্দ কিশোর বয়স্ক। তিনি নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্রের আশীর্বাদধন্য। সুতরাং তারও তো ঘটনা সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু একের সঙ্গে অপরের মিল নেই—যদিও একই বিষয়ে বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করেছেন তাঁরা।

দাম্পত্য জীবনের কথাও প্রায় কেউ কিছু বলেন নি। বর্তমান কালেও এ বিষয়ে আলোচনায় কোথায় যেন একটা লজ্জা অনুভব করেন সকলে। অথচ বিশ্বম্ভরের এই একান্ত নিজস্ব জীবন সম্বন্ধে কিছু জানার আগ্রহ হওয়াই স্বাভাবিক। বিশেষ, লক্ষ্মীর জীবন-কথা না জানার বেদনা সকলেরই থেকে গেছে।

বিবাহের কিছু বর্ণনা অবশ্যই পাওয়া যায়, রন্ধনকার্য, পদসেবা এবং তাম্বুল দানের কথাও দেখা গেছে। বৃন্দাবনদাস লিখেছেন—

শেষে সর্ব-অলঙ্কারে করিয়া ভূষিত।
লক্ষ্মী কন্যা আনিলেন প্রভুর সমীপ॥

... ...

তুলিলেন সভে প্রভুরে পৃথিবী হইতে॥
তবে লক্ষ্মী প্রদক্ষিণ করি সপ্তবার।
যোড়-হস্তে রহিলেন করি নমস্কার॥
তবে শেষে হৈল পুষ্পমালা ফেলাফেলি।
লক্ষ্মী নারায়ণ দোঁহে মহাকুতূহলী॥

দিব্য মালা দিয়া লক্ষ্মী প্রভুর চরণে।
নমস্কারি কহিলেন আত্মসমর্পণে ॥
... ...
বসিলেন প্রভু লক্ষ্মী করি বাম পাশে ॥ [চৈ. ভা. ঃ পৃ. ৪৯-৫০]

অপূর্ব শোভা দেখে সকলেই মোহিত হলেন। কন্যা সম্প্রদান হয়ে গেল। সে রাত্রি বল্লভ আচার্যের ঘরে থেকে বিশ্বম্ভর লক্ষ্মীকে নিয়ে দোলায় চড়ে গৃহে চললেন : সে দিন পথে বর-বধূকে দেখার জন্য লোকেব অন্ত ছিল না। বৃন্দাবনদাস বলেছেন—

গন্ধ-মাল্য, অলংকার, মুকুট, চন্দন।
কজ্জলে উজ্জ্বল দুই লক্ষ্মী-নারায়ণ ॥
... ...
এই "হর-গৌরী-হেন বুঝি" কেহো বোলে ॥
কেহো বোলে "ইন্দ্র শচী রতি বা মদন।"
কোনো নারী বোলো "এই লক্ষ্মীনাবায়ণ" ॥ [তদেব ঃ পৃ. ৫০]

এরপর বিশ্বম্ভরের বায়ুর লক্ষণ দেখা দেয় কিছুদিনের জন্য। সে-সময় লক্ষ্মীর মানসিকতার কোন পরিচয় দেন নি বৃন্দাবনদাস। যখন পুনরায় শিষ্যদের পড়িয়ে গঙ্গাস্নানে যেতে আরম্ভ করলেন, বিষ্ণুপূজা, তুলসী মঞ্চে জলদান প্রভৃতি আরম্ভ হলো তখন আবার লক্ষ্মীদেবীকে দেখা গেল রন্ধনশালায়—

লক্ষ্মী দেই অন্ন খায বৈকুণ্ঠেব পতি।
নয়ন ভবিয়া দেখে আই পুণ্যবতী ॥
ভোজন-অন্তরে করি তাম্বুল ভক্ষণ।
শয়ন করেন, লক্ষ্মী সেবেন চরণ ॥ [তদেব ঃ পৃ. ৫৭]

নগর ভ্রমণ করতে বেরিয়ে তন্তুবায়দেব নিকট থেকে ধাবে যে বস্ত্র আনেন, গন্ধ-বণিকের কাছ থেকে যে গন্ধদ্রব্য নিয়ে আসেন, তাম্বুলী যে তাম্বুল দেয়, শঙ্খবণিক যে দিব্য শঙ্খ তুলে দেয় তাঁর হাতে সে সবের কিছুটা অংশ যে লক্ষ্মীর কথা স্মরণ করেই নিয়ে আসেন বিশ্বম্ভর সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। একটা স্নিগ্ধ প্রীতির পরিচয় আছে এর মধ্যে।

বৃন্দাবনদাস লক্ষ্মীদেবীর সেবাপরায়ণ মূর্তিটিই দেখিয়েছেন। এর আগে অন্ন পরিবেশনরতা লক্ষ্মীকে দেখা গেছে। এবার তার রন্ধনরতা রূপটি দেখা গেল—

একেশ্বর লক্ষ্মীদেবী করেন রন্ধন।
তথাপিহ পরম সন্তোষ-যুক্ত মন ॥
লক্ষ্মীর চরিত্র দেখি শচী ভাগ্যবতী।
দণ্ডে দণ্ডে আনন্দ বিশেষ বাঢ়ে অতি ॥
উষঃকাল হৈতে লক্ষ্মী যত গৃহকর্ম।
আপনে করেন সব, সেই তার ধর্ম ॥ [তদেব ঃ পৃ. ৬৯]

পূজার সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে দেন তিনি। শচীমাতাকে সেবা করেন বিশেষ ভাবে: গৌরাঙ্গসুন্দর পরম তৃপ্তি লাভ কবেন পত্নীব সেবাপরায়ণা রূপ দেখে—

লক্ষ্মীর চরিত্র দেখি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর।
মুখে কিছু না বোলেন, সন্তোষ অন্তর ॥ [তদেব]

বঙ্গদেশে গিয়েছেন গৌরসুন্দর—কয়েক মাস কেটে গেছে। সেবাপরায়ণা লক্ষ্মীদেবী বিরহে কাতর হয়ে পড়েছেন। দু'তিন মাসের অনুপস্থিতিতেই এই বিরহ-বেদনা লক্ষ্মীদেবীর গভীর প্রেমের স্পষ্ট পরিচয় বহন করে—

হেথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী প্রভুর বিরহে।
অন্তরে দুঃখিতা দেবী কারে নাহি কহে ॥
নিরবধি করে দেবী আইর সেবন।
প্রভু গিয়াছেন হৈতে নাহিক ভোজন ॥
নামেতে সে অন্নমাত্র পরিগ্রহ করে।
ঈশ্বর-বিচ্ছেদে বড় দুঃখিতা অন্তরে ॥
একেশ্বর সর্ব-রাত্রি করেন ক্রন্দন।
চিত্তে স্বাস্থ্য লক্ষ্মী না পায়েন কোন ক্ষণ ॥
ঈশ্বর-বিচ্ছেদ লক্ষ্মী না পারি সহিতে।
ইচ্ছা করিলেন প্রভুর সমীপে যাইতে ॥ [তদেব ঃ পৃ. ৭০]

বৃন্দাবনদাস এবার অলৌকিক প্রক্রিয়ায় লক্ষ্মীদেবীর দেহত্যাগের কথা বলেছেন।

বৃন্দাবনদাসের মতে বিশ্বম্ভর স্বয়ং ভগবান—তিনি বঙ্গদেশে থাকতেই লক্ষ্মীদেবীর দেহাবসানের কথা জানতে পারেন। তাই গৃহে ফিরে লক্ষ্মীর কথা জিজ্ঞাসা করেন নি। বৃন্দাবনদাস পাঠকদের মনে আঘাত দিয়েছেন। বিশ্বম্ভরকে ভগবান ব'লে ধরে নিলেও নবলীলায় এই পৃথিবীর মানুষের ন্যায়ই তাঁর আচরণ করা উচিত ছিল। নবদ্বীপের মানুষরাও কি সবাই নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিলেন? বহু দিন পরে বিশ্বম্ভর দেশে ফিরলেন, পথে কোন মানুষই তাঁকে সম্ভাষণ করেন নি? পথেই তো তাঁর লক্ষ্মীর তিরোধানের সংবাদ জানবার কথা। বঙ্গদেশ থেকে বহু দ্রব্যসম্ভার এনেছেন, তা দেখাবার জন্য লক্ষ্মীকে সন্ধান করার গোপন চেষ্টাও করতে নেই?

তবু স্বীকার করতেই হবে যে, দু'একটি সুন্দর চিত্র এঁকেছেন বৃন্দাবনদাস। মায়ের কাছে বধূর সম্বন্ধে মধুর পরিহাস করেছেন—

মুঞিও দেখোঁ বারেবার নৈবেদ্যের সাজে।
আধা-আধি না থাকে, না কহি কারে লাজে ॥
তোমার বধূরে মোর সন্দেহ আছিল।
আজি সে আমার মনের সন্দেহ ঘুচিল ॥ [তদেব ঃ পৃ. ১৩৮]

লক্ষ্মীদেবীই তো পূজার ব্যবস্থা করতেন, নৈবেদ্য সাজাতেন। লক্ষ্মীদেবীরও পরিহাস বোধ আছে, তিনি স্বামীর কথা উপভোগ করলেন—

হাসে লক্ষ্মী জগন্মাতা—স্বামীর বচনে।
অন্তরে থাকিয়া সব স্বপ্ন-কথা শুনে ॥ [তদেব]

বৃন্দাবনদাস তার পর ঘটালেন অলৌকিক ব্যাপার। আহাররত গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ অকস্মাৎ শিশু কৃষ্ণ-বলরামে পরিণত হয়েছেন আর পুত্রের হৃদয়ে—"আপনার বধূ দেখে পুত্রের হৃদয়ে"। চিত্রটিকে প্রতীকরূপে গ্রহণ ক'রে গৌরসুন্দরের হৃদয়ে লক্ষ্মীদেবীর চির অধিষ্ঠানের কথা ধরে নিতে পারেন পাঠকগণ।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনদাসের ওপর বরাত দিয়ে এ বিষয়ে আর বিশেষ কিছুই

বলতে চান নি। গৌরাঙ্গসুন্দর বঙ্গদেশে গিয়ে রইলেন বারোমাস। সে-সময়ে লক্ষ্মীর মানসিক অবস্থা সামান্য তুলির টানে তিনি প্রকাশ করেছেন—

এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী বিরহে দুঃখী হৈলা ॥
প্রভুর বিরহ-সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল।
বিরহ-সর্প-বিষে তার পরলোক হৈল ॥
অন্তরে জানিলা প্রভু যাতে অন্তর্যামী।
দেশেতে আইলা প্রভু শচী-দুঃখ জানি। [চৈ. চ. ঃ পৃ. ৮১]

লক্ষ্মীদেবীর পরলোক প্রাপ্তি বিরহে হলো, না সর্পের দংশনে হলো তাও স্পষ্ট করলেন না তাত্ত্বিক কবি। মাতার দুঃখ জেনেই ফিরলেন শচীনন্দন। নিজের প্রেমের পরিণতি স্বরূপ যে বিবাহ তাতে তাঁর অন্তর্বেদনা কিছু হয়েছিল কিনা তা গোপন করলেন লেখক। একেই বলে অবতার হবার বিড়ম্বনা। লোচনদাস লক্ষ্মীদেবীর রূপ বর্ণনা করেছেন, বর-বধূকে এক ঘরে ভোজন করিয়েছেন এবং কুলবধূদের সহায়তায় বাসবের ব্যবস্থা করেছেন। পরে বল্লভাচার্য—

লক্ষ্মী-কর ধরি দিল বিশ্বম্ভর-করে ॥
আজি হৈতে লক্ষ্মী তোরে কৈল' সমর্পণ।
জানিঞা করিবে ইহার ভরণ-পালন। [চৈ. ম. ঃ পৃ. ৭২]

বল্লভাচার্যের কথায় বিদায়-বেলার বেদনা উছলে পড়লো। তারপর বিশ্বম্ভরের ঘরে ফেরার পালা—

চলিলা সেই বিশ্বম্ভর নিজ প্রিয়া বামে।
লক্ষ্মীর সহিত চড়ে মনুষ্যের-যানে ॥ [তদেব]

তার পর গৃহপ্রবেশ—"লক্ষ্মী কর ধরি নিজগৃহে পরবেশ"—[তদেব]। লোচনদাসের অঙ্কিত এই বিবাহোত্তর চিত্রটি মধুর এবং মর্মস্পর্শী।

এর পরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। কিছুদিন দেশে থেকে গৌরসুন্দর গেলেন বঙ্গদেশে। লক্ষ্মীদেবী শাশুড়ীর সেবা করেন, পূজার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা ক'রে দেন। কাজের মধ্যে লিপ্ত থাকলেও বিরহ-বেদনায় কাতর হয়ে পড়লেন তিনি। লেখক প্রতীকের রূপ দিয়ে বলেছেন যে, বিরহের বিষ সর্পের আকার ধরে যেন তাঁকে ছোবল মারল। তার পর অলৌকিক কান্ড ঘটিয়ে লেখক তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন স্বর্গে।

জয়ানন্দের শচীদেবী সমস্ত শোক ভুলে ছিলেন লক্ষ্মীদেবীর আগমনে। সেকালে অল্পবয়সে বালিকাদের বিবাহ হতো—বিবাহের পর তারা কিছুদিন গিয়ে থাকতো বাপের বাড়ী, কিন্তু জয়ানন্দের লক্ষ্মীদেবী তার ব্যতিক্রম ঘটিয়েছিলেন—

লক্ষ্মী ঠাকুরাণী গৌরচন্দ্রের সেবা করি।
না গেলা বাপের বাড়ী নদীয়া নগরী ॥
শাশুড়ীর সেবা হৈতে আন নাঞি মনে।
গৌরাঙ্গ চরণ ধ্যান করি রাত্রি দিনে ॥ [জয়ানন্দ ঃ চৈ. ম. পৃ. ৬৪]

বিশ্বম্ভর মাতাকে ব'লে রন্ধনের দায়িত্ব দিলেন লক্ষ্মীর ওপর—নিমন্ত্রণ করলেন হরিদাস প্রভৃতি বৈষ্ণবদের: বহুপ্রকার ব্যঞ্জন এবং পিষ্টকাদি রন্ধন করলেন লক্ষ্মীদেবী শাশুড়ীর তত্ত্বাবধানে, পরিতুষ্ট হলেন বৈষ্ণবরা; স্বভাবতই রন্ধনের খ্যাতি হলো লক্ষ্মী-

দেবীর। এর থেকেও কঠিন পরীক্ষা অবশ্য বৃন্দাবনদাসেও আছে, আকস্মিক ভাবে দশ বিশ জন সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠিয়ে দিতেন গৃহে—তাদের জন্য রন্ধনের ব্যবস্থা করতে হতো শাশুড়ী-বধূরে, বিরক্তির চিহ্ন ছিল না কারও মুখে। জয়ানন্দের লক্ষ্মীও সেবাকার্যে উত্তীর্ণ হলেন।

বঙ্গদেশে যাবার সময় বৃন্দাবনদাসের ন্যায় জয়ানন্দের বিশ্বম্ভরও মাতার সেবার দায়িত্ব দিয়ে গেলেন লক্ষ্মীর ওপর—

লক্ষ্মী ঠাকুরাণী প্রভুর বচন না লঙ্ঘিয়া।
না গেলা বাপের বাড়ী শাশুড়ি ছাড়িয়া ॥
বহু যাত্রা শুনি কান্দে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
প্রবোধিল তারে গৌরচন্দ্র দ্বিজমণি ॥ [তদেব ঃ পৃ. ৬৪]

বিশ্বম্ভর তাঁব কাঁধেব যজ্ঞসূত্রও রেখে গেলেন স্ত্রীর কাছে। লক্ষ্মীদেবী সেই যজ্ঞসূত্র পূজা করতেন। তিন সন্ধ্যা নমস্কার জানাতেন গৌরচন্দ্রকে এবং "দুগাছি পাদুকা না দেখিলে প্রাণ ফাটে"—[তদেব]। স্বামীব চিত্রও এঁকে নিয়েছিলেন তিনি।

তারপর একদিন শেষরাত্রে সর্প দংশনে দেহরক্ষা করলেন লক্ষ্মীদেবী—

আর একদিন লক্ষ্মী পালঙ্ক উপরে।
শচী সঙ্গে নিদ্রা লক্ষ্মী বিলাসমন্দিরে ॥
রাত্রি অবশেষে কাল সর্প বুপ ধরি।
দংশিল দক্ষিণ পদ কনিষ্ঠ অঙ্গুলী ॥ [তদেব ঃ পৃ. ৬৭]

শত চেষ্টা ক'রেও বাঁচান গেল না সেই সেবাপরায়ণা পতিব্রতাকে। ক্রন্দনরতা শচীদেবী আকাশবাণী শুনলেন—"বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ গৃহিণী"। [তদেব ঃ পৃ. ৬৯]

দ্বিতীয় বিবাহে আড়ম্বর হলো অনেক বেশী—ব্যয়ভার বহন করলেন বিশ্বম্ভরের শিষ্য এবং বন্ধু-বান্ধবরা। কন্যাকে আসনে বসিয়ে গৌরসুন্দরকে প্রদক্ষিণ করান হলো। মালা বদলও হয়ে গেল—

আগে লক্ষ্মী জগন্মাতা প্রভুর চরণে।
মালা দিয়া করিলেন আত্মসমর্পণে ॥
তবে গৌরচন্দ্র প্রভু ঈষৎ হাসিয়া।
লক্ষ্মীর গলায় মালা দিলেন তুলিয়া ॥
তবে লক্ষ্মী-নারায়ণে পুষ্প ফেলাফেলি।
করিতে লাগিলা হই মহা কুতূহলী ॥ [চৈ. ভা. ঃ পৃ. ৭৭]

সম্প্রদান হোম সবই হয়ে গেল ঃ বৃন্দাবনদাস লিখেছেন—

ভোজন করিয়া সুখ-রাত্রি সুমঙ্গলে।
লক্ষ্মী-কৃষ্ণ একত্র রহিলা কুতূহলে ॥ [তদেব ঃ পৃ. ৭৮]

এরপর গৃহে ফিরে আসা, শচীদেবীর বধূবরণ। কিন্তু তার পর বিষ্ণুপ্রিয়া কোথায় হারিয়ে গেলেন, তাঁর শোকসন্তপ্ত মূর্তি কদাচিৎ চোখে পড়ে। পুরীর গম্ভীরায় (চৈতন্যদেবের বাসস্থান) যে খড়ম জোড়া আছে তা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী পাঠিয়েছিলেন তাঁর জীবনদেবতার জন্য—নগ্নপদে পুরীব পথ চলতে তাঁর কষ্ট হয় এই কথা মনে ক'রে। ভক্ত এবং পার্ষদদের একান্ত অনুরোধে তিনি বারেকের জন্য তা পায়ে দিয়েছিলেন।

মহত্ত্বের বেদনা অনেক, ওই মহীয়সী নারীর বেদনার পরিচয় দেবার কোন ক্ষমতা ছিল না কোন চৈতন্য-জীবনীকারের এবং তা দিতে গেলে অবতারত্বও ক্ষুন্ন হতো। তাই বৃন্দাবনদাস সুকৌশলে জানিয়ে দিলেন—

দণ্ডেকে এসব লীলা যত হইয়াছে।
শত-বর্ষে তাহা কে বর্ণিব হেন আছে॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের আজ্ঞা করি শিরে।
সূত্র-মাত্র লিখি আমি কৃপা-অনুসারে॥ [তদেব ঃ পৃ: ৭৯]

তাত্ত্বিক কবিরাজ গোস্বামী বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা প্রায় এড়িয়ে গেছেন। এড়িয়ে যাবার সুযোগ গ্রহণ করেছেন এক বিপ্রের শাপের ব্যবস্থা ক'রে। কীর্তন দেখতে এসেছিলেন তিনি—কপাট বন্ধ দেখে ফিরে যান। দুঃখিত অন্তরে তিনি গৃহে ফিরে যান। পরে একদিন গঙ্গায় গৌরসুন্দরকে পেয়ে তিনি বলেন—

শাপিব তোমারে মুঞি পাঞা মনেদুঃখ।
পৈতা ছিণ্ডিয়া শাপে প্রচণ্ড দুর্মুখ॥
সংসারসুখ তোমার হউক্ বিনাশ।
শাপ শুনি প্রভুর চিত্তে হইল উল্লাস॥ [চৈ. চ. ঃ পৃ. ৮৬]

সুতরাং বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে আর বিপদে পড়তে হলো না কৃষ্ণদাস কবিরাজের।

লোচনদাস বিষ্ণুপ্রিয়ার রূপ বর্ণনা করেছেন—

রত্নসিংহাসনে বসি, ত্রৈলোক্য-রূপসী,
অঙ্গ-ছটায় বিজুরী পড়িল॥
প্রভুর নিকটে আনি, জগ-মন-মোহিনী,
বিষ্ণুপ্রিয়া মহালক্ষ্মী-নামা।
তরল নয়ান বঙ্ক, হেরি মুখ গৌরাঙ্গ,
মন্দমন্দ হাসি অনুপমা॥ [চৈ. ম. ঃ পৃ. ৮৩]

গৌরাঙ্গের মনোভাব কিছুটা ফুটিয়ে তুলেছেন জীবনীকার লোচনদাস। 'পহু মুচকি হাসিয়া, সিংহাসনে বসিলেন—কন্যা সম্প্রদান করলেন সনাতন পণ্ডিত।

বাসরের কথা শুনিয়েছেন লোচনদাস—

বিশ্বম্ভর বিষ্ণুপ্রিয়া, বাসরে বসিল গিয়া,
আইহগণ মনে অনুমানে।
এই লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া বিষ্ণু বিশ্বম্ভর হঞা,
পৃথিবীতে কৈল অবধানে॥ [তদেব ঃ পৃ. ৮৪]

গৃহে ফিরলেন বিশ্বম্ভর "বিষ্ণুপ্রিয়াব কর ধরি" [তদেব]—শচীদেবী আনন্দে উদ্বেল—"বধূকোলে শচীর নাচনে"। [তদেব ঃ পৃঃ ৮৫]।

গয়া গিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে ফিরলেন বিশ্বম্ভর। এখানে এক অপেক্ষমানা বধূর সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করেছেন লোচনদাস—

বিষ্ণুপ্রিয়া হিয়া মাঝে আনন্দ হিল্লোল।
ধরিতে না পারে অঙ্গ সুখের নাহি ওর॥

আনন্দে আইলা প্রভু আপন আবাস।
গোরাগুণ গায় সুখে এ লোচনদাস ॥ [তদেব : পৃ. ৮৮]

লোচনদাস সম্ভবতঃ তত্ত্ব নিয়ে খুব বেশী চিন্তিত ছিলেন না। তা সত্ত্বেও তিনিও আর এগোতে পারেন নি। বিষ্ণুপ্রিয়া কাব্যের উপেক্ষিতা হয়েই রইলেন।

জয়ানন্দের কাব্যে সনাতন পণ্ডিতই বিবাহের উদ্যোক্তা। গৌরাঙ্গের সঙ্গে তাঁরই উদ্যোগে বিবাহ হ'লো বিষ্ণুপ্রিয়ার। বিবাহের পরেব দিন বিশ্বম্ভর ফিরলেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে—

বিষ্ণুপ্রিয়া সঙ্গে গেলা নিজ গৃহবাসে।
পুত্রবধু দেখি শচী ঠাকুরাণী হাসে ॥
... ...
শচী ঠাকুরাণী আসি প্রেমানন্দ সুখে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল পুত্রবধু মুখে ॥
আজি মোর ঘর দ্বার সম্পূর্ণ হইল।
আজি লক্ষ্মী বধুর শোক পাসরিল ॥ [জয়ানন্দ : চৈ.ম. : পৃ. ৭৪]

এর আগে বাসরের কথা শোনা গেছে, আইহদের উপস্থিতিও ছিল সেখানে। জয়ানন্দই ফুলশয্যার কথা বললেন—

বিষ্ণুপ্রিয়া সঙ্গে লক্ষ্মীবিলাস মন্দিরে।
পুষ্পশয্যায় শয়ন কবাল বিশ্বম্ভরে ॥ [তদেব]

তারপর বিশ্বম্ভরেব বৈরাগ্যেব সময়—বিষ্ণুপ্রিয়াব সেখানে আর স্থান কোথায় ?

হরিদাস গোস্বামী তাঁর 'শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপ লীলা' গ্রন্থে লিখেছেন, "পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণিত প্রভুর অষ্টকালীয় লীলা-স্মরণ-মঙ্গলস্তোত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিত্য পঠনীয় ও স্মরণীয়। এই স্তোত্র একাদশটি শ্লোকে লিখিত।

"তারপর শ্লোকে শ্রীপাদ চক্রবর্তী ঠাকুর প্রাত-কালোচিত লীলার বর্ণনা করিয়াছেন'। তৃতীয় শ্লোকে প্রভুর প্রথম লীলা বর্ণনা আছে। এই শ্লোকে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত প্রভুর বিলাসলীলা ও রসকথার উল্লেখ আছে। এটি প্রভুর মধুর লীলা। তাই শ্রীপাদ চক্রবর্তী ঠাকুর সর্বাগ্রে এই লীলাটি বর্ণনা করিয়াছেন। সর্ব প্রথমে প্রভুর লীলাস্মরণ কালে যাহাতে গৌববক্ষোবিলাসিনী ভক্তি স্বরূপিণী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পবিত্র নাম কীর্তন হয় সেইজন্য পূজ্যপাদ লীলা-লেখক প্রভুর প্রেরণায় শ্রীমতী প্রিয়াজীর ভুবন-মঙ্গল নামোল্লেখ করিয়াছেন।......

"তৃতীয় পুণ্য-শ্লোকটি এই :—

... ...

ভাবার্থ।—নিশান্তে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু পিককুক্কুটের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া শয্যা হইতে উঠিলেন। উঠিয়াই সর্বাগ্রে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত রসকথা কহিলেন। এবং তাঁহাকে তুষ্ট করিলেন।..."

"......শ্রীগৌরাঙ্গ লীলামৃত শ্রীগ্রন্থে প্রভুর অষ্টকালীয় লীলার বিস্তারিত বিবরণ লিখিত আছে। এ স্থলে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিব।

"নিশান্তে শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র যুগলে নিজ মন্দিরে শয়ন করিয়া আছেন। দিব্য জ্যোতিতে প্রভুর প্রতি অংগ ঝলমল করিতেছে। প্রভু প্রিয়াজীসহ যুগলে হেমময় খট্টাঙ্গে শয়ান আছেন, খট্টাঙ্গের পদচতুষ্টয় প্রবালে নির্মিত।......পালঙ্কের উপরিভাগে চতুষ্কোণে চারিটি স্বর্ণ নির্মিত দণ্ড শোভা পাইতেছে।......চন্দ্রাতপের ঝালিরে মণিমুক্তার হার লম্বমান রহিয়াছে।......

"...পিক-কুক্কুটাদির নিনাদে প্রভুর নিদ্রাভংগ হইল।......শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী চকিতে শয্যা হইতে উঠিয়া প্রভুর পদধূলি গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগ করিবার উপক্রম করিলে প্রভু তাঁহাকে রস-কথায় তুষ্ট করিলেন। প্রিয়াজীর পদের ভূষণ-ধ্বনি শ্রবণে শচীমাতার নিদ্রাভংগ হইল।" [পৃ. ২৩-২৫]

অনুমান করা চলে যে, তত্ত্বের আড়ালে যে মধুর রসের কথাই বলা হোক না কেন দাম্পত্য জীবনের কিছু আভাস লাভের ইচ্ছা সকলেরই ছিল। তবে সোনার পালঙ্ক, মুক্তার ঝালর লাগিয়ে লেখকরা বিশ্বম্ভর-বিষ্ণুপ্রিয়ার যে চিত্র এঁকেছেন তা স্বতঃই মিথ্যা ব'লে মনে হবে।

পরবর্তীকালের বৈষ্ণব তাত্ত্বিক শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী বা শ্রীগৌরাঙ্গলীলামৃত গ্রন্থে বিষ্ণুপ্রিয়াকেই গৌরবক্ষোবিলাসিনী বলা হয়েছে, অর্থাৎ বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীর স্থানটি পেয়েছেন তিনিই। কিন্তু চৈতন্য-জীবনীকাররা যে লক্ষ্মী এবং বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে সমস্যায় পড়েছিলেন সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। বৈকুণ্ঠে কেবল লক্ষ্মীকেই দেখা গেছে, সরস্বতী-নারায়ণ-পত্নী হলেও বৈকুণ্ঠের সিংহাসনে তাঁর স্থান নেই। রুক্মিণী-সত্যভামা-জাম্ববতী দ্বারাবতীতে শ্রীকৃষ্ণের রাণী কিন্তু বৈকুণ্ঠে তাঁরা কেউ নন। শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রে যদি তিন রাণী কোন সমস্যা সৃষ্টি করতে না পেরে থাকে তবে গৌরসুন্দরের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিল কেন? মনে হয় সমস্যাটা জীবনীকারদেরই সৃষ্ট —তত্ত্বের বন্যার আঘাত তাঁরা সহ্য করতে পারেন নি।

লক্ষ্মীদেবীর প্রতিই তো গৌরসুন্দরের প্রেম জাগ্রত হয়েছিল। গৌরাঙ্গ যদি নারায়ণ হন তবে লক্ষ্মীদেবীরই তো বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী হবার কথা। বৃন্দাবনদাস বার বার যা বলেছেন, যে চিত্র এঁকেছেন তাতে স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায় যে, কবির মতে লক্ষ্মীদেবী স্বর্গেরই লক্ষ্মী। একদিন স্বামীর পদসেবায় রত লক্ষ্মীদেবীকে দেখলেন শচীমাতা—

কোন দিন সেই লক্ষ্মী প্রভুর চরণ।
বসিয়া থাকেন পদমূলে অনুক্ষণ॥
অদ্ভুত দেখেন শচী পুত্র-পদতলে।
মহা-জ্যোতির্ময় অগ্নি-পুঞ্জ-শিখা জ্বলে॥ [চৈ. ভাঃ পৃ. ৬৯]

এ ছাড়াও বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীর পাদপদ্মের গন্ধও পাওয়া যায় মাঝে মধ্যে—

কোনদিন মহা পদ্ম-গন্ধ শচী আই।
ঘরে দ্বারে সর্বত্রে পায়েন অন্ত নাই॥
হেনমতে লক্ষ্মী-নারায়ণ নবদ্বীপে।
কেহো নাহি চিনেন আছেন গূঢ়রূপে॥ [তদেব]

স্পষ্টরূপেই বৃন্দাবনদাস লক্ষ্মীদেবীকে বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী ক'রে ফেলেছেন।

বিশ্বম্ভর প্রতিদিন দশ বিশ জন সন্ন্যাসীকে ভোজন করাতেন, লক্ষ্মীদেবী সানন্দে রন্ধন করতেন : বৃন্দাবনদাস বলেছেন—

সেই সব ভিক্ষুক পরম ভাগ্যবান্।
লক্ষ্মী-নারায়ণ যারে করে অন্ন-দান ॥ [তদেব : পৃ. ৬৮]

বিবাহের পূর্বের যে চিত্র বৃন্দাবনদাস অঙ্কিত করেছেন তাতেও ওই একই পরিচয় আছে। বৃন্দাবনদাস প্রথম সাক্ষাতের বর্ণনা দিয়েছেন—

দৈবে লক্ষ্মী এক দিন গেলা গঙ্গা স্নানে।
গৌরচন্দ্র হেনই সময়ে সেই স্থানে ॥
নিজ লক্ষ্মী চিনিয়া হাসিলা গৌরচন্দ্র।
লক্ষ্মীও বন্দিলা মনে প্রভু পাদদ্বন্দ্ব ॥
হেনমতে দোঁহে চিনি দোঁহা ঘরে গেলা।
কে বুঝিতে পারে গৌরসুন্দরের খেলা ॥ [তদেব পৃ. ৭৮]

এরূপ বহু নিদর্শন আছে বৃন্দাবন দাসে যা লক্ষ্মীদেবীকে বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী বলেই চিহ্নিত করে।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নাম উচ্চারণ করেন নি বৃন্দাবনদাস। সনাতন পণ্ডিতের কন্যাকে শচীমাতা পুত্রের যোগ্য মনে করেছেন, ধর্মশীলা বুদ্ধিমতী সেই কন্যা—

তাঁর কন্যা আছেন পরম-সুচরিতা।
মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী প্রায় সেই জগন্মাতা ॥ [তদেব : পৃ. ৭৪]

এই কন্যাটিই বিষ্ণুপ্রিয়া এবং বৃন্দাবনদাসের কথায় তিনি 'লক্ষ্মী প্রায়'। অথচ লক্ষ্মীদেবী সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাস বার বার বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীকে স্মরণ করেছেন তা আমরা পূর্বে দেখেছি, এখানে আরও একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হলো—

ব্রহ্মা-শিব-শুক-ব্যাস-নারদাদি করি।
সুর-সিদ্ধ-আদি যত স্বচ্ছন্দ-বিহারী ॥
লক্ষ্মী-নারায়ণ অবতীর্ণ নবদ্বীপে।
জানি সভে আইসেন ভিক্ষুকের রূপে ॥ [তদেব : পৃ. ৬৮-৬৯]

বৃন্দাবনদাস বিষ্ণুপ্রিয়াকেও লক্ষ্মী বলেই পরিচিত করেছেন—বিষ্ণুপ্রিয়া নাম না ব'লেই তাঁর কথা বলেছেন। ড. বিমানবিহারী মজুমদার মনে করেন, "বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্য ভাগবতে বিষ্ণুপ্রিয়াকে লক্ষ্মী নামে উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবত গ্রন্থরচনার সময় বিষ্ণুপ্রিয়া জীবিত ছিলেন এবং তাঁহার প্রতি সম্ভ্রমবুদ্ধিতে কবি তাঁহার নাম করিয়া তাঁহার কথা বলেন নাই। নারায়ণরূপী বিশ্বম্ভর মিশ্রের পত্নী তত্ত্বতঃ লক্ষ্মী, সুতরাং লক্ষ্মী নামেই বিষ্ণুপ্রিয়ার সম্বন্ধে নিতান্ত প্রয়োজনীয় দুই চারিটি কথা বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন।" [শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান : পৃ. ৫৯৭]। ড. মজুমদারের ন্যায় পণ্ডিত এমন কথা কেন বললেন তা বোঝা গেল না। পরলোকগত মানুষের সম্বন্ধে কি সম্ভ্রম না দেখালেও চলে? জীবিত মানুষ সম্বন্ধে নাম উল্লেখ করে দুই চারিটি প্রয়োজনীয় কথা বললে কি তাঁর সম্ভ্রম হানি করা হয়? 'রাজপণ্ডিতে'র

কন্যার নাম গ্রন্থে 'লক্ষ্মী' ব'লে উল্লেখিত হলেই কি তৎকালীন মানুষরা এমন কি স্বয়ং বিষ্ণুপ্রিয়া সেই কন্যার সত্য পরিচয় বুঝতে পারবেন না ?

বৃন্দাবনদাস বুদ্ধিমান এবং গৌরসুন্দরকে অবতার ব'লেই মনে করতেন। গৌরচন্দ্র নিজে যাঁকে চিনে নিয়েছেন, "নিজ লক্ষ্মী চিনিয়া হাসিলা গৌরচন্দ্র", তাঁকে বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী ব'লে স্বীকার না করা প্রকৃত অবতারবাদীদের পক্ষে অসম্ভব ঃ তাই বৃন্দাবনদাসের পক্ষে বিষ্ণুপ্রিয়া "লক্ষ্মী প্রায়"। বিষ্ণুপ্রিয়াকে লক্ষ্মী ব'লে অভিহিত ক'রে বৃন্দাবনদাস তাঁকে লক্ষ্মীদেবীর ছায়া ব'লে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা প্রায় এড়িয়ে গেছেন। তাত্ত্বিক বুঝেছিলেন যে, বিশ্বম্ভর রূপী নারায়ণ লক্ষ্মীদেবীকেই বেছে নিয়েছিলেন নিজ পত্নীরূপে সুতরাং তাঁকে বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী ব'লে স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। বিষ্ণুপ্রিয়াকে তা হলে কোথায় বসান যাবে! বৃন্দাবনদাস সহজ বিশ্বাসে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে লক্ষ্মীদেবীর ছায়ারূপে দেখতে পেয়েছেন কিন্তু তাত্ত্বিকের পক্ষে তা সম্ভব হয় নি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব খাড়া করতে হবে তাঁকে ; তাই তাঁর কাছে বিষ্ণুপ্রিয়া বড় বকম সমস্যা : সুতরাং এড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয় ব'লে তিনি মনে করেছেন।

লোচনদাস তাত্ত্বিক নন, তাই তত্ত্বের দিকে না গিয়ে তিনি সমস্যা সমাধানের একটা সহজ উপায় বের করে নিয়েছিলেন ; তিনি লক্ষ্মীদেবীকে স্বর্গে পাঠালেন—বৈকুণ্ঠ এবং ইন্দ্রলোক, এ দুটো স্থানেব কথাও উল্লেখ কবলেন—

পরম অদ্ভুত সভে দেখে পরতেখ ॥
আকাশের পথে রথ আনিল গন্ধর্ব ।
হরি বলি, দেহ ছাড়ি, লখ্মী গেলা স্বর্গ ॥
লখ্মী-অংশ কোন শক্তি বৈকুণ্ঠ চলিল ।
দেখিয়া সকল লোক পরমবিহ্বল ॥
ইন্দ্রপুরী গেলা লখ্মী আপন আলয় ।
পবম লখ্মী-দ্যুতি সর্ব লখ্মীময় ॥ [চৈ. ম. ঃ পৃ. ৭৬]

লক্ষ্মীদেবী বৈকুণ্ঠে চললেন আবার নিজগৃহ ইন্দ্রপুরীতেও গেলেন। অস্পষ্টতা সৃষ্টি করলেন লোচনদাস : মনের মধ্যে অস্পষ্টতা থাকলে এমনিই হয়।

উপরোক্ত ধোঁয়াটে বক্তব্যের সঙ্গে সমতা রাখার উদ্দেশ্যে লোচনদাস আর একটি নূতন কথা শোনালেন। লক্ষ্মীদেবীর পরলোক প্রাপ্তিব পর বঙ্গদেশ থেকে ফিরে শোক সন্তপ্ত মাতাকে বললেন গৌরসুন্দর—

মায়েরে কহিল প্রভু—শুনহ বচন ।
পূর্বকথা কহি তার জন্মের কারণ ॥
ইন্দ্রের অপ্সরা নৃত্য কবে এক-কালে ।
[illegible]র নির্বন্ধ—পদস্খলন হৈল তারে (তালে ?) ॥
[illegible] হৈল—শাপ দিল সুরেশ্বরে ।
[illegible]তে জন্ম, গিয়া মনুষ্যের ঘরে ॥

শাপ দিয়া পুনঃ দয়া ভেল দেবরাজে।
দুঃখ না পাইব তুমি—হৈব বড় কাজে ॥
পৃথিবীতে অবতার হইবে ঈশ্বর।
তার বধূ হৈবা তুমি—এই দিল বর ॥
তবে ত আসিবে তুমি এই ইন্দ্রপুরী।
কহিল সকল—সেই ইন্দ্রের সুন্দরী ॥ [তদেব : পৃ. ৭৭]

কিন্তু লোচনদাস নতুন নতুন কাহিনী তৈরি ক'রেও সামলাতে পারেন নি।—তার পূর্বে যে চিত্র তিনি এঁকেছেন তা বৈকুণ্ঠনাথের উপযোগী নয় : ইন্দ্রের সভার নর্তকী জেনেও কি সে-ভাবটি তাঁর পক্ষে তবে শোভন হয়েছে? লোচনদাসই বলেছেন—

অন্তঃপট ঘুচাইল দোঁহে দোঁহে দেখি।
দোঁহে দোঁহা দেখি দোঁহার নাচয়ে দু' আঁখি ॥
চন্দ্র রোহিণী যেন একত্র মিলন।
অন্যোন্যে করয়ে দোঁহে কুসুমের রণ ॥
যেন হরপার্বতী—দোঁহে হৈলা মেলা। [তদেব : পৃ. ৭০]

ইন্দ্রেব সভার নর্তকী এবং বৈকুণ্ঠের নাথকে কি এ ভাবে অঙ্কিত করা সম্ভব?

বিষ্ণুপ্রিয়াকে লোচনদাস লক্ষ্মী ব'লে পরিচিত করার চেষ্টা করেছেন—

এই লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া, বিষ্ণু বিশ্বম্ভর হঞা,
পৃথিবীতে কৈল অবধানে। [তদেব : পৃ. ৮৪]

প্রথম বিবাহকে অপসবা উদ্ধাবের প্রয়োজনে লাগিয়ে লোচনদাস সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করলেও বিশেষ বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারেন নি। বিশেষ ক'রে বৃন্দাবনদাস এবং কৃষ্ণদাসে তাঁর বক্তব্যের কোন সমর্থন না থাকায় তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয়।

জয়ানন্দ লক্ষ্মীদেবীর পবলোক প্রাপ্তিব পূর্ব পর্যন্ত তাঁকে সাধারণ মানবীরূপেই দেখিয়েছেন। পবলোক প্রাপ্তিব পর তাঁকে বৈকুণ্ঠের ঈশ্বরী বলেছেন পবোক্ষ ভাবে—

গঙ্গা অন্তর্জলে লক্ষ্মী দিব্য মালা গলে।
চৌদিগে কীর্তিত সর্বলোক হরি বলে ॥
স্বর্গমর্ত্য পাতালে ভেদিল জয়ধ্বনি।
দিব্য রথে বৈকুণ্ঠ চলিলা ঠাকুরাণী ॥ [চৈ. ম. : পৃ. ৬৮]

বৈকুণ্ঠে গেলেন বটে কিন্তু বৈকুণ্ঠের ঈশ্বরী তো না-ও হ'তে পারেন। কিন্তু শচীমাতার শোক-আর্তির মধ্যে বিষয়টা যেন আরও একটু স্পষ্ট হয়ে উঠলো—

দারুণ বিষের জালে প্রাণ দিল মা গঙ্গা জলে
কে আর করিব মোর সেবা।
লক্ষ্মীর চরিত জত স্বপ্ন হেন মোর মত
দল্যা গেলা ক্ষীরোদসম্ভবা ॥ [তদেব : পৃ. ৬৯]

ক্ষীরোদসাগর থেকে লক্ষ্মী উঠে এসেছিলেন মন্থনেব পর। সুতরাং জয়ানন্দও গৌরসুন্দরের প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীদেবীকে বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীরূপেই দেখেছিলেন।

শচীদেবীর এই বিলাপের কালই আকাশবাণী হয়েছিল "বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ

গৃহিণী" ; ওদিকে বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতা সনাতন রাজপণ্ডিত আদেশ পেলেন জগন্নাথের। অলৌকিকত্ব এই পর্যন্ত। বিষ্ণুপ্রিয়া জয়ানন্দের হাতে বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী হয়ে ওঠেন নি।

লোচনদাসই সেকালের একমাত্র জীবনীকার যিনি লক্ষ্মীদেবীকে ইন্দ্রসভার নর্তকী ক'রে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে লক্ষ্মীর পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। আশ্চর্য এই যে, তারই ওপর নির্ভর ক'রে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকেই লক্ষ্মী ব'লে স্থির ক'রে নিয়েছেন এবং পরবর্তীকালের বৈষ্ণবরাও সেই মতই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যে রকম সোনার খাট, সোনার দণ্ড, মুক্তার ঝালরের ব্যবস্থা তিনি করেছেন তাতে গৌরাঙ্গদেবকে পঙ্কে নিমজ্জিত করার চেষ্টা হয়েছে মাত্র। বিষয়-বিরোধী ব্যক্তিত্বকে সোনার পালঙ্কে শুইয়ে দেবতা বানাবার চেষ্টা লজ্জাস্কর। বর্তমান কালের একদল সন্ন্যাসী অবশ্যই যথেষ্ট বৈভবের মধ্যে থাকেন, চৈতন্যদেবকে তাঁদেরই সঙ্গী ক'রে তোলায় একটা বিশেষ উদ্দেশ্য চরিতার্থ হতে পারে বটে, কিন্তু তাতে চৈতন্যদেবের প্রকৃত ভাবমূর্তি প্রকাশ করা যায় না।

গৌরসুন্দরকে অবতার করতে গিয়ে বৈষ্ণব জীবনীকাররা যেমন সমস্যায় পড়েছিলেন বিশ্বরূপ নিত্যানন্দকে নিয়ে, তেমনি বিপদগ্রস্ত হয়েছিলেন লক্ষ্মীদেবী এবং বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে নিয়ে।

শ্রীকৃষ্ণর যদি রুক্মিণী-সত্যভামা-জাম্ববতী থাকতে পারেন তাহলে চৈতন্যদেবের লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়ায় অসুবিধা কিসের? শ্রীকৃষ্ণ হয়তো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব নন, যদি বা হয়েও থাকেন, তবে বহু পুরাকালের ব্যক্তিত্ব ব'লে পৌরাণিক হয়ে উঠতে পেরেছেন ; তাই তাঁর পক্ষে যা সহজ হয়েছে তা প্রায় সমকালীন ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে গ্রহণযোগ্য হবে ব'লে সম্ভবত মনে করতে পারেন নি চৈতন্য জীবনীকারেরা। তাই ইচ্ছামত এবং পরস্পর বিরোধী অলৌকিক কাহিনী সৃষ্টি করতে হয়েছে তাঁদের।

চৈতন্যদেবকে অবতার রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়েই জীবনীকাররা সমস্যা সৃষ্টি করেছেন। সেকালে চৈতন্যদেব ছিলেন এক মহান ব্যক্তিত্ব যাঁর সমকক্ষ ব্যক্তিত্ব সমস্ত ভারতে আজও বিরল। সেই ব্যক্তিত্ব একটি উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্য নিয়ে নিজেকে গঠন করছিলেন। নিজের পছন্দমত গৃহিণী তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর অকাল মৃত্যু ঘটল। ইতিমধ্যে গৌরসুন্দর প্রস্তুত হয়েছেন বিরাট কর্মজগতে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। কেবল নবদ্বীপ বা নদীয়াই নয়, দিগ্বিজয়ী জয়ের পর উত্তর এবং দক্ষিণ ভারত এবং বঙ্গদেশে যাত্রার পর বঙ্গ এবং শ্রীহট্টে তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বৌদ্ধধর্মে জাত-পাত না থাকলেও শূন্যকে অনুধাবন করা যায় না। বৈষ্ণব ধর্মেও জাত-পাত নেই, আছে বিগ্রহ এবং প্রেমভক্তির হৃদয়াবেগ। এই ধর্মের ভিতর দিয়ে সামাজিক জীবনকে ঢেলে সাজাবার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন গৌরসুন্দর। উত্তরকালে তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন যে, মোক্ষলাভ চরম কথা নয়—সামীপ্যই আনন্দের—ঈশ্বরকে সামনে [illegible] সাধারণ সৎ মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের অধিষ্ঠান।

প্র[illegible] পর্ব পর্যন্ত তিনি গৃহী, তারপর আর সংসারের প্রয়োজন ছিল না তাঁর। [illegible] ইচ্ছায় ; গৌরসুন্দর বুঝেছিলেন যে, কঠিন কর্মের উন্মাদনায় তাঁকে [illegible] বৃদ্ধা মাতার নিঃসঙ্গ জীবনে সঙ্গদানের জন্য একটি বধূ যদি [illegible] হওয়া উচিত হবে না তাঁর পক্ষে।

[illegible] কথা কি ভাবেন নি বিশ্বম্ভর? ছোট সংসারকে

বেদনা না দিয়ে বৃহত্তর মানব সংসারের বেদনা দূর করার কল্পনা করা সম্ভব নয়। বৃহৎ প্রজাপুঞ্জের জন্য রামচন্দ্র দুঃখ দিয়েছিলেন আত্মার আত্মীয় সীতাদেবীকে—বৃহৎ মানব গোষ্ঠীর কল্যাণ কামনায় বিশ্বম্ভর দুঃখ দিয়েছিলেন নিজের জীবনের ঘনিষ্ঠতম দুই নারীকে—তার একজন তাঁর মাতা, অপরজন পত্নী। এই দুজন যদি চৈতন্যদেবকে সংসারে আবদ্ধ ক'রে রাখতে পারতেন, তবে ভারতবর্ষ হারাত তার একজন প্রথম সারির ব্যক্তিত্বকে, যে ব্যক্তিত্ব অকুতোভয়ে সমস্ত ভারতব্যাপী মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম ক'রে গেছেন। পূর্বতন কালের বহু সংস্কার তিনি অতিক্রম করেছেন—সমকালীন যুগে অপ্রয়োজনীয় বহু প্রাচীন বিশ্বাসকে তিনি নস্যাৎ ক'রে প্রতিষ্ঠা ক'রে গেছেন মানবতার ধর্ম। বৈদিক যুগে প্রতিটি ব্যক্তির যে মর্যাদা ছিল তাকেই নবরূপ দানের চেষ্টা ক'রে গেছেন তিনি। সেই মহান ব্যক্তিত্বকে অবতারবাদের রহস্যময় আলো-আঁধারে আচ্ছাদিত করতে গিয়ে জীবনীকাররা তাঁকে স্বর্গীয় করার চেষ্টায় তাঁর মনুষ্যত্বকে অপমানিত করেছেন। গবেষকরা সেই ব্যক্তিত্বকে উদ্ধার করবেন। বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর সেটাই মনের বাসনা।

১০. বিশ্বম্ভরের ব্যক্তিত্বের বিকাশ : প্রতিষ্ঠা অর্জন ও নেতৃত্বগ্রহণ

শিশুকাল থেকেই বিশ্বম্ভর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কি শক্তিতে, কি খেলায়, সাঁতারে, কি পড়ায় সর্বত্রই তার জয়-জয়কার। গৃহের অঙ্গনে অন্য শিষ্যদের সঙ্গে ক্রীড়ারত বিশ্বম্ভর। বৃন্দাবনদাস বলছেন—

ডুবিলা চাঞ্চল্য-রসে প্রভু বিশ্বম্ভর।
সংহতি চপল যত বিপ্র অনুচর॥
সভার সহিত গিয়া পড়ে নানা স্থানে।
ধরিয়া রাখিতে নাহি পারে কোন জনে॥
... ...
প্রভুর বালক সব জিনে প্রভু-বলে।
অন্য শিশুগণ যত সব হারি চলে॥ [চৈ. ভা. : পৃ. ২৭]

শিশুকাল থেকেই বন্ধুদের মধ্যে ছিল তার শক্তির প্রতিষ্ঠা। বিশ্বম্ভর যে বিশাল-বক্ষ, বৃষস্কন্ধ বলিষ্ঠদেহী ছিল সে কথা আগেই দেখা গেছে। বালক বিশ্বম্ভরকেও বন্ধুর দল নেতা ব'লেই মেনে নিয়েছিল। জয়ানন্দ বলেছেন—

চৌদিগে বালক সব গঙ্গাজলে ভাসে।
মাঝে গৌরাঙ্গ চান্দ করিল প্রকাশে॥ [জয়ানন্দ : চৈ. ম. : পৃ.২০]

বন্ধুদের মাঝে গৌরাঙ্গ—দলের মধ্যমণি যেন। দুরন্তপনায় সে প্রথম। ডুব সাঁতারে হঠাৎ সকলকে ছাড়িয়ে যায় বহুদূরে, গঙ্গার বিস্তীর্ণ বক্ষ এপার-ওপার করতে দ্বিধা করে না সে—এই দুঃসাহসিক কাজে খুব অল্প সংখ্যক বালকই তার সঙ্গী হতে পারে—

জলক্রীড়া করে প্রভু শিশুগণ-সঙ্গে।
ক্ষণে ক্ষণে গঙ্গার ওপার যায় রঙ্গে॥ [চৈ. ভা. : পৃ. ৩৭]

বিবাদ বাধাতেও নিমাই-এর সমকক্ষ কেউ নেই, তর্ক-বিবাদ-মারামারিতে সে প্রধান—

ঠাকুর কলহ করে প্রতি ঠাঞি ঠাঞি॥ [তদেব]

কেবল দুষ্টুমিতে বা শক্তিতেই নয়। জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রেও তার প্রাধান্য চোখে পড়ে। গঙ্গাদাস পণ্ডিত তো মনে করেন যে, বিশ্বম্ভর উত্তরকালে অধ্যাপক (ভট্টাচার্য) হবেই। সর্বশাস্ত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিশ্বম্ভরকে অধিকাংশ সময়েই পুস্তক হাতে দেখা যেত। গঙ্গাস্নান-বিষ্ণুপূজা-তুলসী মঞ্চে জল দান এবং ভোজনে কিছুটা সময় ব্যয় হতো—অবশিষ্ট সময় হয় গুরুগৃহে নয়তো গৃহে পুস্তকের মধ্যে ডুবে থাকতো কিশোর। 'রাত্রিদিন বিদ্যা-রসে নাহি অবসর'। [তদেব : পৃ. ৪৭]

বিতর্কের ব্যবস্থা হয়—সেখানেও দম্ভের প্রকাশ বিশ্বম্ভরের কথায়। এ সময়ে তার বয়স ১৬ বৎসর। 'বৃহস্পতি জিনিয়া' পাণ্ডিত্য; কিশোর দৃঢ়তার সঙ্গে বলে—

প্রভু বোলে "এথে আছে কোন বড় জন।
আসিয়া খণ্ডুক দেখি আমার স্থাপন॥" [তদেব]

মুরারি গুপ্তের সঙ্গেই বিশ্বম্ভর অধিকাংশ সময় দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হতো। মুরারি

বয়সে কিছু বড়, তাই চুপ ক'রে থাকতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু তাতে বিশ্বম্ভরের চলবে কেন—

প্রভু বোলে "ব্যাখ্যা কর আজি যে পড়িলা।
ব্যাখ্যা করে গুপ্ত, প্রভু খণ্ডিতে লাগিলা॥
গুপ্ত বোলে এক অর্থ প্রভু বোলে আর।
প্রভু ভৃত্যে কেহো কারে নারে জিনিবার॥ [তদেব ঃ পৃ. ৪৮]

বিশ্বম্ভরের পড়াশুনা সমাপ্ত হলো, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করলো সে ঃ বৃন্দাবনদাস আদিখণ্ডে বিদ্যাসমাপ্তির পরিচয় দিয়ে বলেছেন—

আদিখণ্ডে গৌরাঙ্গের সর্বশাস্ত্রে জয়।
ত্রিভুবনে নাহি হেন, যে সম্মুখ হয়॥ [তদেব ঃ পৃ. ৬]

এইবার অধ্যাপনা আরম্ভ করলেন গৌরসুন্দর ; দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হলেন অন্যান্য-অধ্যাপকের সঙ্গে ঃ কৃষ্ণদাস গোস্বামী বলেছেন—

বিদ্যোদ্ধত্যে কাহাকেও না করে গণন।
সকল পণ্ডিত জিনি করে অধ্যাপন॥ [চৈ. চ. ঃ পৃ. ৮২]

একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই যে গৌরসুন্দর সর্ব বিষয়ে প্রতিষ্ঠা অর্জনে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। ভাবমূর্তি তৈরি হলে তবেই নেতৃত্ব দেওয়া যায়! দেশে তখন নানা ধরনের অনাচার চলছে। বিদেশী রাজশক্তিও সাধারণ মানব-কল্যাণের কথা ভাবছে না—বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করলেও এবং কিছুটা সংযত মনোভাবের পরিচয় দিলেও দেশের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতি সদয় হবার উপায়ও ছিল না তার। তাই পারিপার্শ্বিক কারণেই ঔদ্ধত্য, দৃঢ়তা বজায় রেখেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে চেয়েছিলেন গৌরাঙ্গ। তাই সকল পণ্ডিত অধ্যাপকদের বিতর্কে পরাজিত ক'রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে চেয়েছিলেন তিনি—

যত অধ্যাপক—প্রভু চালেন সভারে।
প্রবোধিতে শক্তি কোন জনে নাহি ধরে॥
ব্যাকরণ-শাস্ত্রে সভে বিদ্যার আদান।
ভট্টাচার্য পণ্ডিতও নাহিক তৃণ-জ্ঞান॥ [চৈ. ভা. ঃ পৃ. ৫৪]

প্রাচীন কালের গ্রীক্-দার্শনিক সক্রেটিসের ন্যায় ধাত্রীর কৌশলে যুবক বিশ্বম্ভর অপরের চিন্তা ভাবনাকে মনের গভীর থেকে টেনে বের করতেন। সক্রেটিস গ্রীসের পথে পথে ঘুরে সমকালীন পণ্ডিতদের ধরে আলোচনা জুড়ে দিতেন এবং প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে তাঁদের কোণঠাসা ক'রে ফেলতেন ; বিশ্বম্ভরও সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করতেন। সকলের কাছে কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা জানতে চাইতেন এবং তাঁর সেই ব্যাখ্যাকে অতি সহজেই খণ্ডন ক'রে ফেলতেন আবার প্রতিপক্ষকে বিস্মিত ক'রে তাঁর ব্যাখ্যাকেই প্রতিষ্ঠিত করতেন। সক্রেটিসকে যেমন এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতেন দেশের পণ্ডিতরা তেমনি বিশ্বম্ভরকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতেন নবদ্বীপের অন্যান্য অধ্যাপকরা। বৃন্দাবনদাস বলেছেন—

অনুভবানন্দে করে নগর-ভ্রমণ।
সংহতি পরম-ভাগ্যবন্ত শিষ্যগণ ॥
দৈবে পথে মুকুন্দের সঙ্গে দরশন।
হস্তে ধরি প্রভু তানে বোলেন বচন ॥
"আমারে দেখিয়া তুমি কি কার্যে পলাও।
আজি আমা প্রবোধিয়া বিনা দেখি যাও" ॥ [তদেব]

মুকুন্দ তর্কে পরাজিত হলেন, অপর ভট্টাচার্যেরাও সহজেই পরাজয় বরণ করেন বিশ্বম্ভরের বুদ্ধি দীপ্তির কাছে। কিন্তু সূক্ষ্মবুদ্ধি তার্কিক বিশ্বম্ভর বেশ রসিকও ছিলেন ঃ সহপাঠী মুরারি গুপ্ত ছিলেন জাতিতে বৈদ্য ; তাঁকে তিনি পরিহাস ক'রে বলতেন, 'ব্যাকরণ পড়ে তোমার কি লাভ, গাছ-গাছড়া দিয়ে ওষুধ তৈরি ক'রে রোগী সেবা কর গিয়ে।' পরবর্তী কালে পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণ নিয়েও তিনি পরিহাস ক'রে বেশ আমোদ অনুভব করতেন।

সমস্ত নবদ্বীপে তখন তিনি শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব'লে স্বীকৃত হয়েছেন—সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন তিনি—

ঠাকুর ভ্রমেণ সর্ব নগরে নগরে ॥
পরম-পণ্ডিত জ্ঞান হইল সভার।
সভেই করেন দেখি সম্ভ্রম অপার ॥ [তদেব ঃ পৃ. ৫৫]

বৃন্দাবনদাস আরও বলেছেন—

প্রভু দেখিলেই মাত্র নগরিয়াগণ।
পরম আদর করি বন্দেন চরণ ॥
... ...
যবনেও প্রভু দেখি করে বড় প্রীত।
সর্বভূত-কৃপালুতা প্রভুর চরিত ॥ [তদেব ঃ পৃ. ৫৬]

দৈহিক শক্তিতে এবং জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হবার পর সাধারণ মানুষের সঙ্গে বিশেষ ভাবে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করলেন তিনি। নগরে ভ্রমণ করতে করতে উপস্থিত হলেন তন্তুবায়, গোয়ালা, গন্ধবণিক, মালাকার, তাম্বুলী এবং শঙ্খবণিকদের গৃহে। সকলের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্বন্ধ পাতিয়ে নিলেন। ওই সমস্ত সাধারণ মানুষরাও পরম সুন্দর ব্রাহ্মণকে একেবারে ঘরের মানুষের মতো ক'রে পেয়ে পরম আনন্দ অনুভব করলেন। জাত-পাতের কোন পার্থক্য রাখলেন না বিশ্বম্ভর। সাধারণ মানুষের মনে প্রীতির আসন পেয়ে গেলেন তিনি। উত্তরকালে এই ঘনিষ্ঠতা বিশেষ কাজে লেগেছিল বিশ্বম্ভরের।

সর্বজ্ঞের ঘরেও বিশ্বম্ভরকে নিয়ে গিয়েছিলেন বৃন্দাবনদাস ; তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নিমাইকে অবতার ব'লে পরিচিত করা। লেখকের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের প্রচেষ্টা অপেক্ষা চৈতন্যদেবের উদ্দেশ্যের দিকেই বিশেষ লক্ষ্য রাখা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য। সর্বযুগেই কর্মীকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগসূত্র রাখতে হয়—চৈতন্যদেবও তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সে কাজ করেছিলেন।

প্রতিষ্ঠার জন্য আরও করণীয় ছিল। কেবল নদীয়া অঞ্চলেই নয় বঙ্গদেশে শ্রীহট্টেও

পরিচিতির প্রয়োজন ছিল ; প্রয়োজন ছিল উত্তর ভারতেও প্রতিষ্ঠা অর্জনের। কেবল নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীকেই জয় করা নয়, বাইরের দিগ্বিজয়ী জয়েরও প্রয়োজন ছিল। দুটো ব্যাপারই ঘটে গেল ; তবে দিগ্বিজয়ী জয় আগে না বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠা আগে তা নিয়ে কিছু মত পার্থক্য দেখা যায় বৃন্দাবনদাস এবং কবিরাজ গোস্বামীর মধ্যে। আমরা বৃন্দাবনদাসকে গ্রহণ ক'রে দিগ্বিজয়ী জয়ের পরিচয় গ্রহণ করবো। হরিদাস গোস্বামী মশায় দিগ্বিজয়ীর পরিচয় দিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে ঃ তাঁর মতে দিগ্বিজয়ী কাশ্মীর-দেশীয় বিখ্যাত পণ্ডিত—শ্রীনিম্বার্ক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত একজন আচার্য, নাম শ্রীকেশব আচার্য। শ্রীকেশব কাশ্মীরী নামেই তিনি সাধারণ্যে পরিচিত ছিলেন। এ তথ্য কোথায় পাওয়া গেছে এবং তার প্রমাণ কি জানি না কিন্তু কোন বৈষ্ণব আচার্যের এমন গর্ব থাকে তা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না।

বৃন্দাবনদাস লিখেছেন—

পাই সরস্বতীর সাক্ষাতে বরদান।
সংসার জিনিঞা বিপ্র বুলে স্থানে স্থান ॥
সর্বশাস্ত্র জিহবায় আইসে নিরন্তর।
হেন নাহি জগতে, যে দিবেক উত্তর ॥ [তদেব ঃ পৃ. ৬২]

সর্বত্রই জয় লাভ করেছেন তিনি : তাঁর প্রশ্নের উত্তর দেবার শক্তি ছিল না কারও। নবদ্বীপ তখন বিদ্যার পীঠস্থান ব'লে পরিচিত। নবদ্বীপ-জয় না করতে পারলে জয় সম্পূর্ণ হয় না—সেখানকার পণ্ডিত সমাজের জ্ঞানের সীমা-পরিসীমা নেই। তাই বিদ্যার শেষ এবং প্রধান পীঠস্থান নবদ্বীপের উদ্দেশে যাত্রা করলেন তিনি। বহু স্থানে জয়লাভ ক'রে হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি উপঢৌকন পেয়েছেন তিনি : সে সমস্ত নিয়ে তিনি এলেন নবদ্বীপে, সেই সাড়ম্বর আগমনে সমস্ত নবদ্বীপ সচকিত হয়ে উঠল। দিগ্বিজয়ীর আগমন সংবাদ পৌঁছে গেল নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজে—'নবদ্বীপে আসিয়াছে এক দিগ্বিজয়ী।' [তদেব ঃ পৃ. ৬৩]

গর্বিত দিগ্বিজয়ীর কথা শিষ্যদের কাছ থেকে জানলেন নিমাই পণ্ডিত, তিনি শিষ্যদের সাবধান বাণী শুনিয়ে দিলেন—

যে যে গুণে মত্ত হই করে অহঙ্কার।
অবশ্য ঈশ্বর তাহা করেন সংহার ॥
ফলবন্ত বৃক্ষ আর গুণবন্ত জন।
নম্রতা সে তাহার স্বভাব অনুক্ষণ ॥ [তদেব ঃ পৃ. ৬৩]

প্রতিষ্ঠা অর্জনের প্রথম দিকে নিমাই নিজেও ছিলেন উদ্ধত, দর্পিত। কিন্তু এখন তিনি ফলবন্ত বৃক্ষ—প্রতিষ্ঠার জন্য যে নম্রতা একান্ত প্রয়োজনীয় তাও তিনি উপলব্ধি করেছেন। বিশ্বম্ভরের জীবনে মোড় ফেরার পালা আরম্ভ হয়ে গেছে অনেকদিন আগে থেকেই।

সন্ধ্যাকালে শিষ্যদের নিয়ে গৌরসুন্দর এলেন গঙ্গাতীরে : গঙ্গাজল স্পর্শ ক'রে নমস্কার করলেন পুণ্যতোয়া ভাগীরথীকে ; তারপর বসলেন তীরভূমিতে—শিষ্যগণ বসলো তাকে বেষ্টন ক'রে। এভাবে প্রতি সন্ধ্যাতেই চলে তাঁদের বিদ্যাচর্চা। সজ্ঞা ক'রে দিগ্বিজয়ী-জয় করতে চাইলেন না নিমাই পণ্ডিত—অতবড় মানুষটাকে অপমানিত করার

ইচ্ছা ছিল না তাঁর। নিজের বিদ্যাচর্চার স্থানেই তাঁর ভ্রান্তি প্রদর্শনের ইচ্ছা ছিল তাঁর। নিজেকেই প্রশ্ন করলেন নিমাই পণ্ডিত 'দিগ্বিজয়ী জিনিবাঙ কেমন প্রকারে?' নিজের মনেই সে প্রশ্নের উত্তর দিলেন 'বিরলে করিবাঙ দিগ্‌বিজয়ী জয়।' [তদেব]

দিগ্বিজয়ী তখন বেরিয়েছেন নবদ্বীপের পথে: গঙ্গার তীরে এসে নিমাইয়ের রূপ এবং বিদ্যাচর্চা দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন তিনি—

অপূর্ব দেখিয়া দিগ্বিজয়ী সুবিস্মিত।
মনে ভাবে এই বুঝি নিমাঞি পণ্ডিত॥ [তদেব ঃ পৃ. ৬৪]

শিষ্যদের কাছে পরিচয় পেয়ে গঙ্গা নমস্কার ক'রে দিগ্বিজয়ী সভা মধ্যে এসে বসলেন—নিমাই তাঁকে সমাদরে অভ্যর্থনা করলেন। দু-চার কথায় শিষ্টাচার বিনিময় ক'রে দিগ্বিজয়ীর কবিত্বের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার পর নিমাই তাঁকে অনুরোধ করলেন গঙ্গার মহিমা কীর্তন করতে। মুখে মুখে অপূর্ব কাব্য রচনা করলেন দিগ্বিজয়ী—নিমাইয়ের কথা মত তার ব্যাখ্যাও করলেন তিনি। কিন্তু আদি, মধ্য এবং অন্তে দোষ ধরলেন নিমাই। এবং—

শুনিয়া প্রভুর ব্যাখ্যা দিগ্বিজয়ী বিস্মিত।
মুখে না নিঃসরে বাক্য প্রতিভা স্তম্ভিত॥ [চৈ. চ. ঃ পৃ. ৮১]

দিগ্বিজয়ী কোন উত্তর দিতে না পেরে 'সাত পাঁচ বোলে বিপ্র, প্রবোধিতে নারে।'
[চৈ. ভা. ঃ পৃ. ৬৪]

তখন নিমাই তাঁকে অন্য কিছু পড়তে বললেন কিন্তু দিগ্বিজয়ী তখন আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন—'পড়িতেও পূর্ববৎ শক্তি নাহি আর।' [তদেব]

দিগ্বিজয়ী পরাজিত হওয়ায় শিষ্যরা—'শিষ্যগণ হাসিবারে উদ্যত হইলা'। [তদেব ঃ পৃ. ৬৫] ['তবে শিষ্যগণ সবে হাসিতে লাগিলা'। [(চৈ. চ. ঃ পৃ. ৮১)] 'হাসিতে লাগিলা' থেকে 'হাসিতে উদ্যত হইলা'র মধ্যে অধিকতর সংযমের পরিচয় আছে—নিমাই পণ্ডিত শিষ্যদের নিবারণ করলেন। কবিরাজ গোস্বামীর নিমাই পণ্ডিত এর পরে দিগ্বিজয়ীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন—কাব্যের দোষ যে কিছুই নয় তাও বুঝিয়ে দিলেন—

তুমি বড় পণ্ডিত মহাকবি-শিরোমণি।
যার মুখে বাহিরায় ঐছে কাব্যবাণী॥
তোমার কবিত্ব যৈছে গঙ্গাজলধার।
তোমার সমান কবি কোথা নাহি আর॥
ভবভূতি জয়দেব আর কালিদাস।
তা সবার কবিত্বে আছে দোষের আভাস॥
দোষ-গুণ বিচার এই অল্প করি মানি।
কবিত্ব করণে শক্তি তাহা সে বাখানি॥ [চৈ. চ. ঃ পৃ. ৮১-৮২]

বৃন্দাবনদাসে উপরোক্ত বক্তব্যটি নেই। তবে দুজনেই সেদিনের মত ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করার কথা বলেছেন।

নিমাইয়ের চরিত্রে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। পূর্বে দম্ভ ভরে সতীর্থদের

বিতর্কে আহ্বান করতেন—এখন আর সেই দম্ভ নেই, তিনি পরম বিনয়ী হয়ে উঠেছেন। তর্কে যাঁরা পরাজিত হন তাঁরাও আর অসন্তুষ্ট হন না। বৃন্দাবনদাস জানিয়েছেন—

এই মত প্রভুর কোমল ব্যবসায়।
যাহারে জিনেন সেহো দুঃখ নাহি পায়॥
... ...

জিনিঞাও কারো না করেন তেজ ভঙ্গ।
সভেই পায়েন প্রীত, হেন তান রঙ্গ॥
অতএব নবদ্বীপে যতেক পণ্ডিত।
সভার প্রভুর প্রতি মনে বড় প্রীত॥ [চৈ. ভা.: পৃ. ৬৫]

দিগ্বিজয়ী দিল্লি, কাশী, গুজরাট, বিজয়নগর, কাঞ্চী, হেলঙ্গ-তেলঙ্গ, উড়িষ্যা, গৌড় প্রভৃতি দেশের পণ্ডিতদের জয় ক'রে নবদ্বীপে এসেছিলেন। নিমাই পণ্ডিতের কাছে পরাজয়ের ফলে ওই সকল দেশে নিমাইয়ের নাম কিছুটা ছড়িয়ে নিশ্চয়ই পড়েছিল। তাঁর প্রতিষ্ঠা অর্জনের পক্ষে এই দিগ্বিজয়ী-জয় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। দিগ্বিজয়ী-জয়ের ফলে সমস্ত নদীয়ায় সর্বোত্তম পণ্ডিত ব'লে তাঁর পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হলো। নদীয়ার মানুষেরা তাঁকে 'বাদি সিংহ' উপাধি দিলেন। [তদেব: পৃ. ৬৭]। পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত নিমাই পণ্ডিতের নবদ্বীপে তখন বিশেষ মর্যাদা—

সর্ব-নবদ্বীপে সর্বলোকে হৈল ধ্বনি।
নিমাঞি-পণ্ডিত অধ্যাপক-শিরোমণি॥
. ...

নবদ্বীপে যারা যত ধর্ম-কর্ম করে।
ভোজ্য বস্ত্র অবশ্য পাঠায় প্রভু-ঘরে॥ [তদেব: পৃ. ৬৮]

'বড় বড় বিষয়ী'রাও তার পাশ দিয়ে যাবার সময় দোলা থেকে নেমে তাঁকে নমস্কার জানায়।

বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন এবার। হুসেন শাহের রাজত্বের সর্বস্থানে তাঁর প্রতিষ্ঠা চাই। মাতার আদেশ নিয়ে, লক্ষ্মীকে মাতার বিশেষ যত্ন করার নির্দেশ দিয়ে কয়েকজন বিদগ্ধ শিষ্য নিয়ে গৌরাঙ্গসুন্দর এলেন পদ্মাতীরে। অপূর্ব রূপবান পুরুষটিকে দেখে সকলেই বিমোহিত। পদ্মাতীরে কিছুদিন অবস্থান করলেন তিনি —দলে দলে শিষ্য আসতে লাগল তাঁর কাছে বিদ্যা অর্জনের জন্য। অনেকে জানালো যে, তারা অর্থ-বিত্ত নিয়ে ইতোপূর্বেই নবদ্বীপে পড়তে যাবে ব'লে স্থির করেছিল। নিমাই পণ্ডিতের নাম যে বঙ্গদেশেও ছড়িয়ে গিয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নিমাই কৃত টীকা-টিপ্পনীর কথাও তারা জানে। কিন্তু সাক্ষাতে পড়ার আগ্রহ খুবই স্বাভাবিক—

সাক্ষাতে শিষ্য কর, আমা সভাকারে।
থাকুক তোমার কীর্তি সকল সংসারে॥" [তদেব: পৃ. ৭০]

নিমাই পণ্ডিত শিষ্য গ্রহণ করলেন—বহু শিষ্য অল্প কিছুদিনের মধ্যেই যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হয়ে উঠলো—

শুনি সব বঙ্গদেশী আইসে ধাইয়া।
নিমাঞি পণ্ডিত স্থানে পড়িবাঙ গিয়া ॥
... ...
দুই মাসে সভেই হইলা বিদ্যাবান্ ॥
কত শত শত জন পদবী লভিয়া।
ঘরে যায়, আর কত আইসে শুনিয়া ॥ [ঐদেব]

কবিরাজ গোস্বামীও বলেছেন যে, বঙ্গদেশে নিমাই পণ্ডিতের—

বিদ্যার প্রভাব দেখি চমৎকার চিতে।
শত শত পড়ুয়া আসি লাগিল পড়িতে ॥ [চৈ. চ. : পৃ. ৮০]

বঙ্গদেশেই স্বপ্ন দেখে তপন মিশ্র এলেন গৌরাঙ্গসুন্দরের কাছে সাধ্য-সাধন তত্ত্ব বুঝবার জন্য। গৌরাঙ্গ তাঁকে তা বুঝিয়ে কাশীতে গিয়ে থাকতে বললেন, সেখানে আবার দেখা হবে এ কথাটাও তাঁকে জানিয়ে দিলেন। গৌরাঙ্গসুন্দর যে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ ক'রে চলেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কোন কারণ নেই। ধর্ম জগতে নেতৃত্ব দিতে গেলে যে সামাজিক জগতেও পরিবর্তন সাধন করতে হয় এ জ্ঞান তাঁর পূর্ণ মাত্রায় ছিল।

কয়েক মাস পদ্মাতীরে কাটিয়ে গৌরসুন্দর ফিরলেন নবদ্বীপে। শিষ্যদের দেওয়া স্বর্ণ-রৌপা-বাসন-কম্বল প্রভৃতি বহু সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে এলেন তিনি। বঙ্গদেশীয় বহু শিষ্যও তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করতে না পেরে নবদ্বীপে এসে উপস্থিত হলো—দুর্নিবার চৌম্বকী আকর্ষণ ছিল গৌরসুন্দরের।

সমস্ত দিক দিয়ে প্রতিষ্ঠা অর্জনের পর বৈষ্ণবদের নেতৃত্ব গ্রহণের সময়টি এলো। বৈষ্ণব ধর্মে জাত-পাতের বালাই নেই, তাঁরা মুসলমানকেও অঙ্কে ধারণ করতে পারেন। সকল মানুষকে যাঁরা সমান ব'লে জানেন এবং মানেন সেই ধর্মই ছিল নিমাইয়ের প্রিয়। তিনি ইতিহাস থেকে শিক্ষা পেয়েছিলেন যে, সত্যকার সমতা না আনতে পারলে বিশ্বাস অর্জন সম্ভব নয়। সমতা যেখানে আসবে সেখানে দেখা দেবে দৃঢ়তা। সমাজকে দৃঢ়বদ্ধ করতে হলে সব মানুষকে এক সূত্রে বাঁধতেই হবে। দুঃখী মানুষের জন্য তাঁর বেদনাবোধের অন্ত ছিল না—

প্রভু সে পরম ব্যয়ী ঈশ্বর-ব্যভার।
দুঃখিতেরে নিরবধি দেন পুরস্কার ॥
দুঃখিতে দেখিলে প্রভু বড় দয়া করি।
অন্ন-বস্ত্র, কপর্দক দেন গৌরহরি ॥
নিরবধি অতিথি আইসে প্রভু-ঘরে
যার যেন যোগ্য প্রভু দেন সবাকারে ॥ [চৈ. ভা. : পৃ. ৬৮]

প্রতিদিন দশ বিশ জন সন্ন্যাসীকেও আহার্য দিতেন। জ্ঞানের প্রতিষ্ঠার পর গৌরাঙ্গ-সুন্দরের মানবতার প্রতিষ্ঠা হলো। তিনি এখন পরিপূর্ণ মানুষ—বিরাট ব্যক্তিত্ব।

নিমাইকে দেখে জ্ঞানী মুরারি গুপ্ত বিস্মিত, তিনি ভাবেন—

চিন্তয়ে মুরারি গুপ্ত আপন হৃদয়ে।
"প্রাকৃত মনুষ্য কভু এ পুরুষ নহে ॥

"এমন পাণ্ডিত্য কিবা মনুষ্যের হয়ে।
হস্তস্পর্শে দেহ হৈল পরানন্দ ময়ে ॥
চিন্তলে ইহার স্থানে কিছু লাজ নাঞি।
এমন সুবুদ্ধি সর্বনবদ্বীপে নাঞি ॥ [তদেব : পৃ. ৪৮]

এই প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্বের প্রতি এবার নবদ্বীপের বৈষ্ণব সমাজের দৃষ্টি পড়ল। এমন মানুষের তো বৈষ্ণব হওয়াই উচিত ছিল—বৈষ্ণবদের নেতৃত্ব করার উপযুক্ততম ব্যক্তিত্বই যেন তাঁরা দেখতে পেলেন। বৃন্দাবনদাস বলেছেন গৌরসুন্দরের সমস্ত সম্ভাবনা সত্ত্বেও বৈষ্ণবরা যেন হতাশ—

দেখি বিশ্বম্ভর-রূপ সকল বৈষ্ণব।
হরিষ-বিষাদ হই মনে ভাবে সব ॥
"হেন-দিব্য-শরীরে না হয় কৃষ্ণ-রস।
কি করিব বিদ্যায় হইলে কালবশ ॥"
... ...

সাক্ষাতেও প্রভু দেখি কেহো কোহো বলে।
"কি কার্যে গোঙাও কাল তুমি বিদ্যাভোলে ॥" [তদেব : পৃ. ৫১]

অদ্বৈতের গৃহে অপূর্ব কণ্ঠে কীর্তন গান করেন মুকুন্দ দত্ত। তাঁর সঙ্গেও বিশ্বম্ভরের তর্কযুদ্ধ হয়, সর্ব শাস্ত্রজ্ঞ বিশ্বম্ভরের নিকট পরাজিত হয়ে ভাবতে ভাবতে চলেন তিনি—

"এমত সুবুদ্ধি কৃষ্ণভক্ত হয় যবে।
তিলেকো ইহান সঙ্গ না ছাড়িয়ে তবে ॥" [তদেব : পৃ. ৫৫]

মনে হয় মুকুন্দ আশা করেছিলেন যে, একদিন বিশ্বম্ভর নেতৃত্ব দেবেন বৈষ্ণবদের। যাঁর সঙ্গ ছাড়া সম্ভব নয় তিনিই তো নেতা হবার উপযুক্ত!

বিশ্বম্ভরের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করলেন ঈশ্বরপুরী। গোপনে তিনি এলেন নবদ্বীপে। বৃন্দাবনদাস বলেছেন—

হেনকালে নবদ্বীপে শ্রীঈশ্বরপুরী।
আইলেন অতি-অলক্ষিত বেশ ধরি ॥ [তদেব : পৃ. ৫২]

তাঁর প্রেম বিহ্বলতা দেখে বৈষ্ণবরা তাঁর সত্য পরিচয় পেলেন; কিন্তু অন্যদের কাছে তিনি 'অলক্ষিতে বুলেন, চিনিতে কেহো নারে।' [তদেব : পৃ. ৫৩]

একদিন নিমাই পণ্ডিত অধ্যাপনা শেষে গৃহে ফিরছেন, পথে ঈশ্বরপুরীর সংগে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। পুরী নিমাইকে দেখে কোন সিদ্ধপুরুষ ব'লে মনে করলেন, পরে নিমাইয়ের পরিচয় পেয়ে খুবই সন্তুষ্ট হলেন—"তুমি সে!" বলিয়া বড় হৈল হরষিত।' স্পষ্ট বোঝা গেল যে 'নিমাই পণ্ডিতে'র নাম তখন বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। সেই পণ্ডিত প্রবরের সঙ্গে আলাপ হওয়ায় পুরী খুবই আনন্দিত হলেন—কয়েকমাস ধরে নানা বিষয়ে আলোচনা হলো উভয়ের মধ্যে—উভয়েই পরম আনন্দ উপলব্ধি করলেন।

এরপর গৌরসুন্দর গেলেন গয়ায়, সেখানেও সাক্ষাৎ পেলেন ঈশ্বরপুরীর। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঈশ্বরপুরী-গৌরসুন্দরের সাক্ষাৎ ঘটান নি নবদ্বীপে—

তবে ত করিল প্রভু গয়াতে গমন।
ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তথাই মিলন ॥ [চৈ. চ. : পৃ. ৮২-৮৩]

চৈতন্যভাগবত এবং চরিতামৃতের মতে ঈশ্বরপুরীর নিকট দশাক্ষর মন্ত্র নিয়ে গৌরসুন্দর 'কৈল প্রেম-পরকাশ।' [চৈ. চ. : পৃ. ৮৩] বৃন্দাবনদাস গৌরসুন্দরের পরিবর্তনের চিত্রটি একটি আঁচরে ফুটিয়ে তুলেছেন—

যে প্রভু আসিলা অতি পরম-গম্ভীর।
সেই প্রভু হইলা প্রেমে পরম-অস্থির ॥ [চৈ. ভা. : পৃ. ৯১]

দেশে ফিরে এসে সকল বৈষ্ণবদের ইচ্ছায় গ্রহণ করলেন বৈষ্ণবদের নেতৃত্ব। গৌরাঙ্গ রামাইকে পাঠালেন অদ্বৈত আচার্যের গৃহে—আজ সকল বৈষ্ণবের পূজা গ্রহণ করবেন তিনি। নিত্যানন্দ ছত্র ধরলেন মস্তকে—

নিত্যানন্দ জানে সব প্রভুর ইঙ্গিত।
বুঝিয়া মস্তকে ছত্র ধরিলা ত্বরিত ॥
গদাধর বুঝি সেই কর্পূর তাম্বূল।
সর্বজনে করে সেবা—যেন অনুকূল ॥ [তদেব : পৃ. ১২৯]

চৈতন্যদেবের আজ্ঞায় নবদ্বীপ-শান্তিপুরের বৈষ্ণব প্রধান জগন্নাথ-শচীদেবীর গুরু-সদৃশ অদ্বৈত আচার্য সস্ত্রীক তাঁর পূজো করলেন—

পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা পরম হরিষে।
চৈতন্যচরণ পূজে অশেষবিশেষে ॥
প্রথমে চরণ ধুই সুবাসিত জলে।
শেষে গন্ধে পরিপূর্ণ পাদপদ্মে ঢালে ॥
চন্দনে ডুবাই দিব্য তুলসীমঞ্জরী।
অর্ঘ্যের সহিত দিলচরণ-উপরি ॥
গন্ধ-পুষ্প, ধূপ, দীপাপঞ্চ উপচারে।
পূজা করে প্রেম-জলে বহে মহাধারে ॥ [তদেব পৃ. ১৩০]

চৈতন্যদেবও 'চরণ তুলিয়া দিলা অদ্বৈত মাথায়' [তদেব]। প্রতিষ্ঠা অর্জনের পর নেতৃত্ব গ্রহণ সম্পূর্ণ হলো। এরপর চৈতন্যের রাজকীয় অভিষেক। বৃন্দাবনদাসের কথায়—

প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিলেন ভক্তগণ।
অভিষেক করিতে সভার হৈল মন ॥
সর্ব-ভক্তগণ বহি আনে গঙ্গাজল।
আগে ছাঁকিলেন দিব্য-বসনে সকল ॥
শেষে শ্রীকর্পূর-চতুঃসম আদি দিয়া।
সজ্জ করিলেন সভে প্রেমযুক্ত হৈয়া ॥ [তদেব : পৃ. ১৪৬]

সর্বাগ্রে জল ঢাললেন নিত্যানন্দ। নিত্যানন্দ ব্যতীত সকলকেই গৌরসুন্দর বর চাইতে বলেছেন : নিত্যানন্দের কৌপীন চিরে ভক্তদের মধ্যে তার অংশ বিলিয়ে তিনি নিত্যানন্দকে বসিয়ে দিলেন নেতৃত্বের দ্বিতীয় স্থানে। বৈষ্ণব আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠলো।

১১· গণতান্ত্রিক ব্যক্তিত্ব : দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতা

নিমাই ছিল স্বাভাবিক নেতা। প্রতিবেশী গৃহের খাদ্যাদি নিজে চুরি করতো। অন্য শিশুদের দিয়ে চুরি করতো। বালক বয়সে গঙ্গায় স্নানকালে তাকেই দেখা যেত প্রধান রূপে। কিন্তু শিশুকাল থেকেই তার চরিত্রে গণতন্ত্রী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। লোচনদাস বলেছেন যে, কুকুর ছানা নিয়ে খেলার সময় একদিন অন্য বালকেরা নিমাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে খেলা বন্ধ করতে চাইল—

খেলিতে খেলিতে, তথি আচম্বিতে,
শ্বান-শাবক দুই-চারি।
বাঢ়ল কৌতুক, তহি বাছি এক,
ধরি লইল গৌরহরি॥
সঙ্গের ছাওয়ালে, কহিল এহারে,
শুন শুন বিশ্বম্ভর।
কুৎসিত ছাড়িলে, ভাল তুমি নিলে,
না খেলিব—যাব ঘর॥ [চৈ. ম. : পৃ. ৪৬]

কিন্তু বিশ্বম্ভরই তো দল-নেতা! সুন্দর কুকুর ছানাটি ধরেছেও সে, সুতরাং সেটি তারই হওয়ার কথা। বিশ্বম্ভরের মনের পরিচয় পাওয়া গেল তার কথায়। সঙ্গীদের তো সে বঞ্চিত করতে পারে না—সে সহজ ভাবেই জানাল—

তবে বিশ্বম্ভর, কহিল উত্তর,
এই শ্বান সবাকার। [তদেব]

শ্বান-শাবক নিয়ে খেলবে সকলে, সবারই তার ওপর সমান অধিকার। কিন্তু থাকবে সেটা এক জনের কাছেই—সে অধিকার নিশ্চয়ই তার প্রাপ্য—

সবে এক হঞা, খেল ইহা লঞা,
থাকিবে ঘরে আমার॥ [তদেব : পৃ. ৪৭]

যৌবনে বিবাহের পরেও প্রায়ই যেতেন সাধারণ মানুষের গৃহে ; গোয়ালা গন্ধ-বণিক-মালাকার-তাম্বুলীদের গৃহে গিয়ে স্বচ্ছন্দে মিলতেন সকলের সঙ্গে। রূপ-বিদ্যা-ব্রাহ্মণত্বের অভিমান কিছুমাত্র ছিল না তাঁর। এই তো প্রকৃত গণতন্ত্রীর মনোভাব! গোয়ালারা তাঁকে ভাত খাবার জন্য অনুরোধও করে—বিশ্বম্ভর তাদের কাছে সহজ হ'তে পেরেছিলেন বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল।

গয়া থেকে ফেরার সময় বিশ্বম্ভরের ইচ্ছা হলো নবদ্বীপে না ফিরে মথুরায় যাবার। বৃন্দাবনদাস লিখেছেন—

কাহারে না বলি প্রভু কথো রাত্রি শেষে।
মথুরারে চলিলেন প্রেমের আবেশে॥ [চৈ. ভা. : পৃ. ৯১]

বৃন্দাবনদাসের মতে মথুরায় যাওয়া হয়নি দৈববাণীর ফলে—

"এখনে মথুরা না যাইবে দ্বিজমণি। [তদেব]

লোচনদাসও প্রায় একই কথা বলেছেন। গয়া থেকে বৃন্দাবনে যাবার ইচ্ছা ছিল

বিশ্বম্ভরের ; কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াল দৈববাণী। বৃন্দাবন যাবার সময় হবে সন্ন্যাস গ্রহণের পর—গৃহে ফেরার আদেশ হলো দৈববাণীর মাধ্যমে।

কিন্তু ভক্ত জীবনীকার জয়ানন্দ বহুক্ষেত্রেই বাস্তবকে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। আবেগপ্রবণ ভক্তরা তাঁকে স্বীকৃতি না দিলেও এ ক্ষেত্রেও তাঁর কথাকেই অধিকতর সত্য ব'লে মনে হয়। চৈতন্যদেব অবতার হলে তাঁকে গৃহে ফেরাবার জন্য দৈববাণীর প্রয়োজন হবে কেন? নিজের অন্তরেই তো তিনি গৃহে ফেরার প্রয়োজন উপলব্ধি করবেন ঃ আর তিনি যদি অবতার না হন তবে তাঁকে পথ নির্দেশের জন্য দৈববাণীই বা কেন? এক বিশেষ আবেশময় অবস্থায় বৃন্দাবন-মথুরা যাবার ইচ্ছা মনে জাগা অস্বাভাবিক নয় কিন্তু এ ইচ্ছা খুব দৃঢ়তাপূর্ণও হয় না। তাই সঙ্গীদের মনোভাবের উপর নির্ভর করতেই হয়। যাঁদের সঙ্গে নিয়ে গেছেন গয়ায়, তাঁদের দেশের পথে যেতে ব'লে একাকী বৃন্দাবন-মথুরা যেতে চাইলে সঙ্গীরা ছাড়বেন কেন? হয় সবাই মিলে মথুরা-বৃন্দাবন না হয় তো সবারই একত্র দেশে যাত্রা—এটাই সম্ভবপর। জয়ানন্দ লিখেছেন—

ঈশ্বর হাসিয়া বৈল সকল ব্রাহ্মণে।
দেশেরে চলহ তুমি আমার বচনে ॥
মথুরা জাইব আমি না জাইব দেশে।
আমার মা এরে সভে কহিয় বিশেষে ॥ [জয়ানন্দ ঃ চৈ.ম. ঃ পৃ. ৪৯]

বিশ্বম্ভরের এই অসম্ভব কথা শুনে কাঁদতে লাগলেন মুরারি গুপ্ত, শ্রীনিবাস, গদাধর পণ্ডিত, গোপীনাথ পণ্ডিত, আচার্য বিদ্যানিধি, জগদানন্দ, মুকুন্দ প্রভৃতি সঙ্গীগণ। মর্যাদাসম্পন্ন সঙ্গীদের ক্রন্দন শুনে মত পরিবর্তন করলেন বিশ্বম্ভর—

সভার ক্রন্দন শুনি না গেলা মথুরা। [তদেব]

যাবার জন্য তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন না। তাই সকলের মনোভাবকে তিনি অস্বীকার করেন নি। গণতান্ত্রিক চেতনা ছিল ব'লেই এই মত পরিবর্তন সম্ভব হয়েছিল। যেখানে দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে হবে সেখানে বিশ্বম্ভর ছিলেন আশ্চর্য রকম কঠোর। কিন্তু যেখানে দৃঢ়তা প্রদর্শন অপ্রয়োজনীয় সেখানে সকলের মতের প্রতি তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল।

নবদ্বীপে বৈষ্ণব সমাজ কি তাঁকে নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত? সেটা ইঙ্গিতে জানতে চাইলেন তিনি। সে ইঙ্গিত বুঝে বৈষ্ণব ভক্তরা অভিষেকের ব্যবস্থা করলেন—গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন এবং হলোও তাই—

প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিলেন ভক্তগণ।
অভিষেক করিতে সভার হৈল মন ॥
সর্ব-ভক্তগণ বহি আনে গঙ্গাজল।
... ...
অভিষেক মন্ত্র সভে লাগিলা পড়িতে ॥
সর্বাদ্যে শ্রীনিত্যানন্দ জয় জয় বলি।
প্রভুর শ্রীশিরে জল দিলা কুতূহলী ॥

অদ্বৈত শ্রীবাসাদি যতেক প্রধান।
পড়িয়া পুরুষসূক্ত করায়েন স্নান॥ [চৈ. ভা. ঃ পৃ. ১৪৬]

কেবল বৈষ্ণব প্রধানরাই নন সাধারণ বৈষ্ণব ভক্তরাও যে, অভিষেকে অংশ নিয়েছিলেন তা জানা যায় জল ঢালার পরিমাণ থেকে: চৈতন্যদেবের শ্রীশিরে ঢালা হয়েছিল 'নামমাত্র অষ্টোত্তরশত ঘট জল'। [তদেব]

সন্ন্যাস গ্রহণের কালেও তাঁর গণতন্ত্রী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গেছে। জয়ানন্দ লিখেছেন যে, চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা জেনে পারিষদবর্গকে নিয়ে এলেন হরিদাস: তাঁদের দেখে—

প্রভু বলেন আস্য আস্য আমা পাশে।
বৈরাগ্য চলিলাঙ আমি কৃষ্ণের হাইবাশে॥
(চলিলাম আমি প্রভুর উদ্দেশে॥) [জয়ানন্দঃ চৈ. ম. ঃ পৃ. ১০৪]

সন্ন্যাস গ্রহণের ব্যাপারে চৈতন্যদেব ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কিন্তু ভক্তদের অখুশী করতেও তিনি চান নি। সহজ মনেই তিনি দায়িত্ব ভাগ ক'রে সকলের সম্মতি জেনে নিলেন—

নদিয়া ফুলিয়া শান্তিপুর খড়দহ কুমারহট্ট।
পাঁচজন বাছ্যা লেহ করিয়া সংহট্ট॥
আমার নবদ্বীপ আচার্য গোসাঞি শান্তিপুরে।
খড়দহ নিত্যানন্দে ফুলিয়া হরিদাস ঠাকুর॥
শ্রীনিবাস কুমারহট্ট সর্ব-গুণধাম।
হরিদাস ঠাকুর মাগিয়া লইলা ফুলিআ নবগ্রাম॥ [তদেব]

শ্রীচৈতন্য বিভিন্ন স্থানের দায়িত্ব বিভিন্ন ভক্ত প্রধানের ওপর ন্যস্ত করতে চাইলেন বটে কিন্তু প্রত্যেকের ইচ্ছাকেও দিলেন মর্যাদা—হরিদাসের 'মাগিয়া লওয়া'—তারই ইঙ্গিতবহ। পরোক্ষভাবে সন্ন্যাসকেও স্বীকৃতি দিলেন ভক্তরা।

সন্ন্যাস-গ্রহণ বিষয়ে বৃন্দাবনদাসও শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের গণতান্ত্রিক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে নিত্যানন্দের কাছে অনুমতি চাইলেন—

সন্ন্যাসী হইয়া কালি প্রতি-ঘরে-ঘরে।
ভিক্ষা করি বুলোঁ দেখো কে মোহরে মারে॥
তোমারে কহিলুঁ এই আপন হৃদয়।
গারিহস্থ বাণ আমি ছাড়িব নিশ্চয়॥
ইথে তুমি কিছু দুঃখ না ভাবিও মনে।
বিধি দেহ তুমি মোরে সন্ন্যাস-কারণে॥ [চৈ. ভা. ঃ পৃ. ২৩৭]

গৌরাঙ্গ ইচ্ছাময় ব'লেও কিন্তু সকলের সম্মতি নিতে বললেন নিত্যানন্দ। ইচ্ছা যেখানে দৃঢ়বদ্ধ সেখানে ভক্তরা তো বাধা দেবেন না, তবু তাঁদের সম্মতির প্রয়োজন আছে। চৈতন্যদেব অদ্বৈত আচার্যকে এড়িয়ে গেলেন—গুরুতুল্য আচার্য নিষেধ করলে তো বিপদে পড়বেন তিনি। অন্যান্যদের স্বীকৃতি আদায় ক'রে নেওয়া হয়তো দুঃসাধ্য হবে না। হলোও তাই। মুকুন্দ-গদাধর প্রভৃতি ভক্তরা তাঁর সন্ন্যাসের কথা শুনে শোকাহত হয়েও সম্মতি দিলেন।

জগাই-মাধাই উদ্ধারে নিত্যানন্দের ভূমিকাই অগ্রগণ্য। মাধাই কলসীর মুটকী মেরেছিল অবধূতের মাথায়—

মারিল প্রভুর শিরে মুটকী তুলিয়া ॥
ফুটিল মুটকী শিরে রক্ত পড়ে ধারে। [তদেব ঃ ১৭০]

জগাইকে ক্ষমা করলেন শ্রীচৈতন্য কিন্তু মাধাই অপরাধ করেছে নিত্যানন্দের কাছে। সুতরাং তাকে ক্ষমা করার অধিকার একমাত্র নিত্যানন্দের—

প্রভু বোলে "অপরাধ কৈলে তুমি বড়।
নিত্যানন্দ-চরণ ধরিয়া তুমি পড় ॥" [তদেব ঃ পৃ. ১৭১]

গণতান্ত্রিক মনোভাব থাকলে নিজেকে কেউ প্রধান ব'লে মনে করে না—চৈতন্যদেবও তাই প্রধান হয়েও অপরকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছেন। ঠিক এমনি ঘটনা ঘটেছিল শ্রীবাসের ক্ষেত্রেও। যে বিপ্র শ্রীবাসকে অসম্মান করেছিল তার হয়েছিল কুষ্ঠ রোগ—শ্রীবাসের কাছেই ক্ষমা চাইতে হয়েছিল তাকেও।

মাধাইকে ক্ষমা করলেন নিত্যানন্দ—উদ্ধার হলো জগাই-মাধাই। শ্রীচৈতন্যের গণতান্ত্রিক চেতনা ছিল বহুদূর প্রসারিত। তাই নিত্যানন্দের ক্ষমা লাভের পরও প্রয়োজন হলো সমস্ত বৈষ্ণব ভক্তের অনুগ্রহ। এর ফলে মর্যাদা দেওয়া হলো বৈষ্ণব ভক্তদের—মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হলো জগাই-মাধাইকেও। কোন বৈষ্ণবই আর কোনদিন এ দুজনকে নীচ বা হীন ব'লে মনে করতেও পারবে না : তাই চৈতন্যদেব বললেন—

প্রভু বোলে "দুই মদ্যপ নহে আর।
আজি হৈতে এ দুই সেবক আমার ॥
সভে মিলে অনুগ্রহ কর এ দুয়েরে।
জন্মে জন্মে এ আর যেন মোরে না পাসরে ॥
যেরূপ যাহার ঠাঞি আছে অপরাধ।
ক্ষমিয়া এদের প্রতি করহ প্রসাদ ॥"
শুনিয়া প্রভুর বাক্য জগাই মাধাই।
সবার চরণে ধরি পড়ে সেই ঠাঞি ॥
সর্ব মহা-ভাগবতে কৈল আশীর্বাদ।
জগাই মাধাই দোঁহে হৈল নিরপরাধ ॥ [তদেব ঃ পৃ. ১৭৩]

রূপ-সনাতনের ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। গৌড় হয়ে বৃন্দাবনে যাবেন ব'লে বেরিয়েছেন শ্রীচৈতন্য, কিন্তু এসে উপস্থিত হলেন রামকেল গ্রামে। রাত্রে গোপনে দেখা করতে এলেন নবাব হুসেন শাহের প্রধান দুই হিন্দু কর্মচারী রূপ-সনাতন। হিন্দুর মন্দির ধ্বংসকারী হুসেন শাহের রাজ্য তাই রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায় চৈতন্যদেবের অবস্থানের। চৈতন্যদেবের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাতের উপায় নেই কারও—নিত্যানন্দ-হরিদাসের অনুমতি নিয়ে তবে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। দর্শন পেলেন রূপ-সনাতন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁদের বললেন—

দৈন্যপত্রী লিখি মোরে পাঠাইলে বারবার।
সেই পত্রীতে জানিঞাছি তোমার ব্যবহার ॥

তোমার হৃদয় আমি জানি পত্রী-দ্বারে।
শিখাইতে শ্লোক লিখি পাঠাইল তোমারে ॥
[চৈ. চ. ঃ পৃ. ১০৭]

ধর্মনেতা শ্রীচৈতন্য রাজনৈতিক নেতার ন্যায় বুদ্ধির পরিচয় দিলেন। রূপ-সনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চলেছেন একথা নিত্যানন্দ-হরিদাসকেও বলেন নি। নীলাচল-গৌড়ের সকলেই জানে, প্রধান প্রধান ভক্তরাও জানেন যে, তিনি চলেছেন বৃন্দাবনে; তিনি রূপ-সনাতনকে পেয়ে স্পষ্ট ক'রে জানালেন—

গৌড়-নিকট আসিতে মোর নাহি প্রয়োজন।
তোমা দোঁহে দেখিতে মোর ইঁহা আগমন ॥
এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে।
সবে বোলে কেন আইলা রামকেলি গ্রামে ॥ [তদেব]

রূপ-সনাতনের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য সাক্ষাৎ করতে আসছেন জানলে হুসেন শাহ কি সহজ মনে তা গ্রহণ করতে পারতেন ঃ চৈতন্যদেবের কোন বিপদ হতো না এমন কথাও বলা চলে না। ধর্মনেতাদেরও সেকালে কৌশল অবলম্বন করতে হতো ঃ বৌদ্ধ ধর্ম-নেতাদের অনেকের দুরবস্থার কথাই জানতেন তিনি। তাই তাঁর রামকেলি গ্রামে আগমনের কারণ 'কেহ নাহি জানে'। রূপ-সনাতনও সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন রাতের অন্ধকারে 'বেশ লুকাইয়া' অর্থাৎ ছদ্মবেশে। দু' ভাইকে বিদায় দেবার কালে প্রকাশ পেল চৈতন্যদেবের গণতান্ত্রিক মনোভাব—

দোঁহা আলিঙ্গিয়া প্রভু কহিল ভক্তগণে।
সবে কৃপা করি উদ্ধারহ দুইজনে ॥ [তদেব]

উদ্ধারের নিমিত্ত সকলের কৃপা প্রয়োজন। চৈতন্যদেবের এই উদার গণতন্ত্রী মনোভাবের পরিচয় একালে বিশেষ পাওয়া যায় না।

গণতন্ত্রী চেতনাসম্পন্ন মানুষ অন্যের মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন থাকেন—নেতাকে ভবিষ্যৎ ছোট-বড় নেতাও তৈরি করতে হয়। চৈতন্যদেব সে বিষয়ে বিশেষ সচেতন ছিলেন। তাই তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—

হুঙ্কার করিয়া বোলে শ্রীশচীনন্দন ॥
"মোর এই সত্য সভে শুন মন দিয়া।
যেই মোরে পূজে মোর সেবক লঙ্ঘিয়া ॥
সে অধম জনে মোরে খণ্ড খণ্ড করে।
তার পূজা মোর গায়ে অগ্নি হেন পড়ে ॥
[চৈ. ভা. ঃ পৃ. ২০০]

এই মনোভাব গ্রহণ করলে দ্বিতীয়-তৃতীয় সারির নেতা তৈরি হতে পারে। বঙ্গদেশে সে সময় দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের প্রয়োজন হয়েছিল ঃ চৈতন্যদেবের ন্যায় বলিষ্ঠ কুশলী নেতার অভ্যুদয় সেকালে ঘটেছিল ব'লেই বৈষ্ণব ধ্যান-ধারণার এত প্রসার ঘটেছিল এদেশে।

আপদে-বিপদে সহযোগীদের সঙ্গ দিতে হয় নেতাকে। শ্রীবাসের গৃহে কীর্তন

চলছিল, নৃত্য করছিলেন গৌরাঙ্গদেব। সে সময় মৃত্যু হয় শ্রীবাসের কিশোর পুত্রের। জানতে পেরে কীর্তন থামিয়ে তিনি বালকের দেহ সৎকারের জন্য সকলের সঙ্গে শ্মশানে গেলেন—

সর্ব-গণ সহ প্রভু বালক লইয়া।
চলিলেন গঙ্গাতীরে কীর্তন করিয়া॥ [জয়দেব ঃ পৃ. ২৩৩]

এ নেতৃত্ব বাইরে থেকে প্রক্ষিপ্ত নেতৃত্ব নয়—এ নেতৃত্ব অতি সহজে হৃদয়ের অন্তস্থলে আসন গ্রহণ। চৈতন্যদেব পাণ্ডিত্যের জোরে নেতা হন নি—তাঁর উদার হৃদয়ের ভালবাসা তাঁকে সর্বমানবের হৃদয়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছিল।

কেবল সকলের সঙ্গে মিলিত হওয়া এবং নেতৃত্বের বিভিন্ন স্তর গঠনই নয়, দ্বিতীয় নেতৃপদেও তিনি বসালেন উপযুক্ত ব্যক্তিটিকে। অদ্বৈত আচার্য সকলের শ্রদ্ধেয়, গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের আবির্ভাবের পূর্বে তিনিই ছিলেন বৈষ্ণব সমাজের নেতা। কিন্তু তিনি গৃহস্থ এবং বয়োবৃদ্ধ। তাই তাঁকে নূতন চিন্তার জগতের নায়ক করা সঠিক কাজ হবে না এটা উপলব্ধি করেছিলেন চৈতন্যদেব। সংসার বন্ধনহীন সর্ব-ভারত পর্যটনকারী বলিষ্ঠদেহ নিত্যানন্দকেই তিনি নেতৃত্বের দ্বিতীয় স্থান অধিকারের উপযুক্ত ব'লে মনে করেছিলেন। কিন্তু চৈতন্যদেব ছিলেন অত্যন্ত কুশলী, তাই নিত্যানন্দকে দ্বিতীয় স্থানে বসাবার জন্য তিনি কোন বিশেষ আয়োজন করেন নি। অদ্বৈত আচার্যকে গুরুর স্থান দিয়ে, শুকদেবের থেকে বড় ব'লেও তিনি অতি সহজে নিত্যানন্দকে দ্বিতীয় স্থানে বসিয়েছিলেন। লোচনদাস বলেছেন—

নৃত্য-অবসানে প্রভু কহিল সভারে।
নিত্যানন্দ-পাদপ্রক্ষালন করিবারে॥
নিত্যানন্দ-পাদোদক লহ শিরোপরি।
পাইবে পরম-প্রেমা-আনন্দ-লহরী॥
হেনমতে মহাপ্রভু আজ্ঞা যবে কৈল।
শুনিঞা সবার হিয়া-আনন্দ বাঢ়িল॥
একে চাহে—আরে পাএ প্রভু-আজ্ঞাবাণী।
মস্তকে ধরিল পাদ প্রক্ষালন-পানী॥ [চৈ. ম. ঃ পৃ. ১১৭]

বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দের প্রাধান্য বোঝাতে অন্য এক কাহিনীর অবতারণা করেছেন। একদিন চৈতন্যদেবের কাছে বাল্যভাবে এলেন নিত্যানন্দ। চৈতন্যদেব তাঁর স্তুতি করলেন সকলের সামনে—

স্তুতি করে প্রভু, শুনে সর্বভক্তগণ॥
"নামে নিত্যানন্দ তুমি রূপে নিত্যানন্দ।
এই তুমি নিত্যানন্দ—রাম মূর্তিমন্ত॥
নিত্যানন্দ—পর্যটন ভোজন ব্যবহারে।
নিত্যানন্দ বিনে কিছু নাহিক তোমার॥
তোমারে বুঝিতে শক্তি মনুষ্যের কোথা?
পরম সুসত্য—তুমি যথা কৃষ্ণ তথা॥" [চৈ. ভা. ঃ পৃ. ১৬৪]

যেখানে কৃষ্ণ সেখানেই নিত্যানন্দ, তার থেকেও বড় কথা নিত্যানন্দের কাছেই কৃষ্ণের অবস্থান—এর থেকে আর অধিক আকাঙ্ক্ষিত বৈষ্ণবের আর কি হতে পারে ?

নিত্যানন্দের স্তুতি ক'রে শ্রীচৈতন্য বললেন—

প্রভু বোলে "একখানি কৌপীন তোমার।
দেহ-ইহা বড় ইচ্ছা আছয়ে আমার ॥"
এত বলি প্রভু তাঁর কৌপীন আনিয়া।
ছোট করি চিরিলেন অনেক করিয়া ॥
সকল বৈষ্ণবমণ্ডলীর জনে জনে।
খানি খানি করি প্রভু দিলেন আপনে ॥
প্রভু বোলে "এ বস্ত্র বান্ধহ সভে শিরে।
অন্যের কি দায়, ইহা বাছে যোগেশ্বরে ॥
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে হয় বিষ্ণুভক্তি।
জানিহ কৃষ্ণের নিত্যানন্দ পূর্ণ-শক্তি ॥
কৃষ্ণের দ্বিতীয় নিত্যানন্দ বই নাই।
সঙ্গী, সখা, নয়ন, ভূষণ, বন্ধু, ভাই ॥ [তদেব]

বৃন্দাবনদাস পাদোদক পানের কথাও বলেছেন। চৈতন্যদেবের কথায় ভক্তগণ নিত্যানন্দের পা ধুয়ে পাদোদক পান করেন 'পাঁচবার দশবার একো জনে খায়' [তদেব]। এর থেকে স্পষ্ট ক'রে বলার প্রয়োজন ছিল না যে, নিত্যানন্দই চৈতন্যদেবের পরবর্তী স্থান-অধিকারী। তথাপি বৃন্দাবনদাস জানিয়েছেন যে, সন্ন্যাস গ্রহণের অনেক পরবর্তী কালে পানিহাটীতে অত্যন্ত গোপনে রাঘব পণ্ডিতকে জানিয়েছিলেন গৌরসুন্দর—

"রাঘব তোমারে আমি নিজ গোপ্য কই।
আমার দ্বিতীয় নাহি নিত্যানন্দ বই ॥
এই নিত্যানন্দ যেই করায়েন আমারে।
সে-ই করি আমি, এই বলিল তোমারে ॥
আমার সকল কর্ম—নিত্যানন্দ-দ্বারে।
এই আমি অকপটে কহিল তোমারে ॥" [তদেব : পৃ. ২৯১]

গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন নেতা যাঁদের ওপর নেতৃত্ব করেন, তাঁদের সঙ্গে মধুর ব্যবহার ক'রে থাকেন। চৈতন্যদেব ভক্তদের সঙ্গে মধুর ব্যবহার করতেন—কখনও নেতা ব'লে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইতেন না ব'লেই হৃদয়ের নেতা হতে পেরেছিলেন তিনি। ভক্তদের সঙ্গে চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কথা বহুস্থানে জীবনীকাররা বর্ণনা করেছেন : মাধবেন্দ্র পুরীর আরাধনা তিথিতে ভোজনের পর মালা-চন্দন পরাবার ব্যবস্থা ছিল, বৃন্দাবনদাস সেই চিত্রটি উদ্ঘাটিত করেছেন—

তবে প্রভু সর্ব-বৈষ্ণবের জনে জনে।
শ্রীহস্তে চন্দন-মালা দিলেন আপনে ॥
শ্রীহস্তের প্রসাদ পাইয়া ভক্তগণ।
সভার হইল পরানন্দময় মন ॥ [তদেব : পৃ. ২৯৬]

চৈতন্যদেব শিষ্যদের পরিবেশন ক'রে খাইয়েছেন স্বচ্ছন্দ মনে।

কুষ্ঠ ভক্তের অঙ্গ-সম্মার্জনও করেছেন তিনি। রামকেলিতে হুসেন শাহের গারদে বন্দী সনাতন অনেক কষ্টে অনেক পার হয়ে কাশীতে এসে মিলিত হলেন গৌর সুন্দরের সঙ্গে। হুসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন সনাতন—পথশ্রম জানা ছিল না তাঁর কোনদিন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন—

শ্রীহস্তে করেন তার অঙ্গসম্মার্জন।
তেঁহো কহে মোরে প্রভু না কর স্পর্শন॥ [চৈ. চ. ঃ পৃ. ৩৬১ ।

গৌরসুন্দর বুঝেছিলেন যে, পাষণ্ডীদের সঙ্গে এমন কি মন্দির ধ্বংসকারী প্রশাসকদের সঙ্গে তাঁকে কঠিন সংগ্রাম করতে হতে পারে। তাঁর প্রচারে জাত-পাতের কোন বালাই ছিল না। সামাজিক পীড়নে তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম বিশেষ ভাবে প্রচারিত হলে সমাজে সাম্যবাদী মনোভাব দেখা দিতে পারে এবং তা হলে ধর্মান্তরের প্রয়োজনীয়তাও থাকবে না। তাই স্বভাবতই সেকালের সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসকরা তাঁকে বাধা দেবেই। সুতরাং চৈতন্যদেব শক্তি বৃদ্ধির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। আত্মিক শক্তিতে সমৃদ্ধ আরও অনেক বৈষ্ণব নেতা সংবাদ পেয়ে নবদ্বীপে এসে উপস্থিত হবেন ব'লেই তাঁর মনে হয়েছিল। তাই তিনি নবদ্বীপে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের আন্দোলন তুলে সকল স্থান থেকে বৈষ্ণবদের আকর্ষণ করতে চাইলেন—

এই মত গৌরচন্দ্র নবদ্বীপ-মাঝে।
কীর্তন করেন সব ভক্ত সমাজে॥
যত যত স্থানে সব পার্ষদ জন্মিলা।
অল্পে অল্পে সভে নবদ্বীপেতে আইলা॥
... ...
নিরন্তর সভার মন্দিরে প্রভু যায়। [চৈ. ভা. ঃ পৃ. ১৩৮ ।

কেবল ভক্তদের মধ্যে কীর্তন করলেই হবে না, বাইরে থেকে যেমন বৈষ্ণব মহান্তদের আকর্ষণ ক'রে আনতে হবে, তেমনি নবদ্বীপের মানুষের মধ্যেও সৃষ্টি করতে হবে বৈষ্ণব-ভাবতরঙ্গ। শিষ্যদের মনে ভয় আছে তা তিনি জানেন, দুর্দান্ত জগাই-মাধাই আছে নবদ্বীপে—সমস্ত নবদ্বীপ তাদের ভয় পায়। সেটা বুঝেই চৈতন্যদেব হেসে বললেন—

হাসিয়া কহিল প্রভু ভক্ত সভাকারে।
এই মোর হরিনাম দেহ ঘরে ঘরে॥
নবদ্বীপে বাল, বৃদ্ধ বৈসে যত জন।
চণ্ডাল দুর্গতি আর সজ্জন-দুর্জন॥
সভারে শিখাও হরিনাম গ্রন্থ করি।
অনায়াসে সব লোক যাউ ভব তরি॥
শুনিঞা সকল ভক্ত কহিল প্রভুরে—।
না পারিব হরিনাম দিতে ঘরে ঘরে॥
সেই নবদ্বীপে এক আছয়ে দুরন্ত।
অতি দুরাচার সেই—পাপে নাহি অন্ত॥ [চৈ. ম. ঃ পৃ. ১১৮ ।

তারা জাতিতে ব্রাহ্মণ, সম্পর্কে ভাই—নাম জগাই-মাধাই। এ দু' ভাইকে ভয় পায় নবদ্বীপের মানুষ। গৌর সুন্দর বুঝলেন যে, এদের দু'জনকে বশীভূত করতে পারলে, বৈষ্ণব ধ্যান-ধারণায় দীক্ষিত করতে পারলে সমস্ত নদীয়া অধিকার করা যাবে। ইতিমধ্যে বৈষ্ণবদের শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে। সমস্ত ভারতবর্ষ পর্যটন করে নবদ্বীপে এসেছেন নিত্যানন্দ, ফুলিয়া থেকে এসেছেন হরিদাস ঃ বিশ্বম্ভর নিজে গিয়েছিলেন বঙ্গদেশে, পিতামহের বাসস্থান শ্রীহট্টে—সেখান থেকে এসেছেন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতি। গৌরসুন্দরের সেনাপতি, সৈন্যাধ্যক্ষ্যের অভাব নেই তখন। সুতরাং জোর প্রচার চলেছে। চৈতন্যচরিতামৃত বলেছেন—

শ্রীবাসাদি পারিষদগণ সঙ্গে লঞা।
দুই সেনাপতি বুলে কীর্তন করিয়া।।
পাষণ্ডদলন বানা নিত্যানন্দ রায়।
আচার্য হুঙ্কারে পাপ পাষণ্ডী পলায়।। [চৈ. চ. ঃ পৃ. ৯]

জগাই-মাধাই উদ্ধারের ব্যাপারটা লোচনদাস যে ভাবে লিখেছেন সেভাবে লেখেন নি বৃন্দাবনদাস। উভয়ের বক্তব্যে যথেষ্ট পাথর্ক্য আছে। গৌরসুন্দর নিজের ভক্তদের কাছেই শুনলেন 'না পারিব হরিনাম দিতে ঘরে ঘরে'—জগাই-মাধাইকে দমন ক'রে বৈষ্ণব করতে না পারলে সব ব্যর্থ হয়ে যাবে তা বুঝলেন তিনি। বৃন্দাবনদাস লিখেছেন—

একদিন আচম্বিতে হৈল হেন মতি।
আজ্ঞা কৈল নিত্যানন্দ-হরিদাস প্রতি।।
"শুন শুন নিত্যানন্দ! শুন হরিদাস।
সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ।।
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ বোল, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা।।
ইহা বই আর না বলিবা বোলাইবা।
দিন-অবসানে আসি আমারে কহিবা।। [চৈ. ভা. ঃ পৃ. ১৬৫]

নেতা হিসেবে চৈতন্যদেবের সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় ওই বক্তব্যে। ব্রাহ্মণ অবধূত এবং যবন হরিদাসকে প্রচারে যাবার নির্দেশ দিয়ে তিনি হিন্দু-মুসলমানকে আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ হলেও নিত্যানন্দ ছিলেন অবধূত, যাঁর সম্বন্ধে চৈতন্যদেব নিজেই বলেছেন 'কোন্ জাতি কোন্ কুল, কিছুই না জানি।' [তদেব ঃ পৃ. ১৩৭]। এমন ব্রাহ্মণকে প্রচারে পাঠালেন যাঁর জাত-পাত নেই। বৈষ্ণব ধ্যান-ধারণা প্রচারের জন্য যে, উপযুক্ততম লোককে বাছাই করা হয়েছিল সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

বৃন্দাবনদাস জগাই-মাধাই উদ্ধারের কার্যটি সাজিয়েছেন দু'টি পর্যায়ে—(১) দু' ভায়ের দ্বারা তাড়িত হয়ে প্রথমে নিত্যানন্দ-হরিদাস পলায়ন করেন এবং (২) রাত্রে চৈতন্যদেবের গৃহের সম্মুখে জগাই-মাধাই থাকে জেনে একাকী তাদের সম্মুখে উপস্থিত হন নিত্যানন্দ ঃ মাধাই কলসীর মুটকীর আঘাত হানে তাঁর মস্তকে। সংবাদ পেয়ে ক্রুদ্ধ চৈতন্যদেব সেখানে এসে 'সুদর্শন'কে আহ্বান করেন এবং শেষ পর্যন্ত নিত্যানন্দের উদারতায় উদ্ধার পায় দু'ভাই।

বৃন্দাবনদাস বলেছেন যে, চৈতন্যদেব প্রচারকদের নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রচারের ফলাফল তাঁকে জানাতে—'দিন-অবসানে আসি আমারে কহিবা।' দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতারা আদেশ দিয়েই কর্তব্য শেষ করেন না, কাজের বিবরণ পেশ করতেও বলেন এবং তা হলে কর্মীরা কাজে ফাঁকি দিতে সক্ষম হয় না।

লোচনদাস জগাই-মাধাই উদ্ধারের কাহিনী একটু অন্য ভাবে পরিবেশন করেছেন। চৈতন্যদেবের নেতৃত্বে নবদ্বীপের পথ পরিক্রমা করেছে সংকীর্তনের মিছিল—

যেখানে আছিল ভক্তগণ যত যত।
প্রভুর আজ্ঞায় সভে ভৈগেল একত্র ॥
একত্র হইয়া সভে সংকীর্তন করি।
বিজয় করিলা প্রভু বিশ্বম্ভর হরি ॥
নদিয়ানগরে ভেল আনন্দহিল্লোল।
গগনে উঠিয়া লাগে হরিহরি বোল ॥
নিজঘরে শুতিয়াছে জগাই মাধাই।
নিজমদে মত্ত—নিদ্রা যায় দুই ভাই ॥
সেই পথে কীর্তন করিয়া প্রভু যায়।
নদিয়ার লোক সব দেখিবারে ধায় ॥ [চৈ. ম. ঃ পৃ. ১১৯]

বৃন্দবনদাসেব নিত্যানন্দের ন্যায় লোচনদাসের নিত্যানন্দ একা ছিলেন না। জগাই মাধাই কলসীর কানা মেরেছেন তাঁর মাথায়। এই সামান্য পার্থক্য সত্ত্বেও কাহিনী প্রায় এক। জগাই-মাধাই বশীভূত হলো। নবদ্বীপ বৈষ্ণবের জয়গানে, হরিসংকীর্তনে পরিপূরিত হলো। জয় হলো চৈতন্য-নিত্যানন্দের প্রেম ধর্মের।

জগাই-মাধাই উদ্ধারের পর নবদ্বীপের মানুষ বিশেষ শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠলেন চৈতন্যদেবের প্রতি। শ্রীবাসের গৃহে কপাট দিয়ে কীর্তন-নৃত্য হতো—নৃত্য করতেন স্বয়ং শ্রীচৈতন্য। সে উৎসব দেখার আগ্রহ জাগল সবার মনে; পাষণ্ডীদের জন্যই তাঁরা সেই উৎসব দর্শনে বঞ্চিত—

অন্তরে দুঃখিত লোক সব নদীয়ার।
সভে পাষণ্ডীরে মন্দ বোলয়ে অপার ॥
"পাপিষ্ঠ নিন্দুক বুদ্ধিনাশের লাগিয়া।
হেন মহোৎসব দেখিবারে নারে গিয়া ॥
পাপিষ্ঠ পাষণ্ড সব সবে নিন্দা জানে।
বঞ্চিত হইয়া মরে এ হেন কীর্তনে ॥ [চৈ. ভা. ঃ পৃ. ২১৪]

চৈতন্যদেবের কুশলী নেতৃত্ব সাধারণ মানুষদের থেকে পাষণ্ডীদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলল। এবার তিনি প্রস্তুত হতে লাগলেন সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য। তিনি জানতেন যে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্বভাবই হচ্ছে সরাসরি অথবা কৌশলে অপর ধর্মাবলম্বীদের আঘাত ক'রে নিজেদের গোষ্ঠী বৃদ্ধির চেষ্টা করা। হিন্দু সাম্রাজ্যবাদী চক্র বহু সহস্র বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষ ও ভিক্ষুদের বধ পর্যন্ত করেছে এ সংবাদও তাঁর অজানা ছিল না: বৈষ্ণব উড়িষ্যার সম্রাটও এ অপরাধ থেকে মুক্ত ছিলেন না। কেউ কেউ মনে করেন প্রতাপরুদ্র নিজে এবং কারও মতে তাঁর পিতামহ বহু বৌদ্ধ ধর্মনেতাকে হত্যা করেছিলেন। বহিরাগত মুসলমান সুলতান-

বাদশাদেরও এদেশে টি'কে থাকতে হলে দেশীয় হিন্দু-জৈন-বৌদ্ধদের ধর্মান্তরিত করে, নিজ গোষ্ঠীভুক্ত করতে হবেই এ কথা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন চৈতন্যদেবের অজানা ছিল না। বিশেষ, সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরই প্রেম ধর্মের ওপর ক্রোধ থাকবেই। প্রেম ধর্ম মানুষকে ঐক্যে আবদ্ধ করে। তাদের মধ্যে সমতা এনে দেয় এবং সেটাই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিদ্বেষের কারণ। সুতরাং আক্রমণ আসবেই এটা উপলব্ধি ক'রে গৌরসুন্দর নবদ্বীপের মানুষকে ঐক্যে আবদ্ধ করলেন তাদের সর্বাপেক্ষা ভীতির কারণ জগাই-মাধাইকে বশীভূত ক'রে। প্রেমধর্মের জয় ঘোষিত হলো—নিমাই পণ্ডিতের শক্তি উপলব্ধি ক'রে নবদ্বীপের মানুষ তাঁর কীর্তনে সামিল হলেন। কীর্তনের নামে, হরির নামে ঐক্যসৃষ্টির ব্যবস্থা করলেন চৈতন্যদেব। নিজে আলিঙ্গন দিয়ে, গলার মালা পরিয়ে উৎসাহ দিতে লাগলেন সকলকে—স্ত্রী-পুত্র-মাতা-পিতাকে নিয়ে ঘরে ঘরে কীর্তন করার উপদেশ দিতেন তিনি—

সন্ধ্যা হৈলে আপন দুয়ারে সভে মিলি।
কীর্তন করেন সভে দিয়া করতালি ।।
এইমত নগরে নগরে সংকীর্তন।
করাইতে লাগিলেন শচীর নন্দন ।।
সভারে উঠিয়া প্রভু আলিঙ্গন করে।
আপন গলার মালা দেই সভাকারে ।। [তদেব : পৃ. ২১৫]

নেতার ব্যক্তিগত সম্পর্ক নেতৃত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে: প্রেম ধর্মে এই ব্যক্তিগত সম্পর্ক একান্ত প্রয়োজনীয়ও বটে। চৈতন্যদেবের জীবনে ধর্মের হাত ধরে এলো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রচেষ্টা।

'শান্তিপুর ডুবুডুবু, নদে ভেসে যায়'—যখন নবদ্বীপ কীর্তনের তরঙ্গে ভাসমান তখন একদিন কাজী এলেন সেই পথে। নবদ্বীপের পথে তিনি 'মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ শুনিবারে পায়।' [তদেব]—হরিসংকীর্তন শোনা যেতে লাগল সর্বত্র—

হরি-নাম-কোলাহল চতুর্দিগে মাত্র।
শুনিয়া সঙরে কাজী আপনার শাস্ত্র ।। [তদেব]

কীর্তনীয়াদের তাড়া করলো কাজীর লোকেরা। অনেক মৃদঙ্গ ভাঙা হলো, অনেককে প্রহারও দিলেন কাজী; ক্রোধভরে বললেন—

কাজী বোলে "হিন্দুয়ানী হইল নদীয়া।
করিমু ইহার শাস্তি নাগালি পাইয়া ।।
ক্ষমা করি যাঙ আজি, দৈব হৈল রাতি।
আর দিন লাগি পাইলেই লৈব জাতি ।।" [তদেব : পৃ. ২১৬]

সাম্রাজ্যবাদী ইসলাম ধর্মাবলম্বী শাসকরা 'হিন্দুয়ানী' বরদাস্ত করতেন না এবং জবরদস্তি ধর্মান্তরিত করতেন—'লৈব জাতি'।

সর্বকালে সর্বদেশে বিশ্বাসঘাতকদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়: নবদ্বীপের পাষণ্ডীরা মহাখুশী, নিমাই পণ্ডিত এবার শায়েস্তা হবেন—

নিমাঞি পণ্ডিত যে করেন অহংকার।
সব চূর্ণ হইবেক কাজীর দুয়ার ।। [তদেব]

কিন্তু নিমাই পণ্ডিত যে, কত বলিষ্ঠ দূরদর্শী নেতা ছিলেন তা কেউ অনুমান করতে পারেন নি। চৈতন্যচরিতামৃত-কার লিখেছেন—

চৈতন্য-সিংহের নবদ্বীপে অবতার।
সিংহগ্রীব সিংহবীর্য সিংহের হুঙ্কার॥
সেই সিংহ বসুক জীবের হৃদয়কন্দরে।
কল্মষদ্বিরদ-নাশ যাহার হুঙ্কারে॥ [চৈ. চ. ঃ পৃ. ৭]

যাঁর হুঙ্কারে দুষ্কৃতকারীরা বিনষ্ট হয় সেই সিংহ—সদৃশ চৈতন্যদেব সমস্ত শুনে 'ক্রোধে হইলেন প্রভু রুদ্র-মূর্তিধর'—হুঙ্কার দিয়ে বললেন—

প্রভু বোলে "নিত্যানন্দ হও সাবধান।
এইক্ষণে চল সর্ব-বৈষ্ণবের স্থান॥
সর্ব নবদ্বীপে আজি করিমু কীর্তন
দেখোঁ মোরে কোন্ কর্ম করে কোন্ জন॥
দেখ আজ কাজীর পোড়াও ঘর-দ্বার।
কোন্ কর্ম করে দেখোঁ রাজা বা তাহার॥
প্রেম-ভক্তি বৃষ্টি আজি করিব বিশাল।
পাষণ্ডীর গণের হইব আজি কাল॥ [চৈ. ভা. ঃ পৃ. ২১৬]

আক্রমণ এসেছে রাজশক্তির কাছ থেকে। এই মুহূর্তে তাকে প্রতিহত ক'রে প্রতিবিধান করতে না পারলে বৈষ্ণব ধ্যান-ধারণার প্রচার, প্রেম ভক্তির প্রতিষ্ঠা আর সম্ভব হবে না—পলায়ন করবেন বৈষ্ণবরা। সুতরাং ব্যাপক প্রস্তুতি নিলেন চৈতন্যদেব। সেই সর্ব যুগের প্রথম অসহযোগ আন্দোলন! নবদ্বীপের সমস্ত নাগরিককে আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য আহ্বান জানালেন চৈতন্যদেব—

চল চল ভাই সব নগরিয়াগণ।
সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ কথন॥ [তদেব]

সর্বত্র রটে গেল যে চৈতন্যদেব কীর্তন করবেন নবদ্বীপের পথে পথে—স্বয়ং নৃত্য করবেন। সহস্র সহস্র মানুষ তাঁর নৃত্য দেখবার জন্য উন্মুখ হয়ে ছিলেন, সে সুযোগ এলো। প্রয়োজনে কাজীর ঘর-দুয়ার ভেঙ্গে সেখানেও নৃত্য করবেন তিনি। কাজীর ভয় দূর হয়ে গেল সকলের মন থেকে। মিছিলে যোগদানকারীদের একটি ক'রে 'মহাদীপ' সঙ্গে আনার নির্দেশও দেওয়া হলো। কেবল সর্বপ্রথম অসহযোগ আন্দোলনই নয়—সেই প্রথম মশাল মিছিলের ব্যবহার হলো।

উৎসাহিত নবদ্বীপবাসীরা নিজ নিজ গৃহের সম্মুখে তোরণ সাজালেন—আলোক মালায় সজ্জিত করলেন সে সব তোরণ—'হইল দেউটীময় নবদ্বীপপুর'। একটি জ্যোতির্ময় মানুষের নির্দেশে 'সর্ব নবদ্বীপ'—চলিলা দেউটী লই প্রভুর সমীপ'

মিছিল শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে সাজালেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মহান নেতা। একেবারে প্রথমে থাকবেন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব নেতা অদ্বৈত আচার্য, তাঁর সঙ্গে একদল গায়ক : মিছিলের মধ্যে থাকবেন যবন হরিদাস এবং তাঁর গায়ক সঙ্গীর দল—মিছিলের তৃতীয় অংশে থাকবেন শ্রীবাস পণ্ডিত এবং একদল কীর্তনীয়া; মিছিলের শেষে নিত্যানন্দকে নিয়ে স্বয়ং শ্রীচৈতন্য। বিশ্বম্ভর জানতেন মিছিলের সম্মুখভাগে আক্রমণ হলে পিছনের লোকেরা কিছু বুঝতে না পেরে ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পড়ে এবং একেবারে পশ্চাতের লোকেরা পলায়ন আরম্ভ করে যার ফলে মিছিলের সমস্ত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। তাই হাজার হাজার মানুষের মিছিলকে তিনি তিনটি ভাগে ভাগ ক'রে প্রতিটি ভাগের সম্মুখে রাখলেন বলিষ্ঠ বৈষ্ণবদের এবং মিছিলকে সংযত রাখার জন্য নিজে রইলেন সকলের পশ্চাতে। বর্তমান যুগেও এমন সুকৌশলে মিছিল সাজাতে সক্ষম হন না কোনও নেতা। সামরিক বাহিনীর কৌশল অবলম্বন করেছিলেন গৌরসুন্দর।

নির্দেশ ছিল, চৈতন্যদেবের হুঙ্কার শোনা মাত্র প্রত্যেকে জ্বালবেন হাতের দীপ : তখন গোধূলি সময়—

> কোটি কোটি লোক আসি আছয়ে দুয়ারে।
> পরশিয়া ব্রহ্মাণ্ড শ্রীহরিধ্বনি করে ॥
> হুঙ্কার করিল প্রভু শচীর নন্দন।
> সুখে পরিপূর্ণ হৈল সভার শ্রবণ ॥
> হুঙ্কারের সুখে সভে হইলা বিহ্বল।
> 'হরি' বলি সভে দীপ জ্বালিল সকল ॥
> লক্ষ কোটি দীপ সব চারিদিগে জ্বলে।
> লক্ষ কোটি লোক চারিদিগে 'হরি' বোলে ॥ [তদেব. পৃ. ২১৭]

নদীয়ার প্রতিটি গৃহের দরজা সজ্জিত হয়েছে কলার কাঁদি, পূর্ণঘট, নারকেল-আম্রপল্লবে, ঘৃতের প্রদীপ জ্বলছে—বাটার ওপর সাজান হয়েছে দধি-দূর্বা-ধান্য। সমস্ত নবদ্বীপের মানুষকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলেছে এক বলিষ্ঠ নেতৃত্ব।

মিছিলের উন্মাদনায়, উচ্চ হরিধ্বনিতে সকলের মনের ভয় শূন্যে মিলিয়ে যায়। কাজীকে হুঁশিয়ারী দিয়ে মিছিল এগিয়ে চলে—

> কেহো বোলে "এবে কাজী বেটা গেল কোথা।
> লাগি পাঙ এখনে ছিঁড়িয়া ফেলোঁ মাথা ॥"
> রড় দিয়া যায় কেহো পাষণ্ডী ধরিতে।
> কেহো পাষণ্ডীর নামে কিলায় মাটিতে ॥ [তদেব. পৃ. ২১৯]

নবদ্বীপের সমস্ত পথ পরিক্রমা ক'রে সকলকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুললেন চৈতন্যদেব, কাজীর ভয় তুচ্ছ ক'রে 'গৃহবৃত্ত' ছেড়ে বেরিয়ে এলেন সাধারণ মানুষরাও। পদযাত্রা শেষ হলো কাজীর গৃহে এসে।

অনুচরের কাছে নিমাই পণ্ডিতের হিন্দুয়ানীর সংবাদ পেয়ে ক্রুদ্ধ হলেন কাজী, তিনি মনে করেছিলেন যে, নিমাই বোধ হয় পুনরায় বিবাহ করতে বেরিয়েছেন; কিন্তু নিষেধ সত্ত্বেও হিন্দুয়ানী! কাজী নগরের সমস্ত মানুষের জাতি নষ্ট করবেন স্থির করলেন।

কিন্তু হাজার হাজার মানুষ 'মার-কাট' করতে করতে আসছে শুনে পলায়ন করলেন কাজী নিজের অন্তঃপুরে। ক্রুদ্ধ বিশ্বম্ভর বললেন—

"ঘর ভাঙ্গ ভাঙ্গ" প্রভু বোলে বারে বার। [তদেব. পৃ. ২২৪]

বাইরের ঘরের দরজা ভেঙ্গে ফেলা হলো—তছনছ করা হলো আম-নারকেল-কলা এবং ফুলের বাগান। বিশ্বম্ভরের ক্রোধ তখনও শান্ত হয় নি। কঠিন কণ্ঠে তিনি আদেশ করলেন—

প্রভু বোলে "অগ্নি দেহ বাড়ীর ভিতর ॥
পুড়িয়া মরুক সর্ব-গণের সহিতে।
সর্ব-বাড়ি বেঢ়ি অগ্নি দেহ চারিভিতে ॥
দেখোঁ মোরে কি করে উহার নরপতি।
দেখোঁ আজি কোন্ জনে করে অব্যাহতি ॥ [তদেব]

কাজীকে দমন করায় তার নবপতির সঙ্গেও যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠবে এ কথা বুঝেছিলেন তিনি : সেই মহা-সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত ছিলেন তিনি মনে মনে।

প্রধান ভক্তদের অনুরোধে শান্ত হলেন বিশ্বম্ভর : গৃহে অগ্নি সংযোগ করা হলো না। মুহূর্তে রাশ টেনে ধরলেন মিছিলের প্রধান নেতা—সাধারণ মানুষও সংযত হলো। ফিরে এলেন চৈতন্যদেব সংকীর্তন-নৃত্য করতে করতে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিশ্বম্ভরের নেতৃত্বের গৌরব রক্ষা ক'রেও কাজী-দমন আন্দোলনকে অন্যভাবে সাজিয়েছেন। বৃন্দাবনে প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে চলতে চেয়েছেন তিনি। তিনি বার বার বলেছেন, 'চৈতন্যলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস' এবং—

মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবনদাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ॥ [চৈ. চ. পৃ. ৩৭]

যেখানে বৃন্দাবনদাস বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন সেখানে তিনি সূত্রের আকারে মাত্র বিষয়ের উল্লেখ করবেন একথা ব'লেও তিনি কাজী দমনের ব্যাপারটি সূত্রের আকারে বলেন নি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই। বৃন্দাবনবাসী ভক্তদের জন্যই তাঁর রচনা—'সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ। বৃন্দাবনবাসী ভক্তের উৎকণ্ঠিত মন ॥' [তদেব. পৃ. ৩৮]

কাজী-দমনের কালে চৈতন্যদেবের মুখে শোনা গেছে কাজীকে মারার কথা, তাঁর গৃহে আগুন দেবার কথা। বৃন্দাবনদাসকে স্বীকার ক'রেও বৃন্দাবনের তাত্ত্বিক বৃন্দাবনের ভক্তদের জন্য সে-কথা বলতে পারেন না। তাই কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যদেব মিছিল ক'রে সঙ্কীর্তন নৃত্য করতে করতে এসেও কাজীর সঙ্গে বসে আপোষে সব মিটিয়ে নিয়েছেন। প্রেম-ভক্তি দাতা চৈতন্যদেবের মুখে তিনি হিংসার বাণী উচ্চারণ করাতে চান নি। মনে করার কারণ আছে যে, কবিরাজ গোস্বামীর প্রচেষ্টায় হয়তো তত্ত্ব রক্ষা পেয়েছে কিন্তু সত্য রক্ষা পায় নি।

শ্রীচৈতন্যের মনোভাবেরও একটা বিবর্তন অবশ্যই ঘটেছিল : বৃন্দাবনে বসে গৌড়-বঙ্গের অবস্থা অনুধাবন করা কিছুতেই সহজসাধ্য নয়। যেখানে "হিন্দুয়ানী" করলে 'জাতি নষ্ট' করার হুমকি ছিল সেখানে প্রতিরোধেও তার প্রতিক্রিয়া ঘটানোর প্রয়োজনকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না। বিশেষ, তখনও বিশ্বম্ভর সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' হন নি। বৃন্দাবনদাস যে, কাহিনীর সূত্র জেনেছিলেন গুরু নিত্যানন্দ, মাতা নারায়ণী, মাতামহ শ্রীরাম পণ্ডিত এবং শ্রীবাস পণ্ডিতদের কাছে, একথাটাও স্মরণে রাখতে হবে। উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা ছিল শ্রীচৈতন্যের।

পরবর্তী কালে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা প্রচারের ওপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি রূপ-সনাতনকে পাঠিয়ে দেন মথুরা-বৃন্দাবনে। পুরাতন তীর্থের উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে প্রেম ধর্মের বিস্তারের আদেশ দিয়েছিলেন তিনি। প্রচার ব্যতীত কোন কিছুই প্রতিষ্ঠা করা যে সম্ভব নয় এ ধারণা বৈষ্ণব-ভাবনা গ্রহণের সময় থেকেই তিনি বুঝেছিলেন। জয়ানন্দ লিখেছেন যে, নিত্যানন্দের আগমনের পূর্বেও প্রচারের জন্য পরামর্শ করতেন তিনি অদ্বৈত আচার্য, হরিদাস, মুরারি, মুকুন্দ, বিদ্যানিধি, চন্দ্রশেখরাচার্য, বক্রেশ্বর, গোবিন্দ, নন্দনাচার্য প্রভৃতির সঙ্গে। নিত্যানন্দের আগমনে অত্যধিক উৎসাহিত হয়ে উঠলেন তিনি। এতদিনকার পরামর্শ কার্যে পরিণত হলো—

নৃত্য সঙ্কীর্তন ক'র বিহরে নদীয়া পুরী
ভোজন শয়ন সুখ ছাড়ি।
... ...
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া হরিনাম মন্ত্র দিয়া
সভারে কহিল একে একে।
শুনরে নদীয়ার লোক ছাড়িয়া সংসার শোক
কীর্তন করিয়া প্রেম সুখে॥
কীর্তন সবল কর্ম কীর্তন সকল ধর্ম
কীর্তন পরম ব্রহ্মজ্ঞান।
কীর্তন আগম বেদ রাজসূয় অশ্বমেধ
কীর্তন শ্রবণ গঙ্গাস্নান॥ [জয়ানন্দ, চৈ. ম. : পৃ. ১১৯]

লোচন দাস তো অধ্যাপক বিশ্বম্ভরকে দিয়ে অধ্যাপনা কালেই বঙ্গদেশে প্রচার করিয়েছেন বৈষ্ণব ভাবনা—

চণ্ডাল, পতিত কিবা সজ্জন দুর্জন।
সভারে যাচিয়া প্রভু দিল হরিনাম॥
শুচি বা অশুচি কিবা আচার, বিচার।
না মানিল—সভারে করিল ভবপার॥
নাম-সঙ্কীর্তন প্রভু নৌকা সাজাইয়া।
পার কৈল সবে জীবে আপনি যাচিয়া॥
যে জন পালায়—তারে ধরি কোলে করি।
কাণ্ডারীর রূপে পার করে গৌরহরি॥ [চৈ. ম. পৃ. ৭৬]

বুদ্ধিমান নেতা ছিলেন ব'লেই চৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে বহু পূর্বে নেতৃত্বের দ্বিতীয় স্থানে বসিয়েছিলেন। গৌড়দেশে বহু প্রবীন বৈষ্ণব মহান্ত ছিলেন। বহু পূর্ব থেকে দ্বিতীয় স্থানটি স্থির করে না দিলে ভবিষ্যতে বিরোধ দেখা দেবে না এমন কথা তো নিশ্চয় ক'রে বলা চলে না। তাই তিনি নানা ভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, নিত্যানন্দের স্থান তাঁর পরেই। অদ্বৈত আচার্যকে তিনি গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করতেন, গুরুদেবের থেকেও তাঁকে

বড় ব'লে হয়তো মনে করতেন কিন্তু মনে হয় দুটো কারণে তিনি তাঁকে নেতৃত্ব দিতে চান নি—(১) বার্ধক্য এবং (২) অদ্বৈতের গণের মধ্যে চৈতন্য-বিরোধীর অস্তিত্ব—

করয়ে অদ্বৈত-সেবা চৈতন্য না মানে।
অদ্বৈতেই তারে সংহারিব ভাল মনে॥ [চৈ. ভা. পৃ. ১৬৪]

বৈষ্ণব ভক্তদের অগ্রগণ্য শ্রীবাস পণ্ডিতও ছিলেন, কিন্তু তিনি বড় সোজা মানুষ, মুখের ওপর স্পষ্ট কথা বলেন—কুশলী নেতা হওয়া তাই তাঁর পক্ষেও সম্ভব নয়। নিত্যানন্দ ছিলেন বলিষ্ঠ দেহী ব্রাহ্মণ অথচ অবধূত। ব্রাহ্মণ এবং চণ্ডালকে একই সঙ্গে বক্ষে টেনে নেবার উপযুক্ত পুরুষ। তাই চৈতন্যদেব নিত্যানন্দের কোপীন চিরে সকলের মাথায় বেঁধে নিতে বলেছিলেন। তাঁর পাদোদক শিরে ধারণ করতে বলেছিলেন এবং রাঘব পণ্ডিতের কাছে তাঁকে দ্বিতীয় গৌরাঙ্গ ব'লে উল্লেখ করেছিলেন। কেবল তাই নয়—নিজ সহপাঠী মুরারিকে শিক্ষা দিয়ে সকলকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন যে, গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ একত্র থাকলে নিত্যানন্দের পদবন্দনাই প্রথম করতে হবে। সমস্ত দিক চিন্তা করেই চৈতন্যদেব নিত্যানন্দের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করার ব্যবস্থা নিয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সমস্ত গৌড়ের অধিকার দিয়েছিলেন তাঁকেই—

প্রভু বোলে "শুন নিত্যানন্দ মহামতি।
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আমি নিজ মুখে।
'মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেমসুখে॥
তুমিও থাকিলা যদি মুনি ধর্ম করি।
আপন উদ্দাম-ভাব সব পরিহরি॥
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার।
বোল দেখি আর কেবা করিব উদ্ধার॥
. . ..
মূর্খ নীচ পতিত-দুঃখিত যে জন।
ভক্তি দিয়া কর গিয়া সভার মোচন॥ [চৈ ভা পৃ. ৩০৩]

চৈতন্যদেব নিজ-কর্তব্য পূরণের দায়িত্ব অর্পণ করলেন নিত্যানন্দের ওপর। সমস্ত ভক্তকেই রথযাত্রাকালে নীলাচলে আসতে বললেও নিত্যানন্দকে প্রতি বৎসর আসতে নিষেধ ক'রে দিয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্যের কথায়—

আজ্ঞা পাই নিত্যানন্দচন্দ্র সেই ক্ষণে।
চলিলেন গৌড় দেশে লই নিজগণে॥ [তদেব]

কুশলী জননেতা হিসেবে তিনি অদ্বৈতকেও বড় ব'লে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। রূপ-সনাতনকে ভক্তি দেবার জন্য তিনি অদ্বৈতকে অনুরোধ করেছিলেন—

অমায়ায় কৃষ্ণভক্তি দেহ এ দুয়েরে।
জন্ম জন্ম আর যেন কৃষ্ণ না পাসরে॥
ভক্তির ভাণ্ডারী তুমি বিনে তুমি দিলে।
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণ কারে মিলে?" [তদেব. পৃ. ৩৩৮]

অদ্বৈতের নিজস্ব ভক্তদের দুঃখ পাবার সমস্ত কারণই তিনি দূর ক'রে দিয়েছিলেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজও চৈতন্যদেবের সর্বভারতে প্রচারের উদ্যোগ সম্বন্ধে বলেছেন—

মথুরাতে পাঠাইলা রূপ-সনাতন।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি-প্রচারণ ॥
নিত্যানন্দরামে পাঠাইল গৌড়দেশে।
তেঁহো ভক্তি প্রচারিল অশেষ-বিশেষে ॥
আপনে দক্ষিণ দেশে করিলা গমন।
গ্রামে গ্রামে কৈলা কৃষ্ণনাম-প্রচারণ ॥
সেতুবন্ধ পর্যন্ত কৈল ভক্তির প্রচার।
কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈল সবারে নিস্তার ॥ [চৈ. চ. পৃ. ৩৫]

রূপ-সনাতনকে মথুরা-বৃন্দাবনে থেকে 'পশ্চিমা সভারে' ভক্তিরস দিতে ব'লেই নেতার কর্তব্য শেষ করেন নি একথা জানিয়েছেন বৃন্দাবনদাস; কাজ কতদূর এগিয়েছে তা নিজে গিয়ে দেখে আসবেন স্বয়ং—

আমিহ দেখিব গিয়া মথুরামণ্ডল।
আমি থাকিবারে স্থল করিহ বিরল ॥ [চৈ. ভা. পৃ. ৩৩৯]

চৈতন্যচরিতামৃত বলেছেন যে, দক্ষিণ দেশে যাবার সময় তিনি ভক্ত-বন্ধুদের অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন—একাকী যাবার ইচ্ছায় ব্যক্তিগত বিষয়ের অবতারণা ক'রে কৌশল অবলম্বনও করতে হয়েছিল তাঁকে—

বৈশাখ-প্রথমে দক্ষিণ যাইতে হৈল মন ॥
নিজগণ আনি কহে বিনয় করিয়া।
আলিঙ্গন করে সবা শ্রীহস্তে ধরিয়া ॥
.. ..
এবে সবা-স্থানে মুঞি মাগি এই দানে।
সবে মিলি আজ্ঞা দেহ যাইব দক্ষিণে ॥
বিশ্বরূপ-উদ্দেশ্যে আমি অবশ্য যাইব।
একাকী যাইব কাঁহো সঙ্গে না লইব ॥
সেতুবন্ধ হৈতে আমি না আসি যাবৎ।
নীলাচলে তুমি সব রহিবে তাবৎ ॥
বিশ্বরূপের সিদ্ধি-প্রাপ্তি জানেন সকল।
দক্ষিণদেশ উদ্ধারিতে করেন এই ছল ॥ [চৈ. চ. পৃ. ১৬৭-১৬৮]

কবিরাজ গোস্বামীও স্বীকার করেছেন যে, দক্ষিণ দেশ উদ্ধারের কথা গোপন রেখে চৈতন্যদেব 'ছলনা' করেছিলেন সকলকে। সুতরাং একথা অস্বীকার করা যায় না যে, নানা কারণে চৈতন্যদেব নিজ মনোভাব একান্ত প্রিয়জনদের কাছেও গোপন রাখতেন। স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে প্রেমধর্ম প্রচার ক'রে দক্ষিণের মানুষদের উদ্ধারের কথা গোপন করার কি প্রয়োজনীয়তা ছিল? প্রচারের জন্য দলবল সহ গমনই তো বিধেয়; একাকী যাবার ইচ্ছা প্রকাশের কারণ কি? অন্য কোন বড় গোপন উদ্দেশ্য ছিল কি? শেষ পর্যন্ত নিত্যানন্দের অনুরোধে জলপাত্র এবং কৌপীন বহন করার জন্য তিনি সঙ্গে

নিয়েছিলেন এক 'সরল ব্রাহ্মণ'কে এবং তাঁর নিত্য অনুগামী ভৃত্য গোবিন্দ কর্মকারকে— চতুর কোন একজনকে তিনি সঙ্গী করেন নি। এ সবই চৈতন্যদেবের কোন গোপন উদ্দেশ্যের দিকে অঙ্গুলী সংকেত করে। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ধর্ম এবং সমাজনেতার এরূপ গোপনীয়তা অবলম্বন সেকালে বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

দিকে দিকে উপযুক্ত অনুচর প্রেরণ ক'রে এবং নিজে পদযাত্রা ক'রে সমাজকে পুনর্বিন্যাস করার উপযোগী প্রেমধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা এর পূর্বে সম্ভবত বুদ্ধদেব ব্যতীত আর কেউ করেন নি। কিন্তু বুদ্ধদেব রাজশক্তির সহায়তা পেয়েছিলেন—

নৃপতি বিম্বিসার
নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া লইল
পাদ-নখকণা তাঁর।

কিন্তু চৈতন্যদেব উড়িষ্যার সার্বভৌম ক্ষমতাশালী সম্রাট প্রতাপরুদ্রকে কৃপা করেও বলেছিলেন—

সবে একখানি বাক্য করিবা আমার।
মোরে না করিবা তুমি কোথাও প্রচার॥
এ সে নহে আমারে প্রচার কর তুমি।
তবে এথা ছাড়ি সত্য চলিবাঙ আমি॥ [চৈ. ভা. পৃ ৩০২]

ধর্ম প্রচারে প্রতাপরুদ্রের সহায়তা অস্বীকার করলেন কেন? এই অস্বীকৃতির সঙ্গে একাকী দক্ষিণ দেশ ভ্রমণের ইচ্ছার কোন যোগ আছে কি? কুশলী সমাজ ও ধর্মনেতার মনোভাব উপলব্ধির চেষ্টা করা যেতে পারে উপযুক্ত সময়ে।

সিংহ রাশি সিংহ লগ্নে জাত সিংহ-গ্রীব মহামানবের জীবন-কথা আলোচনার প্রারম্ভে ভারতের জাতীয় চেতনা উন্মেষের যুগে ভারতের জাতীয় সংহতি স্থাপন-প্রচেষ্টায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণকারী স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি উদ্ধার করতে পারি—

"Thus the Social Reformer in India has to fight against forces believed to be semi-divine in their character······It is against a social edifice, resting upon traditional instinct and re-inforced by religious conviction, that the Indian Social Reformer has had to fight ; and that he has been able at times to make an appreciable impression, as in the case of Chaitanya, not only bears testimony to his forceful and commanding personality but also to the attitude of the Indian masses always responsive to real greatness ······ The glamour of divine origin, claimed for the social custom that is assailed, is eclipsed by the actual presence of the semi divine person who claims to communicate his message amid a flood of heavenly effluence, which overpowers the faithful and inspires them with an enthusiasm that carries everything before it. The people feel the advent of an avatar with a message repealing the old and communicating the new. He is bound by no convention ; he is above and beyond all formula. He has in him the inspiration of a revelation, proclaiming the truth that is in him, and he proclaims it in a form that touches the heart and appeals to the imagination.

Such an avatar was Chaitanya, the greatest reformer that Bengal has produced······One divine message is thus arrayed against another, through the mouth of an elect of the Almighty." [A Nation in Making : pg. 396-397]

[ভাবার্থ ঃ সুতরাং ভারতের সমাজ-সংস্কারককে আধা ঐশ্বরিক বলে কথিত বিষয় সমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। ধর্মীয় আচারাদির দ্বারা উজ্জীবিত হয়ে ঐতিহ্যবাহী সামাজিক সংস্কারসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছিল ভারতের সমাজ-সংস্কারককে ; চৈতন্যের মতো সমাজ সংস্কারকরা সাধারণ মানুষের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিলেন। সামাজিক রীতিনীতিগুলো যা ঐশ্বরিক উৎস থেকে এসেছে ব'লে কল্পিত, সে-সব জীবন্ত ঈশ্বরোপম ব্যক্তিত্বের সামনে শিথিল হয়ে পড়ে। তার ফলে বিশ্বাসীদের মন উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং প্রথার বাধা দূর হয়ে যায়। সাধারণ মানুষ মনে করেন যে, পুরাতনকে সরিয়ে নূতনকে প্রতিষ্ঠিত করতে এসেছেন অবতার।

অবতার কোন পুরাতন রীতি-পদ্ধতির দ্বারা আবদ্ধ নন—সমস্ত নিয়মের ঊর্ধ্বে তিনি। ঈশ্বরের শক্তির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি সত্য প্রকাশের জন্যই এসেছেন, তিনি এমনভাবে তা প্রকাশ করেন যা মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে এবং জাগ্রত করে তাদের কল্পনা।

চৈতন্য সেরকমই একজন অবতার, তিনি বঙ্গের শ্রেষ্ঠ সংস্কারক, এক স্বর্গীয় বাণীর বিরুদ্ধে এইভাবেই ভগবান-নির্দিষ্ট মানুষের মুখ দিয়ে অপর একটি স্বর্গীয় বাণীকে উপস্থিত করা হয়। [এ নেশন ইন মেকিং : পৃ. ৩১৬-৩১৭]।

যে ব্যক্তিত্ব অতীতের বহু চিন্তা এবং আচার-আচরণকে ভেঙ্গে মানব-মনে নতুন জোয়ারের সঞ্চার করে-সেই ব্যক্তিত্বকে বঙ্গদেশ ভুললো কি ক'রে! চৈতন্যদেবের কথা মনে হলেই আমরা নিতাইয়ের সঙ্গে দু'হাত তুলে নৃত্যরত নিমাইয়ের চিত্রটিই মনে, ক'রে থাকি। অথচ সমস্ত জীবনীকারই তাঁকে বৃষস্কন্ধ সিংহগ্রীব এবং আজানুলম্বিতবাহু বিশাল শরীর ব'লে উল্লেখ করেছেন—

সিংহ-গ্রীব গজ-স্কন্ধ বিশাল হৃদয়।
আজানুলম্বিত ভুজ—অনু রসময়॥
বিশাল নিতম্ব—উরু কদলীর যেন। [চৈ. ম. পৃ. ৩৮]

অথবা, সমুদ্র থেকে উদ্ধারকারী জেলের ভাষায়—

কিবা ব্রহ্মদৈত্য কিবা ভূত কহনে না যায়।
দর্শনমাত্রে মনুষ্যের পৈশে সেই কায়॥
শরীর দীঘল তার হাত পাঁচ সাত।
এক এক হস্তপদ তার তিন তিন হাত॥ [চৈ. চ. পৃ. ৬০১]

বাঙালী এই বিশাল-দেহ এবং প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষটিকে কেবল নৃত্যরত দেখলেন কেন? বাঙালী শ্রীকৃষ্ণকে কেবল বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণরূপেই বা দেখেন কেন? কংসবধকারী শ্রীকৃষ্ণ, কালীয় নাগ দমনকারী শ্রীকৃষ্ণ, মথুরার রাজা শ্রীকৃষ্ণ, মহাভারতের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ পার্থসারথি, সুদর্শনধারী নারায়ণকে আমরা কেন ভুলে গেলাম? শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিল দেখাবার জন্য চৈতন্যজীবনীকাররা শ্রীকৃষ্ণের একটি দিককেই একান্ত সত্য ব'লে গ্রহণ ক'রে অন্যদিকগুলোকে নস্যাৎ ক'রে দিলেন কেন? সমাজ-সংস্কারক, কাজী দমনকারী চৈতন্যদেবকে মুহূর্তের জন্য লোকসমক্ষে এনে একেবারে গোপন ক'রে ফেললেন কেন? বাঙালীর এই মানসিকতার কারণ নির্ণয় করা আমাদের কাজ নয়। আমরা চৈতন্যদেবের ব্যক্তিত্বের স্বরূপ সন্ধান করতে চাই।

১৪৮৬ খ্রীস্টাব্দে (১৪০৭ শকাব্দে) ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিনে সন্ধ্যাকালে সিংহ-রাশি এবং সিংহলগ্নে গ্রহগণ যখন বিশেষ শক্তিশালী তখন নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন এক অপূর্ব দর্শন শিশু। তখন চন্দ্র রাহুগ্রস্ত, হাজার হাজার মানুষ হরির নাম করতে করতে গঙ্গাস্নান করছেন, চারিদিকে শোনা যাচ্ছে মৃদঙ্গ-সানাইয়ের ধ্বনি। বৃন্দাবনদাস বলেছেন—

ফাল্গুনী পূর্ণিমা আসি হইল প্রকাশ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে সুমঙ্গল।
সেই পূর্ণিমায় আসি মিলিল সকল॥
সংকীর্তন-সহিতে প্রভুর অবতার।

গ্রহণের ছলে তাহা করেন প্রচার ॥
... ...

অনন্ত অর্বুদ লোক গঙ্গাস্নানে যায়।
'হরি বোল হরি বোল' বলি সবে ধায় ॥
হেন হরিধ্বনি হৈল সর্ব-নদীয়ায়। [চৈ. ভা. পৃ. ১৪]
... ...

হেনই সময়ে সর্ব-জগত-জীবন।
অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশচীনন্দন ॥ [তদেব. পৃ. ১৫]

ফাল্গুনী পূর্ণিমা এবং গ্রহণকে উপলক্ষ ক'রে সমস্ত নবদ্বীপেই যখন 'সুজন-দুর্জনে' হরি সংকীর্তন করছিলেন তখন অদ্বৈত আচার্যের গৃহে হরিদাস শ্রীবাসাদি ভক্তগণ সংকীর্তনে আবিষ্ট হয়ে পড়বেন তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? জীবনীকাররা একে অতিলৌকিক যোগাযোগ ব'লে মনে করেছেন নিশ্চয়ই। দশ মাসে চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন নি, মাতৃগর্ভে তিনি আরও কয়েকমাস অবস্থান করেন ফাল্গুনী তিথি পাবার জন্য: চরিতকাররা বলতে চান যে, অবতার বিশেষ সময়ের জন্য যতদিন খুশী অপেক্ষা করতে পারেন এবং সেটাই তাঁদের বৈশিষ্ট্য। কবি কর্ণপুর তাঁর মহাকাব্যে বলেছেন—'ক্রমেণ মাসা দশ তে ত্রয়োধিকাঃ সমীয়ুঃ'—'ক্রমে ঐরূপে ত্রয়োদশ মাস অতীত হইল' (২য় সর্গ/ ২৪)। কবি কর্ণপুরকে অনুসরণ ক'রে কবিরাজ গোস্বামী শুনিয়েছেন—

হৈতে হৈতে হৈল গর্ভ ত্রয়োদশ মাস।
তথাপি ভূমিষ্ঠ নহে মিশ্রের হৈল ত্রাস ॥
নীলাম্বর চক্রবর্তী কহিলেন গণিয়া।
এই মাসে পুত্র হৈবে শুভক্ষণ পাঞা ॥ [চৈ. চ. পৃ. ৬৯]

বৃন্দাবনদাসে বা লোচনে এটা পাওয়া যায় না। বৃন্দাবনের লেখক বঙ্গের লেখকদের অপেক্ষা অধিকতর অলৌকিকত্ব প্রকাশ করতে চেয়েছেন। অবতার ইচ্ছা করলেই 'শুভক্ষণ' তৈরি ক'রে নিতে পারতেন, তার জন্য তাঁর অপেক্ষা করার কোন প্রয়োজন ছিল কি? এই বিশেষ তিথিতে ভারতে বিভিন্ন স্থানে গঙ্গাতীরে আর কোন শিশু কি জন্মগ্রহণ করে নি? একই সময়ে জন্মগ্রহণ করলেই কি সকলে একই প্রকার ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হন?

জয়ানন্দ মনে করেন যে, চৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষ শ্রীহট্টে এসে বসবাস করেন। রাজা ভ্রমরের অর্থাৎ কপিলেন্দ্রদেবের (শিলালিপিতে কপিলেন্দ্রদেবের উপাধি পাওয়া যায় 'ভ্রমর') ভয়ে তাঁরা উড়িষ্যার যাজপুর থেকে পলায়ন করেছিলেন—

চৈতন্য গোসাঞির পূর্বপুরুষ আছিল যাজপুরে।
শ্রীহট্ট দেশেতে পালাঞা গেল রাজা ভ্রমরের ডরে ॥ [জয়ানন্দ, চৈ. ম.]

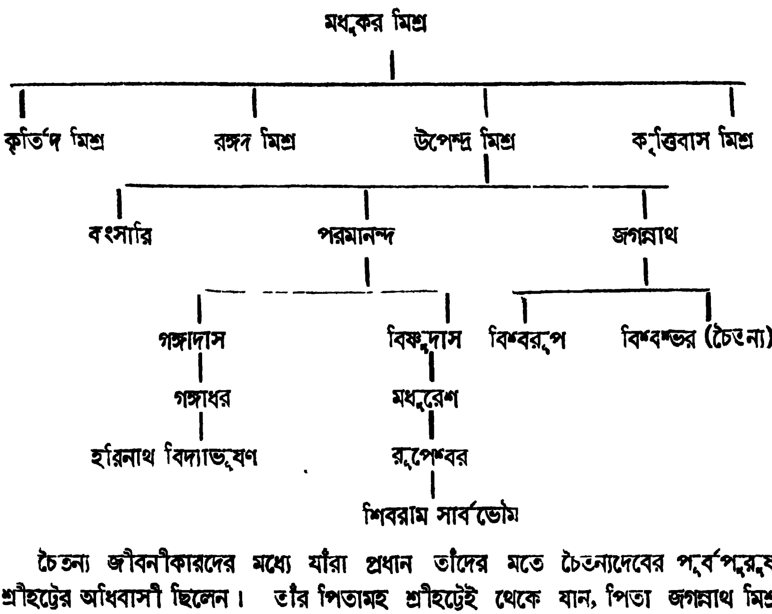
ড. বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন—"যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে কপিলেন্দ্র রাজা হওয়ার পরেই শ্রীচৈতন্যের পূর্বপুরুষ যাজপুর হইতে শ্রীহট্টে পলায়ন করেন, তাহা হইলে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে মিশ্র বংশের তিনবার (যাজপুর, শ্রীহট্ট, নবদ্বীপ) বাসস্থান পরিবর্তনের কথা স্বীকার করিতে হয়।" [চৈতন্যচরিতের উপাদান]

মিশ্র বংশের কোন্ শাখা পালিয়ে গিয়েছিল সে প্রশ্ন কিন্তু থেকে যায়। কেননা, জয়ানন্দ বলেছেন—

সেই বংশে পরম বৈষ্ণব/কমললোচন তার নাম।
পূর্ব জন্মের তপে চৈতন্য গোসাঞি/তার ঘরে কৈল বিশ্রাম ॥ [তদেব]

অর্থাৎ মিশ্রবংশের যে-শাখা পালিয়ে গিয়েছিল, সেই শাখারই চৈতন্য-সমসাময়িক বৈষ্ণব কমললোচন। যাজপুরে কমললোচনের ঘরে চৈতন্য নীলাচল যাবার পথে বিশ্রাম নিয়ে থাকলে, তার অর্থ দাঁড়ায়, কমললোচনের পূর্বপুরুষ যাজপুর থেকে শ্রীহট্টে গেলেও পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই আবার তাঁরা যাজপুরে প্রত্যাবর্তন করেন। এই কমললোচনের নাম চৈতন্যদেবের পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্রের প্রাপ্ত শাখায় নেই। উপেন্দ্র মিশ্রের তিন ভাই রঙ্গদ, কীর্তিদ ও কৃত্তিবাস—এঁদের বংশতালিকা আমরা পাই নি—'চৈতন্য গোসাঞির পূর্বপুরুষ' বলতে এঁরাই উদ্দিষ্ট হতে পারেন।

জগন্নাথ (জগবন্ধু) সিং-এর 'প্রাচীন উৎকল' গ্রন্থে পাওয়া যায় যে, চৈতন্যদেব উৎকলেরই মানুষ, তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন উড়িষ্যার যাজপুর নিবাসী ব্রাহ্মণ : তৎকালীন উড়িষ্যারাজ যে বংশ পরিচয় দিয়েছেন তা নীচে দেওয়া গেল—



চৈতন্য জীবনীকারদের মধ্যে যাঁরা প্রধান তাঁদের মতে চৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষ শ্রীহট্টের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতামহ শ্রীহট্টেই থেকে যান, পিতা জগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপে গঙ্গাতীরে এসে বসবাস করেন। এখানে তিনি শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপে আগত বিখ্যাত জ্যোতিষ শাস্ত্রবিদ নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যা শচীদেবীকে বিবাহ করেন। চৈতন্য চরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর মতে চৈতন্যদেবের পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্রের সাতটি পুত্র ছিল তার মধ্যে পঞ্চম জগন্নাথ মিশ্র চৈতন্যদেবের পিতা—

উপেন্দ্র মিশ্র

কংসারি পরমানন্দ পদ্মনাভ সর্বেশ্বর জগন্নাথ জনার্দন ত্রৈলোক্যনাথ

(জগন্নাথ) — বিশ্বরূপ বিশ্বম্ভর (চৈতন্যদেব)

'শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপলীলা' গ্রন্থ প্রণেতা হরিদাস গোস্বামী বলেন যে, কর্ণাবতীর রাজা শ্যামল বর্মা বঙ্গদেশে আধিপত্য বিস্তার ক'রে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে এদেশে এনে প্রচুর ভূমি এবং গ্রাম দান করেন তাঁদের অন্যতম জিত মিশ্র চৈতন্যদেবের প্রপিতামহ—

জিত মিশ্র

১ম ২য় মধুকর মিশ্র

(মধুকর মিশ্র) — উপেন্দ্র রঙ্গদ কীর্তিদ কীর্তিবাস

(উপেন্দ্র) — কংসারি পরমানন্দ জগন্নাথ পদ্মনাভ সর্বেশ্বর জনার্দন ত্রৈলোক্যনাথ

(জগন্নাথ) — আট কন্যা (বিনষ্ট) বিশ্বরূপ বিশ্বম্ভর (চৈতন্যদেব)

জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন পণ্ডিত, ভক্তিপরায়ণ বৈষ্ণব—তাঁর উপাধি ছিল পুরন্দর। পত্নী শচীদেবীও ছিলেন কৃষ্ণভক্ত। তাঁর গর্ভে আটটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে—সব কয়টি গর্ভেই বিনষ্ট হয়ে যায়। অষ্টকন্যার বিনষ্ট হওয়ার ব্যাপারে ভক্তরা কতদূরে যেতে পারেন তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায় ঃ ভক্তির প্লাবনে সমস্ত যুক্তিকে অনেকেই উড়িয়ে দিয়েছেন। যা সত্য নয় তাকে সত্যরূপে দাঁড় করাবার চেষ্টাতে এমনটিই হয়। ঈশান নাগর এ বিষয়ে তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন—

জগন্নাথ মিশ্র পত্নী শচীর গর্ভগণ।
অদ্বৈতের প্রণামে ক্রমে হইলা পতন॥ [অদ্বৈত প্রকাশ]

'অদ্বৈত প্রকাশ'কে অনুসরণ করে হরিদাস গোস্বামী বলেছেন, "শচীদেবীর শ্রীগর্ভে শ্রীগৌর-ভগবান্ উদয় হইবেন জানিয়া আমাদের গৌরআন্য গোসাঞি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু মিশ্রপত্নীকে গর্ভবতী দেখিলেই গর্ভস্থ শিশুরূপী তাঁহার অভীষ্টদেবকে উদ্দেশ করিয়া তিনি শ্রীগর্ভবন্দনা ও প্রণাম করিতেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মহাবিষ্ণু অবতার। পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীগৌর-ভগবান্ ব্যতীত তাঁহার প্রণাম আর কে গ্রহণ করিতে পারিবেন? এই জন্য শচীদেবীর এক একটি করিয়া আটটি গর্ভ নষ্ট হইয়া গেল।" [শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপ লীলা পৃ. ১২-১৩] অর্থাৎ ভ্রান্তিবশত অদ্বৈত প্রভু শচী-জগন্নাথের আটটি সন্তানকে হত্যা করলেন।

. ভক্তদের জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে—(১) শচীগর্ভে ভগবান আসবেন এখবরটি পেলেন কিন্তু আট আটবার যাঁরা এলেন তাঁদের কেউ যে সেই ভগবান নন এ খবরটি অদ্বৈত আচার্য পেলেন না কেন? (২) পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীগৌর ভগবান ব্যতীত কেউ মহাবিষ্ণু-অবতার অদ্বৈত আচার্যের প্রণাম যদি সহ্য করতেই না পারেন তবে বিশ্বরূপ বাঁচলেন কি প্রকারে? ভক্তরা যে চৈতন্য জীবনের সত্যরূপকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ভবিষ্যৎ গবেষকের কাজ হবে সত্য উদ্ঘাটন। আমরা পথের ইঙ্গিতটুকু করবো।

অপূর্বদর্শন গৌরাঙ্গের জন্মগ্রহণের পূর্বে বিশ্বরূপের জন্ম হয়—তিনিও ছিলেন অপূর্বদর্শন এবং সর্বশাস্ত্র বিশারদ।

সদ্যজাত শিশুর রূপ দেখে বিস্মিত হলেন সকলে। রূপের বর্ণনা দিয়েছেন জীবনীকাররা। সকলেই প্রায় একই ধরনের কথা বলেছেন।

চৈতন্য ভাগবত বলেছেন—

চাঁদ সুশীতল' শ্রীমুখমণ্ডল,
আজানু বাহু বিশাল।

এবং, রূপে কোটি মদন জিনিঞা। [চৈ. ভা পৃ. ১৫]

কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—

তপ্তহেম সম কান্তি প্রকাণ্ড শরীর।
... ...
তিলফুল জিনি নাসা সুধাংশুবদন॥ [চৈ. চ, পৃ. ৮]

এবং, সর্ব-অঙ্গ সুনির্মাণ সুবর্ণপ্রতিমা ভান,
সর্ব-অঙ্গ সুলক্ষণময়।
বালকের দিব্য দ্যুতি দেখি পাইল বহুপ্রীতি
বাৎসল্যেতে দ্রবিল হৃদয়॥ [তদেব. পৃ. ৭২]

লোচনের কাব্যেও আছে—

প্রফুল্ল কমলদল বয়ান বাখানি॥
উন্নত নাসিকা তিলকুসুম জিনিঞা।
ঝলমল গোরা-অঙ্গ কিরণ অমিঞা॥
অধর অরুণ—আর চারু গণ্ডদ্যুতি।
সুন্দর চিবুক দেখি উঠয়ে পীরিতি॥ [চৈ. ম. পৃ. ৩৮]

পদকর্তা বাসুদেব ঘোষ তো সোজা বলে দিয়েছেন—

গোরা রূপের নাহিক তুলনা।

জন্মমুহূর্তেই বোঝা গেল যে, গোরা প্রেম এবং বলিষ্ঠতার প্রতীক। কেবল প্রেমোন্মাদে মত্ত হবার জন্যই তিনি পৃথিবীতে আসেন নি।

শচীদেবীর পিতা নীলাম্বর চক্রবর্তী ছিলেন জ্যোতিষী। তিনি শচীপুত্রের দেহে মহারাজ লক্ষণ দেখলেন, রূপ দেখে চমৎকৃত হলেন। দৌহিত্র প্রগাঢ় পণ্ডিত সর্বগুণান্বিত হবে তা তিনি বুঝলেন। অপর একজন জ্যোতিষী বললেন, এই শিশু সর্ব ধর্ম সাধন করবে, অপূর্ব প্রচারক হবে, মানুষের চিত্তকে করবে উন্নত, উদ্ধার করবে জগৎ।

সর্বভূতে ওর দয়া প্রকাশ পাবে—অন্যদের কথা দূরে থাক বিষ্ণুদ্রোহী যবনরাও তার চরণ সেবা করবে। পিতামাতা দেব-দ্বিজের প্রতি হবে ভক্তিমান : এই শিশু নবধারার প্রবর্তক হবে। জন্মলগ্নের এই ফল নষ্ট করার সাধ্য কারও নেই। কিন্তু সন্ন্যাস গ্রহণের কথাটি দুজনেই গোপন করলেন। অপরিচিত জ্যোতিষী বলেছিলেন—

সেইখানে বিপ্ররূপে এক মহাজন।
প্রভুর ভবিষ্য কর্ম কয়য়ে কথন॥
বিপ্র বোলে "এ শিশু সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ইহা হইতে সর্বধর্ম হইবে স্থাপন॥
. ...
এ শিশু করিবে সর্ব-জগৎ উদ্ধার।
... ...
সর্বভূত-দয়ালু নির্বেদ দরশনে।
সর্ব-জগতের প্রীতি হইবে ইহানে॥" [চৈ. ভা. পৃ. ১৬]

কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, যিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ, যিনি সর্বধর্ম স্থাপন করবেন, সর্ব-জগৎ উদ্ধার করবেন এবং সর্বজগতের প্রীতিলাভ করবেন তিনি 'দ্বিজে' ভক্তিমান হবেন কেন? ভবিষ্যতে জাত-পাতকে অবলুপ্ত ক'রে যিনি সব মানুষকে সমান করবার সাধনা করেছিলেন সমাজ কল্যাণের কথা ভেবে তাঁকে 'দ্বিজ' ভক্তিপরায়ণ করার চেষ্টা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল চৈতন্যদেবের তিরোধানের কিছুদিন পরেই। বৈষ্ণব হয়েও শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাকে নস্যাৎ ক'রে হরিদাস গোস্বামী মশায়ও অতি নগ্নভাবে ব্রাহ্মণের মহিমা ঊর্ধ্বে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন—"নদীয়ার অবতার শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু উচ্চ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার অবতারের শ্রেষ্ঠত্ব এবং শ্রীভগবানের নরলীলার উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। বর্ণশ্রেষ্ঠ বিপ্রকুলে শ্রীভগবানের এই প্রথম অবতার। কলিক্লিষ্ট জীব শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপাপাত্র। কি করিলে তাহাদের কলুষিত মন, চিত্ত এবং কঠিন হৃদয় ভগবদ্ভাবে বিভাবিত হইবে, কি উপায়ে তাহাদের শ্রীভগবানের অবতারে সুদৃঢ় বিশ্বাস হইবে এই চিন্তায় কাতর হইয়া কলিপাবনাবতার শ্রীগৌর-ভগবান সর্বোৎকৃষ্ট-ভাবে সর্ববিধ উপায়ে কলিহত জীবের মনোরঞ্জন করিতে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে· ··· অবতীর্ণ হইয়াছিলেন" [শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপ লীলা পৃ. ১০]।

ব্রাহ্মণকুলে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ব'লেই বোধ হয় 'চৈতন্য-অবতারকে'ই শ্রেষ্ঠ অবতার বলা হয়েছে! এই ধরনের চৈতন্য-ভক্তরাই চৈতন্যদেবের মহৎ চিন্তাকে ধ্বংস করেছেন ব'লে মনে হয়।

জাতকর্ম ও নামকরণ :

একমাস পরে বালক উত্থান-পর্বে অর্থাৎ জাত-কর্মের দিনে শ্রীবাস আচার্যের পত্নী এবং অন্যান্য নারীরা শচীদেবীর সঙ্গে গঙ্গাস্নানে গেলেন। গঙ্গাস্নান সেরে তাঁরা গঙ্গাপূজা ক'রে উপস্থিত হলেন ষষ্ঠীস্থানে। তেল, সিন্দুর, নারকেল, খই, কলা, গুয়া পান প্রভৃতি উপকরণ দিয়ে সমাপন করলেন ষষ্ঠীপূজা। সকলে ফিরলেন নিজ নিজ গৃহে। অদ্বৈত আচার্যের আদেশে তাঁর পত্নী সীতাদেবী উপহার দিলেন শিশুকে, আশীর্বাদ করলেন তাকে। দরিদ্র জগন্নাথ মিশ্র সাধ্যমত দান করলেন।

নামকরণের সময় এল, নীলাম্বর চক্রবর্তী এবং অন্যান্য পণ্ডিতরা এলেন জগন্নাথগৃহে —পতিব্রতা নারীরা এলেন শচীমাতার কাছে : শিশুকে আশীর্বাদ করলেন সকলে ; পূর্বে অনেকগুলো সন্তানের মৃত্যু হওয়ায় শিশুর নাম রাখা হলো 'নিমাই' (নিমের মতো তেতো)—

দূর্বা ধান্য দিল শীর্ষে কৈল বহু আশীষে
চিরজীবী হও দুই ভাই।
ডাকিনী শাকিনী হৈতে শঙ্কা উপজিল চিতে
ডরে নাম থুইল নিমাই ॥ [চৈ. চ. পৃ. ৭৮]

বৃন্দাবনদাস অবশ্য অন্য কারণ দেখিয়ে বলেছেন—

"ইহান অনেক জ্যেষ্ঠ পুত্র কন্যা নাঞি।
শেষ যে জন্ময়ে তার নাম সে 'নিমাঞি' ॥ [চৈ. ভা. পৃ. ১৯]

কিন্তু এতো আদরের আটপৌরে (ডাক) নাম—পতিব্রতারাই এ নাম দিয়েছেন বিচার-বিবেচনা ক'রে। পোশাকী নামও তো একটা চাই, আর তা দিতে পারেন পণ্ডিতরাই—

বোলেন বিদ্বান্ সব করিয়া বিচার।
"এক নাম যোগ্য হয় রাখিতে ইহার ॥
এ শিশু জন্মিলে মাত্র সর্বদেশে দেশে।
দুর্ভিক্ষ ঘুচিল, বৃষ্টি পাইল কৃষকে ॥
জগৎ হইল সুস্থ ইহার জনমে।
পূর্বে যেন পৃথিবী ধরিলা নারায়ণে ॥
অতএব ইহান 'শ্রীবিশ্বম্ভর' নাম।
কুলদীপ কোষ্ঠিতেও লিখিল ইহান ॥ [তদেব]

আজকের দিনের প্রচলিত বিধি অনুযায়ী শিশুর সামনে রাখা হলো ধান, পুঁথি, খড়ি এবং স্বর্ণ—শিশু কি ধরে তা দেখার জন্য, আজকের মতো সেদিনের মানুষও উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন : নিমাই বুকে টেনে নিলেন 'শ্রীমদ্ভাগবত'। আশা করা গেল, ভবিষ্যতে পাষণ্ডী দলনক্ষম প্রেমিক বৈষ্ণব হবেন বিশ্বম্ভর।

কিন্তু নামকরণের দিনে যে নাম রাখা হয় তা অনেক সময়েই হারিয়ে যায়। বিশেষত, কোষ্ঠিতে বিশেষ আদ্যক্ষর মিলিয়ে যে নাম দেওয়া হয় তা অধিকাংশ সময়েই কোষ্ঠিতেই থেকে যায়। বাল্যে নিমাই যখন ক্রন্দন করতেন তখন কৃষ্ণ, হরি ব'লে তাকে শান্ত করা হতো। তাই নারীরা পরিহাস ক'রে তাকে গৌরহরি ব'লে ডাকতেন এবং শেষ পর্যন্ত এই নামটাই পেয়ে গেল বিশেষ স্থান। গৌরহরিই কালক্রমে হয়ে গেল গৌরাঙ্গ, গৌরচন্দ্র।

যথাসময়ে বালকের হাতে খড়িও হয়ে গেল—ভবিষ্যৎ পণ্ডিতের বিদ্যারম্ভ হলো।

চপলতা :

শিশু যখন হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়াত তখন মাতৃহৃদয় এবং প্রতিবেশী নারীদের হৃদয় আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠতো। বাৎসল্য রসের অমিয় ধারা যেমন ফল্গুর মতো প্রবাহিত হতো তাঁদের হৃদয়ে, তেমনি সদা জাগ্রত থাকতো শঙ্কা। শিশুর কাছে

আগুন-পোকা-মাকড় সবই তো সমান! 'অবতার' বোঝাবার উদ্দেশ্যেই সম্ভবত বৃন্দাবনদাস শুনিয়ে দিলেন যে, শিশু একদিন এক বিষধরের ওপর শুয়ে ছিল—

একদিন এক সর্প বাড়ীতে বেড়ায়।
ধরিলেন সর্প প্রভু বালকলীলায়॥
কুণ্ডলী করিয়া সর্প রহিল বেড়িয়া।
ঠাকুর থাকিলা সর্প-উপরে শুইয়া॥ [তদেব]

সর্বযুগে সর্বত্রই শিশুরা কৌতূহলী—শিশুসুলভ কৌতূহলের ফলে এমন ঘটনা ঘটতে পারে না এমন নয়। অবশ্যই বৃন্দাবনদাসের উদ্দেশ্য অন্য প্রকার ছিল তাও নিঃসন্দেহে বলা যায়। লোচনে বা কবিরাজ গোস্বামীতে এ কাহিনী নেই।

শিশু এবার হামাগুড়ি ছেড়ে হাঁটতে আরম্ভ করলো—ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছে সে। গোরাচাঁদের অপূর্ব রূপও ফুটে বের হতে লাগল ক্রমশ। তার চাঁচর কেশ, কমললোচন এবং অরুণ অধর তার চন্দ্রবদনকে মনোমুগ্ধকর ক'রে তোলে। হেলে-দুলে-চলা নিমাইকে নিয়ে নারীদের অন্তর আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে। তাঁরা 'হরি হরি' বলে কীর্তন করেন আর বালক নানা ভঙ্গীতে নাচে ঃ মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে ধূলায় ধূসর হয়ে শিশু কলরোল করতে করতে তড়বড়িয়ে উঠে পড়ে মায়ের কোলে—এর চেয়ে মনোরম স্থান আর কি হতে পারে! মাতৃহৃদয়ে যেমন আনন্দ, শিশুর মনেও ঠিক তেমন আনন্দ—প্রতিবেশী নারীদের মনও পরিপূর্ণ!

নতুন হাঁটতে শিখেছে চঞ্চল নিমাই, নিজের শক্তি যাচাই করতে হবে তো! তাই ঘরে বাইরে টলতে টলতে ছুটে বেড়ায় সে, তাকে তখন ধরে রাখা কঠিন। একলা বাইরে বেরিয়ে সংগ্রহ করে আনে খই কলা যা পায়, তাই অপরিচিতরাও তার অপূর্ব রূপ মাধুরী দেখে তার হাতে তুলে দেন নানা সামগ্রী। আধ আধ কণ্ঠে 'তে' ব'লে হাত পাতে অজ্ঞান শিশু—এই শিশুই তো পরবর্তী কালে ব্রহ্মাণ্ডটাকে হাত পেতে গ্রহণ করবে নিজস্ব দাবীতে—

নিরবধি ধায় প্রভু কি ঘর বাহিরে।
পরম চঞ্চল কেহো ধরিতে না পারে॥
একেশ্বর বাড়ীর বাহিরে প্রভু ধায়।
খই, কলা, সন্দেশ যা দেখে তাই চায়॥
দেখিয়া প্রভুর রূপ পরম মোহন।
যে জন না চিনে, সেই দেই ততক্ষণ॥
সভাই সন্দেশ কলা দেয়েন প্রভুরে।
পাইয়া সন্তোষ প্রভু আইসেন ঘরে॥ [তদেব পৃ. ৫০]

কিন্তু প্রাপ্ত সামগ্রীর কিছুই মুখে দেয় না শিশু—দৌড়ে গিয়ে দিয়ে আসে কীর্তনরতা নারীদের হাতে। উত্তরকালে মহত্তর কিছু দেবার জন্যই তো ব্রহ্মাণ্ড গ্রহণ!

যে সকল স্ত্রীগণে গায়েন হরিনাম।
তা সভারে আনি সব করেন প্রদান॥ [তদেব]

ভক্তরাই তো উদ্ধার পাবেন!

তিন-চার বছরের নিমাই হয়ে উঠলো অত্যন্ত দুরন্ত এবং দুষ্টু। ভবিষ্যতে যাঁরা বড় হয়েছেন, বাল্যে তাঁদের অনেকেই ছিলেন দুরন্ত এবং দুষ্টু ; অবশ্য তার মানে এই নয়

যে বাল্যে দুরন্ত বা দুষ্টু হলে উত্তরকালে সে মহৎ হয়ে উঠবে। ঘরে কেউ না থাকলে সে সমস্ত ঘরে ছড়িয়ে রাখতো চাল, দুধ, তেল যা কিছু পেত। মাতা আসছেন বুঝতে পারলে সে বিছানায় শুয়ে কাঁদতে থাকতো। শিশুর কান্না থামাবেন, না তাকে ভর্ৎসনা করবেন, শচীমাতা পড়তেন বিষম সংকটে।

অতি আগ্রহে বৃন্দাবনদাস শিশুর মুখে তত্ত্ব কথাও শুনিয়েছেন। মাটি এবং দধি-সন্দেশে কোন পার্থক্য দেখে নি শিশু। ভক্ত জীবনীকারদের এ প্রকার চরিত্র চিত্রণের ফলে চরিত্রটি হয়ে উঠেছে অস্পষ্ট। ভগবান যদি সত্যিই নরদেহ ধারণ ক'রে লীলা করতেই আসেন তবে বাল্যকাল থেকেই তিনি তাঁর আচার-আচরণে তা প্রকাশ করবেন কেন? নরের মতো কাজ করার জন্যই তো নরদেহ ধারণ! ভক্ত জীবনীকাররা যে কোন উপায়ে যে কোন সময়ে নিমাইয়ের মধ্যে ঐশ্বরিক শক্তির প্রকাশ ঘটাবার জন্য যেন মুখিয়ে থাকেন; ফলে ভগবানের নরদেহ ধারণের তাৎপর্যই যায় নষ্ট হয়ে। চৈতন্যদেবকে ভগবান করতে গিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন ভক্ত কবিরা।

আর একটু বড় হলে নিমাইয়ের দুরন্তপনা ঘর ছেড়ে বাইরের দিকে প্রসারিত হলো। অন্য বালকদের সাহায্যে প্রতিবেশীদের গৃহ থেকে খাদ্য চুরি করে সে; শিশুদের কাঁদিয়ে বিরক্ত করে, সমবয়সী বালকদের সময়ে অসময়ে প্রহার ক'রে বসতো নিমাই। নিকটবর্তী বন্ধুদের ঘরে গিয়ে খাদ্য চুরি করে আনতে বড় মজা। বৃন্দাবনদাস বলেছেন—

> নিকটে বসয়ে যত বন্ধুবর্গ ঘরে।
> প্রতিদিন আপনে কৌতুকে চুরি করে॥
> কারো ঘরে দুগ্ধ পিয়ে, কারো ভাত খায়।
> হাণ্ডি ভাঙ্গে যার ঘরে কিছুই না পায়॥
> যার ঘরে শিশু থাকে তাহারে কান্দায়।
> কেহো দেখিলেই মাত্র উঠিয়া পলায়॥
> দৈবযোগে কেহো যদি পারে ধরিবারে।
> তবে তার পায়ে ধরি করে পরিহারে॥
> "এবার ছাড়হ মোরে, না আসিব আর।
> আর যদি চুরি করোঁ দোহাই তোমার"॥ [তদেব]

এই চিত্রকল্পটি খুবই স্বাভাবিক এবং সুন্দর। শ্রীমদ্ভাগবতের 'ননীচোরা'র সঙ্গে সাদৃশ্য দেখাবার চেষ্টা থাকলেও এ চিত্রটি সর্বকালেরই। বালকের মনে 'লুকিয়ে খাবার' ইচ্ছাটা বোধ হয় আদ্যিকালের স্বভাব।

নবদ্বীপ লীলায় বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা লোচনদাস এবং কবিরাজ গোস্বামীর থেকেও অধিকতর বাস্তবানুগ বলে মনে করার কারণ আছে। তাঁর মাতা নারায়ণী বাল্যে চৈতন্যদেবকে দেখেছেন, নারায়ণীর জ্যেষ্ঠতাত শ্রীবাস আচার্য, পিতা শ্রীরাম পণ্ডিত ছিলেন চৈতন্যদেবের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভক্ত—তার ওপর বৃন্দাবনদাস ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর নিত্যসঙ্গী। সুতরাং চৈতন্য-জীবন-কাহিনী জানার প্রভূত সুযোগ ছিল তাঁর। লোচনদাস মুরারির গ্রন্থ অনুসরণ করেছেন; কিন্তু সেটা কি মুরারির 'লীলাসূত্র' না মুদ্রিত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃত' কাব্য? দ্বিতীয়টিতে অনেক প্রক্ষিপ্ত বিষয় আছে। বিশেষ বৈকুণ্ঠ-বৈভাস এবং নারদমুনির ভ্রমণাদি (মুরারির নামে প্রচলিত

কাব্য থেকে গৃহীত) বর্ণনা ক'রে প্রথম থেকেই সব কিছুকে অলৌকিকত্বের আধারে ধরবার চেষ্টা করেছেন। কবিরাজ গোস্বামীর কাব্যে বৃন্দাবনে সৃষ্ট তত্ত্বের আচ্ছাদন স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়—বৃন্দাবনদাসকে যেখানে যেখানে তিনি গ্রহণ করেছেন সেখানে সেখানে নতুন কিছু নেই, কিন্তু অন্যত্র তত্ত্বের আচ্ছাদন থাকায় কাহিনী বাস্তবতাকে স্পর্শ করতে পারে নি। নবদ্বীপ লীলায় বৃন্দাবনদাসই তাই আমাদের মূল উপজীব্য। তবে ভাগবতের সঙ্গে মেলাবার জন্যই হোক অথবা অবতার প্রমাণ করার উদ্দেশ্য থেকেই হোক যেখানে যেখানে শিশু-বালককে নিয়ে অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়েছেন সেগুলোকে আমাদের বর্জন করতেই হবে। চৈতন্যভাগবত ঘটনা গুলোর কথা বলেছেন বটে কিন্তু সেগুলো ঘটলে সমস্ত নবদ্বীপে যে রাষ্ট্র হয়ে যেত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ঃ অথচ নবদ্বীপের মানুষরা যে তার কিছুই জানেন না তা বৃন্দাবনদাসের জীবনীকাব্য থেকেই স্পষ্ট হয়।

মিশ্র গৃহে নূপুরের রুনুঝুনু শব্দ, ঘরের মেঝেতে ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন, নিমাইকে কাঁধে নিয়ে চোরদের পলায়নের চেষ্টা, তৈর্থিক ব্রাহ্মণকে অষ্টভুজ রূপ দর্শন করান অথবা পিতার বান্ধব জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্য ভাগবতের একাদশী উপবাসের নৈবেদ্য আহার প্রভৃতি ঘটনাকে স্বকপোল কল্পিত ব'লেই গ্রহণ করতে হবে।

বালক নিমাই যে লেখাপড়ায় ভাল হবেন তা বেশ বোঝা গেল—

দৃষ্টিমাত্র সকল অক্ষর লিখে যায়।
পরম বিস্মিত হই সর্বগণে চায়॥ [তদেব ঃ পৃ. ২৬]

বালক কেবল লেখাপড়ায় মেধাবী তাই নয়, কল্পনাপ্রবণও বটে! রূপকথার অনির্দেশ লোকে যাত্রা করতে চায় তার মন—

আকাশে উড়িয়া যায় পক্ষ তাহা চাহে।
না পাইলে কান্দিয়া ধূলায় গড়ি যায়ে॥
ক্ষণে চাহে আকাশের চন্দ্র-তারাগণ।
হাত-পা আছাড়িয়া করয়ে ক্রন্দন॥ [তদেব]

কল্পনা শক্তি না থাকলে বড় হওয়া যায় না ঃ কি করলে সমাজের, মানুষের মঙ্গল সাধন করা যাবে—কঠিন বাস্তবকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করার উপায় কি, তার জন্য কল্পনার প্রয়োজন ; বাল্যকাল থেকেই গৌরহরির সেই কল্পনা শক্তি জাগ্রত হয়েছিল।

এ সময় পর্যন্ত নিমাই ছিল হরিনামের ভক্ত—হরিনাম শুনলে তার ক্রন্দন থামত—

হরিনাম শুনিলে না কান্দে প্রভু আর॥ [তদেব]

মেধাবী বালক পড়াশুনায় এগিয়ে চলে, এগিয়ে চলে দুষ্টুমিতেও। পড়া শেষ ক'রে প্রতিদিন নিমাই বন্ধুদের নিয়ে গঙ্গাস্নানে যায়। গৃহস্থ-সন্ন্যাসী অসংখ্য মানুষ গঙ্গাস্নান করেন—তারই মধ্যে সাঁতার কাটে, ডোবে-ভাসে বালকের দল—

কতেক বা শান্ত দান্ত গৃহস্থ সন্ন্যাসী।
না জানি কতেক শিশু মিলে তঁহি আসি॥
সভারে লইয়া প্রভু গঙ্গায় সাঁতারে।
ক্ষণে ডুবে ক্ষণে ভাসে নানা ক্রীড়া করে॥ [তদেব ঃ পৃ. ২৭]

দুরন্ত নিমাই কাউকে ভয় পায় না, গ্রাহ্য করে না। বয়স্ক মানুষেরা যে স্নান করছেন, তাঁদের যে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নেই তার—

জল-ক্রীড়া করে গৌর সুন্দর শরীর।
সভার গায়েতে লাগে চরণের নীর ।।
সভে মানা করে তভো মানা নাহি মানে।
ধরিতেও কেহ নাহি পারে একস্থানে ।।
পুনঃ পুনঃ সভারে করাইল প্রভু স্নান।
কারো ছুঁয়ে কারো অঙ্গে কুল্লোল প্রদান ।। [তদেব]

'চরণের নীর' গায়ে ছেটানো অথবা 'অঙ্গে কুল্লোল প্রদান' অবতারের পক্ষেও খুব ভাল নিদর্শন নয়। নিমাইয়ের অপকর্মের ইতিহাস আরো বড়ঃ সে জল দিয়ে ব্রাহ্মণদের ধ্যান ভাঙ্গে, কারো শিবলিঙ্গ চুরি করে, কারো উত্তরীয় নিয়ে পালায়; এ ছাড়াও—

কেহো বোলে "পুষ্প, দূর্বা, নৈবেদ্য, চন্দন।
বিষ্ণু পূজিবার সজ্জ, বিষ্ণুর আসন ।।
আমি করি স্নান, হেথা বৈসে সে আসনে।
সব খাই পাঢ়ি, তবে করে পলায়নে ।।
আরো বোলে "তুমি কেনে দুঃখ ভাব মনে।
যার লাগি কৈলে সেই খাইল আপনে।।" [তদেব]

বালকরা দুষ্টু হতেই পারে কিন্তু তার সীমা ছাড়ান চলে না। সীমা ছাড়ান নিশ্চিত রূপে অপরাধঃ অপরাধের জগতে নিয়ে গিয়ে অবতার সৃষ্টি করার ভ্রান্ত প্রয়াস ছিল জীবনীকারদের। ভ্রান্ত ধারণার আচ্ছাদনে অবতার সৃষ্টির চেষ্টার থেকে সত্যের উদ্ঘাটনে মহামানবের প্রতিষ্ঠা শ্রেয়। অসম্ভব এবং অলৌকিকত্বের ছায়া ভেদ করে চৈতন্য জীবনের সত্য উদ্ঘাটনের জন্য আজ শ্রদ্ধাশীল যুক্তিবাদী গবেষকের বিশেষ প্রয়োজন।

কেবল বয়স্ক মানুষেরাই নন, ৭/৮ বছরের বালিকারাও প্রায় সমবয়সী নিমাইয়ের ওপর বিরক্ত। নিমাই তাদের বিব্রত করে, চুরি করে তাদের বসন (নিছক কৃষ্ণের অনুকরণে গোপিনীদের বস্ত্র হরণের সঙ্গে মেলাতে)। মেয়েরা দল বেঁধে এসে অভিযোগ করে শচীমাতার কাছে—

ব্রত করিবারে যত আনি ফুল-ফল।
ছড়াইয়া ফেলে বল করিয়া সকল ।।
স্নান করি উঠিলে বালুকা দেই অঙ্গে।
যতেক চপল শিশু সেই তার সঙ্গে ।।
অলক্ষিতে আসি কর্ণে বোলে বড় বোল।
কেহ-বোলে "মোর মুখে দিলেক কুল্লোল।।" [তদেব ঃ পৃ. ২৮]

শুধু তাই নয় কাউকে কাউকে আবার বিয়ে করতেও চায় 'মোরে চাহে বিভা করিবারে।' যে কন্যা নৈবেদ্য খেতে দেয় তাকে নিমাই মনোমত বর দান করে। ভয়ঙ্কর বরের ভয়ে তারা নৈবেদ্য ধরে দেয় নিমাইয়ের হাতে। কিছু সুন্দর চিত্রকল্প,

কিছু মনস্তত্ত্ব জ্ঞানের পরিচয় আছে এখানে। তা সত্ত্বেও অসংস্কৃত আচরণ বিশেষ ক'রে সেকালে, বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। নন্দের কুমারের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখাবার উদগ্র বাসনায় জীবনীকার প্রচলিত সমাজের কথা, শোভন আচার-আচরণের কথাও ভুলে গেছেন।

বয়স্করা-কন্যারা অভিযোগ তো করলেন কিন্তু সেদিন নিমাই যে স্নান করতেই যায় নি তা প্রমাণ ক'রে দিল। স্নানের চিহ্নমাত্র তার দেহে নেই। লেখক নিশ্চিত রূপে অলৌকিক ব্যাপার ব'লে এ ব্যাপারটা দেখাতে চেয়েছিলেন; জগন্নাথের মনে সে ভাব জাগলেও বৃন্দাবনদাস প্রকাশ্যে তাকে চাতুরী ব'লে উল্লেখ করতে বাধ্য হয়েছেন।

> হাসয়ে সকল শিশু শুনিয়া চাতুরি॥
> সভেই প্রশংসে "ভাল নিমাঞি চতুর।
> ভাল এড়াইলা আজি মারণ প্রভুর॥" [তদেব : পৃ. ২৯]

নিমাইয়ের চাতুরির কথাটা আমাদের বিশেষ ক'রে মনে রাখতে হবে। প্রয়োজনে সে চাতুরি করে।

চৈতন্যচরিতামৃত পড়ে মনে হয় যে, নিজেকে দেবতা ব'লে ঘোষণা ক'রে কন্যাদের উত্যক্ত করতে ভালবাসতেন গৌরসুন্দর। সকলের নৈবেদ্য সে খেয়ে ফেলতো, কন্যাদের আপত্তি এবং ভয় থাকলেও এমন অপূর্বসুন্দর বালককে তারা কিছু বলতেও পারতো না। মনে হয় বালক গৌরসুন্দর এই খেলা করতে করতেই আকৃষ্ট হলো বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মীর প্রতি; লক্ষ্মীও নিশ্চয়ই এই পরম রূপবান দুর্দান্ত বালকের প্রতি অন্তরের আকর্ষণ অনুভব করতো—

> একদিন বল্লাভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মী নাম।
> দেবতা পূজিতে আইলা করি গঙ্গাস্নান॥
> তারে দেখি প্রভু হৈল সাভিলাষ মন।
> লক্ষ্মী প্রীতি পাইল পাই প্রভুর দর্শন॥
> প্রভু কহে আমা পূজ আমি মহেশ্বর।
> আমাকে পূজিলে পাবে অভীপ্সিত বর॥
> লক্ষ্মী তাঁর অঙ্গে দিল সপুষ্প চন্দন।
> মল্লিকার মালা দিয়া করিল বন্দন॥
> এই মত লীলা করি দোঁহে গেলা ঘরে।
> গম্ভীর চৈতন্যলীলা কে বুঝিতে পারে॥ [চৈ. চ. : পৃ. ৭৬]

কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং বৈষ্ণবতত্ত্বাচার্যগণ সম্ভবত মনে করতেন যে, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠের ঈশ্বরের সঙ্গে মর্ত্য লীলায় অংশ গ্রহণ করতে বল্লভাচার্যের কন্যারূপে জন্ম নিয়েছিলেন : জীবনীকাররা তো শুনিয়ে দিয়েছেন যে, সমস্ত পরিবার এবং পারিষদদের নিয়েই মর্ত্যে এসেছেন চৈতন্যরূপী নারায়ণ। বৃন্দাবনদাসে এবং লোচনে লক্ষ্মীর সঙ্গে বিশ্বম্ভরের সাক্ষাতের যে বিবরণ আছে তা থেকেও ওই একই অনুমান হয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থে লক্ষ্মী-বিশ্বম্ভরের যে চিত্রটি আছে তাকে প্রথম দর্শন ব'লে গ্রহণ করলে তারই পরিপূরক রূপে গ্রহণ করা সহজ হয়ে পড়ে বৃন্দাবনদাস বা লোচনের কাব্যে বর্ণিত ওই দুজনের প্রথম দর্শনের বর্ণনা। কৃষ্ণদাসের বিশ্বম্ভর সে সময় বছর

বার বৎসরের কিশোর এবং বৃন্দাবন-লোচনের বিশ্বম্ভর তখন ১৭/১৮ বৎসরের যুবক হওয়াই সম্ভব। পরবর্তী কালে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী আসায় লক্ষ্মীদেবীকে বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী রূপে গ্রহণ করতে কেউ কেউ কুণ্ঠিত হয়েছেন ঃ বৃন্দাবনদাস তো স্পষ্ট ক'রেই তার অন্য পরিচয় দিয়েছেন যা আর কোন চৈতন্য-চরিত কাব্যেই পাওয়া যায় না।

বলিষ্ঠ, দুরন্ত বিশ্বম্ভর ছিলেন তাঁর যুগের বহু পরবর্তীকালের মানুষ—তিনি নিজের ইচ্ছাকেই প্রকাশ করেছেন লক্ষ্মীদেবীকে বিয়ে করার ব্যাপারে। এ আলোচনা পরে করা যাবে।

চৈতন্যচরিতামৃত বলেছেন—

একদিন শচীদেবী পুত্রেরে ভর্ৎসিয়া।
ধরিবারে গেলা পুত্রে গেলা পলাইয়া ।।
উচ্ছিষ্ট-গর্তে ত্যক্ত হাণ্ডীর উপর।
বসিয়া আছেন সুখে প্রভু বিশ্বম্ভর ।। [তদেব]

মাতাকে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্য কবিরাজ গোস্বামী এ কাহিনীটি সৃষ্টি করেছেন। লোচনে একটু অন্যভাবে এ কাহিনীটি আছে, সেখানেও তত্ত্বজ্ঞান দেওয়া হয়েছে। বৃন্দাবনদাসে যে ভাবে কাহিনীটি আনা হয়েছে তা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্যও বটে। পরে তা দেখা যাবে।

জীবনী গ্রন্থগুলোতে বহু অমিল লক্ষ্য করা যায়। সকলেই সব কাহিনী জানতেন না এটাই তার কারণ নয়। অলৌকিকত্ব, অবতারত্ব দেখাবার জন্য যিনি যেমন পেরেছেন কাহিনী সৃষ্টি করেছেন। উদ্দেশ্যমূলকতা চরিত্রের সত্যরূপকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে।

বিশ্বম্ভরের দুর্দান্ত স্বভাব ঃ

বৃন্দাবনদাস বিশ্বম্ভরের রুদ্ররূপের অনেক পরিচয় দিয়েছেন। অবতার প্রমাণের জন্য অলৌকিকত্বের প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু রুদ্র স্বভাবের সঙ্গে তার সম্পর্ক কোথায়? বিশেষ ক'রে প্রেমভক্তির অবতার যিনি তাঁকেতো সকলকে আকর্ষণ করতে হবে! এ বোধ থাকা সত্ত্বেও বৃন্দাবনদাস এবং লোচনদাস বিশ্বম্ভরের উগ্ররূপ প্রদর্শন করেছেন তাই এর সত্যতা অস্বীকার করা যাবে না। আদিখণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়েই বৃন্দাবনদাস বলছেন—

নিরন্তর চপলতা করে সভা সনে ।।
মায়ে শিখাইলেও প্রবোধ নাহি মানে ।।
শিখাইলে আরও হয় দ্বিগুণ চঞ্চল।
গৃহে যাহা পায় তাহা ভাঙ্গয়ে সকল ।।
ভয়ে আর কিছু না বোলয়ে বাপ-মায়।
... ...
পিতা-মাতা কাহারে না করে প্রভু ভয়।
বিশ্বরূপ অগ্রজ দেখিলে নম্র হয় ।। [চৈ. ভা. ঃ পৃ. ৩০]

কৃষ্ণ প্রেমের আবেশে থাকেন বিশ্বরূপ তাই ভক্ত কবিরা তাঁর সামনে বিশ্বম্ভরকে নম্র

করেছেন। শচী-জগন্নাথ কি ভক্ত নন? তাঁরাও নাকি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন লীলার সঙ্গী হিসেবেই? বৃন্দাবনদাস পিতা-মাতাকে সম্মান দেন নি। সুতরাং ঘটনাটা সত্য ব'লেই মানতে হয়। দুর্দান্ত বালক ঘরের জিনিসপত্র ভাঙচুর করতেন সামান্য ক্রোধ হলেও।

বিশ্বরূপের সন্ন্যাস গ্রহণের পর বিশ্বম্ভর কিছুটা সুস্থির হয়েছিল। থাকত মাতা-পিতার কাছাকাছি ঃ বৃন্দাবন দাস শুনিয়েছেন—

যে অবধি বিশ্বরূপ হইলা বাহির।
তদবধি প্রভু কিছু হইলা সুস্থির॥
নিরবধি থাকে পিতা-মাতার সমীপে।
দুঃখ পাসরয়ে যেন জননী-জনকে॥
খেলা সংবরিয়া প্রভু যত্ন করি পঢ়ে।
তিলার্ধেকো পুস্তক ছাড়িয়া নাহি নড়ে॥ [তদেব ঃ পৃ. ৩৩]

পাণ্ডিত্য অর্জন করাতেই বিশ্বরূপ সংসার ছেড়েছেন একথা মনে ক'রে জগন্নাথ মিশ্র বিশ্বম্ভরের পড়াশুনা বন্ধ ক'রে দিলেন। বিশ্বম্ভর প্রকাশ্যে সঙ্গে সঙ্গেই কোন প্রতিবাদ করে নি, কিন্তু মন তার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো: অলস মস্তিষ্ক পরিণত হলো শয়তানের কারখানায়—

অন্তরে দুঃখিত প্রভু বিদ্যা-রস-ভঙ্গে।
পুনঃ প্রভু উদ্ধত হইল শিশু-সঙ্গে॥
কিবা নিজ-গৃহে প্রভু, কিবা পর-ঘরে।
যাহা পায় তাহা ভাঙ্গে, অপচয় করে॥
নিশা হইলেও প্রভু না আইসে ঘরে।
সর্ব-রাত্রি শিশু-সঙ্গে নানা ক্রীড়া করে॥
কম্বলে ঢাকিয়া অঙ্গ দুই শিশু মেলি।
বৃষ-প্রায় হইয়া চলেন কুতূহলী॥
যার বাড়ী কলাবন দেখি থাকে দিনে।
রাত্রি হৈল বৃষ-রূপে ভাঙ্গয়ে আপনে॥ [তদেব ঃ পৃ. ৩৪]

বিশ্বম্ভর আগে নিজ গৃহের জিনিসপত্র ভাঙ্গত, এখন অপরের গৃহের দিকেও হাত বাড়িয়েছে সে। পড়াশুনা বন্ধ হওয়ার ক্ষোভ থাকতে পারে, কিন্তু দুর্বিনীত হয়ে ওঠা চলে কি? ১২/১৪ বছরের বালক সারা রাত্রি বাড়ীর বাইরে!

পড়াশুনা করার দাবী আদায়ের কৌশলটি অবশ্য সুন্দর ঃ বৃন্দাবনদাসও-এ ব্যাপারকে কেন্দ্র ক'রে কিছু তত্ত্ব কথা শুনিয়েছেন সত্য কিন্তু লোচন বা কবিরাজ গোস্বামী নিমাইকে উচ্ছিষ্ট স্থানে বর্জ্য হাড়ীতে বসিয়েছিলেন যে কারণে তার চেয়ে অনেক মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সে কাজ করেছেন চৈতন্যভাগবত প্রণেতা বৃন্দাবনদাস। বৃন্দাবনদাসের কাহিনীটিই সত্যের নিকটবর্তী ব'লে মনে হয়—

এক দিন মিশ্র চলিলেন কার্যান্তর।
পঢ়িতে না পাঞা প্রভু ক্রোধিত অন্তর॥

বিষ্ণু-নৈবেদ্যের যত বর্জ্য হাণ্ডীগণ।
বসিলেন প্রভু হাঁড়ী করিয়া আসন ॥ [তদেব]

ভাল-মন্দ জ্ঞান নেই, শুচি-অশুচি জ্ঞান নেই। শেষ পর্যন্ত পড়াশুনার ব্যবস্থা হলো।

কিন্তু পড়াশুনা করা সত্ত্বেও নিমাইয়ের ঔদ্ধত্য দূর হলো না। তার যে দুর্বিনীত স্বভাবের পরিচয় বৃন্দাবনদাসেই আছে তাতে তাকে অবতার রূপে কল্পনার কোন কারণই নেই। পিতা জগন্নাথ মিশ্র দেহরক্ষা করেছেন, এ অবস্থায় সংসারের সব দায়িত্ব তো নেবার কথা নিমাইয়েরই কিন্তু তার সেদিকে বিন্দুমাত্র দৃষ্টি নেই। তাই ব'লে তাকে ভগবৎ প্রেমিক উদাসীন ব'লেও তো মনে করা চলে না। দরিদ্রের সংসারে তার আচরণ অনেক সময়েই উৎপাত ব'লে মনে হয়—

ঘরে মাত্র হয় দরিদ্রতার প্রকাশ।
আজ্ঞা যেন মহামহেশ্বরের বিলাস ॥
কি থাকুক, না থাকুক, নাহিক বিচার।
চাহিলেই না পাইলেই রক্ষা নাহি আর ॥
ঘর-দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলেন সেই ক্ষণে।
আপনার অপচয় তাহো নাহি মনে ॥
তথাপিহ শচী যে চাহেন সেই ক্ষণে।
নানা-যত্নে দেব পুত্র-স্নেহের কারণে ॥
এক দিন প্রভু চলিলেন গঙ্গাস্নানে।
তৈল আমলকী চাহে জননীর স্থানে ॥
"দিব্য-মালা সুগন্ধি-চন্দন দেহ মোরে।
গঙ্গাস্নান করি চাঙ গঙ্গা পূজিবারে ॥
জননী কহেন "বাপ শুন মন দিয়া।
ক্ষণেক অপেক্ষা কর মালা আনোঁ গিয়া ॥"
'আনোঁ গিয়া' যেই মাত্র শুনিল বচন।
ক্রোধে রুদ্র হইলেন শচীর নন্দন ॥
"এখন যাইবা তুমি মালা আনিবারে।"
এত বলি ক্রুদ্ধ হই প্রবেশিল ঘরে ॥
যতেক আছিল গঙ্গা-জলের কলস।
আগে সব ভাঙ্গিলেন হই ক্রোধবশ ॥
তৈল, ঘৃত, লবন আছিল যাতে যাতে।
সর্ব চূর্ণ করিলেন ঠেঙ্গা লই হাতে ॥
ছোট বড় ঘরে যত ছিল 'ঘট' নাম।
সব ভাঙ্গিলেন ইচ্ছাময় ভগবান্ ॥
যতেক আছিল শিক টানিঞা টানিঞা।
ক্রোধাবেশে ফেলে প্রভু ছিণ্ডিয়া ছিণ্ডিয়া ॥
বস্ত্র আদি যত কিছু পাইলেন ঘরে।
ফালি ফালি করি চিরি ফেলে দুই করে ॥ [তদেব : পৃ. ৩৯]

ক্রোধ প্রকাশের পরিচয় আরও আছে। ঘর-দুয়ার, গাছ, মাটি সব কিছুর ওপরই 'ঠেঙগা' প্রয়োগ করা হলো। অত্যন্ত আদর-পাওয়া একমাত্র পুত্রদের ক্ষেত্রে অনেক সময় এমনটিই ঘটে।

ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গৃহের উপান্তে শচীমাতা আত্মগোপন করতে চান। আশ্চর্য এই যে, জীবনীকার বৃন্দাবনদাস নিমাইয়ের এই অশোভন আচরণ সত্ত্বেও বলেছেন, 'সব ভাঙিলেন ইচ্ছাময় ভগবান।' কেবল তাই নয়, বৃন্দাবনদাস আরও অবাক করে দিয়েছেন—

ধর্ম-সংস্থাপক প্রভু ধর্ম-সনাতন।
জননীরে হস্ত নাহি তোলেন কখন ॥
এতাদৃশ ক্রোধ আরো আছেন ব্যাপিয়া।
তথাপিহ জননীরে না মারিল গিয়া ॥ [তদেব]

পিতার দেহত্যাগের পরেও নিমাইয়ের দুঃখিনী মাতার প্রতি এ আচরণ অবতার জনোচিত নয়। অথচ বৃন্দাবনদাস বলছেন যে, ধর্ম সংস্থাপনের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন ব'লেই বিশ্বম্ভর মায়ের গায়ে হাত তোলেন নি। সেকালে মায়ের গায়ে হাত তোলাটাই যদি পুত্রদের স্বভাব হয়ে থাকতো তাহলে নিশ্চয়ই নিমাই মহৎ কাজ করেছে ব'লে মনে করতে হবে। কিন্তু দেশে কৃষ্ণভক্তি না থাকলেও এ ধরণের ব্যাপার ছিল ব'লে তো কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। বাল্যকালে চৈতন্যদেব যে দুর্বিনীত-দুর্দান্ত ছিলেন একথা স্বীকার করতেই হবে।

লোচনদাসও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন। তাঁর নিমাই ক্রোধ ভরে উচ্ছিষ্ট হাঁড়ির ওপর বসেছে, মাতা অশুচিস্থানে বসার জন্য হায় হায় করছেন। বিশ্বম্ভর আচমকা যে কাজ ক'রে বসলো তা বৃন্দাবনদাসকেও চমকে দেবে—

অশুচি অশুচি বলি বোলসি কুবোল।
কি শুচি, অশুচি আগে বিচারহ মোর ॥
ইহা বলি সম্মুখে ইষ্টকা লইল হাথে।
ইষ্টকা প্রহার কৈল জননীর মাথে ॥ [চৈ. ম. : পৃ. ৪৫]

'ইষ্টকা' মারার পরমুহূর্তেই লোচনদাস বিশ্বম্ভরের জ্যোতির্ময় মূর্তি দেখিয়ে দিলেন। বিশ্বম্ভর ভগবান, অতএব 'ইষ্টকা' মারার অপরাধ ক্ষালন হয়ে গেল বোধ হয়।

এ ধরনের কোন ঘটনা চৈতন্যচরিতামৃতে নেই। কবিরাজ গোস্বামী তত্ত্বের ছাঁকনীতে না ছেঁকে কোন কিছু পরিবেশন করেন নি। ঘর-দোর ভাঙা, জননীর ওপর প্রচণ্ড ক্রোধ প্রকাশ বা 'ইষ্টকা' প্রচার তো প্রেম ভক্তির অবতারের পক্ষে সম্ভব নয়। সুকৌশলে কৃষ্ণদাস কবিরাজ আগেই ব'লে নিয়েছেন—

চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবনদাস।
মধুর করিয়া লীলা করিলা প্রকাশ ॥
গ্রন্থবিস্তারভয়ে তেঁহো ছাড়িল যে যে স্থানে।
সেই সেই স্থানে কিছু করিব ব্যাখ্যানে ॥ [চৈ. চ. : পৃ. ৬৭]

মুখ্য বিষয় হলো বৃন্দাবনদাস ছাড়বেন কেন? ব্যাখ্যান বলতে প্রকাশ ক'রে বলা এবং বুঝিয়ে বলাও হতে পারে। কবিরাজ গোস্বামী বুঝেছিলেন যে, বৃন্দাবনদাস বৃন্দাবন

থেকে রপ্তানী করা তন্ত্রের স্বরূপ জানেন না। তাই তাঁর সম্মান বাঁচিয়ে পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্যে তাঁর ওই কথা বলা। কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিমাইকে দুর্বিনীত করেন নি—প্রেমভক্তির অবতার দুরন্ত হতে পারেন, দুর্বিনীত হবেন কেন? তন্ত্রের এই দিকটার প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনি লিখেছেন—

বিবিধ ঔদ্ধত্য করে শিষ্যগণ সঙ্গে।
জাহ্নবীতে জলকেলি করে নানা রঙ্গে॥ [তদেব : পৃ. ৮০]

চৈতন্যদেবের বাল্যজীবনের সত্য উদ্ঘাটনে কবিরাজ গোস্বামীর থেকেও আমাদের বেশী নির্ভর করতে হবে বৃন্দাবনদাসের ওপরে। লোচনের 'ইষ্টকা' প্রহারের কথাটাও গ্রহণযোগ্য নয়, কোন ক্রোধের অবস্থা না দেখিয়েই আচমকা লোচন ব্যাপারটা ঘটিয়েছেন। বৃন্দাবনদাস যা বলেছেন তা অনেকটাই মনস্তত্ত্ব সম্মত। নিমাইয়ের ক্রোধ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে—শেষ পর্যন্ত বালক মাটিতে গড়াগড়ি খেয়েছে এবং দিব্য মালা পাবার পর খুবই লজ্জিত হয়েছে—

চলিলা করিতে স্নান লজ্জিত অন্তর। [চৈ. ভা. : পৃ. ৩৯]

সেকালের সমাজকে, অন্যায়কারী রাজশক্তিকে আঘাত দেবার জন্য এ ধরনের দুর্দান্ত-দুর্বিনীত-সাহসী ব্যক্তিত্বের বিশেষ প্রয়োজন যে ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

পরিহাস রসিক ব্যক্তিত্ব :

বিকশিত ব্যক্তিত্বের পরিচয় মেলে গাম্ভীর্যের সঙ্গে রসচপলতার চমৎকার সমন্বয়ে। বিশ্বম্ভরের মধ্যে এই সমন্বয় দেখা দিয়েছিল। মুরারি গুপ্তের সঙ্গে ছিল বিশ্বম্ভরের বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা : গুপ্ত জাতিতে বৈদ্য সুতরাং ব্যাকরণ-অলংকার প্রভৃতি তো তাঁর আলোচ্য নয়; গাছ-গাছড়া নিয়েই তাঁর সময় অতিবাহিত করার কথা। বিশ্বম্ভর তাই নিয়ে পরিহাস করতেন—

প্রভু বোলে "বৈদ্য তুমি ইহা কেনে পড়।
লতা-পাতা নিঞা গিয়া রোগী কর দঢ়॥
ব্যাকরণ-শাস্ত্র এই বিষমের অবধি।
কফ-পিত্ত-অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি॥
মনে মনে চিন্তি তুমি কি বুঝিবে ইহা।
ঘরে যাহ তুমি রোগী দৃঢ় কর গিয়া॥ [তদেব : পৃ. ৪৮]

চৈতন্যচরিতামৃত বলেছেন যে, বালক বিশ্বম্ভর গঙ্গাতীরে বালিকাদের পূজার নৈবেদ্য আহারের উদ্দেশ্যে নিজেকে ঈশ্বর ব'লে ঘোষণা করতো, কাউকে 'বিভা' করতে চাইত—তার হাতে নৈবেদ্যের থালা তুলে দিলে কন্যাদের মনোমত বর দান করতো; নৈবেদ্য নিয়ে যারা পালাবার চেষ্টা করতো তাদের কুৎসিত স্বামী এবং 'চারি চারি সতিনা' হবে ব'লে ভয় দেখাতো। এই পরিহাসকে সত্য মনে ক'রে বালিকারা তার হাতে তুলে দিত নৈবেদ্যের থালা।

শ্রীধর দরিদ্র—খোলা বেচে জীবন ধারণ করেন আর হরিনাম করেন সারাক্ষণ। তাই নিয়েই পরিহাস করেন গৌরসুন্দর—

প্রভু বোলে "শ্রীধর ! তুমি যে অনুক্ষণ ।
'হরি হরি' বল তবে দুঃখ কি কারণ ?
লক্ষ্মীকান্ত-সেবন করিয়া কেন তুমি ।
অন্ন-বস্ত্রে দুঃখ পাও কহ'দেখি শুনি ?" [তদেব : পৃ. ৫৯]

'লক্ষ্মীকান্ত-সেবন' অপূর্ব পরিহাস ! গৌরচন্দ্র যে পরিহাস রসিক ছিলেন তা ওই একটি কথা থেকেই বেশ স্পষ্ট হয় ।

গদাধর ছিলেন রন্ধনে সুদক্ষ ; চৈতন্যদেব রাঘব পণ্ডিত এবং গদাধরের রন্ধনের বিশেষ সুখ্যাতি করেছেন । গদাধর নিজেও খুব পরিহাস রসিক ছিলেন । পরিহাস রসিক, রন্ধনে দ্রৌপদী গদাধরকে নিয়ে চৈতন্যদেবও রসিকতা করতে ছাড়েন নি । তাঁর রন্ধনে দক্ষতা এবং আচার-আচরণকে কেন্দ্র ক'রেই সম্ভবত তিনি এই সরস মন্তব্য করতেন । চৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবনদাস শুনিয়েছেন—

'আপনে চৈতন্য বলিয়াছে বারে বার ।
"গদাধর মোর বৈকুণ্ঠের পরিবার" ।।

পূর্ববঙ্গের মানুষের সংগে তিনি যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন । বহু শিষ্য সেখানে তাঁর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেছেন । বিশেষ প্রীতির সম্পর্কও স্থাপিত হয়েছিল সবার সঙ্গে । তথাপি সে দেশের ভাষা নিয়ে পরিহাস করতে ভালবাসতেন বিশ্বম্ভর । আহারের পর বিষ্ণুগৃহ-দ্বারে এসে বসলেন তিনি—আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ঘিরে বসলেন তাঁকে—

সভার সহিত প্রভু হাস্যকথা-রঙ্গে ।
কহিলেন যেন-মত আছিলেন বঙ্গে ।।
বঙ্গদেশী-বাক্য অনুকরণ করিয়া ।
বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া ।। [তদেব : পৃ. ৭২]

লক্ষ্মীদেবী যে নেই একথা তিনি নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন । দুঃখের অশ্রুকে দমন ক'রে হাস্য-পরিহাসে সময় ব্যয় করার মতো মানসিক ধৈর্য তখন তাঁর হয়েছে ।

গৌরচন্দ্র কেবল 'বাঙ্গালেরে কদর্থেন' তাই নয় ; নিজের পূর্বপুরুষদের বাসভূমি শ্রীহট্টের উচ্চারণ নিয়েও পরিহাস করেন—

বিশেষ চালেন প্রভু দেখি শ্রীহট্টিয়া ।
কদর্থেন সেই-মত বচন বলিয়া ।। [তদেব : পৃ. ৭৩]

বাঙলা ভাষা হলেও পূর্ববঙ্গ-শ্রীহট্ট-নোয়াখালি-চট্টগ্রামের উচ্চারণ অদ্ভুত এবং অনেক সময় বোধগম্যও নয়—'বাঙ্গাল-উচ্চারণের' টান নিয়ে হেসে হেসে তিনি পরিহাস করতেন, পরিহাস করতেন শ্রীহট্টের বিকৃত উচ্চারণে 'বচন বলিয়া' । এ সকল পরিহাসে কোথাও কোন হুলের চিহ্নও ছিল না । কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রীহট্টিয়ারা ক্রুদ্ধ হতেন : নিজের বাসভূমির উচ্চারণ নিয়ে ব্যঙ্গ তাঁরা সহ্য করতেন না—

ক্রোধে শ্রীহট্টিয়াগণ বোলে "হায় হায় ।
তুমি কোন্ দেশী তাহা কহ ত' নিশ্চয় ।।
পিতা-মাতা-আদি করি যতেক তোমার ।
বোল দেখি শ্রীহট্টে না হয় জন্ম কার ?

আপনে হইয়া শ্রীহট্টিয়ার তনয়।
তবে ঢোল কর, কোন্ যুক্তি ইথে হয় ॥" [তদেব]

পরিহাসে ক্রুদ্ধ হলে পরিহাসপ্রিয়তা বৃদ্ধিই পায়; শ্রীহট্টিয়ারা ক্রুদ্ধ হচ্ছেন বুঝে বিশ্বম্ভরের পরিহাসপ্রবণতা বৃদ্ধি পেত ; তাই—

যত যত বোলে, প্রভু প্রবোধ না মানে।
নানামত কদর্থেন সে-দেশী বচনে ॥
তাবত চালেন শ্রীহট্টিয়ারে ঠাকুর।
যাবত তাহার ক্রোধ না হয় প্রচুর ॥ [তদেব]

মনে হয় শ্রীহট্টের মানুষেরা রসিকতা বুঝতেন না ; ক্রোধে তাঁরা পশ্চাদ্ধাবন করতেন বিশ্বম্ভরের—

মহা-ক্রোধে কেহো লই যাই খেদাড়িয়া।
লাগালি না পায়, যায় তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া ॥
কেহো বা ধরিয়া লয় শিকদার-স্থানে।
লৈয়া যায় মহাক্রোধে ধরিয়া দেয়ানে ॥ [তদেব]

শেষ পর্যন্ত বিশ্বম্ভরের বন্ধুদের মধ্যস্থতা করতে হয়। পরিহাস যাঁরা বোঝেন না তাঁদের পরিহাস ক'রে ক্ষেপিয়ে তুলতেন তিনি।

গৃহ-দেবতা বিষ্ণুকে প্রতিদিন যে নৈবেদ্য দেওয়া হয় তা প্রতিদিনই অর্ধেক হয়ে গেছে ব'লে মনে হয়। শচীমাতার স্বপ্ন-কথা শুনে গৌরচন্দ্র হেসে বলেন—

তোমার ঘরের মূর্তি পরতেখ বড়।
মোর চিত্ত তোমার স্বপ্নেতে হৈল দঢ় ॥
মুঞি দেখোঁ বারেবার নৈবেদ্যের সাজে।
আধা-আধি না থাকে, না কহি কারে লাজে ॥
তোমার বধূরে মোর সন্দেহ আছিল।
আজি সে আমার মনে সন্দেহ ঘুচিল ॥" [তদেব : পৃ. ১৩৮]

স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া অর্ধেক নৈবেদ্য খেয়ে ফেলতেন বলে সন্দেহ করতেন। স্ত্রীকে নিয়েও মাতার কাছে—স্বচ্ছন্দে পরিহাস করতেন গৌরসুন্দর। বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর রসিকতা আমোদের সঙ্গে উপলব্ধি করতেন—শ্রীহট্টিয়াদের ন্যায় পরিহাস-অজ্ঞ ছিলেন না তিনি : তাই—

হাসে লক্ষ্মী জগন্মাতা—স্বামীর বচনে।
অন্তরে থাকিয়া সব স্বপ্ন-কথা শুনে ॥ [তদেব]

গৌরসুন্দর এক বিরাট ব্যক্তিত্ব : এক বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে তিনি কর্মপথে অগ্রসর হবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। দুরূহ কর্মপথে অগ্রসর হবার পরিকল্পনা সত্ত্বেও তিনি প্রাণচঞ্চল ছিলেন। জ্ঞান অর্জন, ধর্মপথে পদার্পণ সত্ত্বেও লঘু হাস্য-পরিহাস বর্জন ক'রে শুষ্কতার ধূসরতায় নীরস ও বর্ণহীন হতে চান নি কখনো।

গয়া থেকে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত বিশ্বম্ভর চরিত্রের বিবর্তন

চারিদিকে ধর্মহীনতা এবং পাষণ্ডীদের অপরাধপ্রবণতা দেখে বৈষ্ণবরা বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন। রাজ ভয়েও ভীত ছিল সাধারণ মানুষ। সে কারণেও অনেকেই অসন্তুষ্ট ছিলেন তাঁদের ওপরে—

চারি ভাই শ্রীবাস মিলিয়া নিজ ঘরে।
নিশা হৈলে হরিনাম গায় উচ্চৈঃস্বরে ॥
শুনিয়া পাষণ্ডী বোলে "হইল প্রমাদ।
এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ ॥
মহা তীব্র নরপতি যবন ইহার।
এ আখ্যান শুনিলে, প্রমাদ নদীয়ার ॥" [তদেব : পৃ. ১২]

কেবল তাই নয়, যবন রাজের ভয়ে বৈষ্ণবদের উৎখাত করার ইচ্ছাও হতো অনেকের—

কেহ বোলে "এ বামনে এই গ্রাম হৈতে।
ঘর ভাঙ্গি ঘুচাই ফেলাই নিয়া স্রোতে ॥" [তদেব]

সে সময় ভীত-সন্ত্রস্ত বৈষ্ণবদের সাহস যোগাতেন তাঁদের নেতা, নবদ্বীপের অন্যতম প্রধান পণ্ডিত-বয়োজ্যেষ্ঠ তেজস্বী অদ্বৈত আচার্য। 'অবতারে'র আগমন তিনি ঘটাবেনই, অথবা নিজেই অবতার হয়ে উঠবেন—

শুনিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে।
দিগম্বর হই সর্ব-বৈষ্ণবেরে বোলে ॥
"শুন শ্রীনিবাস! গঙ্গাদাস! শুক্লাম্বর!
করাইব কৃষ্ণ সর্ব-নয়ন-গোচর ॥
সভা উদ্ধারিব কৃষ্ণ আপনে আসিয়া।
বুঝাইব কৃষ্ণভক্তি তোমা সভা লৈয়া ॥
যবে নাহি পারো তবে এই দেহ হৈতে।
প্রকাশিয়া চারি ভুজ, চক্র লইমু হাতে ॥
পাষণ্ডীরে কাটিয়া করিমু স্কন্ধ-নাশ।
তবে কৃষ্ণ প্রভু মোর মুঞি তাঁর দাস ॥" [তদেব]

নিছকই আশ্বাসবাণী। কৃষ্ণ না এলে নিজেই কৃষ্ণ হয়ে উঠবেন : 'এই মত অদ্বৈত বোলেন অনুক্ষণ।' [তদেব]

কৃষ্ণদাস কবিরাজও অদ্বৈতের প্রার্থনার কথা শুনিয়েছেন। উত্তর কালে চৈতন্য-প্রদর্শিত্য আদর্শের পরিচয়ও পাওয়া গেল। ব্রাহ্মণ এবং যবনের সম্মিলন ঘটলো নিমাইয়ের জন্ম মুহূর্তে—এ তো চৈতন্য জীবনের চরম লক্ষ্যের প্রকাশ—

সেই কালে নিজালয়ে উঠিয়া অদ্বৈতরায়ে
নৃত্য করে আনন্দিত মনে।
হরিদাসে লৈয়া সঙ্গে হুঙ্কার-কীর্তন-রঙ্গে।
কেনে নাচে কেহ নাহি জানে ॥ [চৈ. চ. : পৃ. ৬৯]

অনেক সাহিত্যিকই প্রতীকের দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত করেন। উত্তরকালে জাত-পাতকে তুচ্ছ ক'রে সমস্ত ধর্মের মানুষকেই যে মিলিত করার চেষ্টা করেছিলেন চৈতন্যদেব, তারই পরিচয় পাওয়া গেল কবিরাজ গোস্বামীর কথায়।

শিশু নিমাইয়ের একটি অদ্ভুত আচরণের কথা প্রধান জীবনীকাররা শুনিয়েছেন। সে সময়ে কিছু না বুঝলেও কৃষ্ণনামের প্রতি শিশুর অদম্য আকর্ষণ লক্ষ্য করা গেছে। বৃন্দাবনদাস বলেছেন—

তাবত কান্দেন প্রভু কমললোচন।
হরিনাম শুনিলে রহেন ততক্ষণ ॥
পরম সংকেত এই সভে বুঝিলেন।
কান্দিলেই হরিনাম সভেই লয়েন ॥ [চৈ. ভা. ঃ পৃ. ১৮]

হরিনাম-কৃষ্ণনাম শুনলেই শিশুর ক্রন্দন থেমে যেত। চৈতন্য চরিতামৃতকার বললেন—

ক্রন্দনের ছলে বোলাইল হরিনাম। [চৈ. চ. ঃ পৃ. ৭৩]

তাত্ত্বিক এই সুযোগে তত্ত্বকথা শোনালেন। যাই হোক, এটুকু মনে করা যেতে পারে যে, অতি শিশুকালে হরি অথবা কৃষ্ণনামের সুর শিশুকে আকৃষ্ট করতো।

আর একটু বড় হলে আরম্ভ হলো নিমাইয়ের দুরন্তপনা। দল বল নিয়ে খেলত বালক—'শিশুগণে মিলি করে বিবিধ খেলন' [তদেব]। নিমাই অন্যের গৃহের সামগ্রী চুরি ক'রে খায়। কোন খাবার না পেলে তাঁদের হাঁড়ি ভাঙে—শিষ্যদের কাঁদায়। যদি কেউ ধরে ফেলে—

তবে তার পায়ে ধরি করে পরিহারে ॥
"এবার ছাড়হ মোরে, না আসিব আর।
আর যদি চুরি করোঁ দোহাই তোমার ॥" [চৈ. ভা. ঃ পৃ. ২০]

পুত্রের দুরন্তপনা দেখে 'দুঃখভাবে শচীদেবী সোঙরে গোসাঞি'। [চৈ. ম. ঃ পৃ. ৪০] তখন পুত্রের 'শিশু মত আচরণ' [তদেব]—প্রতিবেশিনীরাও চিন্তিত।

নিমাই বালকদের নেতা, নেতৃত্ব করার জন্যই যেন তার জন্ম। গঙ্গার জলে দল বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা—

চৌদিগে বালক সব গঙ্গা জলে ভাসে।
মাঝে গৌরাঙ্গ চান্দ করিল প্রকাশে ॥
[জয়ানন্দ ঃ চৈ. ম. ঃ পৃ. ২০]

বালক ক্রমেই দুরন্ত হয়ে উঠলো ঃ পড়াশুনায় খুবই মেধা একবার পড়লেই কণ্ঠস্থ হয়ে যায়—

দৃষ্টিমাত্র সকল অক্ষর লিখে যায়।
পরম বিস্মিত হই সর্বগণে চায় ॥ [চৈ. ভা. ঃ পৃ. ২৬]

হরি-কৃষ্ণ নামের যে প্রভাব একদিন ছিল নিমাইয়ের ওপর তা শূন্যে মিলিয়ে গেল। বালকের দেব-দেবীকে আর কিছুমাত্র ভয় নেই। দুরন্তপনার জন্য নিমাই বয়স্কদেরও আর সমীহ করে না। বৃন্দাবনদাস এবং কৃষ্ণদাস উভয়েই সে কথা বলেছেন—

পড়িয়া শুনিঞা সব শিশুগণ সঙ্গে।
গঙ্গাস্নানে মধ্যাহ্নে চলেন বহু রঙ্গে ॥

মজ্জিয়া গঙ্গায় বিশ্বম্ভর কুতূহলী।
শিশুগণ সঙ্গে করে জল ফেলাফেলি ॥
নদীয়ার সম্পত্তি বা কে বলিতে পারে।
অসংখ্যাত লোক একো ঘাটে স্নান করে ॥
কতেক বা শান্ত দান্ত গৃহস্থ সন্ন্যাসী।
না জানি কতেক শিশু মিলে তহি আসি ॥
সভারে লইয়া প্রভু গঙ্গায় সাঁতারে।
ক্ষণে ডুবে ক্ষণে ভাসে নানা ক্রীড়া করে ॥
জল-ক্রীড়া করে গৌর সুন্দর শরীর।
সভার গায়েতে লাগে চরণের নীর ॥
সভে মানা করে তভো মানা নাহি মনে।
ধরিতেও কেহ নাহি পারে এক স্থানে ॥
পুনঃ পুনঃ সভারে করাইল প্রভু স্নান।
কারো ছুঁয়ে কারো অঙ্গে কুল্লোল প্রদান ॥
না পাইয়া প্রভুনাগালি বিপ্রগণে।
সভে চলিলেন তাঁর জনকের স্থানে ॥ [তদেবঃঃপৃঃ২৭]

কেবল তাই নয়, অনেক ব্রাহ্মণের বিষ্ণুপূজার আসনে বসে পূজার সব নৈবেদ্য খেয়ে ফেলে নিমাই ; দুষ্টুমি করে লুকিয়ে রাখে কারও উত্তরীয় ঃ কারও নিকটে গিয়ে বলে 'আমি নারায়ণ'—

কলিযুগে নারায়ণ মুঞি পরতেখ ॥" [তদেব]

কাউকে গ্রাহ্য করে না বালক ঃ ধ্যানস্থ ব্রাহ্মণের ধ্যান ভাঙ্গে, গীতা প্রভৃতি লুকিয়ে রাখে। ডুব দিয়ে এসে কারও পা ধরে টেনে নিয়ে যায় নদীর গভীরে—কারও শিশু পুত্রের কানে জল দিয়ে কাঁদায়, কারও পিঠে চড়ে নিজেকে মহেশ্বর ব'লে ঘোষণা করে। যে নিমাই একদিন কৃষ্ণ-হরি নাম শুনে শান্ত হতো, সে নিমাই-ই সমস্ত দেবতাকে তুচ্ছ ক'রে তাঁদের নৈবেদ্য খেয়ে ফেলে। গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে এই ছিল তার নিত্যদিনের কাজ। তাকে দেখলেই শঙ্কিত হতেন সকলে।

প্রায় সমবয়সী বালিকাদের ওপরও কম দৌরাত্ম করতো না বিশ্বম্ভর। তাদের পূজার সমস্ত ব্যবস্থাই নষ্ট ক'রে দিত সে। তাকে দেবতার ভয়-ডর-শূন্য ব'লে মনে হতো বালিকারা অভিযোগ করতো শচীদেবীর কাছে—

বসন করয়ে চুরী, বোলে বড় মন্দ।
উত্তর করিলে জল দেয়, করে দ্বন্দ্ব ॥
ব্রত করিবারে যত আনি ফুল-ফল।
ছড়াইয়া ফেলে বল করিয়া সকল ॥
স্নান করি উঠিলে বালুকা দেই অঙ্গে।
যতেক চপল শিশু সেই তার সঙ্গে ॥
অলক্ষিতে আসি কর্ণে বোলে বড় বোল।"
কেহ বোলে "মোর মুখে দিলেক কুল্লোল ॥

ওকড়ার ফল দেয় কেশের ভিতরে।"
কেহো বোলে "মোরে চাহে বিভা করিবারে।।" [তদেব : পৃ. ২৮]

কবিরাজ গোস্বামীও অনুরূপ চিত্র এঁকেছেন। বালক বয়সেই যে নিমাই বিশেষ মনস্তত্ত্ব বিশারদ হয়ে উঠেছেন তাও বোঝা যায় তাঁর অংকিত চিত্র থেকে—

কভু শিশু-সঙ্গে স্নান করেন গঙ্গাতে।
কন্যাগণ আইলা তাঁহা দেবতা পূজিতে।।
গঙ্গাস্নান করি পূজা করিতে লাগিলা।
কন্যাগণ মধ্যে প্রভু আসিয়া বসিলা।।
কন্যাগণে কহে আমা পূজ দিব বর।
গঙ্গা দুর্গা দাসী মোব মহেশ কিঙ্কর।।
আপনি চন্দন পরি পবেন ফুলমালা।
নৈবেদ্য কাড়িয়া খান সন্দেশ চালু কলা।।
ক্রোধে কন্যাগণ বলে শুন হে নিমাই।
গ্রাম-সম্বন্ধে তুমি আমা সবাকার ভাই।।
আমা সবার পক্ষে ইহা করিতে না জুয়ায়।
না লহ দেবতাসজ্জ না কর অন্যায়।।
প্রভু কহে তোমা সবাকে দিল এই বর।
তোমা সবাকার ভর্তা হবে পরমসুন্দর।।
পণ্ডিত বিদগ্ধ যুবা ধনধান্যবান্।
সাত সাত পুত্র হৈবে চিরায়ু মতিমান।।
বর শুনি কন্যাগণের অন্তরে সন্তোষ।
বাহিরে ভৎর্সনা করে করি মিথ্যা-রোষ।।
কোন কন্যা পলাইল নৈবেদ্য লইয়া।
তাকে ডাকি প্রভু কহে সক্রোধ হইয়া।।
যদি মোরে নৈবেদ্য না দেহ হইয়া কৃপণী।
বুড়া ভর্তা হবে আর চারি চারি সতিনী।।
ইহা শুনি তা সবার মনে হৈল ভয়।
জানি কোন দেবাবিষ্ট ইহাতে বা হয়।।
আনিয়া নৈবেদ্য তাহা সম্মুখে ধরিল।
খাইয়া নৈবেদ্য তাবে ইষ্টবর দিল।। [চৈ. চ. : পৃ. ৭৫]

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীর সংগে নিমাইয়ের সাক্ষাৎ ঘটিয়েছেন এই সময়েই। বৃন্দাবনদাসে এবং লোচনে এই সাক্ষাৎ হয়েছিল পরবর্তী কালে। কৃষ্ণদাসের বর্ণনাকে উভয়ের প্রথম সাক্ষাৎ ব'লে গ্রহণ করাই বিধেয়। গঙ্গাস্নান ক'রে লক্ষ্মীদেবী দেবতা পূজা করতে বসলেন—

তারে দেখি প্রভু হৈল সাভিলাষ মন।
লক্ষ্মী প্রীতি পাইল পাই প্রভুর দর্শন।।
... ...

লক্ষ্মী তাঁর অংগে দিল সপুষ্প চন্দন।
মল্লিকার মালা দিয়া করিল বন্দন॥ [তদেব ঃ পৃ. ৭৬]

দুরন্ত বালকের হৃদয়ে প্রেমের অঙ্কুর দেখা দিল।

গঙ্গা স্নানে গিয়ে অনাচার করার জন্য জগন্নাথ মিশ্র যেদিন পুত্রকে ক্রোধ ভরে শাস্তি দিতে যান সেদিন সেই অভিযোগকারিণী বালিকাদের সাবধানবাণী শুনেই অন্য পথে গৃহে পলায়ন করে নিমাই—সেদিন সে গঙ্গা স্নানেই যায় নি একথা প্রমাণে সাক্ষ্যেরও অভাব হয় না তার।

শচীমাতার নিষেধবাণী বালককে আরও দুরন্ত ক'রে তোলে—ঘরের দ্রব্যাদি সে ভেঙ্গে তছনছ করে—'পিতা-মাতা কাহারে না করে প্রভু ভয়' ঃ একমাত্র জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিশ্বরূপকে দেখলে তার মনে প্রশান্তি নামে। সেই একান্ত শ্রদ্ধেয় অগ্রজ বিশ্বরূপের সন্ন্যাস গ্রহণের পর মনের মধ্যে প্রচণ্ড নাড়া খেল বালক। পিতা-মাতার কাছ ছাড়া হয় না। খেলাধুলা বন্ধ রেখে পুস্তক নিয়ে থাকে সারাক্ষণ। বৃন্দাবনদাস বলেছেন—

যে অবধি বিশ্বরূপ হইল, বাহির।
তদবধি প্রভু কিছু হইলা সুস্থির॥
নিরবধি থাকে পিতা-মাতার সমীপে॥
দুঃখ পাসরয়ে যেন জননী-জনকে॥
খেলা সংবরিয়া প্রভু যত্ন করি পঢ়ে।
তিলার্ধেকো পুস্তক ছাড়িয়া নাহি নড়ে॥
একবার যে সূত্র পঢ়িয়া প্রভু যায়।
আর-বার উলটিয়া সভায়ে ঠেকায়॥ [চৈ. ভা. ঃ পৃ. ৩৩]

পুত্রের বিদ্যার্জনে সবিশেষ মনোযোগ দেখে জগন্নাথ মিশ্র যেন অকস্মাৎ সচেতন হয়ে উঠলেন। এমনি নিষ্ঠা নিয়ে তো বিশ্বরূপও অধ্যয়ন করতো! তিনি মনে করলেন যে, অতিরিক্ত শাস্ত্রজ্ঞানই বিশ্বরূপের সন্ন্যাস গ্রহণের কারণ। অতএব নিমাইয়ের পড়া নিষিদ্ধ হলো—

অতএব ইহার পঢ়িয়া কার্য নাঞি।
মূর্খ হই ঘরে মোর রহুক নিমাঞি॥" [তদেব]

অগ্রজের সন্ন্যাস গ্রহণে যে প্রশান্তি ফিরে আসছিল নিমাইয়ের চিত্তে, তা পুনরায় ঘা খেয়ে দুর্দমনীয় হয়ে উঠলো। জীবনে যা প্রতিষ্ঠা দেয় তা থেকেই বঞ্চিত হলো সে। পুনরায় উচ্ছৃংখল হয়ে উঠলো বালক—

অন্তরে দুঃখিত প্রভু বিদ্যা-রস-ভঙ্গে।
পুনঃ প্রভু উদ্ধত হইল শিশু-সঙ্গে॥ [তদেব ঃ পৃ. ৩৪]

এমনও হলো যে সারা রাত্রি আর সে গৃহেও ফিরতো না। মনের ওপর চাপ পড়ে মনটাই তার গিয়েছিল ভেঙ্গে। কিন্তু উচ্ছৃংখলতারও তো একটা শেষ আছে; নিষ্ঠাবান পড়ুয়ার তো তাতে মন ওঠে না ঃ পড়াশুনার অধিকার তাকে আদায় করতেই হবে, তাই এক অদ্ভুত কাজ ক'রে বসলো বালক। বৃন্দাবনদাস বলেছেন—

পঢ়িতে না পাঞা প্রভু ক্রোধিত অন্তর॥

বিষ্ণু-নৈবেদ্যের যত বর্জ্য-হাণ্ডীগণ।
বসিলেন প্রভু হাঁড়ী করিয়া আসন॥ [তদেব]

অপবিত্র স্থান ; মাতা অনেক অনুনয় বিনয় করলেন—শুদ্ধ হবার জন্য গঙ্গাস্নান করতে হবে তাও জানালেন। বালকের চমৎকার উত্তর—

প্রভু বোলে "তোরা মোরে না দিস পড়িতে।
ভদ্রাভদ্র মূর্খ বিপ্রে জানিব কেমতে ?
মূর্খ আমি না জানিয়ে ভাল-মন্দ স্থান।
সর্বত্র আমার হয় অদ্বিতীয় জ্ঞান॥" [তদেব]

এর মধ্যে জীবনীকার ব্রহ্মজ্ঞানের তত্ত্বটি বললেও মূল কথাটি হলো পড়াশুনার দাবী আদায় ক'রে নেওয়া। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিষয়টিকে গ্রহণ করেছেন কেবল তত্ত্ব বলার উদ্দেশ্য নিয়েই। বৃন্দাবনদাসকেই সঠিক ব'লে মনে হয়। জ্ঞান অর্জনের অদম্য আগ্রহ ছিল দুরন্ত বালকের। পড়তে দেবার শর্ত ক'রে তবে বিশ্বম্ভর নেমে এল হাঁড়ীর সিংহাসন থেকে। তার আনন্দের কথা জানিয়ে শোনালেন বৃন্দাবনদাস—'হইলেন মহাপ্রভু আনন্দ-বিশেষে' [তদেব : পৃ. ৩৫]।

শুভদিনে শুভক্ষণে গৌরসুন্দর যজ্ঞসূত্র ধারণ করলো। এবার রীতিমত গুরুর কাছে শিক্ষা আরম্ভ হলো তার : বিভিন্নশাস্ত্র শিক্ষা চললো। কিন্তু তখনো কিশোরের মনে দুটো ভাবের দ্বন্দ্ব চলেছে। একদিকে রয়েছে অধ্যয়নের প্রবল আকাঙ্ক্ষা, অপরদিকে রয়েছে স্বভাবে প্রচণ্ড দুরন্তপনা, সকলকে তুচ্ছ করার মনোভাব : তখন থেকেই যেন যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা করতে চায় কিশোর—বৃন্দাবনদাস বলেছেন—

গুরুর যতেক ব্যাখ্যা করেন খণ্ডন।
পুনর্বার সেই ব্যাখ্যা করেন স্থাপন॥ [তদেব : পৃ. ৩৬]

গ্রীসের সফিস্টদের ন্যায় তার্কিক হয়ে উঠলো কিশোর নিমাই। যে-মত খণ্ডন করে, তাকেই আবার করে প্রতিষ্ঠা। সতীর্থরা স্তম্ভিত, গুরুও বিস্মিত।

চৈতন্যচরিতামৃতেও দেখা যায়—

অল্পকালে হৈল পঞ্জী-টীকাতে প্রবীণ।
চিরকালের পড়ুয়া জিনে হইয়া নবীন॥ [চৈ. চ. : পৃ. ৭৮]

জ্ঞান আহরণ এবং উদ্ধত আচরণ এই দুটোই চলে একই সঙ্গে। বয়স্ক শিক্ষার্থীদের নানা ফাঁকি জিজ্ঞাসা করে। পড়াশেষে সকল গুরুর শিষ্যরা চলে গঙ্গাস্নানে। কলহ চলে বিভিন্ন গুরুর শিষ্যদের মধ্যে, সতীর্থদের সঙ্গেও কলহ চলে : জল ফেলাফেলি, কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি এমন কি মারামারিও আরম্ভ হয়। এদের মধ্যে দুরন্ততম জগন্নাথ-পুত্র বিশ্বম্ভর : বৃন্দাবনদাসের কথায়—

প্রতি ঘাটে পড়ুয়ার অন্ত নাহি পাই।
ঠাকুর কলহ করে প্রতি ঠাঞি ঠাঞি॥
প্রতি ঘাটে ঘাটে যায় গঙ্গায় সাঁতারি।
একো ঘাটে দুই চারি দণ্ড ক্রীড়া করি [চৈ. ভা. : পৃ. ৩৭]

এই দুরন্ত কলহপ্রিয় কিশোর, যে গঙ্গার এপার-ওপার করে বার কয়েক, সেও ঘরে

এসে বিষ্ণুপুজো করে, তুলসীমঞ্চে জল দেয় প্রতিদিন। তারপর ভোজনান্তে অধ্যয়ন—এ সময় সে ভুলে যায় জগৎ-সংসার।

এর পূর্বে বিশ্বরূপ সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ ক'রে গেছেন। গৃহে থেকে মাতা-পিতার সেবা করার আশ্বাস দিয়েছে বিশ্বম্ভর। তা সত্ত্বেও দুরন্তপনা ত্যাগ করতে পারে না সেঃ দু'টো বিপরীত ধারার দ্বন্দ্ব চলে তার মধ্যে প্রতিনিয়ত।

বিশ্বম্ভরের পিতৃবিয়োগ হলো। পিতার পরলোক প্রাপ্তিতে আকুল হয়ে কাঁদলেন যৌবনে পদার্পণে উন্মুখ বিশ্বম্ভর - মাতাকে সান্ত্বনাও দিলেন যথাসাধ্য। বিধিমত পিতৃক্রিয়াও করলেন। শচীমাতার দরিদ্রের সংসার—বিশ্বম্ভরই এখন তাঁর একমাত্র ভরসা। কিন্তু তাঁর ঔদ্ধত্য যায় না। এখনও তিনি গৃহের দ্রব্যসম্ভার ভাঙচুর করেন, মাতার দুঃখ-বেদনা উপলব্ধি করার কিছুমাত্র ইচ্ছাও যেন তাঁর নেইঃ বিষ্ণুপুজো করেন নিছকই অভ্যাসের বশে—তাঁর জীবনের ওপর তখনও তার কোন প্রশান্ত ছায়া পড়ে নি। ১৬ বৎসর বয়সের যুবক দম্ভে বিভোর—

প্রভু বোলে "ইথে আছে কোন বড় জন।
আসিয়া খণ্ডক দেখি আমার স্থাপন॥ [তদেব ঃ পৃ. ৪৭]

জগন্নাথ মিশ্রের পরলোক প্রাপ্তির পর বিবাহ পর্যন্ত বিশ্বম্ভরের ক্রিয়াকলাপের কথা কৃষ্ণদাস কবিরাজ শোনান নি। তাঁর সেকালের মানসিক দ্বন্দ্বের কথা তিনি গোপন রেখেই গেছেন; তিনি একেবারে বিবাহের কথায় পেঁছে গেছেন—

কতদিনে প্রভু চিত্তে করিলা চিন্তন।
গৃহস্থ হৈলাম এবে চাহি গৃহধর্ম॥
গৃহিণী বিনা গৃহধর্ম না হয় শোভন।
এত চিন্তি বিবাহ করিতে হৈল মন॥ [চৈ. চ. ঃ পৃ. ৭৯]

নিজের পছন্দ মত বল্লভ আচার্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে বিবাহ হলো বিশ্বম্ভরের, বিশ্বম্ভর তখনও গুরুগৃহে অধ্যয়ন করছিলেন।

বিশ্বম্ভরকে দেখে নানা জনে নানা কথা ভাবেন। কেউ তাঁর পাণ্ডিত্যে বিস্মিত, বৈষ্ণবরা মনে মনে আশা করেন যে, তিনি বৈষ্ণব হবেন। এ সময় নবদ্বীপে ঈশ্বর-পুরীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। বিশ্বম্ভর ঈশ্বরপুরীকে গৃহে ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ জানালেন। প্রতিদিন নানা শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা হলো দুজনেরঃ পুরীর ভাব-বিহ্বলতা লক্ষ্য করলেন বিশ্বম্ভর। তাঁর মনে এক প্রচণ্ড আলোড়ন দেখা দিল। তথাপি পাণ্ডিত্যের অভিমান তাঁর আকাশ ছোঁয়াঃ তিনি নিজে অধ্যাপনা আরম্ভ করেছেন—অন্য অধ্যাপকদের তর্ক-দ্বন্দ্বে আহ্বান করছেন; নবদ্বীপের প্রধান পণ্ডিত ব'লে তিনি তখন হয়েছেন সর্বজন স্বীকৃত। বিশ্বম্ভরকে দেখে ফাঁকি জিজ্ঞাসার ভয়ে সবাই পলায়ন করেন।

সময়ের পার্থক্য থাকলেও বৃন্দাবনদাস এবং কৃষ্ণদাস উভয়েই বিশ্বম্ভরের বায়ুর লক্ষণ প্রকাশের কথা বলেন। বৃন্দাবনদাসের মতে বঙ্গদেশে গমনের পূর্বেই এটা ঘটেছিল; কৃষ্ণদাস আভাস দিয়েছেন যে বায়ুরোগ দেখা দেয় বঙ্গদেশ থেকে ফেরার পর। একটা জায়গায় উভয়ের মিল লক্ষ্য করা যায়; পাণ্ডিত্যের গর্ব তখনও সমপরিমাণে দেখা যাচ্ছিল বিশ্বম্ভরের অন্তরে। বৃন্দাবনদাসকেই অধিকতর সত্য-প্রকাশক ব'লে

মনে হয়। মনের ভারসাম্য হারাতে হলে মনের মধ্যে পরস্পর বিরোধী ভাবের প্রচণ্ড টানা-পোড়েন চলা প্রয়োজন। বৃন্দাবনদাসই উদ্ধৃতের শিরোমণির সামনে ঈশ্বর-পুরীকে এনে দাঁড় করিয়েছিলেন—মনের মধ্যে তাই তার প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। এই অবস্থাকে জীবনীকাররা লীলা ব'লেই বোঝাতে চেয়েছেন ঃ কবিরাজ গোস্বামীর মতে—'বায়ুব্যাধিছলে করে প্রেম-পরকাশ।' [চৈ. চ. ঃ পৃ. ৮২]। কিন্তু প্রেম প্রকাশের জন্য এই ছলনার প্রয়োজন কি ছিল? ছলনা ক'রে প্রেম প্রকাশ করলে সাধারণ মানুষের তা বোধগম্যই বা হবে কি করে? সাধারণ মানুষ কেন, বিশ্বম্ভরের প্রিয় বন্ধু, সতীর্থ এবং বৈষ্ণবরাও তো তাঁর এই ছলনা উপলব্ধি করতে পারেন নি ঃ বৃন্দাবনদাস বলেছেন—

এক দিন বায়ু দেহ-মান্দ্য করি ছল।
প্রকাশেন প্রেম ভক্তি-বিকার সকল ॥
আচম্বিতে প্রভু অলৌকিক শব্দ বোলে।
গড়াগড়ি যায়, হাঁসে, ঘর ভাঙ্গি ফেলে ॥
হুঙ্কার গর্জন করে, মালসাট্ পরে।
সম্মুখে দেখয়ে যারে, তাহারেই মারে ॥ [চৈ. ভা. ঃ পৃ. ৫৬]

উপরে যে চিত্র দেখা গেল তাতে 'প্রেম-ভক্তি'র প্রকাশ কোথায়? একটা বিরাট ব্যক্তিত্বের মানসিক দ্বন্দ্বের চিত্রই লক্ষ্য করা গেল। বৃন্দাবনদাস আরও বলেছেন—

শুনিলেন বন্ধুগণ বায়ুর বিকার।
ধাইয়া আসিয়া সভে করে প্রতীকার ॥
বুদ্ধিমন্ত খান আর মুকুন্দ সঞ্জয়।
গোষ্ঠীসহ আইলেন প্রভুর আলয় ॥
বিষ্ণুতৈল নারায়ণতৈল দেন শিরে।
সভে করে প্রতীকার, যার যেন স্ফুরে ॥
আপন ইচ্ছায় প্রভু নানা কর্ম করে।
সে কেমনে সুস্থ হৈবেক প্রতীকারে ॥ [তদেব]

গুরু নানকেরও এ প্রকার অবস্থা হয়েছিল। তিনি তাঁর বৈদ্যকে বলেছিলেন নিজের রোগ নিরাময় করতে। এখানে দেখা গেল মুকুন্দও ব্যাপারটাকে বায়ুর বিকার ব'লেই মনে করেছিলেন। ঈশ্বরপুরীর চরিত্র বিশ্বম্ভরের যে চিত্ত বিক্ষোভ ঘটিয়েছিল তা এক নতুন জগতে উত্তরণের জন্য প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এই বায়ুর লক্ষণ এক নতুন জগতে যাত্রার প্রতীক মাত্র।

পণ্ডিতের স্থিতপ্রজ্ঞ হতে বিলম্ব হলো না। পুনরায় আরম্ভ হলো অধ্যাপনার কাজ; শিষ্যদের নিয়ে গঙ্গাস্নান ঃ গৃহে ফিরে বিষ্ণুপূজা, তুলসী মঞ্চ প্রদক্ষিণ ক'রে হরির নাম কীর্তন ক'রে ভোজনে বসা। বাল্যের সেই হরি-কৃষ্ণ নামের মহিমা উপলব্ধি নতুন ক'রে আরম্ভ হলো।

ভোজনের পর শয়ন এবং পরে উঠে নগর ভ্রমণ। প্রতিদিন আরম্ভ হলো তার সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন : এই সাধারণ মানুষেরা ব্রাহ্মণ নন। মনে হয়

এই সময় থেকেই বিশ্বম্ভর স্থির করে নিলেন তাঁর বৈষ্ণব কর্মপন্থা। কিন্তু তাঁর এই পরিবর্তন তখনও উপলব্ধি করতে পারেন নি বিশিষ্ট বৈষ্ণবরাও। জন কয়েক শিষ্য সঙ্গে নিয়ে চলেছেন তিনি : পথে সাক্ষাৎ হলো বৈষ্ণবদের প্রথম সারির নেতা শ্রীবাসের সঙ্গে। বিশ্বম্ভর তাঁকে বিনীত নমস্কার জানালেন। রসিক শ্রীবাস উপলব্ধি করতে পারলেন না তাঁর সত্য বিনয় : রসিকতা মিশ্রিত পরিহাস করলেন তিনি—

"চিরজীবী হও" বোলে শ্রীবাস উদাস ॥
হাসিয়া শ্রীবাস বোলে "কহ, দেখি শুনি।
কতি চলিয়াছে উদ্ধতের চূড়ামণি ॥ [তদেব : পৃ. ৬১]

অন্য অবস্থা হলে কঠিন উত্তর পেতেন শ্রীবাস। কিন্তু বিশ্বম্ভর সম্ভবত তখন ঈশ্বর পুরীকে সম্মুখে দেখেন : আঘাত করার থেকে আঘাত বরণকে অধিকতর শ্রেয় ব'লে মনে হয় তাঁর।

পণ্ডিত প্রধান ব'লে প্রতিদিন ১০।২০ জন করে শিষ্য বৃদ্ধি পাচ্ছিল তাঁর। এর পর তিনি দিগ্বিজয়ীকে জয় করলেন। যে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত দিল্লি, কাশী, গুজরাট, বিজয়নগর, হেলঙ্গ-তেলঙ্গ, গৌড়-উড়িশ্যা জয় ক'রে বিজয় গর্বে নবদ্বীপ জয় করতে এসেছিলেন তাঁকে পরাজিত ক'রেও বিশ্বম্ভর অতি বিনয়ে বললেন—

"আজি চল তুমি শুভ কর বাসা-প্রতি।
কালি বিচারিব সব তোমার সংহতি ॥
তুমিও হইলা শ্রান্ত অনেক পড়িয়া।
নিশাও অনেক যায়, শুই থাক গিয়া ।।" [তদেব : পৃ. ৬৫]

নবদ্বীপের পণ্ডিতদের প্রতিও আর তাঁর দুর্বিনীত ব্যবহার নেই—

জিনিঞাও কারো না করেন তেজ ভঙ্গ।
সভেই পায়েন প্রীত, হেন তান রঙ্গ ॥
অতএব নবদ্বীপে যতেক পণ্ডিত।
সভার প্রভুর প্রতি মনে বড় প্রীত ॥ [তদেব]

যে গৌরসুন্দরকে কিছুদিন পূর্বেও শ্রীবাস 'উদ্ধতের চূড়ামণি' ব'লে মনে করতেন সেই মানুষটিই দিগ্বিজয়ীকে উপদেশ দিলেন—

প্রভু বোলে "বিপ্র! সব দম্ভ পরিহরি।
ভজ গিয়া কৃষ্ণ সর্ব-ভূতে দয়া করি ।। [তদেব : পৃ. ৬৭]

যে বিশ্বম্ভরের শৈশবে ক্রন্দন শান্ত করতে হরি-কৃষ্ণ নাম শোনাতে হতো, কিশোর বয়সে যে দেবতাদের তুচ্ছ ক'রে পূজার নৈবেদ্য নিজেই গ্রহণ করতো, যৌবনে যিনি পাণ্ডিত্য-গৌরবে 'ঔদ্ধতের চূড়ামণি' হ'য়ে উঠেছিলেন, তিনিই ঈশ্বরপুরীর সাক্ষাৎ লাভের পর পুনরায় কৃষ্ণ কথায় এলেন, সংযত করলেন নিজের উদ্ধত ভাবকে। বিশ্বম্ভরের জীবনের এই বিবর্তন বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়।

কেবল দম্ভ পরিহার করার উপদেশ নয়, নিজেও সমস্ত দম্ভ পরিহার করলেন, কেবল সর্ব-ভূতে দয়া করার উপদেশই নয়, তা আচরিত হতে লাগল নিজের জীবনেও : অন্তর-জগতের পূর্ণ উন্মেষ ঘটলো বিশ্বম্ভরের—

দুঃখিতে দেখিলে প্রভু বড় দয়া করি।
অন্ন-বস্ত্র, কপর্দক দেন গৌরহরি ॥
নিরবধি অতিথি আইসে প্রভু-ঘরে।
যার যেন যোগ্য প্রভু দেন সবাকারে ॥
কোন দিন সন্ন্যাসী আইসে দশবিশ।
সভা নিমন্ত্রেণ প্রভু হইয়া হরিষ ॥ [তদেব : পৃ. ৬৮]

এরূপ মানসিক অবস্থায় বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য বিশ্বম্ভর গেলেন জন কয়েক শিষ্য নিয়ে বঙ্গদেশে। জয়ানন্দের মতে বিবাহের পর অর্থ উপার্জনের জন্যই তাঁর এই বঙ্গদেশে যাত্রা। গয়া থেকে ফেরার পথে তিনি বিশ্বম্ভরের বিবাহের ব্যবস্থা করেছেন। এটা সঠিক ব'লে মনে হয় না। গয়া গিয়েই বিশেষ পরিবর্তন ঘটে বিশ্বম্ভরের, তার পরে বিবাহের মন হবার কথা নয়। এ ব্যাপারে বৃন্দাবনদাসকেই সঠিক ব'লে গ্রহণ করাই শ্রেয়। উপার্জনের জন্য অনেক শিষ্য সঙ্গে নিয়ে যাবারও কোন কারণ নেই। কৃষ্ণ নামের দিকে তাঁর মন আবার ফিরেছে। বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারে জাত-পাতের বিরোধিতা আছে—এই কঠিন কাজ করতে গেলে সর্বত্র পরিচিতি চাই ; ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের তাই বিশেষ প্রয়োজন আছে। গৌরসুন্দর কয়েকমাস থাকলেন বঙ্গদেশে—ফিরলেন অনেক সম্পদ সঙ্গে নিয়ে। এই ক'মাসে বিরহ-কাতর লক্ষ্মীদেবীর সর্পদংশনে দেহাবসান হয়।

বঙ্গদেশে থাকাকালীন তপন মিশ্র নামে এক বিপ্র এলেন সাধ্য-সাধন তত্ত্ব বুঝতে। বিশ্বম্ভর তাঁকে সেই তত্ত্ব বুঝিয়ে পাঠিয়ে দিলেন কাশীতে, ব'লে দিলেন যে, কাশীতে আবার তিনি তাঁর সাক্ষাৎ পাবেন। গৌরহরি এই সময় থেকেই যে নিজ কর্মধারায় একটা ছক তৈরি ক'রে ফেলেছিলেন মনে মনে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বঙ্গদেশে আগমন সেই পরিকল্পনারই একটা অংশ মাত্র।

পত্নী বিয়োগের কথা তিনি শুনেছেন, অন্তর্যামী ব'লে আপনা থেকেই জেনেছেন একথা বলেননি বৃন্দাবনদাস : তাঁর বক্তব্য—

প্রভু বোলে "মাতা ! আমি জানিল সকল।
তোমার বধূরে কিছু শুনি অমঙ্গল ॥" [তদেব : পৃ. ৭৩]

কিন্তু এ সময়ে একটা বড় আদর্শ তাঁকে আবৃত ক'রে ফেলেছে, ব্যক্তিগত শোক তাঁকে আর অভিভূত করতে সক্ষম হলো না, মাতাকে বুঝিয়ে তিনি বললেন—

ঈশ্বরের অধীন যে সকল সংসার। [তদেব]

যাঁকে তিনি নিজের অন্তরের আকর্ষণে বিবাহ করেছিলেন, তাঁকে হারিয়েও বিচলিত হলেন না তিনি। সংযমের, স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়ার পরীক্ষায় যে তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন তা স্পষ্ট হয়ে গেল : লক্ষ্য এখন স্থির। কিন্তু এ সময়ে তাঁকে রীতি-পদ্ধতি অনুসরণকারী ব'লে মনে হয় ; সন্ধ্যা করা, তিলক কাটাকেও তিনি তখনও ধর্ম-কর্মের অঙ্গ ব'লে মনে করেন। নিজে উষাকালে সন্ধ্যা ক'রে মাতাকে প্রণামান্তে অধ্যাপনা করতে যান : মুকুন্দ-সঞ্জয়ের বিরাট চণ্ডীমণ্ডপই তাঁর বিদ্যা-গৃহ। কোন শিষ্যের ললাটে তিলক না দেখলে তিনি বেদনার্ত কণ্ঠে বলেন—

প্রভু বোলে "কেনে ভাই ! কপালে তোমার ।
তিলক না দেখি কেনে, কি যুক্তি ইহার ?...
বুঝিলাঙ আজি তুমি নাহি কর সন্ধ্যা ।
আজি ভাই ! তোমার হইল সন্ধ্যা বন্ধ্যা ॥
চল সন্ধ্যা কর গিয়া গৃহে পুনর্বার ।
সন্ধ্যা করি তবে সে আসিহ পড়িবার ॥" [তদেব]

তারপর শচীমাতার উদ্যোগে দ্বিতীয় বিবাহ। প্রথমবারে গৌরসুন্দর ছিলেন সক্রিয়, দ্বিতীয়বারে তিনি অনেকটাই নিষ্ক্রিয় ; উৎসাহ তাঁর সতীর্থ এবং ভক্তদের। মাতার প্রয়োজনকে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন গৌরহরি ।

এর পর গয়াতে গমন। জয়ানন্দ বলেছেন যে, মৃত্যুর পূর্বে জগন্নাথ মিশ্র গয়াতে তাঁর পিণ্ডদানের কথা ব'লে গিয়েছিলেন—'গয়াতে আমার বাপু দিহ পিণ্ডদান।' [চৈ. ম. ঃ পৃ. ৪৫] বৃন্দাবনদাস প্রভৃতি অন্যান্য জীবনীকাররা পিতার ইচ্ছার কথা শোনান নি। বৃন্দাবনদাসেব ইঙ্গিত থেকে অনুমান করা ভুল হবে না যে, নবদ্বীপেই ঈশ্বর পুরীর সঙ্গে তাঁর গোপনে এ বিষয়ে কথা হয়েছিল ঃ গয়াতে উভয়ের যে সাক্ষাৎ হয় তা পূর্ব-নির্ধারিত। বৃন্দাবনদাস বলেছেন—

জননীর আজ্ঞা লই মহা-হর্ষ-মনে ।
চলিলেন মহাপ্রভু গয়া-দরশনে ॥ [তদেব ঃ পৃ. ৮৮]

পিণ্ড দানে হর্ষের কারণ কি ? গোপন ইচ্ছা চরিতার্থ হবে ব'লেই বিশ্বম্ভর 'হর্ষ-মনে' চললেন এটাই স্বাভাবিক মনে হয়। স্থিরীকৃত লক্ষ্যে পৌঁছতেই হবে তাঁকে এ রকম মানসিকতাই হয়েছিল তাঁর। লোচনদাস বলেছেন যে, পিতৃ পিণ্ডদানের জন্য গয়া যাবার ইচ্ছা হওয়ায় গৌরসুন্দর সঙ্গে কয়েকজন ব্রাহ্মণকে নিয়ে গয়া-গমন করলেন। পিতা বা মাতার ইচ্ছার কথা তিনিও বলেন নি।

গয়াতে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো বিশ্বম্ভরের। তিনি নিজ হস্তে রন্ধন ক'রে ভিক্ষা করালেন পুরীকে ; দিব্য গন্ধ লেপন করলেন তাঁর দেহে এবং দশাক্ষর মন্ত্র নিলেন তাঁর কাছে। পুরীর কাছে তিনি কৃষ্ণপ্রেম ভিক্ষা আশীর্বাদ চাইলেন। পুরীর জন্মস্থান কুমারহট্টের মাটি নিয়ে এলেন তিনি। লোচনদাস বলেছেন যে, রাজগিরি থেকে গয়া যাবার পথে গৌরসুন্দরের সাক্ষাৎ হয় ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে ঃ পুরী তাঁকে 'গোপীনাথ মহামন্ত্র' দিলেন। বৃন্দাবনদাস বলেছেন যে, দশাক্ষর মন্ত্র নেবার পর পুরীর আশীর্বাদে কৃষ্ণপ্রেমে মাতাল হয়ে উঠলেন বিশ্বম্ভব—

যে প্রভু আসিলা অতি পরম-গম্ভীর ।
সে প্রভু হইলা প্রেমে পরম-অস্থির ॥ [তদেব ঃ পৃ. ৯১]

লোচনদাস বলেছেন যে, গোপীনাথ মহামন্ত্র পেয়ে গৌরসুন্দর শ্রীকৃষ্ণভাবে ভাবিত হলেন 'মাধুর্য-রসে মন ডুবাইল' ঃ ভাবের আবেগে তিনি কৃষ্ণ হয়ে উঠলেন।

এবার ফেরার পালা। সকলকে দেশে ফিরতে বললেন তিনি। বৃন্দাবনদাস বলেছেন, নিজে কিন্তু তিনি পা বাড়ালেন মথুরার দিকে—

কাহারে না বলি প্রভু কথো রাত্রি শেষে ।
মথুরায়ে চলিলেন প্রেমের আবেশে ॥ [তদেব]

কিন্তু যাওয়া হলো না। বৃন্দাবনদাস দৈববাণী শোনালেন—

কথো দূর যাইতে শুনেন দিব্যবাণী।
"এখনে মথুরা না যাইবে দ্বিজমণি॥
যাইবার কাল আছে, যাইবা তখনে।
নবদ্বীপ নিজ গৃহে চলহ এখনে॥ [তদেব]

লোচনের বক্তব্য গৌরসুন্দর বৃন্দাবনের পথে পা বাড়ালেন—দৈববাণী তাঁকে দেশে ফেরার নির্দেশ দেয়—

এই মত বুঝাইয়া প্রভু গৌরহরি।
গয়া হইতে বৃন্দাবন প্রভু যাত্রা করি॥
সঙ্গিগণ সংগে করি চলিলা আপনি।
হেনকালে উঠি গেল আকাশেতে বাণী॥
নূতন মেঘের যেন গভীর গর্জন।
বিশ্বম্ভর সম্বোধিয়া কহিল বচন॥
শুন শুন মহাপ্রভু অহে বিশ্বম্ভর।
না যাইবে বৃন্দাবন যাহ নিজ ঘর॥
সন্ন্যাস করিয়া তীর্থ করিবে পর্যটন।
সময়ের বশ হইঞা যাবে বৃন্দাবন॥ [চৈ. ম. ঃ পৃ. ৮৮]

জয়ানন্দ অন্য প্রকার অলৌকিক ঘটনা ঘটালেও দৈববাণী শোনান নি। গৌরসুন্দর মথুরা যাবেন বলায় সঙ্গীরা ক্রন্দন আরম্ভ করলেন; তাই মথুরায় যাবার চেষ্টা না ক'রে তিনি দেশেই ফিরলেন।

এ দৈববাণী আকাশে শোনা যায় নিঃ এ বাণী গৌরাঙ্গের অন্তরের বাণী। যে উদ্দেশ্য সাধন করতে তিনি চান তাতে পলায়নী মনোবৃত্তির স্থান নেই—কঠিন সংগ্রাম ক'রে তাঁকে পথ চলতে হবেঃ সর্বজনের জন্য ঈশ্বর সাধনার পথ প্রস্তুত করতে হলে বিশেষ ক'রে সেকালে, বিপুল কর্মোদ্যোগের প্রয়োজন। তাই মুহূর্তের আবেগ দমন ক'রে গয়া থেকে ফেরার পর সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যন্ত দেশের কর্মক্ষেত্রে ফিরলেন তিনি।

গয়া থেকে ফেরার পর সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যন্ত

গয়া থেকে ফেরার সময় চৈতন্যদেবের মথুরা যাবার ইচ্ছা জেগেছিল মনে, কিন্তু সে ইচ্ছা দমন ক'রে ফিরলেন তিনি দেশে—

ঈশ্বরপুরীর স্থানে হইয়া বিদায়।
দেশে আইলেন প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥
শুনি সর্ব নবদ্বীপ হৈল আনন্দিত।
প্রাণ আসি দেহে যেন হৈল উপনীত॥ [চৈ. ভা. ঃ পৃ. ৯২]

চমৎকার একটি উপমা দিয়ে জীবনীকার নবদ্বীপের মানসিক অবস্থা জ্ঞাপন করেছেন। লোচনদাস ব্যক্তিগত স্পর্শে মর্মস্পর্শী ক'রে তুলেছেন ঘটনাটি—

বিষ্ণুপ্রিয়া হিয়া মাঝে আনন্দ হিল্লোল।
ধরিতে না পারে অঙ্গ সুখের নাহি ওর ॥ [চৈ. ম. : পৃ. ৮৮]

কিন্তু এই 'আনন্দ-হিল্লোল' স্বল্পস্থায়ী : চৈতন্যদেব ফিরে এলেন এক নতুন মানুষ হয়ে। পাণ্ডিত্যের সেই অভিমানের কিছুমাত্র আর অবশিষ্ট নেই; এ সময় থেকেই আরম্ভ হলো তাঁর আবেশ-ভাব : কৃষ্ণদাস বলেছেন 'দেশে আগমন পুনঃ প্রেমের বিলাস' [চৈ. চ. : পৃ. ৮৩]। বৃন্দাবনদাসও তাঁর পরিবর্তনের কথা স্পষ্ট ক'রেই বলেছেন—

গয়া করি আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
পরিপূর্ণ ধ্বনি হৈল নদীয়া নগর ॥...
পরম সুনম্র হই প্রভু কথা কহে।
সভে তুষ্ট হইল দেখি প্রভুর বিনয়ে ॥ [চৈ. ভা. : পৃ. ৯৩]

কেবল বিনয়ই নয়। 'কৃষ্ণ' বলি কান্দিতে লাগিলা বহুতর' [তদেব : পৃ. ৯৪]। বিশেষ বৈরাগ্যের ভাবও দেখা গেল তাঁর মধ্যে—

মহা-বিরক্তের প্রায় ব্যবহার করে ॥
বুঝিতে না পারে আই পুত্রের চরিত। [তদেব]

শ্রীবাসাদি বৈষ্ণবগণ যখন ফুল তুলছিলেন তখন শ্রীমান পণ্ডিত হাসতে হাসতে এসে জানালেন—

পরম অদ্ভূত কথা, মহা অসম্ভব।
নিমাঞিপণ্ডিত হৈলা পরম বৈষ্ণব ॥
গয়া হইতে আইলেন সবল কুশলে।
শুনি আমি সম্ভাষিতে গেলাম বিকালে ॥
পরম বিরক্ত রূপ সকল সম্ভাষ।
তিলার্ধেক ঔদ্ধত্যের নাহিক প্রকাশ ॥...
সর্ব-অঙ্গ মহা-কম্প পুলকে পূর্ণিত।
'হা কৃষ্ণ!' বলিয়া মাত্র পড়িলা ভূমিত ॥ [তদেব : পৃ. ৯৪/৯৫]

বৃন্দাবনদাসের কথায় মনে হয় যে, গয়া থেকে ফেরার পর চৈতন্যদেবের জীবনে এক 'মহা অসম্ভব' ঘটনা ঘটেছে : লোপ পেয়েছে তাঁর সমস্ত ঔদ্ধত্য—পরম বৈষ্ণব হয়েছেন তিনি।'

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে বিশ্বম্ভরের প্রথম মিলন হয় কয়েকজন বৈষ্ণবের সংগে; এখানে অদ্বৈত শ্রীবাসাদি তখনো আসেন নি। বিশ্বম্ভর যে পরিপূর্ণ বৈষ্ণব হয়েছেন এ বোধ হলো সকলেরই। ঈশ্বরপুরীর সঙ্গ গুণেই হয়তো এমনটি ঘটেছে। প্রেম-ভক্তিই তো বৈষ্ণবত্বের লক্ষণ, এর জন্যে কোন দীক্ষা বা অন্য কোন শিক্ষারও প্রয়োজন নেই। বিশ্বম্ভর যখন বৈষ্ণব হয়েছেন তখন পাষণ্ডীদের দমন করা যাবেই এ বিশ্বাস মনে জাগল সকলেরই।

বিশ্বম্ভর ভাবের আবেগে আর অধ্যাপনা করতেও সক্ষম হন না। পড়ুয়ারাও আর অন্যত্র অধ্যয়নে ইচ্ছুক নয়। সকলে মিলে আরম্ভ করলেন সঙ্কীর্তন। তাতে আকৃষ্ট হলেন বৈষ্ণবগণ—

নিকটে বসয়ে যত বৈষ্ণবের ঘর।
কীর্তন শুনিয়া সভে আইলা সত্বর ॥ [তদেব : পৃ. ১০৪]

নদীয়া নগরে সে-সময় থেকে আরম্ভ হলো কীর্তন।

এ সময়েই চৈতন্যদেব বুঝলেন যে, প্রেম-ভক্তিই জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন—ব্রাহ্মণ-শূদ্রের পার্থক্য মিথ্যা সংস্কার মাত্র। জাত-পাতের ব্যবস্থা দিয়ে সমাজ মানুষকে পৃথক ক'রে রাখার চেষ্টা করেছে—এ ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে সম্পূর্ণ মিথ্যার ভিত্তির ওপর। কর্মই মানুষের পরিচয় : মাতাকে তাই তিনি দৃঢ়তার সংগে বলেছেন—

চণ্ডাল চণ্ডাল নহে—যদি কৃষ্ণ বোলে।
বিপ্র নহে বিপ্র—যদি অসৎপথে চলে ॥ [তদেব : পৃ. ৯৮]

চণ্ডীদাসের অমর বাণী—

সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।—

চৈতন্যদেবের জীবনে উঠেছিল মূর্ত হয়ে। এই সময় থেকেই প্রেমের বন্ধনে তিনি আবন্ধ করতে চেয়েছিলেন মানব সমাজকে।

অদ্বৈত আচার্যের কাছে সংবাদ গেল। তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে বললেন, আর ভয় নেই, যাঁকে আনবার জন্য এত চেষ্টা করেছি তিনি এসেছেন। নারায়ণের অবতার রূপে জন্মাবার কথাই হয়তো বলতে চেয়েছেন আচার্যদেব! কিন্তু দেখা গেল যে, বিশ্বম্ভর গঙ্গাস্নানের পথে বৈষ্ণবদের নানা ভাবে সাহায্য করছেন, চরণ ধূলিও নিচ্ছেন মস্তকে—

সভার চরণ-ধূলি লয় বিশ্বম্ভর।
আশীর্বাদ সভেই করেন বহুতর ॥ [তদেব : পৃ. ১০৭]

বিশ্বম্ভরকে বৈষ্ণবরা চরণ-ধূলি দিতে ইতস্তত করেন নি, সুতরাং অদ্বৈত আচার্যের ইঙ্গিত সত্ত্বেও বৈষ্ণব সমাজেও তিনি 'অবতার' হয়ে ওঠেন নি তখনও।

এ সময় একটা নূতন অবস্থা দেখা গেল তাঁর জীবনে। কৃষ্ণ নাম করতে করতে তিনি প্রায়ই আবেশ-বিহ্বল হয়ে পড়তেন। সকলেই প্রেম-ভক্তিতে মাতোয়ারা হয়ে উঠুক এই ইচ্ছা তাঁর চিত্তে প্রবল হয়ে ওঠার জন্যই এমনটি হতো এ অনুমান করা চলে। অনুক্ষণ 'মাধব মাধব' ভাবতে ভাবতে বৈষ্ণব কবিদের শ্রীরাধা 'মাধব' হয়ে উঠতেন : এতো ভাবজগতে 'মাধব' হয়ে ওঠা রূপ—জগতে নয়। বিশ্বম্ভরের সেই অবস্থা দেখা যেত প্রায়ই।

মুরারি গুপ্তের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে এ ধরনের আবেশের কথা অনেকবার বলা হয়েছে : ২য় প্রক্রম ২য় সর্গ ১৮ শ্লোকে বলা হয়েছে 'বরাহ' আবেশের কথা, 'নৃসিংহ' আবেশের কথা বলা হয়েছে ২য় প্রক্রম ১১ সর্গের ৮ম শ্লোকে : সন্ন্যাস গ্রহণের পর দেখা গেছে গোপী-ভাব, দাস-ভাব এবং ঈশ-ভাব, 'গোপী ভাবৈর্দাস ভাবৈরীশভাবৈ : কচিৎ কচিৎ' [২/১৮/১৪]। মুরারির কাব্যে চৈতন্যদেবের হলধর আবেশের কথাও আছে [২/২/১৪]।

কবি কর্ণপূরের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতেও 'বলভদ্র' আবেশের কথা আছে [৮ম সর্গ ৪৮-৫৫ শ্লোক এবং ২৭ শ্লোক]। গ্রন্থের ৭ম সর্গ ৭৯-৮৪ শ্লোকে নৃসিংহ রূপে

কথা আছে। নৃসিংহ রূপে তিনি শ্রীবাস গৃহে আগমন করলেন, পথের সাধারণ মানুষ তাঁকে দেখে পলায়নপর হলেন। সকলকে পলায়ন করতে দেখে শ্রীবাসকে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তিনি কোন বিষয়ে অপরাধ করেছেন কিনা। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, আবেশ মাত্রেই ভাবাবেশ এবং নৃসিংহ রূপ ধারণও প্রকৃতপক্ষে রূপ পরিবর্তন নয়।

লোচন দাসের চৈতন্য মঙ্গলেও চৈতন্যদেবের আবেশের কথা আছে : তাঁর হলায়ুধ আবেশ হয় [পৃ. ১২৯-১৩০]। জীবনীকার নিজেই বলেছেন 'লীলা বলরাম ক্রীড়া করে মহাশয়' [পৃ. ১৩০]—আবেশ নিতান্তই ক্রীড়া, লীলা মাত্র—সত্য নয়। লোচন দাস অন্যত্র আবেশের কথায় বলেছেন—

কহিল ত মহাপ্রভু শ্রীবাস দেখিয়া।
মোর বাঁশী দেহ—চাহে শ্রীহস্ত পাতিয়া ॥
তবে সেই শ্রীনিবাস পণ্ডিত ঠাকুব।
কহিল তাঁহাকে তেঁহ ভক্ত সুচতুর ।।
শুন শুন মহাপ্রভু এই তোব ঘরে।
রাখিল ভীষ্মক-কন্যা মুরলী তোমারে ॥
কপাট লাগিল রাত্রে ঘরের দুয়াবে।
এখনি পাইবা বাঁশী—কহিল তোমারে ॥ [চৈ. ভা. : পৃ. ১৩১]

ভাবের আবেগ থেকে জাত এই আবেশ। তীব্র আর্তির ফলে চৈতন্যদেব নানা সময়ে নারায়ণের নানা 'অবতারের' ভাবে ভাবিত হয়ে আবিষ্ট হয়েছেন। 'সুচতুর' ভক্ত সত্য উদঘাটন ক'রে চৈতন্যদেবকে বেদনাখিন্ন করতে চান নি ; কৌশলে এড়িয়ে গেছেন। আবেশ ছিন্ন হলে ভীষ্মক-কন্যার ঘরের দুয়ারের কপাটের কথা আর স্মরণেও আসবে না।

বৃন্দাবনদাসও বিশ্বম্ভরের সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে বহুবার 'আবেশের' কথা বলেছেন। গয়া থেকে ফিরে বিশ্বম্ভর বৈষ্ণব-সেবায় মন দিলেন। 'কৃষ্ণ' চিন্তার প্রবল আর্তিতে মাঝে মাঝেই তিনি বাহ্য হারাতেন, সে সময় নানা ভাবের আবেশ দেখা দিত তাঁর। অবচেতন মনে স্বপ্ন দেখার মতো তিনি নিজেকে নানা রূপে দেখতেন। প্রবল আর্তি এবং প্রেমই এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতো! পাষণ্ডীদের আচরণে বৈষ্ণবদের দুঃখ দেখে অস্থির হয়ে উঠতেন তিনি। তাঁদের দুঃখ দূর করার তাগিদ মাঝে মাঝেই তাঁকে ত্রাণকর্তা ক'রে তুলতো—নিজেকে দুষ্কৃতকারীদের বিনাশকর্তা এবং সজ্জনদের উদ্ধারকর্তা ব'লে মনে হতো—

"সংহারিব সব বলি" করয়ে হুঙ্কার।
"মুঞি সেই, মুঞি সেই" বোলে বারে বার ॥
ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়।
লক্ষ্মীরে দেখিয়া ক্ষণে মারিবারে যায় ॥

এইমত হৈলা প্রভু বৈষ্ণব আবেশে।
শচী না বুঝয়ে কোন ব্যাধি-বিশেষে ॥ [চৈ. ভা. ঃ পৃ. ১০৭]

সত্যকার 'নারায়ণ' হয়ে উঠলে বিষ্ণুপ্রিয়াকে 'মারিবারে যায়' অবস্থা হবে কেন? সচেতন অবস্থায় পাষণ্ডী বিরোধিতায় বিষ্ণুপ্রিয়াকে বাধা ব'লে মনে হবার ফলেই অবচেতন অবস্থায় তাকে মারতে যান। কোন কাহিনীতেই নারায়ণ রুক্মিণী-সত্যভামা-জাম্ববতীকে 'মারতে' গেছেন এমন কথা তো পাওয়া যায় না।

শ্রীবাস ভাবে আবিষ্ট হয়ে সকল পরিবার-পরিজন সহ চৈতন্যের 'প্রকাশ' দেখলেন—দেখলেন 'কৃষ্ণ-অবতার' যেন বাসুদেব ঘরে। দাস-দাসীরও দেখা পেলেন কোন্ ভক্তির জোরে? অনেক প্রধান ভক্তও তো পরবর্তী কালে এরূপ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেন নি। বৃন্দাবনদাস তার পরই শুনিয়েছেন—"বাহ্য পাই বিশ্বম্ভর লজ্জিত অন্তর" [তদেব ঃ পৃ. ১১৪] ভাবাবিষ্ট অবস্থায় 'কিছু-একটা' করেছেন ভেবেই তো এই লজ্জা।

বরাহ-আবেশের কথাও শুনিয়েছেন চৈতন্যভাগবত—

একদিন বরাহ-ভাবের শ্লোক শুনি।
গর্জিয়া মুরারি ঘরে চলিলা আপনি ॥
... ...
মুরারির ঘরে গেলা শ্রীশচীনন্দন।
সম্ভ্রমে করিলা গুপ্ত চরণ-বন্দন ॥
"শূকর শূকর" বলি প্রভু চলি যায়।
স্তম্ভিত মুরারি গুপ্ত এইমত চায় ॥ [তদেব ঃ পৃ. ১১৫]

বরাহ-আবেশ যে আবেশ মাত্রই তা মুরারির 'চরণ বন্দন' থেকেই উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু বৃন্দাবনদাস পরমুহূর্তেই সত্যকার বরাহ সৃষ্টি করলেন—মুরারির বিষ্ণু গৃহের 'গাড়ু' 'কোলে' তুলে স্তুতি লাভের ইচ্ছায় চৈতন্যদেব 'বরাহ-আকার' ধারণ করলেন। এবার জীবনীকার আর আবেগের কথা বলেন নি, ব'লে বসলেন 'বরাহ-আকার প্রভু হৈলা' (তদেব)। শুধু স্তুতি শোনার জন্য বরাহ-আকার ধারণ? কেবল মাত্র বেদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশের জন্যই কি? কাশীর বৈদান্তিক প্রকাশানন্দের বিরোধিতাই কি এর লক্ষ্য? শেষ পর্যন্ত বরাহ-রূপ ধারণকে একেবারে অর্থহীন ক'রে দিলেন জীবনীকার নিজেই। বরাহ-মূর্তি ধারণ ক'রে তিনি নিজেকে অবতার রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। তাঁর মুখে অকস্মাৎ শোনা গেল—

মিথ্যা নাহি বোলো গুপ্ত! শুন মন দিয়া। [তদেব]

অবতার মিথ্যা বলবেন একথা মনে হলো কেন 'ববাহ-আকার'-এর অথবা বৃন্দাবনদাসের? সুতরাং আকার ধারণ নয়- এক্ষেত্রেও হয়েছিল বরাহ-আবেশ মাত্র।

চৈতন্যদেবের হলধর আবেশও হলো। 'নিত্যানন্দ আসছেন' এই স্বপ্ন দেখেছেন বিশ্বম্ভর; সেই স্বপ্নের কথা বলতে বলতেই হলধর আবেশ—

কহিতে প্রভুর বাহ্য সব গেল দূর।
হলধর-ভাবে প্রভু গর্জয়ে প্রচুর ॥
"মদ আন, মদ আন" বলি প্রভু ডাকে।
হুঙ্কার শুনিতে যেন দুই কর্ণ ফাটে ॥

শ্রীবাস পণ্ডিত বোলে "শুনহ গোসাঞি।
যে মদিরা চাহ তুমি সে তোমার ঠাঞি॥
তুমি যারে বিলাও, সেই তারে পায়। [তদেব ঃ পৃ. ১১৮]

হলধর-বলরাম মদিরা পান করতেন ; হলধর-আবেশে তাই উচ্চকণ্ঠে মদিরার কথাই বলেছেন বিশ্বম্ভর। কিন্তু এ তো আবেশ মাত্র, শ্রীবাসের মুখে তাই প্রেম-মদিরার কথাই শোনা গেল। আরও দু'বার বলরাম-ভাবে মদিরা চেয়েছিলেন তিনি, একবার নিত্যানন্দ কেবলমাত্র হাত দিয়ে দেবার ভঙ্গী করেন এবং হাত পেতে নেবার ভঙ্গী করেন বিশ্বম্ভর ঃ দ্বিতীয়বার তাঁর হাতে 'ঘট ভরি গঙ্গাজল' দেওয়া হয় আর তা 'প্রভু করে পান' (পৃ. ১২৩)। আবেশ ভরে নিজেকে অবতার ব'লে ঘোষণা করলেন তিনি। বহুক্ষণ পর আবেশ কেটে গেল, লজ্জা প্রকাশ করলেন তিনি—

ক্ষণেকে সুস্থির হৈলা শ্রীশচীনন্দন॥
"কি চাঞ্চল্য করিলাঙ ?" প্রভু জিজ্ঞাসয়ে।
ভক্ত সব বোলে "কিছু উপাধিক নহে॥"
সভাবে করেন প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন।
"অপরাধ মোর না লইবা সর্বক্ষণ॥" [তদেব ঃ পৃ. ১২৩]

আবেশ-ভরে যে-সব কথা বলেছেন তাকে 'চাঞ্চল্য প্রকাশ' ব'লেই মনে করেছেন বিশ্বম্ভর। অপরাধ না গ্রহণ করার জন্য অনুরোধও করেছেন ভক্তদের। এ যে নিছকই আবেশ তা ভক্তদের কথায়ও প্রমাণিত।

শঙ্করের গুণ শুনে একদিন 'দিব্য জটাধর' শঙ্কর মূর্তি ধারণ করলেন বিশ্বম্ভর ; এক লম্ফে উঠলেন শিবের গায়নের স্কন্ধে। কিছুক্ষণ নৃত্য ক'রে বাহ্য পেয়ে নেমে এলেন গায়নের স্কন্ধ থেকে এবং 'আপনে দিলেন ভিক্ষা ঝুলির ভিতর।' দেখা যাচ্ছে, কেবল নারায়ণের বিভিন্ন অবতারের আবেশই হয়েছে বিশ্বম্ভরের তাই নয়, শিবের আবেশেও হয়েছে—নারায়ণের অবতারের তো এরূপ হবার কথা নয়। বিশ্বম্ভরের রুক্মিণী আবেশের কথাও পাওয়া যায়।

জগাই-মাধাইর অনাচারের কথা শুনে, হরিদাস-নিত্যানন্দকে আক্রমণের প্রয়াস জেনে ক্রুদ্ধ হয়ে বিশ্বম্ভর বললেন—

প্রভু বোলে "জানো জানো সেই দুই বেটা।
খণ্ড খণ্ড করিমু আইলে মোর হেথা॥ [তদেব ঃ পৃ. ১৬৮]

আবেশ ছাড়াও এ ধরনের কথা অনেক সময়েই বলতেন বিশ্বম্ভর। তাঁর উক্তি শুনে নিত্যানন্দ বলেছিলেন—

নিত্যানন্দ বোলে "খণ্ড খণ্ড কর তুমি।
সে দুই থাকিতে কতি না যাইব আমি॥
কিসের বা এত তুমি করহ বড়াই।
আগে সেই দুইরে যে গোবিন্দ বলাই॥ [তদেব]

নিত্যানন্দ জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করবেন বোঝা গেল ঃ সেই সঙ্গে আরও বোঝা গেল যে বিশ্বম্ভরের সুদর্শনকে আহ্বান, 'ছিণ্ডো মাথা' নৃসিংহ রূপে গর্জন প্রভৃতিকে নিছক 'বড়াই' ব'লেই মনে করতেন অনেকে, আবেশের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলেও সে-সবকে নিছক

আবেশ ব'লেই ভক্তরা মনে করতেন, তাকে সত্য ব'লে মনে ক'রে কখনও বিভ্রান্ত হন নি তাঁরা।

অন্যান্য আরও আবেশের কথা না বললেও আর দু'টো বিষয় অন্তত উল্লেখ করা প্রয়োজন। আবিষ্ট নিত্যানন্দকে স্থির করেছিলেন বিশ্বম্ভর ; ব্যাস-পূজার কথা হলো, পরে 'দুই প্রভু' নৃত্য করতে লাগলেন। আবেশ দেখা দিল দু'জনেরই : বিশ্বম্ভর বাহ্য পেয়ে লজ্জা প্রকাশ করলেন চাঞ্চল্য প্রকাশের জন্য। কিন্তু নিত্যানন্দের আবেশ তখনও দূর হয় নি।

সংবরণ নহে নিত্যানন্দের আবেশ।
প্রেম-রসে বিহ্বল হইয়া প্রভু শেষ ॥
ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে দিগম্বর।
বাল্য-ভাবে পূর্ণ হৈল সর্ব-কলেবর ॥
কোথা বা থাকিল দণ্ড, কোথা কমণ্ডলু।
কোথা বা বসন গেল, নাহি আদি মূল ॥
চঞ্চল হইলা নিত্যানন্দ মহা ধীর।
আপনে ধরিয়া প্রভু করিলেন স্থির ॥ [তদেব : পৃ. ১২৩]

স্বয়ং বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দের আবেশ ভাব ছিন্ন করলেন। এই ভাবকে তিনি নিজে চাঞ্চল্য ব'লেই মনে করতেন। বহুবার নিজে এই চাঞ্চল্য প্রকাশের জন্য লজ্জিত হয়েছেন, এ ধরনের চাঞ্চল্য তাঁর মধ্যে দেখা দিলে নিত্যানন্দ যেন তাঁকে স্থির করেন এ অনুরোধও করেছিলেন তিনি—

ক্ষণেকেই বাহ্যদৃষ্টি দিয়া, বিশ্বম্ভর।
হাসিয়া অদ্বৈত-প্রতি বোলয়ে উত্তর ॥
"কিছু না চাঞ্চল্য মুঞি করিয়াছি পিছু ?"
অদ্বৈত বোলয়ে "উপাধিক নহে কিছু ॥"
প্রভু বোলে "শুন নিত্যানন্দ মহাশয়।
রক্ষিবা—চাঞ্চল্য যদি মোর কিছু হয় ॥" [তদেব : পৃ. ২০০]

চৈতন্যচরিতামৃতও আবেশের কথা বলেছেন। বৃন্দাবনদাসের ন্যায় কৃষ্ণদাসও মুরারির গৃহে বরাহ-আবেশের কথা বলেছেন, তবে বৃন্দাবনদাসের ন্যায় বরাহ সত্যকার বরাহরূপ ধারণ করেছিলেন এমন কথা বলেন নি কৃষ্ণদাস—বরং পরোক্ষে নিছক আবেশের কথাই বলেছেন—

বরাহ-আবেশ হৈলা মুরারি-ভবনে।
তার স্কন্ধে চড়ি প্রভু নাচিলা অঙ্গনে ॥ [চৈ. চ. : পৃ. ৮৩]

চতুষ্পদ বরাহ নিশ্চয়ই মুরারির স্কন্ধে চড়ে নৃত্য করেন নি।

শ্রীবাসের ঘরে গিয়ে একদিন বিশ্বম্ভর তাঁকে 'বৃহৎ সহস্র নাম' পড়তে বললেন— 'পড়িতে আইল স্তবে নৃসিংহের নাম'। নাম শুনেই আবেশ হলো 'গৌররায়'-এর—

নৃসিংহ-আবেশে প্রভু হাতে গদা লৈয়া।
পাষণ্ডী মারিতে যায় নগরে ধাইয়া ॥

নৃসিংহ-আবেশে দেখি মহাতেজোময়।
পথ ছাড়ি ভাগে লোক পাঞা মহাভয় ॥
লোকভয় দেখি প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল।
শ্রীবাসের গৃহে যাঞা গদা ফেলাইল ॥
শ্রীবাসেরে কহে প্রভু করিয়া বিষাদ।
লোক ভয় পাইল মোর হৈল অপরাধ। [তদেব : পৃ. ৮৭]

গদা হাতে পথ-পরিক্রমায় সাধারণ মানুষ ভীত হওয়ায় লজ্জিত হয়েছিলেন বিশ্বম্ভর। সুতরাং কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে আবেশকে দৈহিক রূপান্তর ব'লে মনে করেন নি, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

শিবের গায়নের মুখে শিব-প্রশস্তি শুনে বিশ্বম্ভরের মহেশ আবেশের কথাও চৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়। ধর্ম-চেতনা মনে সবিশেষ জাগ্রত হওয়ায় বৈষ্ণবী ভাব-জগতের বাইরের দেবতাদের আবেশও দেখা দিত বিশ্বম্ভরের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই।

বিশ্বম্ভর নিজেই তাঁর আবেশকে 'চাঞ্চল্য' ব'লে মনে করতেন। আবেশ এবং আর্তিতে তখনও তাঁর চিত্ত উদ্বেল। নদীর মতোই চঞ্চল গতিতে তা প্রবহমান। সমুদ্রের সন্ধান তখনও লাভ করে নি বিশ্বম্ভর-চিত্ত। 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-তে রূপান্তরের জন্য তা অপেক্ষা করছিল। লক্ষ্যকে আয়ত্ত করার জন্য তখনও তিনি চঞ্চল; তিনি লক্ষ্যে স্থির হয়েছিলেন 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' হবার পর—তার পর থেকেই তাঁর আবেশ-ভাব প্রায় তিরোহিত হয়ে যায়। ড. বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান' গ্রন্থে বলেছেন, "সন্ন্যাস-গ্রহণের পর শ্রীচৈতন্য কখনও বিষ্ণুর সিংহাসনে বসেন নাই, নিজেকে ভগবান বলেন নাই। এমন কি কেহ তাহাকে 'সচল জগন্নাথ' বলিলে তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন" (পৃ. ৫৯৩)।

নানা সময়ে ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়তেন বিশ্বম্ভর। তাঁরই প্রেরণায় কীর্তন আরম্ভ হলো নদীয়া নগরে—'এবে সে কীর্তন হৈল নদীয়া নগরে'। নবদ্বীপের মানুষরা বিশেষ ক'রে বৈষ্ণবভক্তরা মনে করলেন—

হেন উদ্ধতের যদি হেন ভক্তি হয়।
না বুঝি কৃষ্ণের ইচ্ছা এ বা কিবা হয় ॥" [চৈ. ভা. : পৃ. ১০৪]

লোচনদাস বলেছেন যে, এ সময় থেকেই বিশ্বম্ভরের মনে আকুল আর্তি দেখা দিল—কৃষ্ণ-বিরহ-বেদনায় তিনি আকুল হয়ে উঠলেন—

একদিন নিজগৃহে আছয়ে শুইয়া।
কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে কান্দে বিহ্বল হইয়া ॥
রাধাভাবে ব্যাকুল হইয়া প্রভু ডাকে।
মাথুর-বিরহে হাথ মারে নিজবুকে ॥ [চৈ. ম. : পৃ. ৯২]

লোচনদাসের বর্ণনায় বৃন্দাবনী-তত্ত্বের স্পর্শ থাকলেও সেই আর্তির পরিচয় পাওয়া যায় যা থেকে বিভিন্ন প্রকার আবেশ জন্মেছিল।

বৃন্দাবনদাসও এই আর্তির পরিচয় দিয়েছেন : গদাধরকে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন—

কোথা কৃষ্ণ আছেন শ্যামল পীতবাসা ॥
সে আর্তি দেখিতে সর্ব-হৃদয় বিদরে। [চৈ. ভা. : পৃ. ১১০]

নবদ্বীপের মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল : কীর্তন প্রচারে অধিকাংশই উল্লসিত, কিন্তু পাষণ্ডীদেরও অভাব ছিল না। তারা বিশেষ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো ; উচ্চ কীর্তন ধ্বনি নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটায় তাদের—মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকলে কি ক্ষতি হয়, তা তাদের বোধগম্য হয় না। পাষণ্ডীদের একজন ভরসা দিলেন—

আজি মুঞি দেয়ানে শুনিলুঁ সব কথা।
রাজার আজ্ঞায় দুই নাও আইসে এথা ॥
শুনিলে নদীয়ার কীর্তন বিশেষ।
ধরিয়া নিবারে হৈল রাজার আদেশ ॥ [তদেব : পৃ. ১১১]

রাজার লোকজন বৈষ্ণবদের ধরতে আসছে শুনে ভীত হলেন বৈষ্ণবরা। সহজ সরল মানুষ শ্রীবাস—সকলের কথাতেই তাঁর বিশ্বাস। তাই তিনিও বিশেষ ভীত হলেন।

কিন্তু বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব কোন কিছুকেই ভয় পায় না ; বিশ্বম্ভরের অন্তরে কোন ভয় নেই। তিনি নিঃশঙ্ক চিত্তে নগরে নগরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। 'নির্ভয়ে বেড়ায় মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর'। এ ভাবেই তিনি বৈষ্ণবদের অন্তরের শঙ্কা দূর করতে চাইলেন। তাঁর বীর্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠুক বৈষ্ণবকুল। তিনি জানতেন যে, নবদ্বীপে শ্রীবাসের গৃহ-ই পাষণ্ডীদের বিশেষ লক্ষ্যস্থল, তাই তাঁকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। ভ্রমণ করতে করতে ভাগীরথীর তীর থেকে দ্রুত গতিতে গেলেন শ্রীবাসের গৃহে ভাবে আবিষ্ট হয়ে। সে ভাব দেখে সচকিত হলেন শ্রীবাস ; তিনি বুঝতে পারলেন যে, ভয় জিনিসটা বাইরের—ভাবে সমাহিত হতে পারলে ভয় দূর হয়ে যায়—

প্রভুরে দেখিয়া প্রেমে কাঁদে শ্রীনিবাস।
ঘুচিল অন্তর-ভয় পাইয়া আশ্বাস ॥ [তদেব : পৃ. ১১২]

এই সময় বিশ্বম্ভর নিজেকে ভগবান ব'লে ঘোষণা করতেন। ঔদ্ধত্য প্রকাশ ক'রে বলতেন যে, তিনি হস্তী-অশ্ব-মৃগ এমন কি যবন রাজাকেও 'কৃষ্ণ' বলাবেন। নিজেকে ভগবান ব'লে ঘোষণা করলেও তাঁর মনে সন্দেহ ছিল যে, শ্রীবাস তাঁর কথায় বিশ্বাস না-ও করতে পারেন : তাই তিনি বললেন—

ইহাতে বা অপ্রত্যয় তুমি বাস মনে।
সাক্ষাতেই করো দেখ আপন নয়নে ॥ [তদেব : পৃ. ১১৩]

শ্রীবাস-ভ্রাতুস্সুতা চার বৎসরের নারায়ণীকে 'কৃষ্ণ' বলে কাঁদতে বললেন তিনি : শিশু নারায়ণী "হা কৃষ্ণ!" বলিয়া 'কান্দে, নাহিক সংবিত' (তদেব)। প্রায় এক বৎসর কীর্তনে মাতোয়ারা হয়ে রইলো নবদ্বীপ।

হরিদাস এসেছেন নবদ্বীপে—এবার এলেন নিত্যানন্দ। নিমাই পণ্ডিতের নিকট পরাজয় স্বীকার ক'রে ফিরে গেছেন দিগ্বিজয়ী। বিশ্বম্ভরের সঙ্গে নিভৃতে আলাপ

ক'রে পর্যটনে বেরিয়ে পড়েছেন ঈশ্বরপুরী—নবদ্বীপের কীর্তন-রঙ্গের কথা ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন অঞ্চলে। তাই সম্ভব হলো নিত্যানন্দের আগমন।

বিশ্বম্ভর স্বপ্নে জেনেছেন নিত্যানন্দের আগমন সংবাদ : বর্তমান যুগের প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ ইয়ুং মনে করেন যে, মানুষ ভবিষ্যৎকেও তাঁর স্বপ্নের ভিতর দিয়ে দেখে থাকে। বিশ্বম্ভরের ভবিষ্যৎ জীবনে নিত্যানন্দের একটা বড় স্থান ছিল; বিরাট এক বৈষ্ণব-আন্দোলন সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষাও ছিল তাঁর। তাই কেবল নিত্যানন্দ নয়, ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু বৈষ্ণব প্রধান এলেন নবদ্বীপে এবং পরবর্তী কালে আরও অনেকে আসেন নীলাচলে। নিত্যানন্দ নিজেই বলেছেন—

নদীয়ায় শুনি বড় হরি-সংকীর্তন।
কেহো বোলে তথায় জন্মিলা নারায়ণ ॥ [তদেব : পৃ. ১২১]

নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভরে নন্দন আচার্যের গৃহে মিলন হলো। দুজনেই বাক্যহারা—ধারা প্রবাহিত হলো দু'জনের নয়নে।

কেবল নিত্যানন্দই নন। শ্রীহট্ট থেকে এলেন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি এবং আরও অনেকে। বিভিন্ন স্থান থেকে প্রধান প্রধান বৈষ্ণবরা এলেন : জয়ানন্দ বলেছেন—

গৌরচন্দ্র, নিত্যানন্দ অদ্বৈত সমীপে।
মহান্তে তিলার্ধ স্থান নাই নবদ্বীপে ॥
গৌড় বঙ্গ তেলঙ্গ মগধ উৎকল।
নানাদেশের পারিষদ পুরিল সকল ॥ [জয়ানন্দ : চৈ. ম. : পৃ. ৭৬]

লোচনদাসও অনেক ভক্ত প্রধানের নাম উল্লেখ করে বলেছেন—

অনেক মিলিলা সে গৌরাঙ্গ-অনুচর।
নামক্রমে লিখন না হয় তা-সভার ॥
... ...
নানাদেশে যতেক আছিলা ভক্তগণ।
সভেই মিলিলা আসি প্রভুর চরণ ॥ [চৈ. ম. : পৃ. ৯৪]

প্রধান নেতা হয়েও বিশ্বম্ভর সম্ভবত যুগ্ম নেতৃত্বের কথা ভেবেছিলেন : ধর্মরক্ষা, ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যের প্রতিষ্ঠা—'সবার উপরে মানুষ সত্য' এই বোধ জাগিয়ে তোলা এবং দুষ্টের দমনের জন্য শক্তি সংহত করার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। রীতি-পদ্ধতি-অনুষ্ঠানকে অস্বীকার করলেন শ্রীচৈতন্যের নেতৃত্বাধীন এই বৈষ্ণবরা; দৃঢ়চিত্তে ঘোষণা করা হলো—

সহজ জীবেরে যে অধম পীড়া করে ॥
বিষ্ণু পুজিয়াও যে প্রজার দ্রোহ করে।
পুজাও নিষ্ফল হয়, আরো দুঃখে মরে ॥
'সর্বভূতে আছেন শ্রীবিষ্ণু' না জানিয়া।
বিষ্ণুপুজা করে অতি প্রাকৃত হইয়া ॥
... ...
এ সব লোকের কি কুশল কোন ক্ষণে।
হইয়াছে হইবেক-বুঝ ভাবি মনে ॥ [চৈ. ভা. : পৃ. ২১৬]

নিত্যানন্দকে দিয়ে ব্যাস পূজো করালেন। পূজোর মালা গৌরাঙ্গের গলায়ঃ নিত্যানন্দের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে বৈষ্ণব সমাজের প্রথম সারিতে এগিয়ে দিলেন গৌরসুন্দর।

অদ্বৈত আচার্যকে সংবাদ পাঠালেন গৌরসুন্দর। তিনি এলেন,।নন্দন আচার্যের গৃহে—সেখান থেকে নিয়ে আসা হলো তাঁকে। এবার কর্মক্ষেত্রে নামবার সময় হলো, নেতৃত্ব গ্রহণের উদ্যোগ করলেন বিশ্বম্ভর। এতাবৎ অদ্বৈতই ছিলেন বৈষ্ণব সমাজের নেতা। নিজস্কন্ধে নেতৃত্বের দায়িত্ব নেবার জন্য তাই আচার্যকে আদেশ দিলেন বিশ্বম্ভর—'আমার পূজার কর ধার্য" (তদেবঃ পৃ. ১৩০)। গৌরাঙ্গের আজ্ঞা পেয়ে অদ্বৈত আচার্য 'চৈতন্যচরণ পূজে অশেষবিশেষে।' ষোড়শোপচারে চৈতন্যচরণ বন্দনা করলেন আচার্য; আরতি হলো—মাল্যচন্দন-বস্ত্রাদি দানও হলো যথারীতি। পূজা অন্তে চৈতন্যদেব 'চরণ তুলিয়া দিলা অদ্বৈত মাথায়' (তদেব)। কিন্তু আচার্যও তো অন্যতম প্রধান। তাই তিনি নিজের গলার মালা অদ্বৈতের গলায় পরিয়ে হেসে বললেন, 'বর মাগো, বর মাগো।' শ্রীচৈতন্যের আদর্শের কথা স্মরণে রেখেই আচার্যদের বর প্রার্থনা করলেন—

অদ্বৈত বোলেন "যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রী-শূদ্র আদি যত মূর্খেরে সে দিবা॥
... ...
চণ্ডাল নাচুক তোর নাম গুণ-গায়্যা॥" [তদেবঃ পৃ. ১৩১]

বৎসর খানেক 'কৃষ্ণ কোলাহল' ক'রে বৈষ্ণবদের উৎসাহিত করলেন বিশ্বম্ভর। নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ, দৃঢ়বন্ধ ঐক্য স্থাপিত না হলে প্রেম-ধর্মের প্রচার সম্ভব হবে না তা তিনি বুঝেছিলেন। সেকালে প্রেমধর্ম প্রচার ব্যতীত সামাজিক সমতা আনা যাবে না তা-ও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন; লক্ষ্য স্থির ক'রেই তিনি পৃথক পৃথক ভাবে সকলের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করেন 'নিরন্তর সভার মন্দিরে প্রভু যায়' (তদেবঃ পৃ. ১৩৮) সেই সঙ্গে সকল অন্তরঙ্গকে একত্র করার ব্যবস্থাও হলো—

প্রভু বোলে "ভাই সব! শুন মন্ত্র সার।
রাত্রি কেনে মিথ্যা যায় আমা সভাকার॥
আজি হৈতে নির্বন্ধিত করহ সকল।
নিশায় করিব সভে কীর্তন-মঙ্গল॥ [তদেবঃ পৃ. ১৩৯]

আরম্ভ হলো একত্র সঙ্কীর্তন—বাইরের লোকের প্রবেশ সেখানে ছিল নিষিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠলো বিশ্বমানব-প্রেমে বিশ্বাসী, সামাজিক ঐক্য সাধনে ব্যগ্র এক বিশেষ বৈষ্ণব গোষ্ঠী—

অনন্ত চৈতন্য-ভৃত্য—নাম জানি কত॥
সঙ্গেই প্রভুর নৃত্যে থাকেন সংহতি।
পারিষদ বই আর কেহো নাহি তথি॥
প্রভুর হুঙ্কার আর নিশা-হরি-ধ্বনি।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেনমত শুনি॥ [তদেব]

এই ব্রহ্মাণ্ড ভেদী উচ্চ সঙ্কীর্তন-ধ্বনি যেন প্রেম-ভক্তিতে অবিশ্বাসী পাষণ্ডীদের, এমন

কি বিরোধী রাজশক্তিকেও দ্বন্দ্বে আহ্বান জানায়। সেই সঙ্গে বৈষ্ণবদের সাধন-ভজনকেও ক'রে তুললো সহজ-সরল। প্রেম-ভক্তির অনুগামী হবার জন্য, সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় বৈষ্ণবদের কোন আচার বা অনুষ্ঠান মেনে চলার প্রয়োজন নেই : কেবল নামকীর্তনই যথেষ্ট। সকল চৈতন্য জীবনীকারই চৈতন্যদেবের কথাটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥" [চৈ. চ. : পৃ. ৩১]

লোচনদাস বলেছেন যে, চৈতন্যদেব নিজে নগর-সংকীর্তনে বের হবার সিদ্ধান্ত ক'রে ভক্তদের বললেন—

হরিনামসংকীর্তন কলিযুগধর্ম ।
নামগুণ-সংকীর্তনে সাধিব সব-কর্ম ॥
আনহ যেখানে যেই আছে বন্ধুজন ।
মিলিয়া সকল লোক কর সংকীর্তন ॥ [চৈ. ম. : পৃ. ১১৮]

এই সময় অন্তরের গভীর আর্তি নানা আবেশের মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছিল—

অচিন্ত্য আবেশ সেই—বুঝন না যায় ।
যখন যে হয়—সেই অপূর্ব দেখায় ॥ [চৈ. ভা. : পৃ. ১৩৯]

অপূর্বসুন্দর চৈতন্য দেহে গভীর আর্তির বহিঃপ্রকাশ অপূর্ব দেখাবারই কথা !

শ্রীবাসের গৃহে দরজায় কপাট লাগিয়ে ভক্তরা সংকীর্তন করতেন—বাইরের কারও প্রবেশাধিকার ছিল না। কোন ভক্তের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনও সেখানে প্রবেশ করতে পারতেন না। চৈতন্যদেবের আদেশ ছিল সুকঠিন। বর্তমান কালের দৃঢ়বদ্ধ রাজনৈতিক দলেও সম্ভবত এত কঠিন নিয়ম পালন করা হয় না। নবদ্বীপের বহু মানুষ চৈতন্যের নৃত্য দেখার আগ্রহ নিয়ে দ্বারের বাইরে অপেক্ষা ক'রে থাকতো হতাশচিত্তে—

প্রভুর আজ্ঞায় দৃঢ় লাগিয়াছে দ্বার ।
প্রবেশিতে নারে লোক নব নদীয়ার ॥
... ...
সহস্র সহস্র লোক কলরব করে ।
"কীর্তন দেখিব—ঝাট ঘুচাহ দুয়ারে" । [তদেব : পৃ. ১৪২]

কীর্তনের শব্দে পাষণ্ডীরা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতো—তাদের ধারণা ছিল যে, যবন-রাজ এই 'হিন্দুয়ানী'র জবাব দিতে গ্রাম ধ্বংস করবে—'যবনে গ্রাম করিবে কবল'।

[তদেব : পৃ. ১৪৪]

নবদ্বীপের সাধারণ মানুষ সংকীর্তনে উপস্থিত থাকতে চাইতেন। তাঁরা মনে করতেন যে, পাষণ্ডীদের প্রবেশরোধ করতেই দ্বার বন্ধ ক'রে কীর্তনের ব্যবস্থা করেছেন চৈতন্যদেব : সুতরাং পাষণ্ডীদের ওপর তাঁরা সবিশেষ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। ফলে, নবদ্বীপের মানুষ দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল—অধিকাংশই পৃষ্ঠপোষক হলেন বৈষ্ণবদের।

বৎসরেক বৈষ্ণব ভক্তদের নিয়ে কীর্তন করার পর পরিপূর্ণরূপে বৈষ্ণব-সমাজের কর্তৃত্ব গ্রহণ করলেন চৈতন্যদেব। এর পূর্বে অদ্বৈত আচার্যকে দিয়ে তিনি নিজের পূজো করিয়েছেন—এবার বৈষ্ণবদের আদেশ দিলেন তাঁর অভিষেক করতে। অভিষেকের পর পূজা করা হলো চৈতন্যদেবের—

পূজার সামগ্রী লই সর্ব-ভক্তগণ।
পূজিতে লাগিলা নিজ প্রভুর চরণ ॥ [তদেব : পৃ. ১৪৬]

চৈতন্যদেবের আহারের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল : সকলে মিলেই যে আহার করেছিলেন তা অবশ্যই উপলব্ধি করা যায় বৃন্দাবনদাসের লেখা থেকে। চৈতন্যদেব যে প্রচুর আহার করতে পারতেন তার পরিচয় অবশ্যই অনেক স্থলেই পাওয়া গেছে। চৈতন্যচরিতামৃতও নীলাচলে আহার্যের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকেও একই তথ্য জানা যায়। চৈতন্যদেব নিজেও আহার্যের বন্দোবস্ত নিয়ে যথেষ্ট পরিহাস করেছেন। এ থেকেও তাঁর দৈহিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় ; তিনি কেবলমাত্র একজন নৃত্যরত ভাবালু প্রকৃতির মানুষ ছিলেন না।

দরিদ্র তথাকথিত অস্পৃশ্য শ্রীধরের সঙ্গে ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রীতির সম্পর্ক ; থোড়-মোচা বিক্রী ক'রে কৃষ্ণের সেবা ক'রে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাঁর থোড়-মোচা কাড়াকাড়ি ক'রে অর্ধ মূল্যেও কিনে নিতেন অনেক সময়। পণ্ডিতপ্রবর নিমাইয়ের সঙ্গে এই দরিদ্র ভক্তের ছিল পরিহাসের সম্পর্ক : তাঁর ফুটো লৌহ পাত্রে তিনি জল পান করতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নি। যবন হরিদাসকেও তিনি বলেছেন—

"এই মোর দেহ হৈতে তুমি মোর বড়।
তোমার যে জাতি, সেই জাতি মোর দঢ় ॥ [তদেব : পৃ. ১৫৩]

জাত-পাতের বিরোধিতা তিনি করেছেন নিজের জীবন দিয়ে—যা নিজে প্রচার করেছেন তা আচরণ করেছেন নিজের জীবনে।

বাল্যভাবে অনেক সময়েই দিগম্বর হয়ে থাকতেন নিত্যানন্দ—চৈতন্যদেব তাঁর প্রতিও যথেষ্ট যত্ন নিতেন, একান্ত প্রীতিতে তাঁকে অনেক সময়েই বসন পরিয়ে দিতেন। একদিন নিত্যানন্দের কৌপীন ছোট ছোট খণ্ডে ভাগ ক'রে ভক্তদের মস্তকে ধারণ করতে বললেন চৈতন্যদেব—নিত্যানন্দের পাদোদক পান করতেও বললেন সকলকে। কৌশলে নিত্যানন্দকে বৈষ্ণব-সমাজের নেতৃত্বের দ্বিতীয় স্থানে প্রতিষ্ঠিত করলেন তিনি।

দক্ষ সেনাপতির ন্যায় সকল দিকের প্রস্তুতি সমাপন ক'রে প্রচারে বের হবার আদেশ দিলেন নিত্যানন্দ-হরিদাসকে। প্রচারের সৈনাপত্য পেলেন ব্রাহ্মণ অবধূত এবং যবন হরিদাস। সেকালে এ ব্যবস্থা ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সমাজে তখনও ছিল ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য। তাই চৈতন্যদেব বেছে নিলেন নিত্যানন্দকে। কিন্তু নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ হলেও অবধূত—জাত-পাতের কোন বিচার ছিল না তাঁর। সে কালের হিন্দু সমাজে তাই ব্রাহ্মণ অথচ অবধূতকে প্রচারে নিযুক্ত করা কৌশলের পরিচায়ক। তাঁর সঙ্গে দেওয়া হলো যবন হরিদাসকে : সে সময় রাঢ়-গৌড়-বঙ্গ ছিল যবন রাজার অধীনে—প্রচারে হরিদাসকে নিযুক্ত ক'রে চৈতন্যদেব বোঝাতে চাইলেন যে, বৈষ্ণবের কাছে হিন্দু মুসলমানে কোন ভেদ নেই। উভয়েই প্রেমধর্মে স্বচ্ছন্দে দীক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

এই প্রচারের ফলে উদ্ধার পেল নবদ্বীপের সর্বাপেক্ষা দুর্ধর্ষ ব্রাহ্মণ-দস্যু জগাই-মাধাই। কেবল উদ্ধার করাই নয়। নাম জপ এবং সেবার কাজেও তাদের নিযুক্ত করা হলো—'অলস মস্তিষ্ক যাতে শয়তানের কারখানা' হয়ে উঠতে না পারে সেদিকেও দৃষ্টি ছিল দূরদৃষ্টি সম্পন্ন চৈতন্যদেবের।

শিশুর চাপল্য-কোমলতার সঙ্গে বজ্রের কাঠিন্য মিশেছিল তাঁর চরিত্রে। বৈষ্ণবের প্রেম-ভক্তি প্রচারের কালেও পরিণত নেতার গাম্ভীর্য সত্ত্বেও গঙ্গা স্নানে গিয়ে শিশুকালের ন্যায়ই তিনি 'জল ফেলাফেলি' করতেন—

জল দেয় প্রভু সর্ব বৈষ্ণবের গায়।
কেহ নাহি পারে সভে হারিয়া পলায় ॥
জলযুদ্ধ করে প্রভু যার তার সঙ্গে।
কতক্ষণ যুদ্ধ করি সভে দেয় ভঙ্গে ॥ [তদেব : পৃ. ১৭৪]

বজ্রের কাঠিন্যও প্রকাশ পেয়েছে বহু স্থানে। শ্রীবাসের গৃহে দ্বার বন্ধ ক'রে নৃত্য করার সময় ভেতরে গোপনে বসে থেকে শ্রীবাসের শাশুড়ী অথবা নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণরাও রেহাই পান নি—সকলকেই বের ক'রে দেওয়া হয়েছে ঘর থেকে। শিখি মাহিতীর ভগ্নী মাধবীদেবীর নিকটে গিয়ে তণ্ডুল নিয়ে আসার জন্য ছোট হরিদাসকে বর্জন করেছিলেন তিনি—

প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন ॥ [চৈ. চ. : পৃ. ৪৪২]

গৌড় থেকে সুগন্ধি চন্দন তেল এনেছিলেন জগদানন্দ চৈতন্যদেবের জন্য। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন, জগদানন্দকে বলেন—

আমি ত সন্ন্যাসী তৈল না পারি লইতে ॥
জগন্নাথে দেহ লঞা দীপ যেন জ্বলে। [তদেব : পৃ. ৫৫৮]

জগদানন্দ পণ্ডিতকে বিশেষ স্নেহ করতেন চৈতন্যদেব। কিন্তু তা সত্ত্বেও কঠোর চিত্তে তিনি তৈল গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। আচার-অনুষ্ঠানে বিশ্বাসী না হয়েও তিনি লোক শিক্ষার জন্য সামাজিক ব্যবহারাদিকে সহজে অমান্য করতেন না। পরমানন্দ পুরীর মুখে শোনা গেছে—

লোকহিত লাগি তোমার সব ব্যবহার।
আমি সব না জানি গম্ভীর হৃদয় তোমার ॥ [তদেব : পৃ. ৪৪৩]

চৈতন্যদেব ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী। প্রচারের কার্য আরম্ভের পরেও, শ্রীবাসের ঘরে সংকীর্তনে মাতোয়ারা হয়েও এবং নানা সময়ে ভাবের আবেশে নিজেকে ভগবান ব'লে ঘোষণা সত্ত্বেও তিনি বৈষ্ণবদের পদধূলি গ্রহণ করতে ছাড়তেন না। যাঁকে অভিষেক ক'রে নেতারূপে বরণ ক'রে নিয়েছিলেন বৈষ্ণব সমাজ, তিনি কখনও দুর্বিনীত হন নি : কঠিন হয়েছেন, কিন্তু তা লক্ষ্য স্থির রেখে কর্তব্য পালনের জন্যই—

বাহ্য হৈল বিশ্বম্ভর সর্ববৈষ্ণবেরে।
মহাভক্তি করেন, বিশেষ অদ্বৈতেরে ॥ [চৈ. ভা. : পৃ. ১৯৫]

তাঁর চরণ ধূলি চৈতন্যদেব গ্রহণ করেন ব'লে অদ্বৈত খুবই অস্বস্তি অনুভব করতেন—

নিরবধি চোরা মোরে বিড়ম্বনা করে।
প্রভুতা ছাড়িয়া মোর চরণেতে ধরে ॥
বলে নাহি পারো মঞি প্রভু মহাবলী।
ধরিয়াও লয় মোর চরণের ধূলি ॥ [তদেব]

চৈতন্যদেব চরণ-ধূলি গ্রহণ করেন ব'লে অদ্বৈত-আচার্য অত্যন্ত দুঃখ পেতেন তাই তিনি চৈতন্যদেবকে ক্রুদ্ধ করবার জন্য মতলব আঁটলেন। প্রেম-ভক্তির কথা শুনো বিলীন ক'রে দিয়ে তিনি জ্ঞানমার্গের প্রাধান্য প্রদর্শন করতে লাগলেন। চৈতন্যকে ক্রুদ্ধ ক'রে তোলার এটাই শ্রেষ্ঠ উপায় ব'লে তিনি মনে করেছিলেন—তিনি পড়ুয়াদের শোনাতে লাগলেন—

"জ্ঞান বিনে কিবা শক্তি ধরে বিষ্ণুভক্তি।
অতএব সভার 'প্রাণ জ্ঞান' সর্বশক্তি ॥
... — —
'বিষ্ণু ভক্তি' দর্পণ লোচন হয় 'জ্ঞান'।
চক্ষুহীন জনের দর্পণে কোন্ কাম ? [তদেব]

জাহ্নবীর তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে নিত্যানন্দকে নিয়ে শ্রীচৈতন্য এলেন অদ্বৈত-গৃহে। আচার্যকে প্রশ্ন করলে তিনি জ্ঞানমার্গের প্রাধান্যের কথা বললেন দৃঢ়তার সঙ্গে ঃ তখন—

পিঁড়া হৈতে অদ্বৈতেরে ধরিয়া আনিয়া।
স্বহস্তে কিলায় প্রভু উঠানে পাড়িয়া ॥ [তদেব ঃ পৃ. ১৯৮]

ক্রোধ উপশম হলে—"অদ্বৈতেরে মারিয়া লজ্জিত বিশ্বম্ভর" [তদেব ঃ পৃ. ১৯৯]। চৈতন্যচরিতামৃতেও এ তথ্য আছে—

আচার্য-গোসাঞিরে প্রভু করে গুরুভক্তি।
তাহাতে আচার্য বড় হয় দুঃখ মতি ॥
ভঙ্গী করি জ্ঞানমার্গ করিল ব্যাখ্যান।
ক্রোধাবেশে প্রভু তারে কৈল অবজ্ঞান ॥
তবে আচার্যের মনে আনন্দ হইল।
লজ্জিত হইয়া প্রভু প্রসাদ করিল ॥ [চৈ. চ. ঃ পৃ. ৮৬]

অদ্বৈতের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে উপযুক্ত নেতার ন্যায়ই তিনি ঘোষণা করলেন যে, ভক্তদের অতিক্রম ক'রে তাঁর পূজা করলে তিনি তা গ্রহণ করবেন না।

বৃন্দাবনদাস বলেছেন, অদ্বৈতকে প্রহার ক'রে লজ্জিত হয়েছিলেন বিশ্বম্ভর। 'তিন প্রভু'ই পরস্পরের মনের কথা বুঝলেন। সকলে মিলে গঙ্গা স্নান ক'রে এসে ভোজনে বসলেন। লোকাচারকে তখনও অস্বীকার করেন নি বিশ্বম্ভর ঃ তিন ব্রাহ্মণ গৃহের ভিতরে ভোজনে বসলেও 'দ্বারে বসি ভোজন করয়ে হরিদাস।' (চৈ. ভা. ঃ পৃ. ২০১)। প্রচারের স্বার্থে এই সামাজিক আচার তিনি স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন।

শচীমাতার বৈষ্ণব-অপরাধ ছিল, তাই তাঁর প্রেম ভক্তি পাবার অধিকারও ছিল না। চৈতন্যদেবের মুখে একথা শুনে 'মহাবক্তা' শ্রীবাস বলেছিলেন—

তুমি-হেন পুত্র যার গর্ভে অবতার।
তাঁর কি নহিব প্রেমযোগে অধিকার।। [তদেব : পৃ. ২০৯]
... ...
যদি বা বৈষ্ণবস্থানে থাকে অপরাধ।
তথাপিহ খণ্ডাইয়া করহ প্রসাদ।।" [তদেব : পৃ. ২১০]

বিশ্বম্ভর জানালেন যে, অদ্বৈতের 'স্থানেতে আছে তার অপরাধ': তাঁর চরণ ধূলি গ্রহণ করলে শচী মাতার দোষ খণ্ডিত হবে এবং 'হইবেক প্রেমভক্তি'। শুনে অদ্বৈত শিউরে উঠবেন এবং বাহ্য হারিয়ে ফেললেন, সেই অবকাশে শচীমাতা "আচার্য-চরণ-ধূলি লইলেন শিরে।" [তদেব]। অদ্বৈতের নিত্য সহচর বিশ্বরূপ সন্ন্যাস নিয়ে চলে গেলেন, বিশ্বম্ভরও ভক্ত হয়ে উঠলেন অদ্বৈতের। শঙ্কিত মাতা পরম দুঃখেই তাই বলেছিলেন, 'কে বোলে 'অদ্বৈত—'দ্বৈত'-এ বড় গোসাঞি।' (তদেব : পৃ. ২১২)। মাতার উদাহরণ দিয়ে চৈতন্যদেব বুঝিয়ে দিলেন যে, অপরাধ করলে তার প্রায়শ্চিত্ত করা চাই—সেখানে ছোট বড় কোন ভেদ নেই।

নদীয়ার মানুষজন আকৃষ্ট হলেন চৈতন্যদেবের প্রেমভক্তি প্রচারে, তাঁর ভাবাবেশের কথা শুনে এবং জগাই-মাধাইয়ের ন্যায় দস্যুদের পরিবর্তন দেখে। চৈতন্যের শক্তিতে তাঁরা হলেন আস্থাবান। ঠিক এই সময় নবাবের মাতুল চাঁদ কাজীর সংগে বিরোধ বাঁধল তাঁর: কাজী তাঁর সহকারীদের নিয়ে এসে ভাঙলেন মৃদঙ্গ, অনাচার করলেন এবং জাতি নেবেন ব'লে শাসিয়ে গেলেন। ভারতবর্ষে রাজশক্তি সেদিন প্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলনের দৃঢ় রূপ দেখতে পেল। উপলব্ধি করলো প্রতিবাদ মিছিলের শক্তি: আন্দোলনের ক্ষেত্রে সেই প্রথম 'মশাল মিছিল': এত শৃঙ্খলাবদ্ধ মিছিল বোধ হয় ভারতবর্ষ পরবর্তী কালেও আর কখনও দেখে নি। সেই প্রেম-ভক্তির প্রাণ বন্যায় সমুদ্র-তরঙ্গের আঘাতে পর্যুদস্ত হয়ে গিয়েছিল রাজশক্তি। কাজী মাথা নত ক'রে মেনে নিয়েছিলেন 'হিন্দুয়ানী'র অধিকার। প্রজার ধর্মের ওপর হস্তক্ষেপ প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে স্তব্ধ হলো। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন—

এত শুনি কাজীর দুই চক্ষে পড়ে পানী।।
প্রভুর চরণ ছুঁই কহে প্রিয়বাণী।।
তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুমতি।
এই কৃপা কর যে তোমাতে রহু ভক্তি।।
প্রভু কহে এক দান মাগিয়ে তোমার।
সঙ্কীর্তন বাদ যৈছে না হয় নদীয়ায়।।
কাজী কহে মোর বংশে যত উপজিবে।
তাহাকে তালাক দিব কীর্তন না বাধিবে।।
শুনি প্রভু হরি বলি উঠিলা আপনি।
উঠিলা বৈষ্ণব সব করি হরি ধ্বনি।। [চৈ. চ. : পৃ. ৯৪-৯৫]

চৈতন্যদেবের নেতৃত্বে সর্বত্রই বৈষ্ণবদের জয় হলো। কেবল সামাজিক দুষ্কৃতকারীদেরই দমন করা হলো তাই নয়, রাজকীয় অপরাধও প্রতিরোধ করা গেল।

কাজী দমনের পর থেকে বিশ্বম্ভরের মানসিক অবস্থা একটা নূতন মোড় নিল।

হরিনাম শুনলেই তিনি বাহ্য হারাতেন—অশ্রু-কম্প-পুলক সঞ্চারিত হতো তাঁর দেহে। আবেশে কখনও নিজেকে কৃষ্ণ বলেন, কখনও কৃষ্ণকে চোর ব'লে সম্বোধন করেন—

"কোথাকার কৃষ্ণ তোর মহাদস্যু সে।
শঠ ধৃষ্ট কিতব—ভজে বা তারে কে ॥
... ...
কি কার্য আমার সে বা চোরের কথায়।"
যে 'কৃষ্ণ' বোলয়ে তারে খেদাড়িয়া যায় ॥
[চৈ. ভা. : পৃ. ১২৮]

কৃষ্ণদাস কবিরাজও এ বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। গোপী ভাবাবেশে চৈতন্যদেবকে 'গোপী গোপী' ব'লতে শুনে একজন পড়ুয়া তাঁকে কৃষ্ণ নাম করতে বলে—

কৃষ্ণনাম কেনে না লও কৃষ্ণনাম ধন্য।
গোপী গোপী বলিলে বা কিবা হবে পুণ্য ॥
শুনি প্রভু ক্রোধে কৈল কৃষ্ণে দোষোদগার।
ঠেঙ্গা লৈয়া উঠিল প্রভু পড়ুয়া মারিবার ॥
ভয়ে পলায় পড়ুয়া পাছে প্রভু ধায়।
আস্তেব্যস্তে ভক্তগণ প্রভুরে রহায় ॥ [চৈ. চ. : পৃ. ৯৫]

এ সময়ে অনুক্ষণ সংকীর্তন চলতো। নব নব আবেশে তিনি বাহ্য হারাতেন: 'দুই প্রহরেও নৃত্য নহে সংবরণ'—ভাগবতগণ শ্রান্ত হয়ে পড়তেন কিন্তু বিশ্বম্ভর চেতনারহিত। এ সময়েও তিনি ছিলেন বিশেষভাবে সমাজ সচেতন। আচার-অনুষ্ঠানে ভণ্ডামী গোপন থাকতে পারে। তার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার। তিনি জানতেন যে অন্তরের গভীর থেকে উৎসারিত প্রেমই সমাজকে ঐক্যে বিধৃত করতে পারে। আবেশ বিহ্বলতা সত্ত্বেও তাই তাঁর বক্তব্য ছিল—

প্রেমযোগে সেবা করিলে সে কৃষ্ণ পাই।
মাথা মুড়াইলে যমদণ্ড না এড়াই ॥
কুলে রূপে ধনে বা বিদ্যায় কিছু নহে।
প্রেমযোগে ভজিলে সে কৃষ্ণ তুষ্ট হয়ে ॥ [চৈ. ভা. : পৃ. ২৩১]

যে প্রেম কৃষ্ণকে তুষ্ট করে সেই প্রেমই মানুষকে আত্মার আত্মীয় করতে সক্ষম:

ভক্তদের মধ্যে প্রীতির বন্ধন কতটা সুদৃঢ় হয়েছিল তার একটি ছোট্ট উদাহরণ দিয়েছেন বৃন্দাবনদাস। একের জন্যে অন্যে দুঃখকে দুঃখ ব'লেই মনে করতেন না। একদিন শ্রীবাসের গৃহে নৃত্য করছেন গৌরাঙ্গ, এমন সময় অন্দরে ক্রন্দন শোনা গেল। শ্রীবাস অন্দরে গিয়ে দেখলেন যে, অসুস্থ বালক-পুত্র মৃত্যু বরণ করেছে। শ্রীবাস ক্রন্দনরতা নারীদের শান্ত করলেন; ক্রন্দনের শব্দে বিশ্বম্ভরের বাহ্য হলে সংকীর্তনে ব্যাঘাত ঘটবে। ভক্তরাও বিচলিত হতে পারেন। অনেকক্ষণ পর বাহ্য পেলেন গৌরাঙ্গ দেব। সব শুনে তিনি সকলকে নিয়ে অন্তঃপুরে গেলেন: নিয়তি কে ন বাধ্যতে—ভবিতব্য যা তা ঘটবেই: সকলকে শান্ত ক'রে বালকের সৎকারের জন্য চললেন গঙ্গাতীরে—

সর্ব-গণ সহ প্রভু বালক লইয়া।
চলিলেন গঙ্গাতীরে কীর্তন করিয়া ॥ [তদেব : পৃ. ২০৩]

শ্রীবাস কারও একাগ্রতা নষ্ট করতে চান নি, নিজের বেদনা সত্ত্বেও অন্যদের কীর্তনানন্দ উপভোগের অবকাশ দিতে চেয়েছিলেন : জানা মাত্র চৈতন্যদেব নিজেও শ্রীবাসের দুঃখের অংশীদার হলেন ভক্তদের নিয়ে, নিজেও চললেন গঙ্গাতীরে। সেকালের এই ঐক্যবোধ বর্তমান কালে নিশ্চিতরূপে অনুকরণযোগ্য। চৈতন্যদেবের ন্যায় বলিষ্ঠ সহানুভূতিশীল নেতা একালে একান্তই দুর্লভ।

মানব-সমাজের সমতা এবং ঐক্যবোধ শুধু কথার কথাই ছিল না চৈতন্যদেবের নিকটে। তিনি যেমন শ্রীধরের ফুটো লোহপাত্রে জল খেয়েছেন, তেমনি ভিক্ষা ক'রে গ্রহণ করেছেন ভিক্ষোপজীবী শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর অন্ন। চৈতন্যদেবের দৃষ্টিতে কোন প্রকৃত ভক্ত, শুদ্ধ-অন্তর সৎ মানুষ পতিত বা পাপিষ্ঠ নন। নিত্যানন্দকে নিয়ে তিনি প্রতি বৈষ্ণবের ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। যে-কোন কিছু প্রচারের ব্যাপারে এরূপ ব্যক্তিগত যোগাযোগ বিশেষ সহায়ক হয়ে থাকে।

প্রেম-ভক্তি-ধর্ম প্রচারের জন্য, মানব-ঐক্য সাধনের উদ্দেশ্যে সন্ন্যাস গ্রহণের বাসনা জাগলো বিশ্বম্ভরের মনে। একদিন তিনি ভক্তদের নিকটে এক ধাঁধা বললেন—

"করিল পিপ্পলিখণ্ড কফ নিবারিতে ॥
উলটিয়া আরো কফ বাড়িল দেহেতে ॥ [তদেব : পৃ. ২৩৬]

একথার অর্থ কেবল নিত্যানন্দ বুঝতে পারলেন—

নিত্যানন্দ বুঝিলেন প্রভুর অন্তর।
জানিলেন—প্রভু শীঘ্র ছাড়িবে ঘর ॥ [তদেব]

জয়ানন্দের মতে প্রথমেই শ্রীবাসের নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন বিশ্বম্ভর—

আর দিন গৌরাঙ্গ বড় নিশি অবশেষে।
শ্রীনিবাস পণ্ডিতেরে কহিল বিশেষে ॥
আজি হইতে ছাড়িল সংসার অভিলাষ।
নবদ্বীপ সম্প্রতি ছাড়িব শ্রীনিবাস ॥ [জয়ানন্দ চৈ. ম. : পৃ. ৮৮]

প্রচলিত কথা আছে যে, সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য পিতা-মাতার আদেশ গ্রহণ করতে হয়। জয়ানন্দের বিশ্বম্ভর সেইমত মায়ের আদেশ ভিক্ষা করেছিলেন ; লোচনদাস বলেছেন যে, নবদ্বীপে শুদ্ধমতি মহান সন্ন্যাসী কেশব ভারতী এসেছিলেন ; তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় বিশ্বম্ভরের : তার পরই বিশ্বম্ভর ভক্তদের বললেন—

ধরিয়া যোগীর বেশ যাব দেশে দেশে।
যথা গেলে পাঙ প্রাণনাথের উদ্দেশ্যে ॥
ইহা বলি কান্দে প্রভু ধরণী পড়িয়া।
নিজ-অঙ্গ-উপবীত ফেলিল ছিঁড়িয়া ॥ [চৈ. ম. : পৃ. ১৩৯]

জানাজানি হওয়ায় শচীমাতা শুনলেন পুত্রের সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছার কথা। জয়ানন্দের সঙ্গে লোচনের মিল নেই। তবে লোচন 'উপবীত' ছুঁড়ে ফেলার কথা বলেছেন—যে সন্ন্যাসী জাত-পাতে বিশ্বাস করেন না তাঁর আবার উপবীত কি ? কবিরাজ গোস্বামীর বিশ্বম্ভর পাষণ্ডীদের উদ্ধারের কথাই কেবল ভেবেছেন—

এ সব জীবের অবশ্য করিব উদ্ধার।
অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব।
সন্ন্যাসীর বুদ্ধ্যে মোরে প্রণত হইব ।। [চৈ. চ. : পৃ. ৯৬]

চৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যাচ্ছে যে, কেশবভারতী নদীয়া নগরে এসেছিলেন; বিশ্বম্ভর তাঁকে ভিক্ষা নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

বৃন্দাবনদাস বলেছেন যে, বিশ্বম্ভর প্রধান ভক্তদের তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছার কথা জানিয়েছিলেন। গদাধর তাঁকে শচীমাতার দুঃখের কথা স্মরণ করিয়ে বললেন—

অনাথিনী মায়েরে বা কেমতে ছাড়িবে।
প্রথমে ত' জননী-বধের ভাগী হবে ।। [চৈ. ভা. : পৃ.২৩৮]

আশ্চর্য এই যে, মুকুন্দাদি ভক্তরা তাঁর চাঁচর কেশের কথা মনে ক'রেই যেন সবিশেষ বিচলিত হ'য়ে পড়েছিলেন—

করিবেন মহাপ্রভু শিখার মুণ্ডন।
শ্রীশিখা সঙরি কান্দে সর্বভক্তগণ ।।
কেহো বোলে "সে সুন্দর চাঁচর চিকুরে।
আর মালা গাঁথিয়া কি না দিব উপরে ।।" [তদেব]

বৃন্দাবনদাসের শচীমাতাও লোকমুখে পুত্রের সন্ন্যাস গ্রহণের কথা শুনলেন। তাঁর মুখে গভীর শোকবাণী উচ্চারিত হলো—'না যাইব না যাইব বাপ! আমাদের ছাড়িয়া।' মাতার মনে বিষ্ণুপ্রিয়ার কথাটাই নিশ্চয় ছিল।

বিশ্বম্ভর মাতাকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে গিয়ে সান্ত্বনা বাক্য শোনালেন—

প্রভু বোলে "মাতা! তুমি স্থির কর মন।
শুন যত জন্ম আমি তোমার নন্দন ।।
চিত্ত দিয়া শুনহ আপন গুণগ্রাম।
কোনো কালে আছিল তোমার পৃশ্নিনাম ।।
তথায় আছিলা তুমি আমার জননী।
তবে তুমি স্বর্গে হৈলা অদিতি আপনি ।।
তবে আমি হইল বামন অবতার।
তথাও আছিলা তুমি জননী আমার ।।
তবে তুমি দেবহূতি হৈলা আর-বার।
তথাও কপিল আমি নন্দন তোমার ।।
তবে ত' কৌশল্যা হৈলা আরবার তুমি।
তথাও তোমার পুত্র রামচন্দ্র আমি ।।
তবে তুমি মথুরায় দেবকী হইলা।
কংসাসুর-অন্তঃপুরে বন্ধনে আছিলা ।।...
এই মত তুমি মোর মাতা জন্মে জন্মে। [তদেব : পৃ. ২৩৯-৪০]

—ব'লে বিশ্বম্ভর সান্ত্বনা দিলেন মাতাকে। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার সান্ত্বনা কি? অন্য কোন জীবনীকার অবশ্য শচীমাতাকে এভাবে সান্ত্বনা দেন নি।

লোচনদাস বিষ্ণুপ্রিয়ার এ সময়কার অবস্থা বর্ণনা করেছেন। সংবাদ শুনেই অচেতন হয়ে পড়েছিলেন তিনি। দিবা অবসানে গৃহে ফিরে ভোজন অন্তে যখন তিনি শয্যায় শুয়েছেন তখন দেখা গেল 'বান্ধে ভুজ-লতা দিয়া, প্রিয়-প্রাণনাথের চরণ' (চৈ. ম.: পৃ. ১৪৯) বিষ্ণুপ্রিয়া কেবল নিজের দুঃখের কথাই বলেন নি। সকলের হয়েই আবেদন করেছেন প্রভুর কাছে—

তোমার চরণ বিনি, আর কিছু নাহি জানি,
আমারে ফেলাহ কার ঠাঁয়।
ধর্ম-ভয় নাহি তোরা, শচী-বৃদ্ধ আধমরা,
কেমনে ছাড়িবে হেন মায়॥
মুরারি, মুকুন্দদত্ত হেন সব ভকত,
শ্রীনিবাস আর হরিদাস।
অদ্বৈত-আচার্য আদি ছাড়িয়া কি কার্য সাধি,
কেমনে বা করিবে সন্ন্যাস॥ [তদেব : পৃ. ১৪৯]

মাতার শোক-দীর্ণ অন্তরের পরিচয়ও পাওয়া যায় তাঁর কাব্যে। লোকমুখে শুনে শচীমাতা প্রথমেই নিজের কথাটি বললেন—'তুমি মাত্র পুত্র মোর দেহে এক আঁখি' (তদেব : পৃ. ১৪৯)। তার পরেই তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া এবং ভক্তদের অবস্থাও স্মরণ করিয়ে দিলেন—

আগেত মরিব আমি তবে বিষ্ণুপ্রিয়া।
মরিবে ভকত সব বুক-বিদরিয়া॥ [তদেব]

পূর্ব পূর্ব জন্মের কথা ব'লে লোচনের বিশ্বম্ভর মাতাকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করেন নি। তিনি ধ্রুবের কথা ব'লে বৃথা মাতাকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। বিষ্ণুপ্রিয়াকে অন্তরের ভালবাসা জানিয়ে যা বললেন, তা সংসার এবং সংসারীর পক্ষে মারাত্মক—যে ভালবাসা তিনি জানালেন তারও দাঁড়াবার কোন স্থান থাকে না। বিশ্বম্ভর 'মুচকি হাসিয়া' বললেন—

মিছা সুত, পতি, নারী পিতা মাতা যত বলি,
পরিণামে কেবা বা কাহার।
শ্রীকৃষ্ণ চরণ বহি, আর ত কুটুম্ব নাহি,
যত দেখ এ মায়া তাহার॥
কিবা নারী, পুরুষ সভারি সে আত্মা এক,
মিছা মায়াবন্ধে রহে দুই। [তদেব : পৃ. ১৫০]

বৃন্দাবনদাস বলেছেন যে, সন্ন্যাস গ্রহণের দিনটির কথা বিশ্বম্ভর নিভৃতে জানালেন নিত্যানন্দকে—মাত্র পাঁচজনকে সে কথা জানাতে বললেন তিনি। সর্বত্র জানাজানি হ'য়ে গেলে বিদায়ক্ষণে বিশেষ অসুবিধা সৃষ্টি হতে পারে মনে ক'রেই এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল—

যেদিন চলিল প্রভু সন্ন্যাস করিতে।
নিত্যানন্দ-স্থানে তাহা কহিল নিভৃতে॥

"শুন শুন নিত্যানন্দস্বরূপ গোসাঞি।
এ কথা ভাঙ্গিবে সবে পঞ্চ-জন-ঠাঞি॥ [চৈ. ভা. : পৃ. ২৪০]

এই 'পঞ্চজনের' প্রথমেই শচীমাতা তারপর গদাধর, ব্রহ্মানন্দ, শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য এবং মুকুন্দ। অদ্বৈত শ্রীবাস জানলে অনর্থ অনিবার্য। 'ইন্দ্রাণি' নিকটে কাটোয়া গ্রামে কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস নেবেন তিনি।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ তিন জনের উপস্থিতির কথা বলেছেন—

এত বলি ভারতী গোসাঞি কাটোয়াতে গেলা।
মহাপ্রভু তাঁহা যাই সন্ন্যাস করিলা॥
সংগে নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখর আচার্য।
মুকুন্দ দত্ত এই তিন কৈল সর্বকার্য॥ [চৈ. চ. : পৃ. ৯৭]

বিশদ বিবরণের দায় দায়িত্ব তিনি ছেড়ে দিয়েছেন বৃন্দাবনদাসের ওপর।

লোচনদাস অন্যপ্রকার বিবরণ দিয়েছেন। যে দিন মুরারিকে সান্ত্বনা দিয়ে বিশ্বম্ভর বলেছেন 'সন্ন্যাস করিব—তাব আছয়ে বিলম্ব' (পৃ. ১৫২) তার পরদিনই প্রাতঃকালে তিনি একাকী গঙ্গা সন্তরণ ক'রে কণ্টক নগরে 'ভারতী গোসাঞি'র নিকট চলে গেছেন। এ দিনই যে তিনি বের হবেন তা নিত্যানন্দও জানতেন না। তাঁকে নিয়ে চললো ভক্তদের আলোচনা—'কোথা গেলে পাব দরশন' (পৃ. ১৫৬)। তাঁর সন্ধানে যাবার জন্য বৃন্দাবন, বারাণসী, নীলাচলের উল্লেখও করলেন কেউ কেউ। কাঞ্চন নগরে কেশবভারতীর নিকটে সন্ন্যাস নেবেন একথা গৌরাঙ্গ বলেছিলেন বটে কিন্তু কথাটা সত্য কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল ভক্তদের মনে—'সত্য করি' এই বাক্য দঢ় নাহি বুঝি' (চৈ. ম. : পৃ. ১৫৩)। তথাপি সেখানে একবার সন্ধান করা প্রয়োজন : সুতরাং নিত্যানন্দ কয়েকজন প্রধান ভক্তকে নিয়ে চললেন সন্ধানে—

মুখ্য মুখ্য জনকথো দিল তার সনে॥
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য, পণ্ডিত দামোদর।
বক্রেশ্বর-আদি করি' চলিলা সত্বর॥
এই সব লঞা নিত্যানন্দ চলি' যায়।
প্রবোধিয়া শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়॥ [তদেব]

জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলে একটি নূতন কথা আছে। একদিন অদ্বৈত শ্রীনিবাস-মুরারি-হরিদাস-মুকুন্দ-গদাধর প্রভৃতি এলেন বিশ্বম্ভরের গৃহে ; ঘরের মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়াও তখন ছিলেন। সকলে জিজ্ঞাসা করলেন—'জিজ্ঞাসল ঈশ্বরে বৈরাগ্য কেন করে।' গৌরাঙ্গ উত্তরে বলেন যে, 'বৈরাগ্যই প্রায় ধর্ম।' জয়ানন্দের বিষ্ণুপ্রিয়াও বলেছেন—

জথা তথা জায় তুমি সংগে জাইব আমি
না ছাড়িয়া দ্বিজরাজ।
করিব তুমার সেবা সেই সে আমার শোভা
গৃহ পরিজনে পড়ু বাজ॥ [জয়ানন্দ : চৈ. ম. : পৃ. ১২০]

লোচনের বিশ্বম্ভরের ন্যায়ই জয়ানন্দের বিশ্বম্ভরও উত্তরে জানালেন—

শুন সতী বিষ্ণুপ্রিয়া হৃদএ দেখ চিন্তিয়া
সব মিথ্যা কেহ কার নহে। [তদেব : পৃ. ১২১]

যজ্ঞ সূত্রটি বিষ্ণুপ্রিয়ার হাতে দিয়ে গেলেন তিনি : লোচনের বিশ্বম্ভরের ন্যায় সেটা ছিঁড়ে না ফেললেও তাৎপর্যের দিক দিয়ে একই বিষয়ের ব্যঞ্জনা করে।

বৃন্দাবনদাস বলেছেন যে, সে-দিনটি বিশ্বম্ভর সমস্ত বৈষ্ণবদের সংগে কীর্তন ক'রে কাটালেন ; পরম আনন্দ প্রকাশ ক'রে ভোজন করলেন : সন্ধ্যায় গঙ্গাকে নমস্কার ক'রে বসলেন তার তীর-ভূমিতে। গৃহে ফিরে এলে ভক্তরা এবং নগরীয়ারা দলে দলে এসে মালা-চন্দন পরিয়ে দিলেন এই প্রেম-ধর্মের পূজারীকে। তখনো তাঁরা জানেন না যে, পরের দিন আর পাওয়া যাবে না তাঁকে। তিনি যে এক বিরাট পরিবর্তনের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন তা জানতেন সামান্য ক'জন-মাত্র।

সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বরাত্রে ভোজনান্তে শয়ন করতে গেলেন গৌরাঙ্গদেব, একেবারেই স্বাভাবিক মানুষটি। কোন চাঞ্চল্য ছিল না তাঁর মধ্যে। প্রধান ভক্তদের মধ্যে হরিদাস এবং গদাধর নিকটেই শয়ন করলেন। শচীদেবী জানেন যে, ভোরেই বেরিয়ে পড়বেন বিশ্বম্ভর, নিদ্রাহীন চোখে তিনি বসেছিলেন বাহির দুয়ারে—'আইর নাহিক নিদ্রা কান্দে অনুক্ষণ।'

পরের দিন প্রাতে খুবই করুণ দৃশ্য : সারারাত কেঁদেছেন শচীমাতা, বেদনাপ্লুত জননীর সংগে বাহির দুয়ারে সাক্ষাৎ গমনোদ্যত পুত্রের। মায়ের হাত ধরে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করলেন পুত্র—বৃন্দাবনদাসের লেখনী সামান্য কয়েকটি কথায় দৃশ্যটি ফুটিয়ে তুলেছে—

দণ্ডে দণ্ডে যত তুমি করিলা আমার।
আমি কোটি-জন্মেও নারিব শুধিবার॥
... ...

জননীর পদধূলি লই প্রভু শিরে।
প্রদক্ষিণ করি তানে চলিলা সত্বরে॥ [চৈ. ভা. : পৃ. ২৪১]

'সত্বরে' যাওয়া ছাড়া উপায়ই বা কি! এ দৃশ্য অধিকক্ষণ ধরে রাখা কোন লেখকের পক্ষেই সম্ভব নয়। 'সন্ন্যাস করিয়া সর্ব জীব উদ্ধারিতে' একাকী সত্বরে তিনি বেরিয়ে পড়লেন।

বৃন্দাবনদাসের লেখনী অপূর্ব একটি বিষাদময় অবস্থার চিত্র এঁকেছে। বৈষ্ণব মহান্তরা প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান ক'রে বিশ্বম্ভরকে নমস্কার জানাতে তাঁর গৃহে এসে দেখলেন 'বাহির দুয়ারে, বসে আছেন শচীমাতা। নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণের কথা মুহূর্তে সমস্ত নবদ্বীপে ছড়িয়ে গেল। সর্ব দিক থেকে ছুটে এলেন আবালবৃদ্ধবনিতা নিমাইয়ের গৃহে : সর্বত্র বিষাদ। বিচিত্র আর্তির প্রকাশ। পাষণ্ডীদের মনও দ্রবীভূত হলো—

তখনে সে 'হায় হায়' করে সর্বলোক।
পরম নিন্দক পাষণ্ডীও পায় শোক॥
"পাপিষ্ঠ আমরা না চিনিল হেন জন।"
অনুতাপ ভাবি সভে করেন ক্রন্দন॥

নিন্দা দ্বেষ যাহার মনেতে আছিল।
প্রভুর বিষয়ে সর্ব-জীবের খণ্ডল ।। [তদেব : পৃ. ২৪২]

গঙ্গা পার হয়ে কণ্টক নগরে (কাটোয়া) এসে পৌঁছলেন গৌরসুন্দর। নিত্যানন্দসহ যে কয়জন লোককে আসতে বলা হয়েছলো তারাও এসে পৌঁছলেন একে একে: কেশব ভারতীর স্থানে এসে উপস্থিত হলেন নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য এবং ব্রহ্মানন্দ। তাঁকে উদ্ধার করার জন্য বিশ্বম্ভর অনুরোধ করলেন কেশবভারতীকে: তাঁর জ্যোতির্ময় রূপ দেখে সম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন ভারতী।

কথা বলতে বলতেই ভাবে বাহ্য হারিয়ে নৃত্য করতে লাগলেন বিশ্বম্ভর। গান ধরলেন মুকুন্দ এবং অন্যান্য ভক্তগণ। কেশবভারতীর নিকট প্রতিদিন সমাগম হয় বহু মানুষের—নিমাইয়ের ভাব-নৃত্য এবং নয়নে অশ্রুধারা দেখে তাঁদের অশ্রুও আর বাধা মানল না: উপস্থিত পুণ্যার্থীরা ব্যাকুল চিত্তে ভাবতে লাগলেন—

আমা সভের প্রাণ বিদরে দেখিতে।
ভার্যা বা জননী প্রাণ রাখিব কেমতে ॥" [তদেব]

কেশবভারতী মুগ্ধ হলেন, রাত্রি অতিবাহিত হলো পরম আনন্দে। চন্দ্রশেখর আচার্যের ওপর সমস্ত ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দিলেন বিশ্বম্ভর: সন্ন্যাস গ্রহণেচ্ছু নিমাইয়ের অপূর্ব কান্তি দেখে মুগ্ধ মানুষের দল পাঠাতে লাগলেন প্রচুর দ্রব্যাদি—'নানা গ্রাম হইতে সে নানা উপায়ন।' [তদেব : পৃ. ২৪৩]

জয়ানন্দ বলেছেন—'সর্ব সুখ ছাড়ি প্রভু চলেন বিদেশে।' তিনি কাটোয়া চললেন সন্ন্যাস গ্রহণ করতে, সঙ্গে নিলেন—নিত্যানন্দ, মুকুন্দ দত্ত 'বৈদ্য' গোবিন্দ কর্মকার, চন্দ্রশেখর আচার্য, আচার্য হরি, বাসুদেব দত্ত, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, ভগাই গঙ্গাদাস এই ন' জনকে—

তুমা সভার বিদ্যমানে লইব সন্ন্যাস। [জয়ানন্দ, চৈ. ম. : পৃ. ১২৫]

লোচনদাসও কেশবভারতীর সম্মুখেই বিশ্বম্ভরের শ্রীকৃষ্ণ আবেশের চিত্র এঁকেছেন—ভারতী তাঁর নানা আবেশ দেখে চমৎকৃত হলেন।

মস্তক মুণ্ডনের ব্যবস্থা হলো, উঠলো চারিদিকে ক্রন্দনের ধ্বনি; চাঁচর চিকুর - : শোভা পাবে না মস্তকে! ক্ষৌরকারের চোখেও অশ্রুর বাধা মানে না।

মুণ্ডনের পর সকলে একত্র গঙ্গাস্নান করলেন, তারপর এসে সন্ন্যাসের স্থানে বসলেন। ভারতীকে বললেন বিশ্বম্ভর—

প্রভু বোলে "স্বপ্নে মোর কোন মহাজন।
কর্ণে সন্ন্যাসের মন্ত্র কহিল বচন ।।
বুঝ দেখি তাহা তুমি কিবা হয় নহে।"
এত বলি প্রভু তার কর্ণে মন্ত্র কহে ॥ [চৈ. ভা. : পৃ. ২৪৩]

বিস্মিত হলেন ভারতী—সেই মহামন্ত্রেই তিনি দীক্ষা দিলেন বিশ্বম্ভরকে। নবরূপে দেখা দিলেন বিশ্বম্ভর—

পরিলেন অরুণ-বসন মনোহর।
... ...

দণ্ড কমণ্ডলু দুই শ্রীহস্তে উজ্জ্বল।

... ...

প্রেমধারে পূর্ণ দুই কমল-লোচন॥ [তদেব]

লোচন বলেছেন যে, কেশব ভারতী তরুণ বিশ্বম্ভরের অপূর্ব রূপ দেখে প্রথমে তাঁকে সন্ন্যাস মন্ত্র দিতে অস্বীকার করেন। পঞ্চাশের কম বয়স্বকে সন্ন্যাস দিতে হয় না; তাই ভারতী বলেছিলেন, 'তোমারে সন্ন্যাস দিতে না হয় আমার'। [চৈ. ম. : পৃ. ১৫৪]। এরপর গোরাচাঁদের আবেশ দেখা দিল—চমৎকৃত হলেন ভারতী; তথাপি তিনি তাঁকে জননী এবং পত্নীর সম্মতি নিয়ে আসতে বললেন, ভারতীর ইচ্ছা—

মনে আছে—গোরাচাঁদে করিয়া বিদায়।
আসন ছাড়িয়া আমি যাব অন্য ঠাঁই॥ [তদেব]

কিন্তু ভারতীর চাতুরী শেষ পর্যন্ত কার্যকর হলো না। বৃন্দাবনদাসের বিশ্বম্ভরের ন্যায় লোচনের বিশ্বম্ভরও স্বপ্নে পাওয়া মন্ত্র ভারতীর কর্ণে দিলেন। বিস্মিত ভারতী তখন তাঁকে সন্ন্যাস দিতে স্বীকৃত হলেন। আনন্দে আবেশ হ'লো বিশ্বম্ভরের—স্বেদ কম্প-পুলক দেখা দিল তাঁর দেহে। অগণিত মানুষ সে-অপূর্ব দৃশ্য দেখে আনন্দ-বিহ্বল, শোক-কাতর হলেন।

মস্তক মুণ্ডনের সময়ে স[illegible] উ[illegible] [illegible]—[illegible]বার [illegible]ক্ষণ ই[illegible] ক'রে বেদনার্ত হৃদয়ে শেষ পর্যন্ত মুণ্ডনের কাজ [illegible]।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর এল নামকরণের পালা। বৃন্দাবনদাস বলেছেন যে, কেশব ভারতী এমন একটি নামের কথা চিন্তা করতে লাগলেন যা এর পূর্বে কখনও শোনা যায় নি; ভারতীর শিষ্য হলেও তাঁকে 'ভারতী' বলা সঠিক কার্য হবে না। অপূর্ব সন্ন্যাসীর অপূর্ব নামই তো চাই। চিন্তান্বিত কেশব ভারতীর মনে এসে গেল এক অপূর্ব-সুন্দর নাম—

পাইয়া উচিত নাম কেশব ভারতী।
প্রভু-বক্ষে হস্ত দিয়া বোলে শুদ্ধমতি॥
"যত জগতের তুমি কৃষ্ণ [illegible]।
করাইলা চৈতন্য—কীর্তন প্রকাশিয়া॥
এতেকে [illegible] ার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সর্বলোক তোমা হ[illegible] [illegible]॥" [চৈ. ভা. : পৃ. ২৪৪]

নামকরণের ব্যাপারে লোচনদাসের [illegible] [illegible] কেশব ভারতী জিজ্ঞাস করলেন নিমাইকে—

কি নাম তোমার [illegible] এ॥
যতেক বৈষ্ণবগণ ছিল সংখ্যা[illegible]।
সভে মিলি সন্ন্যাসি[illegible] [illegible]মানে॥
বুদ্ধি-অনুসারেব[illegible] যে মনে।
হেনকালে শুভবাণী উঠি[illegible] গগনে॥
ধ্বনি শুনি, সর্বলোক হৈ[illegible] চমৎকার।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম [illegible]। [চৈ. ম. : ১৫৬-১৫৭]

সন্ন্যাস গ্রহণের ন্যায় বিশিষ্ট ক্ষেত্রেও জীবনীকারদের বক্তব্যে যথেষ্ট গরমিল লক্ষ্য করা যায়। 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' নামকরণেও বৃন্দাবনদাস এবং লোচনদাস ভিন্ন কথা বলেছেন। নবদ্বীপ খণ্ডে বৃন্দাবনদাসকেই মোটামুটি ভাবে অধিকতর সঠিক মনে করাই যুক্তিযুক্ত। অলৌকিক বিষয়গুলো এবং বৃন্দাবনদাসের মন্তব্যাদি বাদ দিলে তথ্যের বিচারে বৃন্দাবনদাসকেই আমরা অধিক মর্যাদা দিয়েছি।

সন্ন্যাস গ্রহণের কার্য সমাপ্ত হলে চারদিকে 'মহা-হরিধ্বনি-কোলাহল' ক'রে বৈষ্ণবরা অন্তরের আনন্দ প্রকাশ করলেন এবং 'ভারতীরে সর্বভক্ত করিলা প্রণাম।' [চৈ· ভা· : পৃ. ২৪৪] 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম হওয়ায় বিশ্বম্ভরও তুষ্ট হলেন।

লোচনদাস' বলেছেন যে, গুরুর আদেশে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেদিন সেখানেই থাকলেন। রাত্রে সকলে মিলে করলেন সংকীর্তন—গুরু-শিষ্যের নৃত্যও হলো ; পরদিন প্রাতে গুরুকে প্রদক্ষিণ ক'রে প্রণাম করলেন। নীলাচলে যাবার অনুমতি চাইলেন তাঁর কাছে। গুরু আশীর্বাদ ক'রে নির্দেশ দিলেন। 'সংস্থাপন করিবারে সংকীর্তন-ধর্ম' এবং সর্বলোক নিস্তারিতে করুণা প্রকাশ করতে। পুনরায় গুরুর চরণ স্পর্শ ক'রে পথে বেরিয়ে পড়লেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

বৃন্দাবনদাস লিখেছেন যে, সন্ন্যাস গ্রহণের পর সমস্ত রাত চললো কীর্তন-নৃত্য। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দেহে দেখা দিল স্বেদ-কম্প-পুলক, মাঝে মাঝে হুঙ্কারও দিতে লাগলেন তিনি। কেশবভারতীকে আলিঙ্গন করলেন চৈতন্যদেব। ভারতীও আবেশ ভরে নৃত্য করতে লাগলেন। পরদিন প্রভাতে গুরুর নিকট বিদায় নিয়ে চললেন চৈতন্যদেব।

জয়ানন্দ বলেছেন যে, সন্ন্যাস গ্রহণের পর নীলাচলে যাবার জন্য-প্রস্তুত হলেন গৌরচন্দ্র। একমাত্র কৃষ্ণদাস কবিরাজের কাছেই শোনা গেল—

প্রথম সূত্র প্রভুর সন্ন্যাস করণ।
তবে ত চলিলা প্রভু শ্রীবৃন্দাবন।। [চৈ· চ· : পৃ. ১০২]

তিনজনে নীলাচলে যাবার উদ্যোগের কথা বলেছেন—সেটাই সঠিক ব'লে মনে হয়। তত্ত্বের হিসাব করলে কৃষ্ণপ্রেমী সন্ন্যাসীর বৃন্দাবন যাবারই কথা। সম্ভবত কবিরাজ গোস্বামী তত্ত্বের তাগিদে তথ্যকে অস্বীকার করেছিলেন। সেটা করার সুযোগও ছিল কারণ সন্ন্যাস গ্রহণের পর যেখানে যাবার উদ্যোগই করুন না কেন চৈতন্যদেব, গিয়ে পৌঁছেছিলেন শান্তিপুরে।

চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের উদ্দেশ্য

ভারতবর্ষে সন্ন্যাসীর অভাব কোনদিন হয় নি। এ কালেও হিমালয়ের গুহায়, পথের ধারে, বিভিন্ন পর্বতে এমন কি গ্রামে শহরেও শত-সহস্র সন্ন্যাসীর সন্ধান পাওয়া যায়। অনেকেই নিজেদের সিদ্ধি নিয়েই ব্যস্ত—সমাজ-সংসারের দিকে তাদের কিছুমাত্র দৃষ্টি নেই। আবার স্বামী বিবেকানন্দের মতো সন্ন্যাসীও দেখা গেছে যাঁরা আত্মোপলব্ধির সংগে সংগে মানব সেবায়, সমাজকল্যাণে আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁরা মানুষের মধ্যেই ভগবানকে উপলব্ধি করতে বলেছেন। ঈশ্বরই যদি সংসার

সৃষ্টি ক'রে থাকেন তখন সমস্ত মানুষকে সন্ন্যাসে উদ্বুদ্ধ ক'রে সেই সংসারকে ভাঙার চেষ্টা তো ঈশ্বর-বিরোধিতারই নামান্তর—এমন বিশ্বাসও রয়েছে অনেক সন্ন্যাসীর মধ্যে। মানবাত্মাকে যা খর্ব করে তাকেই সরিয়ে দেবার চেষ্টা করা চাই। স্বামীজী সেই বিশ্বাসেই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার কথা বলেছেন—মানব সমাজে সমতা না এলে মানবচিত্ত বিপর্যস্ত হয়—সমতা চিত্তের বিকাশে সহায়তা করে, তাই স্বামীজী সমাজতন্ত্রের পৃষ্ঠ-পোষকতা করেছেন। যে বৈদান্তিক সকল মানুষের মধ্যে ব্রহ্মের অস্তিত্ব হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করেন; যে ভক্ত মনে করেন যে, ভগবান সর্বত্র আছেন, এমন কি হিরণ্য-কশিপুর প্রাসাদের স্তম্ভের মধ্যেও তিনি আছেন, সেই বৈদান্তিক, সেই ভক্ত কি কখনও মানুষে-মানুষে পার্থক্য করতে পারেন? এ সব মহান সন্ন্যাসীকে 'রাজনৈতিক সন্ন্যাসী' ব'লে চিহ্নিত করা কোন সত্য বিচার নয়। যে সন্ন্যাসী আত্মমুক্তি সাধনে ব্যস্ত তাঁকে মহৎ মানব ব'লে স্বীকার করেও স্বার্থসম্পন্ন মনে করা অন্যায় নয়। যে সন্ন্যাসী সৃষ্টিকে সুন্দর করতে চান, মানবমনে আলোকবর্তিকা জ্বালিয়ে চিত্তের প্রসার ঘটাতে চান তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী, মহান ভক্ত। প্রতিটি মানব মনের বিকাশ ঘটবে এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের সংগে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে সেই তো হবে সুন্দর সমাজ। পদ্মের প্রতিটি পাপড়ি বিকশিত হয়ে পরস্পরের সংগে সুসংবদ্ধ রূপে বিধৃত থাকলেই তার সৌন্দর্যের চরম বিকাশ। যিনি সমাজে সেই অবস্থা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নিজের সমস্ত স্বার্থ বিসর্জন দিতে পারেন তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী, সত্যকার ভক্ত। স্বামী বিবেকানন্দ এ যুগের সেই সন্ন্যাসী—চৈতন্যদেব সে যুগের সেই মহামানব। প্রেম ভক্তির অবতার। তখনকার দিনের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার পটভূমিতে চৈতন্যদেব ছিলেন অত্যধিক সমাজ-সচেতন সন্ন্যাসী।

চৈতন্যদেব কোন রীতি-পদ্ধতি অনুসরণ করতে চান নি কখনও। মানুষের মধ্যে কোন ভেদকেও তিনি মানতেন না। জয়ানন্দ বলছেন, চৈতন্যদেব একদিন নাচতে নাচতে আচম্বিতে এক শ্লোক উচ্চারণ করলেন—

আমি কোন বর্ণী নহি নহি এ গৃহস্থ।
আমি সন্ন্যাসী নহি নহি যে বনস্থ॥
ব্রহ্ম ক্ষত্রি বৈশ্য শূদ্র চারি আমি নহি।
আমি যে বটি তাহা নিষ্কপটে কহি॥
যুগে যুগে জন্মে জন্মে আর নাহি আশ।
সবে বটি গোপীনাথের দাসের দাস॥ [চৈ. ম. : পৃ. ১২৯]

কোন নিয়মের মধ্যে তিনি নিজেকে আবদ্ধ রাখতে চান নি শুধু গোপীনাথের দাসের দাস হওয়াই ছিল তাঁর জীবনের পরম আশা। জাত-পাতেও তাঁর বিশ্বাস ছিল না।

জয়ানন্দ আরও বলেছেন যে, প্রেম-ভক্তি বিলোবার ব্যাপারেও কোন ক্ষেত্র-বিচার ছিল না তাঁর। এখানেও তিনি ছিলেন চলিত রীতির বিরোধী। নিজের জীবনের আচরণে তিনি সমাজ-নিয়মকেও স্বীকৃতি দেন নি। জয়ানন্দের চৈতন্যদেব তাই—

আচণ্ডাল আদি সভারে দিল কোল।
আব্রহ্ম ভরিয়া শুনি হরি হরি বোল॥ [তদেব : পৃ. ১৩৭]

লোচনদাসের চৈতন্যদেবেরও সেই কথা—হিসাব ক'রে ক'রে তিনি কখনো চলেন নি—

সুরাসুরগণে দিমু এই প্রেম ধন।
চণ্ডাল যবন মূর্খ স্ত্রী বালক জন॥ [চৈ. ম. ঃ পৃ. ১১৭]

পাত্রাপাত্র বিচার নেই তাঁর কাছে ; ওটা তো হিসেবী লোকদের কথা। নারী সমাজের অর্ধেক, সংসারকে সুন্দর ক'রে তোলার দায়িত্ব তাঁদেরই বেশি ঃ বোরখা-ঘোমটায় তাঁদের অন্ধকারে রাখার চেষ্টাকে অস্বীকার করেছেন তিনি।

বৃন্দাবনদাসও ওই একই কথা বলেছেন। বিশ্বম্ভর গোয়ালা-গন্ধবণিক-তাম্বুলী প্রভৃতির ঘরে গেছেন। গোয়ালারা তাঁকে ভাত খাওয়ার কথা বলেছেন ঃ অস্পৃশ্য শ্রীধরের ভাঙ্গা পাত্রে রাখা জল পান করেছেন। চৈতন্যচরিতামৃতেও ওই একই কথা। জীবনীকারদের কেউ কেউ আকস্মাৎ চৈতন্যদেবকে সন্ধ্যা-আহ্নিক—চন্দন লেপন-এর ব্যাপারে পৃষ্ঠপোষকতা করালেও সাধারণ ভাবে তাঁকে রীতি-পদ্ধতির বিরোধী রূপেই দাঁড় করিয়েছেন। কৃষ্ণদাসও বলেছেন—

পাঁচে মিলি লুটে প্রেম করে আস্বাদন।
যত পীয়ে তত তৃষ্ণা বাঢ়ে অনুক্ষণ॥
পুনঃ পুনঃ পীয়াইয়া হয মহামত্ত।
নাচে কান্দে হাসে গায় যৈছে মদোন্মত্ত॥
পাত্রাপাত্র বিচার নাহি নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাঁহা পায় তাঁহা করে প্রেমদান॥
... ...
উথলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী বৃদ্ধ বালক আদি সবারে ডুবায়॥
সজ্জন দুর্জন পঙ্গু জড় অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের মন॥ [চৈ. চ. ঃ পৃ. ২৭-২৮]

প্রেম বন্যায় ডোবাবার জন্য কোন সন্ধ্যা-আহ্নিক জপতপের ব্যবস্থা ছিল না। সন্ন্যাস গ্রহণের পরেও চৈতন্যদেব পূজা-পদ্ধতি নিয়ে কোন কথাই বলেন নি। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যদেব তপন মিশ্রকে বলেছেন—

অতএব কলিযুগে নাম-যজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম কৈলে নাহি হয় পার॥
রাত্রি-দিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥
শুন মিশ্র! কলিযুগে নাহি তপ যজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ, তার মহা ভাগ্য॥
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটিনাটি পরিহরি একান্ত হইয়া॥ [চৈ. ভা. ঃ পৃ. ৭১]

শ্রীমদভাগবতোক্ত প্রেমভক্তির প্রকাশই ছিল চৈতন্যদেবের ধর্ম ; কোন আচার-অনুষ্ঠানকে তিনি কখনো স্বীকার করেন নি। ভাগবতে মহামুনি উগ্রশ্রবার কাছে শৌনকাদি ঋষিরা জানতে চেয়েছিলেন ভগবানের কথা—

মোহ মুগ্ধ জীবগণ সংসার কাননে।
শ্রীহরির নাম যদি করে একমনে॥
অবিলম্বে মুক্তি লভে সেই মহাশয়।
এ ঘোর সংসারে তার মোহ নাশ হয়॥
একবার কৃষ্ণ নাম করি উচ্চারণ।
সর্বপাশে লভে মুক্তি নিশ্চিত সে জন॥
... ...
আছয়ে যতেক ভয় সংসার বন্ধনে।
সকলি তা দূর হয় হরিনাম গানে॥ [পৃ. ৩৪]

হরিগুণগান যে অনুষ্ঠানাদির থেকে শ্রেষ্ঠ একথাও বলেছেন ভাগবত—

স্বর্গ আদি লাভ তরে ধর্ম অনুষ্ঠান।
তাহা হতে শ্রেষ্ঠ হয় হরিগুণ গান॥ [পৃ. ৩৬]

কৃষ্ণনাম স্মরণ ক'রেই মুক্তি পেয়েছিলেন ধ্রুব, কোন আচার-অনুষ্ঠান করেন নি তিনি—

হরিপ্রেমে পুলকিত হইয়া তখন।
হরির বিরহে সদা করেন ক্রন্দন॥ [পৃ. ৩৫৭]

ভক্ত প্রহ্লাদ তাঁর বালক বন্ধুদের বলেছেন—

এস ভাই নাম-সুধা কর সবে পান।
উচ্চারণ মাত্র মুক্ত হবে সব প্রাণ॥
... ...
অতএব শুন ভাই ধর্ম কর সার।
হরিনাম কৃষ্ণনাম বল অনিবার॥ [পৃ. ৫৩৬]

ভাগবতের সেই প্রেম-ভক্তির প্রবক্তা চৈতন্যদেব কাশীর বৈদান্তিকদের বলেছেন—

গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিলা শাসন॥
মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তে অধিকার।
কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার॥
কৃষ্ণনাম হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনু কলিকালে নাহি আর ধর্ম।
সর্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্রমর্ম॥ [চৈ. চ. : পৃ. ৩১]

হরিনাম ব্যতীত কলিতে অন্য গতি নেই (তদেব : পৃ. ৩১)—নাম কীর্তনই কলিযুগের ধর্ম এবং সেই ধর্মই তো তিনি প্রচার করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—

যুগধর্ম প্রবর্তাইমু নাম সংকীর্তন। [তদেব : পৃ. ৭]

নামসংকীর্তন প্রচার করাই যাঁর উদ্দেশ্য তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা কি? সন্ন্যাস নিয়েও কি তিনি সন্ন্যাসীর নিয়ম পালন করেছেন? এ ক্ষেত্রে যতির যে সংজ্ঞা ভাগবত দিয়েছেন তাও তো অনুসরণ করেন নি তিনি! শ্রীমদ্ভাগবতে দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন—

গ্রামেতে প্রবেশ করি দিনেকের বেশি।
রাত্রিবাস না করিবে, হইবে উদাসী ॥
ভূমণ্ডল পর্যটন তাহাদের ব্রত।
একাকী ভ্রমণ তারা করিবে সতত ॥
কৌপীন ও দণ্ড তারা করিবে ধারণ।
কোন স্থানে নাহি করে আশ্রয় গ্রহণ ॥ [পৃ. ৫৫৪]

'সন্ন্যাস গ্রহণের পর ভক্ত বন্ধুদের নিয়ে তিনি এলেন শান্তিপুরে।' বৃন্দাবনদাস বলেছেন—

তবে গৌরচন্দ্র সন্ন্যাসীর চূড়ামণি।
চলিল পশ্চিম মুখে করি হরি-ধ্বনি ॥
নিত্যানন্দ গদাধর মুকুন্দ সংহতি।
গোবিন্দ পশ্চাতে আগে কেশব ভারতী ॥ (চৈ. ভা. ঃ পৃ. ২৪৭)

'একাকী চলার' নির্দেশ মানেন নি চৈতন্যদেব। নিত্যানন্দকে নবদ্বীপে পাঠালেন ভক্ত-বন্ধুদের শান্তিপুরে অদ্বৈতের গৃহে নিয়ে আসার জন্যে—

সভার অপেক্ষা আমি করি শান্তিপুরে।
রহিবাঙ শ্রীঅদ্বৈত-আচার্যের ঘরে ॥ [তদেব ঃ পৃ. ২৪৯]

লোচনদাসেও সেই একই কথা পাওয়া যাচ্ছে -

সভারে লইয়া তুমি আইস তথাকারে।
একত্রে হইবে দেখা আচার্যের ঘরে ॥ [চৈ. ম. ঃ পৃ. ১৬০]

সুতরাং 'সন্ন্যাসীর কারও গৃহে আশ্রয় গ্রহণ কর্তব্য নয়' এ রীতিও তিনি লঙ্ঘন করেছেন।

কাশীর 'সর্ব-সন্ন্যাসি প্রধান' প্রকাশানন্দ চৈতন্যদেবকে বলেছিলেন—

সন্ন্যাসী হঞা কর গায়ন নর্তন।
ভাবক সব সঙ্গে লৈয়া কর সংকীর্তন ॥
বেদান্তপঠন ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম।
তাহা ছাড়ি কেন কর ভাবকের কর্ম ॥ [চৈ. চ. ঃ পৃ. ৩১]

সন্ন্যাসের রীতি পদ্ধতি তিনি মানতেন না। আহার্যের পরিমাণ দেখে নিজেই পরিহাস ক'রে বলতেন—সন্ন্যাসীর আহার্যই বটে! যে রামচন্দ্র পুরীকে 'গুরুবুদ্ধ্যে' (তদেব ঃ পৃ. ৫১৮) 'সম্ভ্রম সম্মান' করতেন চৈতন্যদেব, সেই রামচন্দ্র পুরী বলেছেন—

সন্ন্যাসী হইয়া করে মিষ্টান্ন ভক্ষণ।
এই ভোগে হয় কৈছে ইন্দ্রিয়-বারণ ॥ [তদেব ঃ পৃ. ৫১৮]

জয়ানন্দ চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস ও নীলাচলে বাস সম্বন্ধে একটি নূতন কথা বলেছেন ঃ বারাণসীর বড় বড় সন্ন্যাসীরা শ্রীচৈতন্যকে লিখে পাঠালেন—

বারাণসী হইতে পত্র আইল আচম্বিতে ॥
বড় বড় সন্ন্যাসী সকল পত্র লেখি।
নীলাচলে চৈতন্য ইহাএ সভে মনে দুঃখী ॥

সন্ন্যাসীর যোগ্যস্থান নীলাচল নহে।
সে সব সুখদস্থান সন্ন্যাসীর যোগ্য নহে ॥
সম্ভোগ ভক্ষণ মাল্য চন্দন জে পরে।
পাষাণ শরীর সেই অবশ্য বিগরে ॥ [জয়ানন্দ. চৈ.ম. : পৃ. ২০৮]

পত্রোত্তরে সিংহ-পারাবতের তুলনা ক'রে তীব্র ব্যঙ্গের একটি শ্লোক লিখে পাঠালেন চৈতন্যদেব। পত্রটি তাঁর দৃঢ়তা এবং বলিষ্ঠতার পরিচয় দেয়। পত্রের উত্তর পেয়ে বারাণসীর প্রধান প্রধান প্রাচীন সন্ন্যাসীরা নীলাচলে এসে চৈতন্যদেবের আশ্রয় গ্রহণ করেন—

এই পত্র শুনি জত প্রাচীন সন্ন্যাসী।
নীলাচল গেলা সভে ছাড়ি বারাণসী ॥ [তদেব : পৃ. ২১০]

রীতি-পদ্ধতি অনুষ্ঠানকে যিনি কখনও স্বীকার করেন নি : সন্ন্যাসের নিয়মও যিনি পুঁথি মিলিয়ে মিলিয়ে গ্রহণ করেন নি তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণে নিশ্চয়ই বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছিল। এ বিষয়েও জীবনীকারদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে।

জয়ানন্দ বলেছেন যে, বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রবোধ দিয়ে চৈতন্যদেব সন্ন্যাস নিয়ে যান কেশব ভারতীর কাছে—কেশবভারতী স্বপ্নে তাঁর আগমনের কথা জেনে "আগু বাড়াইয়া জায়"—তাঁকে বরণ ক'রে আনতে এগিয়ে যান। সন্ন্যাস গ্রহণ কেন করবেন তা জানিয়েছেন চৈতন্যদেব—

আমি যদি বৈরাগ্য না করিব সংসারে।
বেদনিন্দা কলিযুগে ধর্ম না প্রচারে ॥
কুলধর্ম যুগধর্ম আমি না পালিব।
কেমতে সংসার লোক ধর্ম প্রচারিব ॥ [তদেব : পৃ. ১২৬]

ধর্ম প্রচারের জন্যই তাঁর এই সন্ন্যাস। নিয়ম জানা সন্ন্যাসীদের ন্যায় তিনি নিজেকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখতে চান নি। বুদ্ধদেব-শঙ্করাচার্য-রামানুজ-নানক প্রভৃতি বহু প্রাচীন এবং মধ্যযুগের সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীই তো প্রচারে বেরিয়েছিলেন। চৈতন্যদেবেরও উদ্দেশ্য ছিল প্রচার : সে যুগের চাহিদা ছিল মানব সমাজে ঐক্য স্থাপন করা ; চৈতন্যদেব সন্ন্যাস নিয়ে বিশেষ ভাবে সে কাজ আরম্ভ করেন—

আচণ্ডাল আদি সভারে দিল বোল।
আব্রহ্ম ভরিয়া শুনি হরি হরি বোল ॥ [তদেব : পৃ. ১৩৭]

সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে শ্রীবাসের গৃহে গৌরাঙ্গ তাঁর ভক্তদের নিয়ে নৃত্য-সঙ্কীর্তন করতেন : এখানে বাইরের লোকের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। লোচনদাস গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণের ব্যাপারে একটা অতিলৌকিক কারণ নির্দেশের চেষ্টা করেছেন। তাঁর বক্তব্য হলো, জনৈক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ এই ভাব-নৃত্য দেখতে গিয়ে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসেন—তাঁকে গৃহে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় নি। গঙ্গাস্নান করতে করতে এই ব্রাহ্মণ একদিন গৌরাঙ্গকেও স্নানরত দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিলেন—

তোর নৃত্য দেখিবারে বড় ছিল সাধ।
পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ এক তাতে দিল বাধ ॥

না দিল যাইতে মোরে বাহির-দুয়ারে।
তেমনি বাহির তুমি হইবে সংসারে ॥
ইহা বলি, উপবীত ছিণ্ডিলেক ক্রোধে।
ক্রোধে অচেতন বিপ্র—নাহি পরবোধে ॥
দ্বারের বাহির কৈল—আমি নাহি সহি।
শাপ দিল—হও তুমি সংসারের বহি ॥ [চৈ. ম. : পৃ. ১২৮]

সন্ন্যাস গ্রহণের কারণটি সহজ করতে চেয়েছেন লোচনদাস : কেবল উপবীত ছিন্ন করে ব্রাহ্মণের অভিশাপই নয়—গৌরাঙ্গকে স্বপ্নও দেখিয়েছেন লোচনদাস—

হেন মতে নিরঞ্জন-সঙ্গ আছে পহুঁ।
স্বপ্ন কহে সভাকারে হাসি, লহু লহু ॥
শুন সর্বজন স্বপ্ন দেখিল রজনী।
আচম্বিতে মোর ঠাঁই আইলা দ্বিজমণি ॥
মোর কর্ণে কহিল সন্ন্যাস-মন্ত্র এক।
এখন আমার মনে আছে পরতেক ॥ [তদেব : পৃ. ১৩৬]

অভিশাপ এবং স্বপ্নের সাহায্যে সন্ন্যাস গ্রহণ ব্যাপারটাকে সহজ ক'রে দিলেও গৌরাঙ্গের মনোভাবের কথাও বলেছেন লোচনদাস—

ধরিয়া যোগীর বেশ যাব দেশে দেশে।
যথা গেলে পাও প্রাণনাথের উদ্দেশ্যে ॥
ইহা বলি কান্দে প্রভু ধরণী পড়িয়া।
নিজ-অঙ্গ-উপবীত ফেলিল ছিঁড়িয়া ॥
কৃষ্ণকৃষ্ণ বলি ডাকে অতি আর্তনাদে।
সকরুণ-স্বরে 'প্রাণনাথ' বলি কান্দে ॥ [তদেব : পৃ. ১৩৯]

লোচনদাস চৈতন্যদেবের আর্তি দেখিয়েছেন, কৃষ্ণ লাভের জন্যই যে তার সন্ন্যাস গ্রহণ তাও বলেছেন। তবে সেই সঙ্গে উপবীত ছিন্ন করার কথা ব'লে ব্রাহ্মণত্বের গর্বকে আঘাত করতেও ছাড়েন নি। কৃষ্ণ ভক্তের কোন জাত নেই এটাই বলতে চেয়েছেন তিনি।

চৈতন্যচরিতামৃত বলছেন যে, সকল পাষণ্ডীকে উদ্ধার করার বাসনা সত্ত্বেও অনেকেই তাঁকে এড়িয়ে গেছে ; এই সব নিন্দক পাপিষ্ঠকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যেই তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণ। সংকীর্তনেই তো কৃষ্ণ প্রাপ্তি সম্ভব, কলিতে তো অন্য পথ নেই। পাপিষ্ঠদের উদ্ধারের জন্য তিনি নূতন খেলা খেললেন—

মায়াবাদী কর্মনিষ্ঠ কুতার্কিক গণ।
নিন্দক পাষণ্ডী যত পড়ুয়া অধম ॥
সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল।
সেই বন্যা তা সবারে ছুঁইতে নারিল ॥
তাহা দেখি মহাপ্রভু করেন চিন্তন।
জগৎ ডুবাইতে আমি করিলুঁ যতন ॥
কেহ কেহ এড়াইল প্রতিজ্ঞা হৈল ভঙ্গ।
তা সবা ডুবাইতে পাতিব কিছু রঙ্গ ॥

এত বলি মনে কিছু করিয়া বিচার।
সন্ন্যাস আশ্রম প্রভু কৈলা অঙ্গীকার ॥ [চৈ. চ. : পৃ. ২৮]

সন্ন্যাস আশ্রম তাহলে উদ্দেশ্য মূলক 'রঙ্গ'! এটা কৃষ্ণ লাভের পথ নয় এবং সে উদ্দেশ্য নিয়ে চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণ নয়। তাত্ত্বিক কবিরাজ গোস্বামী আরও শুনিয়েছেন—

সন্ন্যাস করিয়া প্রভু কৈল আকর্ষণ।
যতেক পলাইঞাছিল তার্কিকাদিগণ ॥
পড়ুয়া পাষণ্ডী কর্মী নিন্দকাদি যত।
তারা আসি প্রভু-পায়ে হয় অবনত ॥
অপরাধ ক্ষমাইল ডুবিল প্রেমজলে।
কেবা এড়াইবে প্রভুর প্রেম-মহাজালে ॥
সবা নিস্তারিতে প্রভু কৃপা-অবতার।
সবা নিস্তারিতে করে চাতুরী অপার ॥ [তদেব : পৃ. ২৮-২৯]

সবাইকে আকর্ষণ করার জন্যই সন্ন্যাস গ্রহণ! সন্ন্যাসীর প্রতি স্বভাবতই আকৃষ্ট হয় সকল মানুষ : সন্ন্যাস তাই চৈতন্যদেবের 'মহা-জাল'। কেবল নূতন 'রঙ্গ'ই নয় 'চাতুরী অপার'ও বটে!

এ বিষয়ে বৃন্দাবনদাসের সাক্ষ্যই বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য। সন্ন্যাস গ্রহণের সময় নিত্যানন্দ নবদ্বীপে ছিলেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছাও নিমাই সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন তাঁরই নিকটে। বৃন্দাবনদাস ছিলেন নিত্যানন্দের সদা-সঙ্গী, মাতা নারায়ণী চৈতন্যদেবের আশীর্বাদ ধন্যা—মাতামহ শ্রীরাম পণ্ডিতরা চার ভাই-ই তাঁর প্রধান ভক্তদের মধ্যেই পড়েন। রাম পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীবাসের গৃহেই নৃত্য সঙ্কীর্তন করতেন চৈতন্যদেব। সুতরাং চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ-লীলার সমস্ত কাহিনীই এই তিন সূত্র থেকে সঠিক ভাবেই বৃন্দবনদাসের জানার কথা। বৃন্দাবনদাস চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণ সম্বন্ধে বলেছেন—

ক্ষণেকে ঠাকুর নিত্যানন্দ-হাথে ধরি।
নিভৃতে বসিলা গিয়া গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥
প্রভু বোলে "শুন নিত্যানন্দ মহাশয়।
তোমারে কহিয়ে নিজ হৃদয় নিশ্চয় ॥
ভাল যে আইলাঙ আমি জগত তারিতে।
তরণ নহিল আইলাঙ সংহারিতে ॥
আমারে দেখিয়া কোথা পাইব বন্ধ-নাশ।
এক গুণ বন্ধ আরো হৈলা কোটি পাশ ॥ [চৈ.ভা. : পৃ. ২৩৬-৩৭]

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যদেব নিত্যানন্দের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। জগতের মানুষকে নিস্তার করার জন্যই তাঁর আগমন; কিন্তু ঘটনাস্রোত তো বিপরীত দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। সুতরাং মানুষকে আকর্ষণ করার জন্য তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন—

দেখ কালি শিখা সূত্র সব মুণ্ডাইরা।
ভিক্ষা করি বেড়াইমু সন্ন্যাস করিয়া ॥

যে যে জনে চাহিয়াছে মোরে মারিবারে।
ভিক্ষুক হইমু কালি তাদের দুয়ারে॥
তবে মোরে দেখি সেই ধরিব চরণ।
এই মতে উদ্ধারিব সকল ভুবন॥
সন্ন্যাসীরে সর্বলোক করে নমস্কার।
সন্ন্যাসীরে কেহো আর না করে প্রহার॥
সন্ন্যাসী হইয়া কালি প্রতি-ঘরে-ঘরে।
ভিক্ষা করি বুলোঁ দেখোঁ কে মোহরে মারে॥
তোমারে কহিলুঁ এই আপন হৃদয়।
গার্হস্থ্য বাস আমি ছাড়িব নিশ্চয়॥
... ...
জগত উদ্ধার যদি চাহ করিবারে।
ইহাতে নিষেধ নাহি করিহ আমারে॥ [তদেব : পৃ. ২০৭]।

একেবারে স্পষ্ট ক'রেই সন্ন্যাস গ্রহণের উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন চৈতন্যদেব। জগৎ উদ্ধারের জন্যই সন্ন্যাসের এই ফাঁদ পাতা! সাধারণ মানুষের মনের খবর তিনি রাখতেন। সন্ন্যাসীকে সকলেই ভক্তি করে—আশ্রয় নেয় তাঁর চরণে, সুতরাং জগৎ উদ্ধার করতে হলে সন্ন্যাস গ্রহণ করতেই হবে। ঠাকুর কৃষ্ণদাস বলেছেন, সন্ন্যাস গ্রহণ পাষণ্ডীদের ধরার জন্য 'মহা-জাল' কিংবা 'চোরা কাঁটা'। নবদ্বীপের ঘটনা সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা ওয়াকিবহাল বৃন্দাবনদাসেরও সেই একই কথা। তথ্য এবং তত্ত্বের সম্মিলন ঘটেছে এখানে। সুতরাং চৈতন্যদেবের এই ভাবনাই যে সত্য সে-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

প্রথমে বৃন্দাবনের পরিবর্তে দক্ষিণ ভ্রমণের কারণ

বৃন্দাবনদাস একাধিকবার শুনিয়েছেন যে, চৈতন্যদেবের মনের কথা জানা ছিল খুবই কঠিন। সন্ন্যাসী হয়েও তিনি স্পষ্ট ক'রে অনেক সময়েই নিজ উদ্দেশ্যের কথা বলেন নি। বর্তমানে রাজনীতিবিদরা যেমন সকল কথা স্পষ্ট ক'রে বলেন না চৈতন্য-দেবও সেকালে সেরূপই করতেন। সে কালে দেশের রাজনৈতিক অবস্থাই তাঁকে হয়ত এ ধরনের আচরণ করতে প্রণোদিত করেছিল। নীলাচলে যাবার পথে নিত্যানন্দ সন্ন্যাসী চৈতন্যদেবের দণ্ড ভাঙলেন, সে সময় চৈতন্যদেব সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাস বলেছেন—

কে বুঝিতে পারে গৌরসুন্দরের লীলা।
মনে করে এক, মুখে পাতে আর খেলা॥
... ...
মারিবেন হেন যারে আছয়ে অন্তরে।
তাহারেও দেখি যেন মহা প্রীতি করে॥ [তদেব : পৃ. ২৬০]

যাঁকে মারবেন স্থির করেন তাঁকেও প্রীতি করেন—এ তো রাজনীতিবিদদের মানসিকতা।

অন্তরের কথা প্রকাশ করেন না তাঁরাই। বৃন্দাবনদাস অন্যত্র বলেছেন—'ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিবারে শক্তি কার'। [তদেব : পৃ. ২৮৬]

কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যদেব রূপ সনাতনকে বলেছেন—

গৌড় নিকট আসিতে মোরে নাহি প্রয়োজন।
তোমা দোঁহা দেখিতে মোর ইহা আগমন ॥
এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে।
সবে বোলে কেন আইলা রামকেলি গ্রামে ॥

রূপ-সনাতন চৈতন্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন 'অর্ধরাত্রে' এবং 'বেশ লুকাইয়া'। হুসেন শাহের অজ্ঞাতসারে সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের : চৈতন্যদেব পূর্ব থেকেই তা বুঝেছিলেন। হুসেন শাহের কাছে থেকে তাঁর যাত্রার উদ্দেশ্য গোপন রাখা তাই একান্ত প্রয়োজন ছিল—সুতরাং ঘোষিত হয়েছিল বৃন্দাবন যাত্রার কথা। চৈতন্যদেব সন্ন্যাসী ছিলেন কিন্তু তাঁর কার্যকলাপ তাঁকে রাজনৈতিক সন্ন্যাসী ব'লেই পরিচিত করে।

পিতৃপিণ্ডদানের জন্য গয়ায় গেলেন তিনি; তখনো তিনি শ্রীবাসের ভাষায় 'উদ্ধতের চূড়ামণি' (চৈ. ভা. : পৃ. ৬১)। বৃন্দাবনদাসও তাঁর সে সময়কার অবস্থা বর্ণনা ক'রে বলেছেন 'তেমন উদ্ধত আর নাহি নবদ্বীপে' (পৃ. ৬০)। কিন্তু গয়া থেকে আসার পর তাঁর সম্পূর্ণ পরিবর্তন লক্ষিত হয়, ঔদ্ধত্য গেছে—কৃষ্ণ নামে ক্রন্দন করেন—

যেইজন আইসে প্রভুরে সম্ভাষিতে।
প্রভুর চরিত্র কেহো না পারে বুঝিতে ॥
পূর্ব-বিদ্যা ঔদ্ধত্য না দেখে কোন জন।
পরম বিরক্ত-প্রায় থাকে সর্বক্ষণ ॥ [চৈ. ভা. : পৃ. ৯৬]

এ রকম মানসিকতা নিয়ে গয়া থেকে মথুরা-বৃন্দাবন যাত্রার আকাঙ্ক্ষা জাগাই স্বাভাবিক। সমস্ত জীবনীকাররাই সেই ইচ্ছার কথাই জানিয়েছেন। বৃন্দাবনদাস শুনিয়েছেন।—

কাহারে না বলি প্রভু কথো রাত্রি শেষে।
মথুরায়ে চলিলেন প্রেমের আবেশে ॥ [তদেব : পৃ. ৯১]

কিন্তু যাওয়া হলো না সে-যাত্রা! বৃন্দাবনদাস দৈববাণীর সাহায্য নিলেন যাত্রা স্থগিতের উদ্দেশ্যে। চৈতন্যদেব একাই তো চলেছিলেন পথে, তিনিই শুনলেন দৈববাণী। তাঁর নিকট থেকেই তাহলে অন্যরা শুনেছেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর যিনি রাজনীতি-বিদদের ন্যায় আচরণ করেন, তাঁর এ-সময়ের আচরণেও কোন উদ্দেশ্য ছিল না এমন কথা অতি সহজেই কি বলা যায়!

এক মহান আদর্শ নিয়ে তিনি জীবন আরম্ভ করেছিলেন। জ্ঞান অর্জন ক'রে তাঁর সত্য উপলব্ধি হয়েছিল। যদি সব মানুষের মধ্যেই ভগবান থাকেন তবে সব মানুষকে সমান ব'লে স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু জ্ঞানের পথ দুরূহ, প্রেমের পথেই মানব-ঐক্য স্থাপন সম্ভব। মথুরা-বৃন্দাবনে গেলে সাধারণ মানুষদের ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করবে কে? প্রেমের রাজ্যে পৌঁছবার পরিচয় মথুরা-বৃন্দাবনের ভাবনায় কিন্তু কর্তব্য নবদ্বীপে অক্লান্ত কর্মে। মথুরা-বৃন্দাবনের অন্তরালে তিনি সর্ব মানবকে সংগঠিত

করার উদ্দেশ্যকে গোপন রাখতে চেয়েছিলেন। সেটা রাজনীতি হ'লেও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার, মানব কল্যাণ সাধনের রাজনীতি! সেকালে এটার বিশেষ প্রয়োজন ছিল—'কে বুঝিতে পারে গৌরচন্দ্রের লীলা।'

লোচনদাসও দৈববাণী শুনিয়েছেন। তবে তাঁর বিশ্বম্ভর সদলবলে মথুরা-বৃন্দাবন যাত্রার উদ্যোগ করেছিলেন। এ দৈববাণী অবশ্যই বৃন্দাবন যাত্রা বন্ধ করেই ক্ষান্ত হয় নি, তাঁর ভবিষ্যতের ইঙ্গিতও করেছে—

শুন শুন মহাপ্রভু অহে বিশ্বম্ভর।
না যাইবে বৃন্দাবন যাহ নিজ ঘর॥
সন্ন্যাস করিয়া তীর্থ করিবে পর্যটন।
সময়ের বশ হইঞা যাবে বৃন্দাবন॥ [চৈ. ম. : পৃ. ৮৮]

জয়ানন্দও মথুরা যাবার সংকল্পের কথা বলেছেন। সঙ্গীদের তিনি দেশে ফিরে যেতে অনুরোধ ক'রে জানালেন—'মথুরা জাইব আমি না জাইব দেশে'। জয়ানন্দ, শ্রীনিবাস, মুরারি, মুকুন্দ গদাধরদের সঙ্গীরূপে বর্ণনা করেছেন। বিশ্বম্ভরের মথুরা যাবার ইচ্ছায় সকলে ক্রন্দন আরম্ভ করলেন। যাওয়া হলো না বিশ্বম্ভরের। সকলের সঙ্গে দেশেই ফিরতে হ'লো তাঁকে। কিন্তু জয়ানন্দ দৈববাণী শোনান নি—'সভার ক্রন্দন শুনি না গেলা মথুরা [চৈ. ম. : পৃ. ৪৯]।'

সুতরাং গয়া থেকে মথুরা-বৃন্দাবনে যাবার ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি ফিরে এলেন নবদ্বীপে। বিশ্বম্ভরের মানসিক অবস্থার যে পরিবর্তন ঘটেছিল তাতে তাঁর পক্ষে 'কৃষ্ণের' সন্ধানে মথুরা-বৃন্দাবন যাওয়াই ছিল স্বাভাবিক। তথাপি তাঁর এই দেশে ফিরে আসা কোন উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত করে না কি?

এর পর ঘটলো কাজী দমন। একটু বিশদভাবে বিষয়টা দেখা প্রয়োজন। বৃন্দাবন দাস বলেছেন যে, কীর্তনের ওপর কাজীর আক্রমণ অহেতুক; এ আক্রমণ হিন্দুত্বের ওপর মুসলমান শাসকের ক্রোধ প্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়—

একদিন দৈবে কাজী সেই পথে যায়।
মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ শুনিবারে পায়॥
হরি-নাম কোলাহল চতুর্দিগে মাত্র।
শুনিয়া স্মঙরে কাজী আপনার শাস্ত্র॥ [চৈ. ভা. : ২১৫]

'নিমাঞি আচার্যের ওপর ক্রোধও প্রকাশ করেন কাজী, ক্রুদ্ধ কাজী—

যাহারে পাইল কাজী, মারিল তাহারে।
ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ অনাচার কৈল দ্বারে॥
... ...
কাজী বোলে "হিন্দুয়ানী হইল নদীয়া।
করিমু ইহার শাস্তি নাগালি পাইয়া॥
ক্ষমা করি যাঙ আজি, দৈব হৈল রাতি।
আর দিন লাগি পাইলেই লৈব জাতি॥ [তদেব : পৃ. ২১৬]

এই ক্রুদ্ধ হিন্দু বিদ্বেষী কাজীকে দমন করেছিলেন নিমাই। বৃন্দাবন দাস বলেছেন

যে, কাজীর উদ্যান সমূহ নষ্ট করা হলো, ভেঙে ফেলা হল তাঁর ঘর-দ্বার। কাজী পলায়ন ক'রে প্রাণ বাঁচালেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের কাজী অভিযোগ পেয়েছেন ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কাছ থেকে।

মৃদঙ্গ করতাল সঙ্কীর্তন উচ্চধ্বনি।
হরি হরি ধ্বনি বিনে আর নাহি শুনি॥
শুনিঞা যে ক্রুদ্ধ হৈল সকল যবন।
কাজি পাশে আসি সবে কৈল নিবেদন॥ [চৈ. চ.]

সমধর্মীদের অভিযোগ পেয়ে ক্রুদ্ধ কাজী এলেন নবদ্বীপে, ভাঙলেন মৃদঙ্গ, সক্রোধে ঘোষণা করলেন—

এত কাল কেহ নাহি কৈল হিন্দুয়ানী।
এবে উদ্যম চালাও কোন বল জানি॥
কেহ কীর্তন না করিহ সকল নগরে।
আজি আমি ক্ষমা করি যাইতেছি ঘরে॥
আর যদি কীর্তন করিতে লাজ পাইমু।
সর্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু॥ [তদেব]

তাত্ত্বিক কবিরাজ গোস্বামীর বিশ্বম্ভর এক্ষেত্রে তথ্যনিষ্ঠ বৃন্দাবন দাসের বিশ্বম্ভরের ন্যায় কাজীর ঘর-দ্বার ভাঙেন নি—আপোষ করেছেন এবং কাজীকে দিয়ে নিজ ধর্মের ত্রুটি স্বীকার করিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু দুই জীবনীকারই কাজীর মূল লক্ষ্যের কথাটি একইভাবে উল্লেখ করেছেন : কাজীর ক্রোধ হিন্দুয়ানীর উপর এবং পুনরায় হিন্দুয়ানী দেখলে তিনি জাতি নেবেন, বিশ্বম্ভরকে এই হিন্দুয়ানীর প্রধান পুরুষ বলে যে কাজী চিহ্নিত করেছিলেন তা বৃন্দাবনদাস স্পষ্ট ক'রে বলেছেন ইঙ্গিতে বলেছেন কৃষ্ণদাস।

বিশ্বম্ভর জানতেন—

হিন্দুকুলে কেহো যেন হইয়া ব্রাহ্মণ।
আপনেই গিয়া হয় ইচ্ছায় যবন॥ [চৈ. ভা. পৃ. ৮১]

এঁদের সম্বন্ধে কোন বিরোধ করবার কথা নয়। তিনিও তো বৌদ্ধ, এমন কি মুসলমানদেরও স্বেচ্ছায় বৈষ্ণব হবার জন্য আহ্বান করেছিলেন। স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হওয়া ব্যতীত সেকালে তো 'জাতি নেওয়াও' হচ্ছিল জোর করে : ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন যে, হুসেন শাহের আমলে ভারতে আগত পোর্তুগীজ পর্যটক দুয়ার্ট বারবোসা (Duart Barbosa) বলেছিলেন যে, রাজার এবং তাঁর পদস্থ কর্মচারীদের পৃষ্ঠপোষকতা পাবার উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশে বহু মূর্তি উপাসক প্রতিদিন দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন (History of Mediaeval Bengal : p. 57)।

নিশ্চিতরূপেই সে যুগের সমাজ-সচেতন ধর্মনেতা চৈতন্যদেবের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। স্বার্থরক্ষায় ধর্মান্তর ধর্মকে রক্ষা করে না—এতে প্রকৃত ইসলামেরও ক্ষতি। রাজশক্তির সঙ্গে সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন তিনি। নিতান্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কোন দিক বিচার না ক'রে তিনি সুলতানের প্রশাসনিক প্রতিনিধি কাজীর সঙ্গে বিরোধে প্রবৃত্ত হন নি : রাজশক্তির সঙ্গে বিরোধ সহজে মেটে না। বৃন্দাবনদাস কাজীর গৃহাদি

যে ভাবে বিধ্বস্ত করিয়েছেন তাতে কাজী প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবেন না এটা হতেই পারে না—কোন রাজশক্তিই মাথা নত ক'রে অপমান মেনে নেয় না। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরোধের যে আপোসই করুন না কেন অভিযোগকারীরা তা মেনে নেবে কেন? সুতরাং কাজীদমনেই সমস্ত বিরোধের অবসান হয়েছিল এটা মনে করা ভ্রমাত্মক।

এ ব্যাপারের কিছু পরেই বিশ্বম্ভর সন্ন্যাস নিলেন। পাষণ্ডীদের নিকটে টেনে এনে প্রেম ধর্মে তাদের দীক্ষিত করা ছিল বিশ্বম্ভরের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। তাদের নিকটে টেনে নিতে না পারলে সুযোগ-সন্ধানীর মতো তারা ধর্মান্তর গ্রহণ করতে পারে। 'সন্ন্যাসি-বুদ্ধ্যে মোরে করিবে নমস্কার' (চৈ. চ. পৃ. ৩৬)। সন্ন্যাস গ্রহণের আরও একটা উদ্দেশ্য থাকাও বিচিত্র নয়—রাজশক্তির সঙ্গে বিরোধ একটু থমকে যাবে—সহসা সন্ন্যাসীর সঙ্গে কাজী বিরোধ করতে সাহস পাবেন না। চৈতন্যদেবের মনোভাব তো কারও বোধগম্য ছিল না!

সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি নবদ্বীপে ফিরছেন না এমন কথাই ঘোষণা করলেন। সন্ন্যাস গ্রহণে বাধা আসতে পারে এই ভয়ে সামান্য কয়েকজনকে মাত্র জানানো হয়েছিল সন্ন্যাস গ্রহণের দিনটির কথা। হয়তো বা সুলতানের প্রশাসকদেরও তিনি কিছু জানতে দিতে চান নি। বৃন্দাবনদাস বলেছেন যে, সন্ন্যাস গ্রহণের পর গুরু এবং কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চললেন বনের দিকে; তিনি আচার্য চন্দ্রশেখরকে পাঠিয়ে দিলেন নবদ্বীপে। আচার্যের নিকট সংবাদ পেয়ে বৈষ্ণব ভক্তরা বিলাপ করতে লাগলেন: এমন সময় দৈববাণী হলো যে, চৈতন্যদেব দু'চার দিনের মধ্যেই নবদ্বীপে আসবেন।

চৈতন্যদেব সকলকে নিয়ে পশ্চিম দিকে চললেন। নির্জনে বনবাসের ইচ্ছা জানালেন। সে রাত্রি এক গ্রামে থেকে পরের দিন চলতে আরম্ভ করলেন পূর্বদিকে, বললেন—'আমি চলিলাঙ নীলাচলে'—

> জগন্নাথ প্রভুর হইল আজ্ঞা মোরে।
> "নীলাচলে তুমি ঝাট আইস সত্বরে" ॥ [চৈ. ভা. : পৃ. ২৪৮]

অন্য কারও ইচ্ছায় তিনি নীলাচলে গিয়ে থাকেন নি, জগন্নাথের নাম ক'রে তিনি নিজের ইচ্ছাই প্রকাশ করেছিলেন। জয়ানন্দও বলেছেন যে, নীলাচলে যাবার জন্য গৌরচন্দ্র প্রস্তুত হলেন। লোচনদাসও বলেছেন যে, সন্ন্যাস গ্রহণের পরদিন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুরুর নিকট বিদায় চাইলেন—

> প্রভাতে উঠিয়া প্রভু মাগেন বিদায় ॥
> গুরু প্রদক্ষিণ করি' করয়ে প্রণাম।
> নীলাচল যাই যদি পাই সম্বিধান ॥ [চৈ. ম. : পৃ. ১৫৭]

সুতরাং লোচনের মতেও নীলাচলে যাবার সিদ্ধান্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নিজেরই।

কেবল তাত্ত্বিক কবিরাজ গোস্বামী নীলাচলে বাসের ব্যাপারে অন্য কথা বলেছেন। তাঁর মতে চৈতন্যদেবের বাসস্থান নির্ধারণের দায়িত্ব তিনি ভক্তদের ওপরই ছেড়ে দিয়েছিলেন; শচীমাতাই নীলাচল নির্দেশ করেন, বলেন—

তাতে এই যুক্তি ভাল মোর মনে লয়।
নীলাচলে রহে যদি দুই কার্য হয়॥
নীলাচলে নবদ্বীপে যৈছে দুই ঘর।
লোক গতাগতি বার্তা পাব নিরন্তর॥
তুমি সব করিতে পার গমনাগমন।
গঙ্গাস্নানে কভু হৈবে তাঁর আগমন॥ [চৈ. চ. ঃ পৃ. ১৩৩]

সন্ন্যাসীর রীতি অনুযায়ী নবদ্বীপ ব্যতীত রাঢ়-গৌড়-বঙ্গের যে কোন স্থানে তিনি থাকতে পারতেন বটে কিন্তু তা না থেকে স্বাধীন বৈষ্ণব গজপতি রাজার রাজত্বে বসবাসই তিনি যুক্তিযুক্ত ব'লে মনে করেছিলেন। আসামের স্বাধীন হিন্দু রাজাদের থেকেও উড়িষ্যার প্রতাপরুদ্রদেব অধিকতর পরাক্রমশালী ছিলেন। আসামের কিছুটা অংশ এক সময় হুসেন শাহ দখল ক'রে নিয়েছিলেন কিছুদিনের জন্য। গজপতির অনুপস্থিতির সুযোগে হুসেন শাহ নীলাচল পর্যন্ত অগ্রসর হলেও গজপতির প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের সুলতান পিছু হঠে আসেন। গজপতির অন্যতম প্রধান দুর্গাধ্যক্ষ-অমাত্য গোবিন্দ বিদ্যাধর বিশ্বাসঘাতকতা না করলে সে যাত্রা হুসেন শাহকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে হতো না। চৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যদেবকে বলতে শুনি, 'যদ্যপি সহসা মুঞি করিয়াছি সন্ন্যাস'—সহসা সন্ন্যাসের কারণ কাজীকে অসুবিধায় ফেলা ব'লে মনে করা বিশেষ ভুল না হওয়াই সম্ভব। সন্ন্যাস সত্ত্বেও স্থায়ী ভাবে সুলতানের রাজ্যে অবস্থান বিদ্রোহের পক্ষে যুক্তিযুক্ত ছিল না, অথচ প্রেমধর্ম প্রচারের দ্বারা মানুষের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতেও হবে। নবদ্বীপের নিকটে তাই থাকার প্রয়োজন ছিল ঃ গৌড়ে প্রচারের দায়িত্বও তাই বলিষ্ঠ নিত্যানন্দের ওপরই দিয়েছিলেন তিনি।

হুসেন শাহ মোটামুটি ভাবে ভাল রাজা ছিলেন সন্দেহ নেই ; তাঁর সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্য নতুন গতি পায়, তাঁর অনেক হিন্দু পদস্থ কর্মচারীও ছিল। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃতও হিন্দু পদস্থ কর্মচারীদের মুখ দিয়েই বলিয়েছেন—রূপ-সনাতনের কথায়—

যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ॥
তথাপি যবনজাতি না করি প্রতীতি। [চৈ. চ. ঃ পৃ. ১০৬-১০৭]

কেশব ছত্রী বলেছেন সুলতানকে—

যবনে তোমার ঠাঁই করয়ে লাগানি।
তার হিংসায় লাভ নাহি হয় মাত্র হানি॥ [তদেব ঃ পৃ. ১০৪]

বৃন্দাবনদাস বলেছেন যে, হুসেন শাহ গৌরচন্দ্রের প্রশস্তি ক'রে অন্তঃপুরে গেলে হিন্দু পদস্থ কর্মচারীরা পরামর্শ করতে বসলেন—

স্বভাবেই রাজা মহাকাল-যবন।
মহাতমোগুণবুদ্ধি জন্মে ঘনেঘন॥
ওড্রদেশে কোটি কোটি প্রতিমা প্রসাদ।
ভাঙ্গিলেক কত কত করিলে প্রমাদ॥

দৈবে আসি সত্ত্বগুণ উপজিল মনে।
তেঁঞি ভাল কহিলেন আমা সভা স্থানে ॥
আর কোন পাত্র আসি কুমন্ত্রণা দিলে।
আরবার কুবুদ্ধি আসিয়া পাছে মিলে ॥ [চৈ. ভা. ঃ পৃ. ২৮৪]

এর ওপর যদি কাজীর সঙ্গে তাঁর বিরোধের কথা কেউ স্মরণ করিয়ে দেয়! চৈতন্যদেব এসব ভেবে নীলাচলে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চেয়েছিলেন এটা স্বীকার করাই কি যুক্তি যুক্ত নয়? বিদ্রোহের নামে হঠকারিতা মূর্খতা মাত্র—উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রচেষ্টাই লক্ষ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেই লক্ষ্য স্থির রেখেই পদক্ষেপ করছিলেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন যে, সন্ন্যাসের পর ভাবের আবেগে চৈতন্যদেব বৃন্দাবন যাবার উদ্যোগ করেছিলেন কিন্তু নিত্যানন্দ তাঁকে ভুলিয়ে নবদ্বীপে নিয়ে আসেন। একথা কি খুব বিশ্বাসযোগ্য? অতবড় পণ্ডিত চৈতন্যদেবের ভৌগোলিক জ্ঞান কি এতই সামান্য! আবেশ কি তাঁকে তিন চার দিন আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল? চৈতন্যদেবের বৃন্দাবন যাবার প্রকৃত ইচ্ছা থাকলে কি নিত্যানন্দ তাঁকে ভুলিয়ে নবদ্বীপে আনতে সাহস পেতেন? পুনরায় স্মরণ করা যেতে পারে 'অচিন্ত্য গৌরাঙ্গ তত্ত্ব বুঝান না যায়' ঃ [চৈ. ভা. ঃ পৃ ১৮২] এবং 'বুঝিতে না পারে কেহ দুই প্রভুর মতি।' [চৈ. চ. ঃ পৃ. ১৭১]। ইচ্ছাকৃত ভাবেই চৈতন্যদেব এসেছিলেন নবদ্বীপে এ কথা মনে করা খুবই স্বাভাবিক। সন্ন্যাসের পর ভক্তদের সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটিয়ে তাঁদের উৎসাহ বর্ধনের প্রয়োজন ছিল। চৈতন্যদেবের উপস্থিতি, তাঁর ব্যক্তিত্ব, উৎসাহ জাগিয়ে তুলতো ভক্তদের মনে। প্রতি বৎসর রথযাত্রার কালে সকলকে নীলাচলে আসতে বলা কেবল তীর্থ দর্শনের উদ্দেশ্যে নাও হ'তে পারে। তীর্থ তো বহু আছে, বিশেষ ক'রে বৈষ্ণবদের আছে মথুরা-বৃন্দাবন। কিন্তু সে-সব স্থানে চৈতন্যের সান্নিধ্যের উন্মাদনা তো ছিল না!

চৈতন্যদেব কিছুদিন থাকলেন নীলাচলে। বিভিন্ন স্থান থেকে স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি ভক্তরা এখানে এসে উপস্থিত হলেন; চৈতন্যদেবকে দেখেই আকৃষ্ট হতেন তীর্থ যাত্রীরা। 'সচল জগন্নাথ' ব'লে ততদিনে পরিচিত হয়েছেন তিনি।

বৃন্দাবনদাস বলেছেন যে, চৈতন্যদেব পুনরায় 'গৌড়দেশে আইলেন কুতূহলে' (চৈ. ভা. ঃ পৃ. ২৭৫)। এখানে বিভিন্ন স্থানে বহু মানুষকে, প্রেম ধর্মে দীক্ষিত ক'রে তিনি মথুরার পথ ধরলেন—'মথুরা চলিলেন ভক্তগোষ্ঠী লৈয়া'। (তদেব ঃ পৃ.২৮৩) কিন্ত দেখা গেল যে, তাঁর লক্ষ্য ছিল প্রচারকার্য; এখানে হুসেন শাহের পদস্থ হিন্দু কর্মচারীদের ওপর প্রভাব বিস্তার ক'রে তিনি ফিরলেন শান্তিপুরে—এরপর এলেন কুমারহট্ট, পানিহাটি, বরাহনগর। বৈষ্ণবদের ঘরে ঘরে থাকলেন অনেকদিন, নিজের ভাব বিহ্বলতার স্পর্শে বৈষ্ণব করলেন বহু মানুষকে ঃ তারপর ফিরে গেলেন নীলাচলে।

চৈতন্যচরিতামৃতও বলেছেন যে, বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে চৈতন্যদেব এলেন রামকেলি গ্রামে—সেখানে 'অর্ধরাত্রে' কৃপা করলেন ছদ্মবেশী রূপ-সনাতনকে, এঁরা ছিলেন হুসেন শাহের পদস্থ হিন্দু কর্মচারী। বৃন্দাবন যাত্রার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা ক'রে গোপনে উদ্দেশ্য সাধন করলেন তিনি। পরবর্তীকালে এই রূপ-সনাতনকে তিনি বৃন্দাবন-মথুরায় প্রচারের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। রূপ-সনাতনকে কৃপা ক'রে

কানাইয়ের নাটশালা পর্যন্ত গিয়ে তিনি ফিরে এলেন নীলাচলে। রূপ-সনাতনের কথায় যদি 'লোক-সংঘট্ট' নিয়ে বৃন্দাবন যাওয়া উচিত নয় ব'লেই তিনি মনে ক'রে থাকেন তবে কানাইয়ের নাটশালা পর্যন্ত যাবার কি প্রয়োজন ছিল? রামকেলি গ্রামে অর্ধরাত্রে গোপনে রূপ সনাতনকে 'কৃপা করা' রূপ যে কার্যটি তিনি করেছিলেন তাকে আরো গোপনে রাখাই কি তাঁর উদ্দেশ্য ছিল? রামকেলি থেকে ফিরে এলে কোন না কোন সময়ে হুসেন শাহের সন্দেহ জাগতে পারতো, সে ধরনের কোন সন্দেহ যাতে না জাগে সেই উদ্দেশ্যেই কি চৈতন্যদেবের আরও খানিকটা এগিয়ে যাওয়া? তা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত শেষ রক্ষা হয় নি, রূপের গৃহত্যাগের পর সনাতনকে কারারুদ্ধ করেন হুসেন শাহ সন্দেহের বশবর্তী হয়েই। এ ঘটনার পর অর্থাৎ সনাতনকে বন্দী করার পর চৈতন্যদেব আর গৌড়ে যান নি। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, চৈতন্যদেবের সমাজ-চিন্তা স্বাভাবিক ভাবেই রাজনীতি ঘেঁষেই চলেছিল—সর্বকালেই সমাজ-চিন্তায় রাজনীতি ওতোপ্রোতভাবে জড়িত থাকেই।

মথুরা-বৃন্দাবনের কথা বহুবার উত্থিত হলেও এবং কৃষ্ণ-রসে রসিকের পক্ষে বৃন্দাবন মথুরায় যাওয়া খুবই স্বাভাবিক হলেও নীলাচল থেকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রথমে দক্ষিণ দেশে গেলেন কেন? রামানুজের দেশ দেখার উদ্দেশ্যে, না তার থেকেও বড় কিছু উদ্দেশ্য ছিল? উত্তর ভারতে সে-সময় বহু সমাজ-সচেতন সাধক ছিলেন, মাধব পুরী-ঈশ্বর পুরী, পরমানন্দ পুরী, নিত্যানন্দ, দিগ্বিজয়ী প্রভৃতির নিকট শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সে-সংবাদ পেয়েছিলেন এমন অনুমান করা অযৌক্তিক নয়। তথাপি দক্ষিণ দেশ পর্যটনেই গেলেন তিনি প্রথমে।

দিল্লী-মথুরা-বৃন্দাবন তখন মুসলমান সম্রাটের অধীনে কিন্তু দক্ষিণ ভারতে তখন বহু স্বাধীন হিন্দু রাজা ছিলেন—দিল্লীর বিরোধী মুসলমান বাহমনী রাজ্যও বেশ শক্তিশালী ছিল। দিগ্বিজয়ী যে সব স্থান থেকে জয়পত্রী নিয়ে এসেছেন তার কথা বলেছেন বৃন্দাবনদাস—

গৌড়, তিরোত, ডিল্লী, কাশী আদি করি।
গুজরাট, বিজয়ানগর, কাঞ্চী-পুরী॥
হেলঙ্গ, তেলঙ্গ, ওড্র দেশ আর কত।
পণ্ডিতের সমাজ সংসারে আছে যত॥ [চৈ. ভা. ঃ পৃ. ৬৬]

সব দেশের কথাই দিগ্বিজয়ীর কাছে শোনা সম্ভব। নিত্যানন্দের পর্যটনের তালিকায়ও বিজয়ানগরের নাম আছে—'তবে প্রভু আইলেন বিজয়ানগর' (তদেব ঃ পৃ. ৪৬)। সুতরাং বিজয়নগরের সমৃদ্ধির কথা, বৈষ্ণব ধ্যান-ধারণার কথা নিশ্চিতরূপেই জানা ছিল চৈতন্যদেবের। বহু বৎসর ধরে উড়িষ্যার বৈষ্ণব গজপতি রাজাদের যে যুদ্ধ চলছিল একথাও নিশ্চয়ই তিনি শুনে থাকবেন।

১৫১০ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে অর্থাৎ ওই বৎসর বৈশাখে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দক্ষিণ ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং নীলাচলে ফিরে আসেন ১৫১২ খ্রীস্টাব্দে রথযাত্রার পূর্বে আষাঢ় মাস (জুন) নাগাদ। ১৫০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৫১২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসটা ভাল ক'রে জানা প্রয়োজন।

R. Sewell-এর 'A Forgotten Empire' থেকে জানা যায় যে, দাক্ষিণাত্যে

হিন্দু মুসলমান রাজাদের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ লাগত। যুদ্ধে জয়-পরাজয়ে সর্বাপেক্ষা বিপদ হতো সাধারণ মানুষদের। হিন্দুর জয় হলে মুসলমান সুলতানের হাজার হাজার নিরীহ মুসলমান প্রজাকে নির্বিচারে হত্যা করা হতো—মুসলমানের জয় হলে নির্বিচারে হত্যা করা হতো হিন্দু সাধারণকে। মুসলমান রাজশক্তি সেই সঙ্গে আর একটি কাজ করতেন—হিন্দুর মন্দির ভেঙ্গে সেখানে মসজিদ বানানো হতো। ১৪৯০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই বাহমনী সাম্রাজ্য ভেঙ্গে ৫টি স্বাধীন মুসলমান রাজ্য স্থাপিত হয়, স্বভাবতই দক্ষিণে মুসলমান শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। বাহমনী সাম্রাজ্য যে পাঁচটি ভাগে ভাগ হয়ে যায় তারা যথাক্রমে (১) আদিল শাহ (বিজাপুর), (২) বারিদ শাহ (বিদর অথবা আমেদাবাদ), (৩) ইমাদ শাহ (বেরার), (৪) নিজাম শাহ (আমেদনগর), (৫) কুতুব শাহ (গোলকুণ্ডা)।

নরসিংহের রাজত্বকালে বিজয়নগরের গৌরব বৃদ্ধি হয়। বিশেষ ভাবে সংগঠিত হয় সমস্ত দেশ—প্রতিহত হয় মুসলমান আক্রমণ। "During the time of Narasinha the Muhammedan aggression was stayed by his power and the force of his armies, and that the empire of Vijayanagar was under him once more consolidated : R. Sewell pg. 109". নরসিংহের রাজত্বকাল ১৪৯৮ থেকে ১৫০৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। দিগ্বিজয়ী, নিত্যানন্দ প্রভৃতির নিকট থেকে চৈতন্যদেব নিশ্চিতরূপেই রাজা নরসিংহের সময়কার বিজয়নগরের কথাই শুনে থাকবেন। মুসলমান রাজশক্তির আক্রমণ প্রতিহতকারী নরসিংহের দেশ দেখার ইচ্ছা স্বভাবতই সুলতানের প্রশাসক কাজীর সঙ্গে সংঘর্ষকারী চৈতন্যদেবের হতেই পারে। সমাজ-সচেতন রাজনৈতিক অবস্থা উপলব্ধিকারী চৈতন্যদেবের মনে আরও কিছু ইচ্ছা কি জাগতে পারে না?

প্রশ্ন হতে পারে যে সন্ন্যাসীরা রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণার কথা নিয়ে সময় ব্যয় করবেন কেন? নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী তাঁর দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস গ্রন্থে (*A History of South India* · K A Nilkantha Sastri) সন্ন্যাসী বিদ্যারণ্যের কথা উল্লেখ করেছেন যাঁর শিক্ষা এবং প্রচারে সুলতানের শাসনকর্তা ধর্মান্তরিত হরিহর এবং তাঁর ভ্রাতা পুনরায় হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেন এবং ধর্মান্তরণে মুসলমান রাজশক্তির জবরদস্তি প্রতিরোধে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন সম্ভবতঃ ১৩৩০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী আরও বলেছেন যে, বিদেশাগত মুসলমানদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার আন্দোলন দাক্ষিণাত্যে আরম্ভ হয় প্রায় ১৩২৭ খ্রীস্টাব্দ থেকেই। তখন দাক্ষিণাত্যে নব-শৈবধর্মের অভ্যুদয় আরম্ভ হয়েছে—সুলতানদের মূর্তি ভাঙ্গা, মন্দির অপবিত্রকরণ এবং মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ নির্মাণকে বাধা দেবার প্রচেষ্টা দেখা দেয় —নব-শৈব ধর্মই ছিল এই সর্ব-ব্যাপী আন্দোলনের প্রেরণা স্থল। নব-শৈব ধর্ম অনুযায়ী ভক্তদের কোন জাত নেই, সকলেই সমান ঃ ইসলাম ধর্মের বিকল্প হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল তার মধ্যে। চৈতন্য দেবের প্রেমধর্মেও কোন জাত-পাতের ভাগ ছিল না—ভক্ত মাত্রেই সমান—এ সত্যই তিনি প্রচার করেছেন, সুবিধা ভোগের উদ্দেশ্যে ধর্মান্তর গ্রহণকারীদের তিনি পুনরায় স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বিশেষ করে গৌড় বঙ্গে তাঁর প্রবর্তিত প্রেমধর্ম সেকালে ইসলামের বিকল্প হয়ে ওঠার শক্তি অর্জন করেছিল। রাজশক্তির পরিবর্তন চৈতন্যদেব চান নি হয়তো কিন্তু ধর্মান্তরণের বিপুল বন্যাকে নিঃসন্দেহে তিনি প্রতিহত করতে

পেয়েছিলেন।—At that time, moreover, they and their leaders were under the influence of a strong revival of Saivism and in no mood to submit passively to the profanation and destruction of their temples and to the corruption and overthrow of their long-established usages.....in its ideals of perfect equality among the bhaktas, the new Saivism was a worthy rival of Islam, and the impetus it gave to politics had not a little to do with the failure of Tughlak rule to take root in many parts of the Deccan [Nilkantha Sastri *A History of South India* pg 236]। দক্ষিণ ভারতে অবশ্যই অনেকগুলো ছোট ছোট হিন্দু রাজ্য ছিল, ছিল বিজয়নগরের মতো বড় শক্তিশালী রাজ্যও—গৌড় বঙ্গে সে অবস্থা ছিল না।

দাক্ষিণাত্যের হিন্দু রাজারা উপলব্ধি করেছিলেন যে, ঐক্যবদ্ধ না হলে মুসলমান আক্রমণ তাঁরা প্রতিহত করতে পারবেন না। হরিহরের চেষ্টায় হিন্দু তীর্থ শৃঙ্গেরীতে এক বিরাট উৎসবে হিন্দু সন্ন্যাসীদের উপস্থিতিতে বহু হিন্দু শাসক একত্র মিলিত হয়েছিলেন ১৩৪৬ খ্রীস্টাব্দে। বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে এর সময় দাক্ষিণাত্যে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রচেষ্টা যে চলছিল সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নেই। বাহমনী সুলতান ১ম, ২য়, এবং ৩য় মহম্মদের সময় বিজয়নগরের সঙ্গে বারবার যুদ্ধ হয় (১৩৫৮-১৪৭৮): লক্ষ লক্ষ সাধারণ হিন্দু এবং হাজার হাজার পুরোহিতকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়। মন্দির ভেঙে মসজিদ নির্মাণও করা হয় বহু স্থানে—ফলে সে সময়ে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠার ব্যাপারে প্রধান বাধা ছিলেন হিন্দু-মুসলমান রাজশক্তি—বিশেষ ক'রে মুসলমান রাজশক্তি।

১৪২৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে বিজয়নগরের রাজা দেব রায়ের রাজত্বকালে উড়িষ্যার রাজাদের সঙ্গে বিরোধ চলতে থাকে। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন দেবরায় মুসলমান সুলতানদের ক্রমবর্ধমান শক্তিকে প্রতিহত করার উপায় স্থির করার জন্য এবং দেশের অভ্যন্তরে হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতি রক্ষার উদ্দেশ্যে মন্ত্রীদের নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। তারই ফলে মুসলমানরাও তাঁর সৈন্য বাহিনীতে যোগদানের অধিকার পান। স্বাধীন ভাবে ধর্মাচরণের সুযোগও পান। দেবরায়ের সিংহাসনের সামনে একটি কোরান স্থাপনের ব্যবস্থা হলো। এ ভাবে পুনর্গঠনের ফলে সৈন্যবাহিনী অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠলো। "Devaraya held a Council of his nobility to explore the cause of Muslim successes and devise means of counteracting them As a result Musalmans were therefore eligible for service in his army and allowed the free exercise of their religion; a Koran was placed before his throne that they "might perform the ceremony of obedience in his presence, without sinning against their laws" After this reorganization the army became a more efficient striking force (Ibid : p 271) সম্ভবত এ সময়ে বিজয়নগরের মুসলমানরা ধর্মাচরণে স্বাধীনতা লাভ করে এবং সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের অধিকার পেয়ে বিজয়নগরকে নিজ দেশ ব'লে মনে ক'রে হিন্দুদের পাশে এসে দাঁড়াতে পেরেছিলেন।

দেবরায়ের মৃত্যুর পরও বিজয়নগরের সঙ্গে উড়িষ্যার গজপতি রাজাদের যুদ্ধ চলতে থাকে। প্রতাপরুদ্রদেবের সঙ্গে বিজয়নগরের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের যুদ্ধও চলে বেশ কয়েক বৎসর। গজপতি কপিলেন্দ্রদেব বিজয়নগর সাম্রাজ্যের বহু অঞ্চল অধিকার করেন। সম্ভবত ১৪৬৭ খ্রীস্টাব্দে কপিলেন্দ্রদেবের মৃত্যু হয়; তখন বিজয়নগরের সালুভা নরসিংহ বিজয়নগরের অধিকার চ্যুত অনেক অঞ্চল অধিকার ক'রে নেন। সালুভা নরসিংহ ছিলেন বিজয়নগরের একজন সেনাপতি : লক্ষ্য করার বিষয়, চৈতন্যদেবের জন্ম বর্ষে ১৪৮৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি বিজয়নগরের সিংহাসনে বসেন। ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন যে, কপিলেন্দ্রর অন্যতম পুত্র পুরুষোত্তম উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করলেও বাহমনী সুলতানের সাহায্যে যখন কপিলেন্দ্র দেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র হাম্বির পুরুষোত্তমকে সিংহাসনচ্যুত করেন, তখন সালুভা নরসিংহ পুরুষোত্তমকে সাহায্য দেন এবং পুনরায় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করান। "It seems probably that Narasinha helped Purusottoma Gajapati to regain the throne of Orissa from which he had been expelled by Hambir with the aid of the Bahamani Sultan Muhammad III (Ibid pg 273)

১৪৯৬ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ ত্রিচনাপল্লী এবং তাঞ্জোরের শাসনকর্তারা শ্রীরঙ্গমের বৈষ্ণবদের ওপর অত্যাচার করতে থাকলে বিজয়নগরের সেনাপতি নরেশ নায়ক সে সব অঞ্চল অধিকার ক'রে নেন।

১৫০৯ খ্রীস্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথিতে বিজয়নগরের সর্ব শ্রেষ্ঠ রাজা কৃষ্ণদেব রায় বিজয়নগরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। হিন্দুদের সমস্ত ধর্মসম্প্রদায়ের ওপর তাঁর প্রীতি ছিল যদিও নিজেকে তিনি বৈষ্ণব ব'লেই মনে করতেন।

গৌড় বঙ্গে চৈতন্যদেব হুসেন শাহের মনোভাব লক্ষ্য করেছেন। অনেক বিষয়ে তিনি উদার মনোভাবের পরিচয় দিলেও ধর্মের ব্যাপারে তাঁর রাজ্যেও হিন্দুর 'জাতি' নেওয়া হতো, তিনি ধ্বংস করেছেন অনেক মন্দির। সেই সঙ্গে কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু ত্রুটি সত্ত্বেও তিনি দেখেছেন সুফীদের প্রেম-ধর্মের মহত্ত্ব। নিত্যানন্দ প্রভৃতির নিকট নিশ্চিতরূপে তিনি জেনেছিলেন সালুভ নরসিংহের কার্যকলাপের কথা; মুসলমান রাজশক্তির বিরুদ্ধে তাঁর ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার কথা, মুসলমান প্রজাদের মনে বিশ্বাস জাগিয়ে তুলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের মনোভাবের কথা; নিশ্চয়ই জেনেছিলেন বৈষ্ণবদের রক্ষার জন্য বিজয়নগরের সেনাপতির ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি। সুতরাং উড়িষ্যা এবং বিজয়নগরের বৈষ্ণব রাজাদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের প্রচেষ্টা গ্রহণ তাঁর মতো ব্যক্তিত্বের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না কি? তিনি বুঝেছিলেন যে, গৌড়-বঙ্গে অধিক দিন থেকে তিনি প্রেম-ধর্ম প্রচারের সুযোগ নাও পেতে পারেন— সেজন্য তাঁকে কিছুদিন অপেক্ষা করতেই হবে। সেই সঙ্গে বৈষ্ণব রাজাদের ঐক্যবদ্ধ করার স্বপ্নও তিনি দেখে থাকতে পারেন। তাই এলেন নীলাচলে; দেখলেন প্রতাপরুদ্রদেব গেছেন কৃষ্ণদেব রায়ের সিংহাসন আরোহণের মুহূর্তে অধিকৃত বিজয়নগরের অঞ্চলগুলো শক্তিশালী করতে। চৈতন্যদেবের উদ্দেশ্য প্রথম ঘা খেল। কিন্তু প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী চৈতন্যদেব হতাশ হলেন না : নীলাচলে সার্বভৌমকে বৈষ্ণব ক'রে যথা সম্ভব সত্বর তিনি বেরিয়ে পড়লেন দাক্ষিণাত্যের পথে।

দাক্ষিণাত্যে তিনি ত্রিমন্দনগর, ত্রিবঙ্কু, তাঞ্জোর, ত্রিচিন্নাপল্লী, কাঞ্চী, সেতুবন্ধ প্রভৃতি বহু স্থানে ভ্রমণ করেন। ত্রিবঙ্কুর-রাজা রুদ্রপতি এবং বরোদার 'গোবিন্দ সেবক' রাজা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ঃ ত্রিবঙ্কুর-রাজা রুদ্রপতি প্রেম ধর্মে দীক্ষিত হন, গোবিন্দের করচায় পাওয়া যায় যে, রাজার ভাবাবেগ দেখে চৈতন্যদেব বলেছিলেন—

দেখিয়া রাজার ভক্তি আমার নিমাই।
কোল দিয়া রাজারে বলেন এসো ভাই॥
হরিনামে যার চক্ষে বহে অশ্রুধারা।
সেইজন হয় মোর নয়নের তারা॥
দেখিয়া তোমার ভক্তি রাজা মহাশয়।
জুড়াল আমার প্রাণ জানিহ নিশ্চয়॥
এত বলি মহারাজে বিদায় করিয়া।
স্নান করিবারে প্রভু গেলেন চলিয়া॥

বরোদার রাজাও চৈতন্যদেবের নিকট মস্তক অবনত করেন। চৈতন্যদেব যে দক্ষিণ দেশে বহু হিন্দু রাজার ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নে । দক্ষিণের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের বিজয়নগরে গমনের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল চৈতন্যদেবের সুতরাং সেখানেও যে তিনি গিয়েছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ; কৃষ্ণদেব রায়ের ওপর সে যাত্রা যে তিনি অধিক প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি এটা ইতিহাস থেকে অনুমান করা যায়। 'অধিক প্রভাব বিস্তার' করতে পারেন নি বললে কিছু প্রভাব পড়ে থাকতে পারে ব'লে মনে হতে পারে। ইতিহাসের সাক্ষ্য নেওয়া যাক ; সিউয়েল বলেছেন যে, রায়চুড়ে অগ্রগতির অন্তত পাঁচ বৎসর পূর্বে, উদয়গিরি এবং পূর্বাঞ্চলের দুর্গের বিরুদ্ধে অভিযানের অন্তত পক্ষে এক বৎসর পূর্বে, কৃষ্ণদেব রায় মুসলমান সুলতানের বিরুদ্ধে একটা বড় রকম আক্রমণের কথা চিন্তা করছিলেন। "We learn . that Krishna Dev Raya was meditating a grand attack on the Muhammedan as least 5 years before his ceadvan to Raichur—a year even before his expedition against Udaigiri and the fortress on the east" R. Sewell: *A Forgotten Empire* pg. 12৪. ১৫১৩ খ্রীস্টাব্দে কৃষ্ণদেব রায় উদয়গিরি অভিযান করেন—তার এক বৎসর পূর্বে ১৫১২ খ্রীস্টাব্দের প্রথম চার-পাঁচ মাস পর্যন্ত চৈতন্যদেব ছিলেন দক্ষিণ দেশে হিন্দু রাজ্য আক্রমণ না ক'রে বিদেশী মুসলমান রাজ্য আক্রমণের ইচ্ছা কেন জেগেছিল কৃষ্ণদেব রায়ের মনে ? কিন্তু রাজনীতি নানাভাবে মানুষকে প্ররোচিত করে। প্রতাপ রুদ্রদেব কৃষ্ণদেব রায়ের সিংহাসনে আরোহণের কালে ১৫০৯ খ্রীস্টাব্দে চলে এসেছিলেন দাক্ষিণাত্যে এবং সুলতান হুসেন শাহকে প্রতিহত করতে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন উড়িষ্যায় —পুনরায় পশ্চাৎ দিক থেকে আক্রমণের আশঙ্কায় তাই কৃষ্ণদেব রায় হয়তো গজপতিকে দূরে সরিয়ে রাখতেই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিলেন। সুতরাং কৃষ্ণদেবের ওপর চৈতন্যদেবের প্রভাব পড়লেও তা কার্যকর হয় নি। ইতিহাস এ পর্যন্ত সেই সাক্ষ্যই দেয়।

১৫১২ খ্রীস্টাব্দের মে-জুন মাসে চৈতন্যদেব ফিরে আসেন নীলাচলে। ১৫১৩ বা ১৫১৪ খ্রীস্টাব্দে রথযাত্রার পরে তিনি বৃন্দাবনের পথে যাত্রা করেন ; ১৫১৫ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকেই সম্ভবত তিনি উত্তর ভারত পর্যটন ক'রে ফিরে আসেন নীলাচলে।

১৫১৫-১৬ খ্রীস্টাব্দেই ১৪৫৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে উড়িষ্যার অধিকৃত কোণ্ডভিড়ুর দুর্গম দুর্গ কৃষ্ণদেব রায় অধিকার ক'রে নেন।

কবিরাজ গোস্বামী তাঁর চৈতন্যচরিতামৃতে ছয় বৎসর 'গমনাগমনের' কথা বলেছেন। সাড়ে তিন থেকে চার বৎসর দাক্ষিণাত্যে এবং উত্তর ভারতে গমনাগমন ধরলে আরও আড়াই বা দু'বছর অবশিষ্ট থাকে। হুসেন শাহের জীবৎকালে চৈতন্যদেব গৌড়-বঙ্গে বহু দিন অতিবাহিত করেন নি; হুসেন শাহের মৃত্যু হয় ১৫১৯ খ্রীস্টাব্দে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে শেষ বার বৎসর চৈতন্যদেব নীলাচলে ছিলেন—অন্যত্র গমন করেন নি। সুতরাং ১৫২১ খ্রীস্টাব্দের পর তিনি অন্য কোথাও যান নি এরকম সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। অনুমান করা অসংগত নয় যে, নিত্যানন্দ ১৫১৯ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে ব্যাপক ভাবে প্রেম-ধর্মের প্রচার আরম্ভ করতে পেরেছিলেন। এই প্রচারের অবস্থা প্রত্যক্ষ করার উদ্দেশ্যে এবং শেষবারের মতো জন্মভূমি দেখতে চৈতন্যদেব একবার রাঢ় অঞ্চলে এসেছিলেন নিশ্চয়ই এবং সেটা ১৫২১ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে মাস ছয় হ'তে পারে। তাহলে দেড় থেকে দু'বছর অবশিষ্ট থাকে 'গমনাগমনের' জন্য। দক্ষিণ দেশে প্রথমবারে তিনি যে সাফল্য অর্জন করেছিলেন তাকে পূর্ণতা দিতে তাঁর দ্বিতীয়বার দক্ষিণ দেশে যাওয়াই সম্ভব। দক্ষিণ দেশের সাহিত্যে এবং সমাজ জীবনের নানা ক্ষেত্রে চৈতন্যদেবের যে প্রভাব লক্ষিত হয় তা এই দ্বিতীয়বার যাত্রাকেই সমর্থন করে। ১৫১৫/১৫১৬ খ্রীস্টাব্দে কৃষ্ণদেব রায় কোণ্ডভিড়ু অধিকার করার পরই চৈতন্যদেব আর একবার দক্ষিণ দেশে যাত্রার প্রয়োজন অনুভব করেন বলেই মনে হয়।

গোদাবরী বা কূর্মক্ষেত্রে চৈতন্যদেব যে একাধিকবার গিয়েছিলেন কবিকর্ণপুরের সংস্কৃতে লেখা চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে আছে: "সদ্য দক্ষিণ প্রত্যাগত চৈতন্যদেব স্নানযাত্রার সময় (স্নানযাত্রা থেকে রথযাত্রার মধ্যবর্তী সময়ে জগন্নাথ গূঢ়ভাবে থাকেন) জগন্নাথের দর্শন না পেয়ে 'বভুব দুঃখী কৃতবাষ্পমোক্ষ' এবং তিনি পুনরায় গোদাবরী তীরে গিয়ে রামানন্দের সঙ্গে মিলিত হলেন।"

রাইস (E P. Rice) লিখেছেন যে, মোটামুটি ১০০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে জৈনধর্মের প্রাধান্য হ্রাস পেতে থাকে। এর মূলে একাধিক কারণ লক্ষ্য করা যায়। (১) শঙ্করাচার্যের প্রভাব (২) গঙ্গ রাজ্যের পতন (১০০৪ খ্রীস্টাব্দে) এবং জৈন ধর্মের প্রতি বিরূপ চোল রাজাদের প্রাধান্য (৩) বল্লাল রাজার বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ (১১০০ খ্রীঃ) (৪) কল্যাণের বাসবাচার্যের নেতৃত্বে বীর শৈবধর্মের অভ্যুত্থান (১১৬০ খ্রীঃ) (৫) ত্রয়োদশ শতকে মাধবাচার্যের অবির্ভাবের ফলে বৈষ্ণবধর্মে বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার (৬) চতুর্দশ শতকে বিজয়নগরের শক্তিশালী হিন্দু সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় এবং সর্বশেষে—ষোড়শ শতকে চৈতন্য প্রচারিত কৃষ্ণভক্তিবাদের প্রভাবে বৈষ্ণবীয় ভাববন্যা বয়ে গেল দেশের ওপর দিয়ে: জৈন-ধর্মের কৃচ্ছ্রতা থেকে জনচিত্তকে সম্পূর্ণ ভাবে সরিয়ে নিয়ে গেল তা (*A History of Kanarese Literature*, pg. 21)।

শাস্ত্রী লিখেছেন যে, দাসদের (সন্ন্যাসী গায়ক) জনপ্রিয় সংগীত এই সময়কার কানাড়ায় বৈষ্ণব সাহিত্যের আর একটি রূপ। এই সব গায়করা প্রেরণা পেয়েছিলেন মাধবাচার্য, ব্যসরায় এবং ১৫১০ খ্রীস্টাব্দে দক্ষিণদেশে চৈতন্যদেবের আগমনের ফলে এই বিশেষ ধরনের সঙ্গীত অত্যধিক প্রেরণা পায় ("Popular songs in ragale metre

by dasas (mendicant singers) was auother form Vaishnaba litereture in Kanaḍa in this period. These singers got their inspiration from Madhvacharya and Vyasaraya and the visit of Chaitanya to the south in 1510 did much to stimulate the growth of this popular type of song" : [K.A. Nilakantha Sastri : *A History of South India*, pg. 404].

চৈতন্যদেবের প্রভাবে এই দাস গায়কেরা যে চৈতন্যপন্থী হয়ে উঠেছিলেন তা বোঝা যায় দক্ষিণ ভারতের 'সাতানি' (চৈতন্য>চাতান~সাতান>সাতানি) সম্প্রদায়ের ইতিহাস থেকে। সাতানিরা এ অঞ্চলের ধর্ম সম্প্রদায় গুলোর সংখ্যা গরিষ্ঠতায় দ্বিতীয়। এঁরা গোলিয় এবং অন্যান্য তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষদের পৌরোহিত্য করেন। এঁরা বিষ্ণুকে কৃষ্ণ মূর্তিতে উপাসনা ক'রে থাকেন এবং নিজেদের চৈতন্য-সম্প্রদায়ভুক্ত ব'লে ঘোষণা করেন। নগর সংকীর্তন এঁদের অন্যতম ধর্মকর্ম ; 'বাংগলার বৈষ্ণব' ব'লেই তাঁরা পরিচিত (*Imperial Gazatteer of India*—Mysore & Coorg 1901)।

এই সব প্রভাব দেখে অনুমান করা সংগত যে, ১৫১৬ খ্রীস্টাব্দের পর এবং ১৫২১ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে চৈতন্যদেব অন্ততপক্ষে এক থেকে দেড় বৎসরের জন্য আর একবার দক্ষিণ দেশে গিয়েছিলেন। এবার তিনি কৃষ্ণদেব রায়ের ওপর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী সহজে তার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয় না ; তাই কৃষ্ণদেব রায় গজপতিপ্রতাপরুদ্রের শক্তিকে চিরকালের জন্য বিধ্বস্ত করেন : ১৫১৯ খ্রীস্টাব্দে উভয় পক্ষে শান্তি চুক্তি হয়; গজপতি তাঁর কন্যা টিক্কার সঙ্গে কৃষ্ণদেব রায়ের বিবাহ দেন,কৃষ্ণদেব রায়ও গজপতিকে অধিকৃত অনেক অঞ্চল ফিরিয়ে দেন।"The peace was concluded before 8th August 1519, when Krishna Raya made a gift of some villages which he received from Pratap Rudra' : 'Pratap Rudra married his daughter to Krishna Dev Raya. This ended the Orissa campaigns' [Prof P. Mukherje : *The Gajapati Kings of Orissa*, 83 85] "Krihnadev's army pressed upto Cuttack and then Prataprudra sought peace, gave away one of his daughters to Krishnadeva in marriage and Krishnadeva returned all the land of Prataprudra north of the river Krishna. [Sastri : *A History of South India*, pg. 281]

এই শান্তি প্রতিষ্ঠা, চিরকালের জন্য উভয় বৈষ্ণব রাজার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থা এবং কৃষ্ণদেব রায়ের অধিকৃত বিস্তীর্ণ অঞ্চল গজপতিকে ফিরিয়ে দেওয়ার মধ্যে চৈতন্যদেবের প্রভাবের কোন পরিচয় পাওয়া যায় কি ?

শেষ পর্যন্ত চৈতন্যদেবের বিশেষ প্রভাব যে পড়েছিল কৃষ্ণদেব রায়ের ওপর, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। কবি কর্ণপুরের চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে দেখা যায় যে, কর্ণাটপতির অমাত্য মল্লভট্ট প্রতাপরুদ্রের সভায় এসে রাজার প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিলেন "আপনার মত সুহৃদ যাঁর, তার সতত কুশল। কিন্তু সম্প্রতি তাঁর অধিক কুশল।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "সে কি রকম ?'

"মল্লভট্ট বললেন, লোকমুখে সেই 'কাঞ্চন দ্যুতি" যতীন্দ্রে'র কথা শুনে কর্ণাটপতি ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণদের পাঠিয়েছিলেন তাঁর চরিত্র অবগত হতে, সেতুবন্ধ থেকে তারা ফিরে

আসার পর তাদের মুখে তাঁর অলৌকিক চরিতকথা জেনে তিনি ভবদহনজ্বালা বিস্মৃত হয়েছেন।"

কর্ণপুরের রচনা থেকে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, দু' রাজার মধ্যে পরিপূর্ণ শান্তি স্থাপনের পরই চৈতন্যদেবের প্রভাব পড়ে কৃষ্ণদেব রায়ের ওপর। শান্তি ১৫১৬ বা ১৫১৯ যে সময়েই হোক না কেন, চৈতন্যদেবের দ্বিতীয়বার দক্ষিণ যাত্রা তার পরেই অনুমিত হয়। অন্যদিকে শান্তি স্থাপনের চুক্তিতেও চৈতন্যদেবের প্রভাব সূচিত করে।

দক্ষিণদেশে পর্যটনের কালে বিজয়নগরে যাওয়ার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল চৈতন্যদেবের। প্রেম ধর্ম প্রচারের উপযুক্ত একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে যে তিনি চেয়েছিলেন সে কথা নিশ্চিতরূপেই বলা চলে। বৈষ্ণব রাজাদের মধ্যে বিরোধ মিটিয়ে দিতে পারলে বৈষ্ণবের প্রেম ধর্ম প্রচারের সীমাহীন সম্ভাবনা দেখা দেবে একথা বুঝেছিলেন চৈতন্যদেব। তিনি সে উদ্দেশ্যেই কৃপা প্রদর্শন করেন কৃষ্ণদেব রায়কে। বিজয়নগরের রাজগুরু ব্যাসরায়ের সঙ্গেও নিশ্চয়ই তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল। ব্যাসরায়ের উপদেশেই কোণ্ডাভিড়ু দুর্গ থেকে বন্দী ক'রে আনা প্রতাপরুদ্রদেবের উত্তরাধিকারী জ্যেষ্ঠ পুত্র বীরভদ্রকে কৃষ্ণদেব রায় মুক্তি দিয়েছিলেন। "By tradition Prince Virabhadra, the son of king Prataparudra, the Gajapati, owed his release from prison to Sri Vyasaraya) Introduction 8th, Volume of Madhva Siddhanta Prakasani of Mysore)।

কি কারণে কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে প্রতাপরুদ্রদেবের শান্তি চুক্তি স্থাপিত হয় তা খুব স্পষ্ট নয়। নুমিজ (Numiz) বলেন যে, বীরভদ্রের আত্মহত্যাই তার প্রধান কারণ। মুক্তি পেয়ে বীরভদ্র আত্মহত্যা করেছিলেন কিনা এবং ক'রে থাকলে তার কি কারণ তা জানা যায় নি। নুমিজের অনুমান গ্রহণযোগ্য নয়—বিজয়নগরে পুত্র আত্মহত্যা করলে কটকে প্রতাপরুদ্রদেব শান্তি চুক্তি করবেন, না আত্মবিসর্জনকে তুচ্ছ ক'রে প্রাণপণ যুদ্ধ করবেন? হতে পারে যে, হুসেন শাহের সঙ্গে ষড়যন্ত্রকারী, প্রতিষ্ঠিত প্রশাসক গোবিন্দ বিদ্যাধর এবারও বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে কৃষ্ণদেব রায়কে এমন ভাবে সাহায্য করেছিলেন যাতে প্রতাপরুদ্রদেবের সন্ধি করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। কিন্তু তাতে প্রতাপরুদ্রদেব কৃষ্ণদেব রায়কে কন্যা দান করবেন কেন, কৃষ্ণদেব রায়ই বা কেন কৃষ্ণানদীর পরপারবর্তী অধিকৃত সমস্ত ভূমি ফিরিয়ে দেবেন গজপতিকে? এ ঘটনার পশ্চাতে কোন মঙ্গল হস্তের কল্পনা কি অসম্ভব? রাও সাহেব এইচ কৃষ্ণ শাস্ত্রী একটি শিলালিপির কথা বলেছেন যা সেই মঙ্গল হস্তের অস্তিত্বের কথা আরও জোরদার ক'রে তোলে: প্রতাপরুদ্রদেব এবং কৃষ্ণদেব রায় একত্র দান করছেন শিলালিপিতে সে কথা বলা হয়েছে [Rao Saheb Mr. H. Krishna Sastri in Para 58 of the Madras Epigraphical Report for 1912-13 says: "In my report for 1908--09, page 110, Paragraph 70, reference was made to an inscription of Saka 1448 from Undavilli in which Krishnaraya and Virarudra Pratapadeva Gajapati appeared as donors, simultaneously. It looks very likely that in this year the opponent Kings Virarudra Gajapati and Krishna raya met on the banks of the river Krishna Venwa in order to get reconciled to each other and to settle the terms of peace. Otherwise it is not natural to expect a gift of both the kings recorded in the self-same inscription.": page

clxviii of introduction.)। শান্ত ভাবে উভয় বৈষ্ণব সম্রাটের এই ব্যবস্থা গ্রহণের পশ্চাতে বৈষ্ণব ব্যাসরায় এবং চৈতন্যদেবের কল্যাণ-হস্তের কল্পনা কি অস্বাভাবিক? প্রসঙ্গত স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে কারও কারও মতে চৈতন্যদেব ব্যাসরায়ের ধারারই সন্ন্যাসীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন (Chaitanya took Sanyasa from an ascetic of Vyasaryya's line)।

কবি কর্ণপুর তাঁর গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় ব্যাসরায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। গৌরাঙ্গ ভক্তের এই উল্লেখ থেকে নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, চৈতন্যদেবের সঙ্গে ব্যাসরায়ের সাক্ষাৎকার যে বিজয়নগরেই হয়েছিল সে কথা নিঃসন্দেহে অনুমান করা চলে। চৈতন্যদেব তখন যুবক এবং ব্যাসরায় প্রৌঢ়ত্বের সীমা অতিক্রম ক'রে গেছেন।

এই দুই বৈষ্ণব মহাপুরুষ দুই বৈষ্ণব রাজার ওপর প্রভাব বিস্তারের সঙ্কল্প গ্রহণ করবেন এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে?

অনুমান করা যেতে পারে যে, হিন্দু-মুসলমান রাজাদের কার্যকলাপ দেখে চৈতন্যদেব খুশী হতে পারেন নি। যুদ্ধজয়ের পর মুসলমান রাজারা হাজার হাজার পুরোহিত এবং সাধারণ নরনারীকে নির্বিচারে হত্যা করেছেন, মন্দির ধ্বংস ক'রে মসজিদ বানিয়েছেন; ঠিক তেমনি নির্বিচারে হত্যা করেছেন হিন্দু রাজারাও। বিজয়নগরের রাজা সালুভা নরসিংহ যে অন্তঃপুরের কিছু নারীকে হত্যা করেছিলেন সে সংবাদ না পাওয়ার কোন কারণ নেই। যুদ্ধ জয়ের পর কৃষ্ণদেব রায়ও হত্যা লীলায় মেতে উঠতেন (a terific slaughter took place : Sewell : *A Forgotten Empire*)। বিজয়নগরের রাজপরিবার এবং পারিষদরা বিলাসে জীবন যাপন করতেন (The king and his court led an extravagant and luxurious life : Sastri pg. 314)। অচ্ছুৎ ব'লে কথিত মানুষরা চাষ করতেন এবং জনমজুরের মতো খাটতেন; তাঁদের অবস্থা ছিল ক্রীতদাসের ন্যায়—তাঁরা থাকতেন গ্রামের বাইরে। (The outcastes who tilled the land and did menial work (under conditions little different from slavrey) lived in hamlets at a distance from the village proper : *Ibid* pg. 319) সাধারণ মানুষদের পরিধেয় প্রায় কিছুই ছিল না (The common people go quite naked, with the excpetion of a piece of cloth about their middle : *Ibid* pg. 322).

সুতরাং রাজাদের কাছে চৈতন্যদেবের আশা করবার বিশেষ কিছু ছিল না। ১৫১৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে গৌড়-বঙ্গের সঙ্গে উড়িষ্যার যুদ্ধ প্রায় বন্ধ হয়ে যায় কারণ এ সময় হুসেন শাহ পরোক্ষভাবে দিল্লীর সম্রাটের বিরোধিতা করেন (He displayed open hostilities against the representatives of the Delhi Sultan in Bihar after the death of Sikandar Lodi in 1517 A.D. : R. C. Majumder : *History of Mediaeval Bengal*, pg. 52)। ১৫১৯ খ্রীস্টাব্দে হুসেন শাহের মৃত্যু হয়। অন্যদিকে ১৫১৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই বিজয়নগরের সঙ্গে উড়িষ্যার শান্তি স্থাপিত হয় এবং তারপর থেকে কৃষ্ণদেব রায় মুসলমান রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। চৈতন্যদেব সাধ্যমত সামাজিক এবং রাজনৈতিক কর্তব্য সমাপন ক'রে এবং সমস্ত দাক্ষিণাত্যে প্রেম-ধর্মের সাফল্যজনক প্রচার শেষ ক'রে নীলাচলে স্থায়ী ভাবে অবস্থান করতে লাগলেন। আর একবার আমরা গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি, এই বিরাট ব্যক্তিত্বের পূর্ণ পরিচয় প্রকাশের সার্থক চেষ্টা আরম্ভ হোক।

বিষয়ীদের প্রতি মনোভাব এবং প্রতাপরুদ্র

সন্ন্যাস গ্রহণের পর চৈতন্যদেব যে, বিষয়ীদের মুখ দর্শন করতে চাইতেন না সে বিষয়ে সকল চৈতন্য জীবনীকাররাই একমত ছিলেন। কিন্তু সকলেই একথাও স্বীকার করেছেন যে, চৈতন্যদেবের মনোভাব উপলব্ধি করাও ছিল অপরের পক্ষে দুঃসাধ্য। বৃন্দাবনদাস বলেছেন—

ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিবাবে শক্তি কার।
না গেলেন মথুরা ফিরিলা আরবার॥ [চৈ. ভা. ঃ পৃ. ২৮৬]

কৃষ্ণদাস বলেছেন—

বৃন্দাবন যাইতে কৈল গৌড়েরে গমন। [চৈ চ. ঃ পৃ. ১০৩]

চৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যদেব বলেছেন রূপ-সনাতনকে—

তোমা দোঁহা দেখিতে মোর ইঁহা আগমন॥
এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে।
সবে বোলে কেন আইলা রামকেলি গ্রামে॥ [তদেব ঃ পৃ. ১০৬]

চৈতন্যদেবের মনোভাব বোঝা যে সম্ভব নয় তা অন্যত্র মুকুন্দ দত্তের মুখে শোনা গেছে। শ্রীচৈতন্যের দণ্ড ভঙ্গ করলেন নিত্যানন্দ - ক্রুদ্ধ হয়ে চৈতন্যদেব সবলকে পশ্চাতে রেখে দ্রুতগতিতে চললেন নীলাচলের উদ্দেশে ঃ এই দণ্ড ভঙ্গের ব্যাপারে কোন রহস্য আছে মনে ক'রেই মুকুন্দ বললেন—

এত শুনি প্রভু আগে চলিলা শীঘ্রগতি।
বুঝিতে না পারে কেহ দুই প্রভুর মতি॥ [চৈ. চ. ঃ পৃ. ১৫১]

নীলাচলে বসবাস করতে এলেন কেন চৈতন্যদেব? কেউ মনে করেন যে, এককালে উড়িষ্যা তাঁর পিতৃভূমি ছিল ব'লেই এ ব্যবস্থা; কেউ বলেন যে, গৌড়ের সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ রক্ষার সুযোগ হবে ব'লেই এ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন চৈতন্যদেব। চৈতন্য চরিতামৃতে সার্বভৌমকে বলেছেন চৈতন্যদেব

আমি বালক সন্ন্যাসী ভালমন্দ নাহি জানি
তোমার আশ্রয় লৈল গুরু করি মানি॥
তোমার সঙ্গ লাগি মোর এথা আগমন।
সর্বপ্রকারে করিবে তুমি আমার পালন॥ [তদেব ঃ পৃ. ১৫৬]

অর্থাৎ কবিরাজ গোস্বামীর মতে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গে মিলনের জন্য চৈতন্যদেব এসেছিলেন নীলাচলে। কিন্তু চৈতন্যভাগবত উদ্দেশ্যকে আরও একটু বিস্তীর্ণ করেছেন। কেবল সার্বভৌমের সঙ্গে মিলনই নয়, রায় রামানন্দ এবং প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে মিলনও ছিল শ্রীচৈতন্যের উদ্দেশ্য ঃ তিনি গজপতি রাজা প্রতাপরুদ্রকে বলেছেন—

তুমি, সার্বভৌম আর রামানন্দ রায়।
তিনের নিমিত্ত মুঞি আইলু এথায়॥ [চৈ. ভা. ঃ পৃ. ৩০২]

এটাও কি চৈতন্যদেবের নীলাচল বাসের চরম কারণ? সমকালীন রাষ্ট্র ও সমাজের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন এই ধর্মনেতার মনোভাব তাঁর কার্যকলাপ থেকেই অনুমান করতে হবে।

বিষয়ীর প্রতি বিরাগ সত্ত্বেও চৈতন্যদেব গৌড়বঙ্গের সুলতান হুসেন শাহের দুই প্রধান হিন্দু কর্মচারী রূপ-সনাতনকে উদ্ধার করেছিলেন। হুসেন শাহ হিন্দু রাজ্য আক্রমণ কালে পদস্থ হিন্দু কর্মচারীদের সঙ্গে নিতেন এবং তাঁদের উপস্থিতিতেই ভাঙতেন হিন্দুর দেবমন্দির—মন্দির ধ্বংসের ব্যাপারে হিন্দুদের পৃষ্ঠপোষকতা আছে এটা দেখানোই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তাই সাধারণ হিন্দুরা এইসব পদস্থ কর্মচারীদের ওপর বিরূপ ছিলেন। এঁরা দুজনে চৈতন্যদেবের কাছে 'দৈন্যপত্রী লিপি' পাঠিয়েছেন 'বার বার'। হুসেন শাহকে দুর্বল ক'রে দেওয়া প্রয়োজন ছিল, দক্ষ হিন্দু পদস্থ কর্মচারীদের তাই সরিয়ে নিতেই হবে। তাই বিষয়ী হলেও বিপদের সম্ভাবনা সত্ত্বেও চৈতন্যদেব রামকেলি গ্রামে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। রাত্রির অন্ধকারে ছদ্মবেশে দু'ভাই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বিষয়ী হলেও দুজনকেই তিনি আলিঙ্গন করেন। রাষ্ট্রনীতিক এবং সামাজিক কারণে বিষয়ীকে উদ্ধার করতে বিলম্ব করেন নি তিনি।

লোচনদাসও শুনিয়েছেন যে, 'বিষয়ীর মুখ প্রভু নাহি দেখে কভু' তথাপি রায় রামানন্দের সঙ্গে মিলনে কিছুমাত্র ইতস্তত করেন নি। অন্য জীবনীকারদের থেকে লোচনদাস একটু অন্যরকম ভাবে সাজিয়েছেন তাঁর কাহিনী—গোদাবরী তীরে অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হয় নি দুজনের। লোচনদাস বলেছেন—

> কাঞ্চী-নগরে প্রভু ভেল উপনীত ॥
> রত্নময়-পুরী সেই কাঞ্চীনগর।
> নগর দেখিয়া তুষ্ট হইল ন্যাসীবর ॥ [চৈ. ম. ঃ পৃ. ১৭৮]

বিষয়বিরোধীর রত্নময় পুরী দেখে তুষ্ট হবার তো কোন কারণ নেই। রায় রামানন্দের উপস্থিতির কথা ভেবেই কি এই 'তুষ্ট' হওয়া? সুতরাং বিষয়ীর ওপর চৈতন্যদেব বিরূপ ছিলেন একথা বলা চলে না, বিষয়ীটি কে—এটাই ছিল সম্ভবত তাঁর মনের কথা। তাঁর মনোভাব যে দুর্বোধ্য একথা তাঁর জীবনীকাররা স্পষ্টভাবেই শুনিয়ে দিয়েছেন।

চৈতন্যদেব বিষয়ীর সেই রত্নময় পুরীর দ্বারে এসে উপস্থিত হলেন এবং রাজপুত্রের দর্শন প্রার্থী হলেন—

> আচম্বিতে রাজদ্বারে উত্তরিলা প্রভু ॥
> রাজার দুয়ারে গিয়া দ্বারীকে কহিল।
> রাজপুত্র কোথা আছে—নিভৃতে পুছিল ॥···
> প্রভু কহে—রাজপুত্রে জানাহ বচন।
> তাহার নিমিত্তে মোর এথা আগমন ॥ [তদেব]

এই রাজপুত্র বা রাজা রায় রামানন্দ—গজপতি সম্রাট প্রতাপরুদ্রদেবের গোদাবরী নদীর পরপারবর্তী দক্ষিণ দেশের প্রশাসক। রায় রামানন্দকে সর্বসময়ের অনুচর করার প্রয়োজন ছিল চৈতন্যদেবের।

চৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যদেব এবং রায় রামানন্দের কাহিনী অন্যরূপে বর্ণিত হয়েছে। চৈতন্যের দক্ষিণ ভ্রমণ কালে সার্বভৌম তাঁকে গোদাবরী তীরস্থ বিদ্যানগরের কর্তা রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অনুরোধ করলেন—

শূদ্র বিষয়ী জ্ঞানে তারে উপেক্ষা না করিবা।
আমার বচনে তারে অবশ্য মিলিবা ॥ [চৈ চ ঃ প্‌ ১৭১]

গোদাবরীতে অনেক আড়ম্বরের সঙ্গে স্নান করতে এসেছিলেন রামানন্দ—সেখানেই সাক্ষাৎ হলো দুজনের। পরস্পরে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন ঃ বললেন চৈতন্যদেব—

তোমা মিলিবারে মোর এথা আগমন।
ভাল হৈল অনায়াসে পাইল দরশন ॥ [তদেব ঃ প ১৭৯]

চৈতন্যদেব রামানন্দকে প্রশাসনের কাজ পরিত্যাগ করে তাঁর পার্শ্বচর হতে বললেন, প্রতাপরুদ্রের অনুমতি নিয়ে রামানন্দ রাজার কার্যভার ছেড়ে চৈতন্যদেবের নিত্যসহচর হলেন—

রায় কহে তোমার আজ্ঞা রাজাকে কহিল।
তোমার ইচ্ছায় রাজা বিষয় ছাড়াইল ॥
আমি কহিল তোমা হৈতে না হয় বিষয়।
চৈতন্যচরণে রহোঁ যদি আজ্ঞা হয় ॥ [তদেব ঃ প ২২৮]

হিন্দু মন্দির ধ্বংসকারী সুলতান হুসেন শাহের দুই দক্ষ পদস্থ হিন্দু প্রধানকে সরিয়ে এনেছিলেন যে উদ্দেশ্যে সেই উদ্দেশ্যই এখানে কাজ করেছে। হুসেন শাহকে প্রতিরোধ করার জন্য প্রতাপরুদ্রের শক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল। ভক্ত রামানন্দ রায় প্রশাসনের কাজে অযোগ্য তাই প্রতাপরুদ্রের কাছ থেকে তাঁকে সরিয়ে নিয়ে দক্ষিণের সীমান্তকে সুরক্ষিত করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। তাই বিষয়ী হলেও রূপ সনাতন এবং রায় রামানন্দকে কৃপা করতে চৈতন্যদেব কিছুমাত্র ইতস্তত করেন নি। অথচ যে প্রতাপরুদ্র তাঁর ইচ্ছাকে মর্যাদা দিয়ে রামানন্দকে বিষয় থেকে মুক্তি দিলেন এবং বারবার কৃপা প্রার্থী হয়েছেন, তাঁর বিষয়ে চৈতন্যদেব এত কঠোর হয়েছিলেন কেন ? প্রতাপরুদ্র প্রেম-ভক্তির পূজারী হয়ে বিষয় ছাড়লে হুসেন শাহকে প্রতিরোধ করবে কে ?

চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার নবম পরিচ্ছেদে দেখা যায় যে, রায় রামানন্দের ভাই গোপীনাথ পট্টনায়ক রাজা প্রতাপরুদ্রের 'দুইলক্ষ কাহন কৌড়ি' তছরূপ করেছে। রামানন্দের সমস্ত পরিবার, পঞ্চ ভ্রাতা, পিতা ভবানন্দ সকলেই ছিলেন চৈতন্যদেবের ভক্ত। সকল ভক্ত শ্রীচৈতন্যকে অনুরোধ করলেন গোপীনাথকে রক্ষা করার জন্য—তাকে খড়্গের ওপর ফেলে হত্যার ব্যবস্থা চলছিল। কিন্তু অন্যায়কারী বিষয়ীর প্রতি কোন মমতা ছিল না তাঁর। কিন্তু তাঁকে খুশী করা হবে মনে করে প্রতাপরুদ্র গোপীনাথকে মার্জনা করেন, তার বেতন দ্বিগুণ বৃদ্ধি ক'রে দেন। বিশ্বাসঘাতক কর্মচারী রাজশক্তিকে দুর্বল করে—গোপীনাথের মৃত্যুদণ্ড না চাইলেও তার অপসারণ তিনি চেয়েছিলেন। তাঁর সেবায় উন্মুখ হলেও কিন্তু প্রতাপরুদ্রের কৃপালাভ সহজ সাধ্য হয় নি।

চৈতন্যচরিতামৃত বলেছেন, অদ্বৈত আচার্যের কিঙ্কর কমলাকান্ত বিশ্বাস রাজা প্রতাপরুদ্রকে একটি পত্র লেখেন। আচার্যের ঈশ্বরত্ব প্রতিষ্ঠা ক'রে তিনি তাঁকে ঋণমুক্ত করতে আবেদন জানান। পত্রটি চৈতন্যদেবের হাতে এলে তিনি নিজভৃত্য গোবিন্দকে আদেশ দেন—

গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা ঐছে আজি হৈতে।
বাউলিয়া বিশ্বাসেরে না দিবে আসিতে॥ [চৈ. চ. ঃ পৃ. ৬০]

বিশ্বাসের এ পত্রের কথা আচার্য জানতেন না। জেনে অত্যন্ত মর্মাহত হলেও তাকে ক্ষমা করতে অনুরোধ জানালেন শ্রীচৈতন্যকে। চৈতন্যদেব বিশ্বাসকে ক্ষমা ক'রে ডেকে বললেন—

প্রভু কহে বাউলিয়া ঐছে কাহে কর।
আচার্যের লজ্জা ধর্মহানি সে আচর॥
প্রতিগ্রহ না করিয়ে কভু রাজধন।
বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন॥ [তদেব ঃ পৃ. ৬১]

প্রতাপরুদ্রদেবকে উদ্ধারে কিন্তু অনেক বিলম্ব করেন চৈতন্যদেব। এই উদ্ধার সম্বন্ধে বিভিন্ন জীবনীকার বিভিন্ন কথা বলেছেন। জয়ানন্দের মতে স্বয়ং জগন্নাথ আদেশ দিয়েছিলেন চৈতন্যদেবকে, সেই আদেশ পেয়ে চৈতন্যদেব স্বয়ং কটকে যাত্রা করেন প্রতাপরুদ্রকে কৃপা করতে-

জগন্নাথের আজ্ঞা চৈতন্য কটক জায়।
রাজা প্রতাপরুদ্রে প্রকাশ দেখায়॥
সার্বভৌম তুমাবে দেখিব চতুর্ভুজ।
অষ্টভূজ তুমারে দেখিব প্রতাপরুদ্র॥ [জয়ানন্দ ঃ চৈ. ম. ঃ পৃ. ১৪৯]

গজপতি সম্রাট তখন গজের পৃষ্ঠে কটকের পথে বেরিয়েছেন—

প্রতাপরুদ্র রাজা পাট হাথীর উপরে।
রাউত রায় বিদ্যাধর শ্বেত চামর ধরে॥
দেখিআ চৈতন্য গোসাঞি পথমধ্যে রহি।
পাট হস্তী মাথা নুঞাএ কড়পাতে মহি॥
দেখিআ রাজার মনে বিস্ময় হইল।
হস্তী হইতে লাফ দিয়া ভূমিতলে পড়িল॥
রাজা বলে গোসাঞি আমি রাজমদে মত্ত।
আমায় নিস্তারিলে তুমার অনেক মহত্ত্ব॥
গোসাঞি বলে প্রতাপরুদ্র সূর্যবংশে রাজা।
তুমার প্রসাদে মোর সুখময় প্রজা॥
তুমা সম্ভাষিব আমি জগন্নাথের আজ্ঞা।
সর্বতত্ত্ব তুমি বিনে আমার প্রতিজ্ঞা॥
রাজা বলে আজি মোর হইলস সুপ্রভাত।
আমার মন্দিরে আইলা সচল জগন্নাথ॥ [তদেব ঃ পৃ. ১৫৩]

রাজা প্রতাপরুদ্র এবং পাটরাণী চন্দ্রকলাকে কৃপা ক'রে সেদিনই কটক থেকে ফিরে এলেন চৈতন্যদেব। পুরী থেকে কটক এবং কটক থেকে পুরী একদিনে যাতায়াত বিশ্বাস-যোগ্য নয়। এরপর পুনরায় জয়ানন্দ লিখেছেন—

প্রতাপরুদ্রে কৃপা করিল জেন মতে॥

সার্বভৌম মুখে রাজা শুনিঞা সকল।
চৈতন্য ভেটিতে রাজা গেলা নীলাচল॥ [তদেব : পৃ. ১৯১]

এই সময় চৈতন্যদেব অষ্টভুজ মূর্তি দেখান রাজা ও রাণীকে। এতে দুজনের রচনা আছে কি? অথবা, জগন্নাথের আদেশ সত্ত্বেও কি চৈতন্যদেব প্রথমে অষ্টভুজ মূর্তি দেখান নি?

জয়ানন্দের কাহিনী গ্রহণ করা যায় না। রাজার প্রতি জগন্নাথদেবের অত্যধিক কৃপার পরিচয় আছে এই কাহিনীতে। নীলাচলে আগমনের কতদিন পরে জয়ানন্দের চৈতন্যদেব রাজাকে কৃপা করেছিলেন? ইতিহাস বলে, চৈতন্যদেব যখন নীলাচলে আসেন তখন প্রতাপরুদ্র ছিলেন বিজয়নগরে এবং বিজয়নগর থেকে তিনি যখন দ্রুত নীলাচলে ফেরেন তখন চৈতন্যদেব বেরিয়ে গেছেন দক্ষিণ ভ্রমণে এবং দক্ষিণ ও উত্তর ভারত পর্যটন ক'রে ফেরেন ২ থেকে ৩ বৎসর পরে। নীলাচলে ফিরে এসে 'সচল জগন্নাথ' ব'লে পরিচিত হতেও নিশ্চয়ই দু'তিন বছর কেটেছিল। সুতরাং জয়ানন্দের কাহিনী গ্রহণ না ক'রেও বলা যায়, নীলাচলে চৈতন্যদেবের প্রথম পদার্পণের ৪ থেকে ৬ বৎসর পরে রাজাকে তিনি কৃপা করেছিলেন—সময়টা তাই ১৫১৪ থেকে ১৫১৬ বলে অনুমান করা চলে।

লোচনদাসের চৈতন্যদেব দক্ষিণে যাত্রা করলেন, প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে তখনও তাঁর সাক্ষাৎ হয় নি। ২।৩ বৎসর পর ফিরলেন তিনি নীলাচলে। এরপর মথুরা যাবেন ব'লে পথে বের হলেন কিন্তু কানাইয়ের নাটশালা থেকে ফিরে এলেন নীলাচলে। এখানে অনেক দিন কাটল সংকীর্তনে। পুনরায় ঝাড়িখণ্ডের পথে যাত্রা করলেন মথুরার উদ্দেশে: এলেন বারাণসীতে—সেখান থেকে মথুরা-বৃন্দাবন হয়ে ফিরলেন নীলাচলের উদ্দেশ্যে। এসে পেঁছিলেন গৌড় দেশে, রাঢ়ে—নবদ্বীপে। তারপর তিনি এলেন নীলাচলে। এই দু'বার মথুরা যাবার ফলে আরও ২।৩ বৎসর কেটেছিল নিশ্চয়। এক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, ১৫১৪ থেকে ১৫১৬ সালের মধ্যে বা কিছুপরে প্রতাপরুদ্রকে কৃপা করেছিলেন তিনি। শ্রীচৈতন্যদেবের ভৃত্যের কাছেও তিনি দর্শনের জন্য বিনীত প্রার্থনা করেছিলেন—

গোবিন্দেরে কহে রাজা কাতর-বয়ান॥
কোন মতে দেখো মুঞি গোসাঞির চরণ।
ইহার উপায় মোরে কহ মহাজন॥ [চৈ. ম. : পৃ. ১৯৬]

আরও কিছুদিন কেটে গেল। রাজার আকুতি ভক্তদের মন টলিয়ে দিয়েছিল। সমস্ত ভক্তের মুখপাত্র হয়ে পুরী গোসাঞি একদিন ভয়ে ভয়ে চৈতন্যদেবকে নিবেদন করলেন—

পুরী গোসাঞি বোলে বোল রাখিবে আমার॥
কাশীমিশ্র আদি করি' সব ভক্তগণ।
সভার বচনে মুঞি বলি এ বচন॥
শ্রীজগন্নাথদেব নীলাচলে বাস।
প্রতাপরুদ্র রাজা হয় তার নিজ দাস॥

তোর পদ দেখিবারে সাধে মো-সভারে।
আজ্ঞা পাইলে হয় সেই চরণ-গোচরে ॥ [তদেব ঃ পৃ. ১৯৬-৯৭]

অতি প্রিয় পুরী গোসাঞি এবং ভক্তদের মনের ইচ্ছা সত্ত্বেও চৈতন্যদেবের প্রতিক্রিয়া খুবই স্পষ্ট। রাজার সঙ্গে সন্ন্যাসীর কিসের সম্পর্ক? শ্রীচৈতন্য উত্তর দিলেন—

প্রভু বোলে—সবজন শুনহ বচন।
সন্ন্যাসীর ধর্ম নহে রাজ-দরশন।
আমি ত সন্ন্যাসী—সেই হয় মহারাজ।
দোঁহার দর্শনে দোঁহার কিছু নাহি কাজ ॥ [তদেব]

কিন্তু রাজা যে তাঁর চরণ-দর্শন প্রত্যাশায় ১০দিন উপবাস ক'রে আছেন। দর্শন লাভ সম্ভব নয় শুনলে নিশ্চয়ই তিনি অচেতন হয়ে পড়বেন। প্রধান ভক্তদের কাছে সে কথা শুনে রাজাকে দর্শন দিলেন চৈতন্যদেব, উপদেশ দিলেন—

প্রভু বোলে—রাজা হের শুনহ বচন ॥
প্রজার পালন তোর এই বড় ধর্ম।
প্রজা পুত্র—রাজা পিতা—কহিল এ মর্ম ॥ [তদেব]

রূপ-সনাতন বা রায় রামানন্দের ন্যায় রাজার কর্ম ত্যাগ করতে বললেন না চৈতন্যদেব ঃ সমদৃষ্টি নিয়ে পিতার ন্যায় প্রজা পালন করার নির্দেশ দিলেন প্রতাপরুদ্রকে। লোচনদাসের মতে ১৫১৪।১৫১৬ খ্রীস্টাব্দে প্রতাপরুদ্রকে সমদৃষ্টি নিয়ে রাজ্য শাসন করার নির্দেশই দিয়েছিলেন চৈতন্যদেব।

বৃন্দাবনদাস বলেছেন—

যে সময়ে ঈশ্বর আইলা নীলাচলে।
তখনে প্রতাপরুদ্র নাহিক উৎকলে ॥
যুদ্ধরসে গিয়াছেন বিজয়ানগরে।
অতএব প্রভু না দেখিলেন সেই বারে ॥
ঠাকুরো থাকিয়া কথোদিন নীলাচলে।
পুনঃ গৌড়দেশে আইলেন কুতূহলে ॥ [চৈ. ভা. ঃ পৃ. ২৭৫]

এই 'কথোদিন' কি কয়েকটি দিন মাত্র না কয়েক মাস? নীলাচলে এসে বৈদান্তিক সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে বৈষ্ণব করেছেন। এত বড় বৈদান্তিকের পরিবর্তন বড় সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তাঁকে ষড়ভুজ দর্শন করিয়ে দ্রুত পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন একথাও বিশ্বাস যোগ্য নয়। নারায়ণের অবতার ধরে নিলেও মানুষরূপে লীলা করতে এলে মানুষের আচরণই তো করা উচিত! দ্রুত পরিবর্তনের জন্য তো তা হলে মন্ত্র দিয়েই করতে পারতেন এবং কেবল সার্বভৌম কেন স্বয়ং হুসেন শাহেরও পরিবর্তন ঘটিয়ে দিতে পারতেন। চৈতন্যদেব যে অবতার ব'লে সেকালে পরিচিত ছিলেন না, বহু বৈষ্ণবেরও যে সে বিশ্বাস ছিল না তা আমরা আগেই দেখেছি। চৈতন্যদেবের নীলাচলে অবস্থিতির শেষ দিকে অদ্বৈত-শ্রীবাসাদি বৈষ্ণবগণ তাঁকে অবতার ক'রে তোলার চেষ্টা ক'রে চৈতন্যদেবের নিকট তিরস্কৃত হয়েছিলেন। সুতরাং 'ষড়ভুজ' দর্শনকে প্রতীক হিসেবেই গণ্য করতে হবে। বৈষ্ণব ধ্যান-ধারণার শক্তিই এর দ্বারা সূচিত হয়েছে।

বৃন্দাবনদাস আরও জানিয়েছেন যে, নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে 'হরি' কীর্তন আরম্ভ হয়ে গেল; চৈতন্যদেব পরিচিত হলেন 'সচল জগন্নাথ' রূপে—

'এই ত' সচল জগন্নাথ' সভে বোলে।
হেন নাহি যে প্রভুরে দেখিয়ে না ভোলে॥ [তদেব ঃ পৃ. ২৭২]

'সচল জগন্নাথ' রূপে পরিচিত হওয়া নিশ্চিতরূপে সময় সাপেক্ষ। বৃন্দাবনদাস আরও বলেছেন—

এইমতে অল্পে অল্পে যত ভক্তগণ।
নীলাচলে আসি সভে হইলা মিলন॥ [তদেব ঃ পৃ. ২৭৩]

ক্রমে ক্রমে ভক্তদের আগমন হতেও অল্প সময় লাগার কথা নয়। 'দামোদর স্বরূপ মিলিলা কথোদিনে'—সুতরাং সব 'কথোদিন' এক নয়। বৃন্দাবনদাসকে গ্রহণ করলে চৈতন্যদেবের এবারে নীলাচলে উপস্থিতি প্রায় ১ বৎসর হবে।

নীলাচল থেকে আবার গৌড়দেশে এলেন চৈতন্যদেব - গৌড়ের পথে সপার্ষদ থাকলেন কিছুদিন সার্বভৌম ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে, ক্রমেই জন সংঘট্ট হতে লাগলো তাঁর দর্শন পাবার জন্য ঃ গোপনে চলে গেলেন ফুলিয়া -- বাচস্পতিও সেকথা জানতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত চৈতন্যদেব মথুরা গমনের উদ্দেশ্যে পথে বেরিয়ে এলেন রামকেলি গ্রামে। সেখানে রূপ-সনাতনকে উপদেশ দিয়ে নীলাচলে ফিরে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। রামকেলি থেকে এলেন শান্তিপুরে, সেখানে মাধবেন্দ্র পুরীর আরাধনা তিথি উৎসব পালন ক'রে এলেন কুমারহট্টে এবং সেখানে কিছুদিন থেকে এলেন পানিহাটিতে ঃ পানিহাটি থেকে এলেন বরাহনগরে। বৃন্দাবনদাস জানিয়েছেন যে, গঙ্গাতীরে গ্রামে গ্রামে ভক্তদের গৃহে গৃহে থাকলেন তিনি, তাঁর ভাব-বিহ্বল রূপ দেখে বৈষ্ণব হলেন বহু মানুষ। এরপর শ্রীচৈতন্য ফিরে এলেন নীলাচলে এবার তিনি রইলেন কাশীমিশ্রের গৃহে।

সুতরাং বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যদেব যদি নীলাচলে প্রথমে এসে থাকেন ১৫১০।১১ খৃষ্টাব্দে তাহলে অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে যে তিনি নীলাচল থেকে মথুরা যাবার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন প্রায় ১ বৎসর পর অর্থাৎ ১৫১১।১২ খৃষ্টাব্দে কারণ 'সচল জগন্নাথ' হয়ে উঠতে এবং অল্পে অল্পে ভক্তদের আগমনে যথেষ্ট সময় লাগারই কথা। দ্বিতীয়বার নীলাচলে আগমনের পূর্বে যেভাবে গঙ্গাতীরে তিনি ভক্তদের গৃহে গৃহে কাটিয়ে এসেছেন তাতে বৎসর দুই কেটে যাওয়াই সম্ভব অর্থাৎ দ্বিতীয়বার তিনি নীলাচলে আসেন ১৫১৩।১৪ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কিছুতেই নয়। তাঁর ফিরে আসার সংবাদ পাওয়া মাত্র প্রতাপরুদ্র নীলাচলে চলে এলেন তাঁর সাক্ষাৎ লাভের আশায়—

প্রতাপরুদ্রের স্থানে হইল গোচর।
নীলাচলে আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর॥"
সেইক্ষণে শুনিমাত্র নৃপতি প্রতাপ।
কটক ছাড়িয়া আইলেন জগন্নাথ॥
প্রভুরে দেখিতে সে রাজার বড় প্রীত।
প্রভু সে না দেন দরশন কদাচিত॥ [তদেব ঃ পৃ. ৩০০]

এরপর অবশ্যই প্রতাপরুদ্রকে কৃপা করলেন চৈতন্যদেব। কিন্তু তার জন্য অনেক প্রচেষ্টা এবং কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছিল ভক্তদের—

সার্বভৌম-আদি সভা স্থানে রাজা কহে।
তথাপি প্রভুরে কেহো না জানায় ভয়ে ॥ [তদেব ঃ পৃ. ৩০১]

শেষ পর্যন্ত ভক্তরা যুক্তি ক'রে এই সিদ্ধান্ত করলেন—

"যে সময়ে প্রভু নৃত্য করেন আপনে।
বাহ্যজ্ঞান দৈবে নাহি থাকয়ে তখনে ॥
রাজাও পরম ভক্ত—সেই অবসরে।
দেখিবেন প্রভুরে থাকিয়া অগোচরে ॥ [তদেব]

তাই হলো ; একদিন 'আড়ালে থাকি দেখে রাজা নৃত্য করে প্রভু' রাজা মুগ্ধ হয়ে গেলেন কিন্তু তথাপি স্বেদ-চোখের জল-নাসার রস অঙ্গের ধূলার সঙ্গে মিশে যে ক্লেদের সৃষ্টি করেছিল তা দেখে রাজার মন বিষণ্ণ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর ভ্রম বুঝতে পারেন এবং চৈতন্যদেবের কৃপালাভ করেন।

গোপনে দেখলেও সামনা সামনি হতে পারছেন না রাজা ঃ বিষয়ীর প্রতি চৈতন্য দেবের মনোভাব জানা থাকায় প্রধান প্রধান ভক্তরাও বলতে পারছেন না কিছু—

বিশেষ উৎকণ্ঠা হৈল প্রভুরে দেখিতে।
তথাপি না পারে কেহো দেখা করাইতে ॥ [তদেব ঃ পৃ. ৩০২]

চৈতন্যদেব একদিন পুষ্পোদ্যানে বসেছিলেন পারিষদগণকে নিয়ে—প্রতাপরুদ্র এসে লুটিয়ে পড়লেন তাঁর পদতলে—চেতনা হারালেন তিনি। তাঁর দেহে কৃষ্ণভক্তির চিহ্ন দেখে শ্রীচৈতন্য তাঁকে কৃপা করলেন ঃ নিজের গলার মালা তাঁর গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন—

প্রভু বোলে "কৃষ্ণ ভক্তি হউক তোমার।
কৃষ্ণকার্য বিনে তুমি না করিহ আর ॥
নিরন্তর গিয়া কর কৃষ্ণসংকীর্তন।
তোমার রক্ষিতা—বিষ্ণুচক্র সুদর্শন ॥
তুমি'সার্বভৌম আর রামানন্দ রায়।
তিনের নিমিত্ত মুঞি আইলু এথায় ॥
সবে একখানি বাক্য করিবা আমার।
মোরে না করিবা তুমি কোথাও প্রচার ॥ [তদেব ঃ পৃ. ৩০২]

রায় রামানন্দের কথা বললেন চৈতন্যদেব কিন্তু তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের কোন কথা পাওয়া গেল না চৈতন্য ভাগবতে। দক্ষিণ দেশে গমন না করলে রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের কোন সম্ভাবনাও ছিল না। একথাও নিশ্চিত যে, রাজাকে কৃপা করার পূর্বেই রামানন্দের সঙ্গে চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ হয়েছিল। সুতরাং রাজার সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বেই চৈতন্যদেব দক্ষিণ দেশে গিয়েছিলেন এ কথা মানতেই হবে। গৌড়ের কথায় বৃন্দাবনদাস ছিলেন ব্যাসদেবের ন্যায়, কিন্তু নীলাচল-এ চৈতন্যদেবের কর্মধারা বা তাঁর দক্ষিণ যাত্রা অথবা বৃন্দাবন গমন সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল অসম্পূর্ণ। রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পূর্বে দক্ষিণ গমনের ব্যাপারটা হিসেবের মধ্যে ধরলে সেই সাক্ষাৎকার আরও অন্তত ২।৩ বৎসর পেছিয়ে যায়। সুতরাং সিদ্ধান্ত করা ভ্রান্ত নয় যে, প্রতাপরুদ্রদেব

চৈতন্যদেবের কৃপালাভ করেছিলেন ১৫১৫ থেকে ১৫১৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে। তাঁর সম্বন্ধে প্রচার করতেও নিষেধ করে দিয়েছিলেন তিনি।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যদেব সন্ন্যাসের পর গৌড়দেশে কিছুকাল ভ্রমণ ক'রে এলেন নীলাচলে। সেখানে বৈদান্তিক সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে বৈষ্ণব ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী করলেন। তারপর তিনি গেলেন দক্ষিণ দেশে। কৃষ্ণদাস ভ্রমণের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে প্রায় ৩ বৎসর সময় ব্যয় হবার কথা। কম ক'রে ধরলেও পুনরায় চৈতন্যদেব নীলাচলে ফিরে আসেন ১৫১২।১৩ খ্রীস্টাব্দে। এই সময় প্রতাপরুদ্র সার্বভৌমকে জিজ্ঞাসা করলেন—

শুনিনু তোমার ঘরে এক মহাশয়।
গৌড় হৈতে আইলা তেঁহো মহাকৃপাময়॥
তোমারে বহু কৃপা কৈলা কহে সর্বজন।
কৃপা করি করাহ মোরে তাঁহার দর্শন॥
ভট্ট কহে যে শুনিলে সেই সত্য হয়।
তাঁহার দর্শন তোমার ঘটন না হয়॥
বিরক্ত সন্ন্যাসী তেঁহো রহয়ে নির্জনে।
স্বপ্নেহ না করে তেঁহো রাজদরশনে॥ [চৈ. চ. ঃ পৃ. ২১৫]

এ সময় চৈতন্যদেব দক্ষিণে গমন করেছিলেন। সুতরাং প্রতাপরুদ্র-সার্বভৌমের কথা হয় ১৫১০ থেকে ১৫১২-১৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে।

চৈতন্যদেবের দক্ষিণদেশ থেকে ফিরে আসার পর প্রতাপরুদ্রের কথা তুললেন সার্বভৌম--

সার্বভৌম কহে এই প্রতাপরুদ্র রায়।
উৎকণ্ঠিত হঞা তোমা মিলিবারে চায়॥
কর্ণে হস্ত দিয়া প্রভু স্মরে নারায়ণ।
সার্বভৌম কহ কেন অযোগ্যবচন॥
সন্ন্যাসী বিরক্ত আমার রাজদরশন।
স্ত্রী দরশন সম হয় বিষের ভক্ষণ॥ [তদেব ঃ পৃ. ২২৭-২৮]

চৈতন্যদেব সার্বভৌমকে সাবধান ক'রে বলেন--

প্রভু কহে তথাপি রাজা কালসর্পাকার।
কাষ্ঠনারী-স্পর্শে যৈছে উপজে বিকার॥
ঐছে বাত পুনরপি মুখে না আনিবে।
পুনঃ যদি কহ আমা এথা না দেখিবে॥ (তদেব ঃ পৃ. ২২৮)

রামানন্দ রায় চৈতন্যদেবের প্রতি রাজার ভক্তির কথা জানালেন। শ্রীচৈতন্য উত্তর দিলেন 'এই গুণে কৃষ্ণ তাঁকে করিবেন অঙ্গীকার'--কিন্তু দর্শন দিতে তখনও সম্মত হলেন না। বার বার দৈন্যপত্রী লিখে রূপ-সনাতন বিষয়ী হয়েও কৃপা লাভ করেন, ভক্ত রামানন্দের সঙ্গে আলাপ ক'রেই চৈতন্যদেব তাকে বিষয় থেকে উদ্ধার করেন, কিন্তু প্রতাপরুদ্রের ক্ষেত্রে তিনি বড় কঠোর। এর একটা বিশেষ তাৎপর্য নিশ্চয়ই ছিল।

রাজদরশন সম্ভব নয় বিরক্ত সন্ন্যাসীর পক্ষে—শুনে প্রতাপরুদ্র দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন—

তাঁর প্রতিজ্ঞা না করিব রাজদরশন।
মোর প্রতিজ্ঞা তাঁহা বিনা ছাড়িব জীবন॥
যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপাধন।
কিবা রাজ্য কিবা দেহ সব অকারণ॥ [তদেব : পৃ. ২৩০]

তথাপি কৃপা হলো না। গৌড় থেকে রথযাত্রা দেখতে দু'শ ভক্তের আগমন হয়েছিল নীলাচলে। তাঁদের মুখপাত্র হয়ে নিত্যানন্দ চৈতন্যদেবের একটি বহির্বাস চেয়ে নিলেন এবং সেটি পাঠিয়ে দিলেন রাজাকে : রাজা শ্রীচৈতন্য-জ্ঞানে সেই বহির্বাসকে পূজা করতে লাগলেন পরম আনন্দে। রামানন্দের সনির্বন্ধ অনুরোধে চৈতন্যদেব জানালেন—

যদ্যপি প্রতাপরুদ্র সর্বগুণবান।
তাহারে মলিন কৈল এক রাজনাম॥
তথাপি তোমার যদি মহাগ্রহ হয়।
তবে আনি মিলাহ মোরে তাহার তনয়॥
"আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" এই শাস্ত্রবাণী।
পুত্রের মিলনে যেন মিলিলা আপনি॥ [তদেব : পৃ. ২৪৬]

রাজা কৃতার্থ হয়ে পাঠিয়ে দিলেন রাজপুত্রকে। সেই শ্যামল সুন্দর কুমারকে দেখে ব্রজেন্দ্রনন্দনের কথা মনে পড়লো চৈতন্যদেবের, বার বার তিনি তাকে আলিঙ্গন করলেন : সেই আলিঙ্গনে বালকের পরম আবেশ দেখা দিল।

রথের আগে নৃত্য করছেন চৈতন্যদেব এবং ভক্তরা। রাজা তা দেখে বিস্মিত হলেন। পরোক্ষে রাজাকে কৃপা করলেন তিনি

রাজার তুচ্ছ সেবা দেখি প্রভুর প্রসন্ন মন।
সে প্রসঙ্গে পাইল এই রহস্যদর্শন॥
সাক্ষাতে না দেখা দেন পরোক্ষে এত দয়া।
কে বুঝিতে পারে চৈতন্যের এই মায়া॥ [তদেব : পৃ. ২৩১]

পরোক্ষে এই 'দয়া' কে যদি কৃপা বলা যায় তবে সেটা ১৫১৩।১৪ খ্রীষ্টাব্দ হতে পারে। বহির্বাস পূজা আরম্ভ এবং পুত্রকে চৈতন্যদেবের হাতে তুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই নিশ্চয়ই এই পরোক্ষ কৃপা প্রদর্শিত হয় নি। এও তো বাহ্যজ্ঞানহীন নৃত্যরত শ্রীচৈতন্য-দর্শন মাত্র!

চৈতন্যচরিতামৃত বলছেন 'জগন্নাথবদন চাঞা' চৈতন্যদেব ভাবে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। 'ভাবের তরঙ্গ' উথলে উঠলো তাঁর হৃদয়ে, আরম্ভ হলো তাঁর নৃত্য।

এই মত প্রভু নৃত্য করিতে করিতে।
প্রতাপরুদ্রের আগে লাগিলা পড়িতে॥
সম্ভ্রমে প্রতাপরুদ্র প্রভুকে ধরিল।
তাঁহারে দেখিতে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল॥
রাজা দেখি মহাপ্রভু করেন ধিক্কার।
ছি ছি বিষয়ি স্পর্শ হইল আমার॥ [তদেব : পৃ. ২৬৬-৬৭]

রাজা ভীত হলেন কিন্তু সার্বভৌম তাঁকে আশ্বস্ত ক'রে বললেন 'তোমার উপর প্রভুর

প্রসন্ন আছে মন'—যে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন তিনি তা প্রকৃতপক্ষে 'তোমা লক্ষ্য করি শিখায়েন নিজগণ' (তদেব)।

নৃত্যের ফলে শ্রান্ত চৈতন্যদেব যখন শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন তখন সার্বভৌমের উপদেশে রাজবেশ পরিত্যাগ ক'রে বৈষ্ণবের বেশে পদসেবা করতে করতে রাজা রাসলীলা এবং কথামৃত শ্লোক উচ্চারণ করলেন। প্রেমের আবেশে চৈতন্যদেব আলিঙ্গন করলেন প্রতাপরুদ্রকে। রাজাকে কিন্তু তিনি চিনতে পারেন নি—'ইহা নাহি জানে এহো হয় কোন্ জন' (তদেব : পৃ. ২৬৯)।

নীলাচলে আরও কিছুদিন থাকার পর বৃন্দাবন যাবার ইচ্ছা হলো চৈতন্যদেবের। তিনি সাময়িকভাবে নীলাচল ছেড়ে যাবেন শুনে দুঃখিত হলেন প্রতাপরুদ্র—

সার্বভৌম রামানন্দ আনি দুইজন।
দোঁহাকে কহেন রাজা বিনয়-বচন॥
নীলাদ্রি ছাড়ি প্রভুর মন অন্যত্র যাইতে।
তোমরা করহ যত্ন তাঁহারে রাখিতে॥
তাঁহা বিনা এই রাজ্য মোরে নাহি ভায়।
গোসাঞি রাখিতে করিহ নানা উপায়॥ [তদেব : পৃ. ২৯৭]

নানা ছলে 'আজি কালি করি' অনেকগুলো মাস কাটালেন তাঁরা। 'তৃতীয় বৎসরে' গৌড় থেকে আবার ভক্তগণ এলেন রথযাত্রা দেখতে। ১৫১৩ কে প্রথম বৎসর ধরলে ১৫১৫ খ্রীস্টাব্দ তৃতীয় বৎসর হয়। এ ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হয় চৈতন্যদেবের কথাতেই। গৌড়ের ভক্তগণ রথযাত্রার পর ফিরে গেলেন গৌড়ে : সার্বভৌম এবং রামানন্দকে তখন তিনি বললেন—

বহুত উৎকণ্ঠা মোর যাইতে বৃন্দাবন।
তোমার হঠে দুই বৎসর না কৈল গমন॥
অবশ্য চলিব দোঁহে করহ সম্মতি। [তদেব : পৃ. ৩০৩]

১৫১৩ থেকে দু'বৎসর ১৫১৫ই হয়। বর্ষা শেষে বিজয়াদশমীর দিন চৈতন্যদেব বৃন্দাবন যাত্রা করেন। গৌড় হয়ে যাবেন তিনি : কটকে এসে পৌঁছলেন, রামানন্দ রাজাকে নিয়ে এলেন শ্রীচৈতন্যের নিকটে। প্রতাপরুদ্রের 'ভক্তি দেখি প্রভুর তুষ্ট হৈল মন'। 'উঠি মহাপ্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন' (তদেব : পৃ. ৩০৪)। চৈতন্যদেবের কৃপা পেলেন রাজা।

প্রভু-কৃপা-অশ্রু তাঁর দেহে হৈল স্নান॥
সুস্থ করি রামানন্দ রাজা বসাইলা।
কায়মনোবাক্যে প্রভু তারে কৃপা কৈলা॥ [তদেব]

হাতীর পিঠে চড়ে মহিষীরা গৌড়ের পথে যাত্রী চৈতন্যদেবকে দেখলেন।

সুতরাং চৈতন্যচরিতামৃতের মতেও রাজা চৈতন্যদেবের কৃপা পেয়েছিলেন ১৫১৫ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে নয়। চৈতন্যজীবনীকারদের বক্তব্যে সময়টা খুব সঠিকভাবে নির্দিষ্ট করা না গেলেও অনুমান করা যেতে পারে যে, প্রতাপরুদ্র চৈতন্যদেবের কৃপা পেয়েছিলেন ১৫১৪ থেকে ১৫১৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে। সময়টাকে আরও নির্দিষ্ট করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

ড. সুকুমার সেন সম্পাদিত সাহিত্য একাদেমী প্রকাশিত চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের ভূমিকায় পাওয়া যায়, "চৈতন্যের জন্ম ১৪৮৬ খ্রীস্টাব্দে, তিরোভাব ১৫৩৪ খ্রীস্টাব্দে। চব্বিশ বছর বয়স পূর্ণ হবার মুখে ১৫১০ খ্রীস্টাব্দে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।"

চৈতন্য চরিতামৃতকার বলেছেন—

চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস।
চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস ॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
কভু দক্ষিণ কভু গৌড় কভু বৃন্দাবন ॥ [তদেব : পৃ. ৬৪]

ওই গ্রন্থেই অন্যত্র বলা হয়েছে—

শেষ অষ্টাদশ বর্ষ অন্ত্যলীলা নাম।
তার মধ্যে ছয় বর্ষ ভক্তগণ-সঙ্গে।
প্রেমভক্তি লওয়াইলা নৃত্যগীতরঙ্গে ॥
দ্বাদশ বৎসর শেষ রহিলা নীলাচলে।
প্রেমাবস্থা শিখাইলা আস্বাদনচ্ছলে ॥ [তদেব : পৃ. ৬৪]

অর্থাৎ শেষ চব্বিশ বৎসরের ছয় বৎসর দক্ষিণ-গৌড়-বৃন্দাবনে গমনাগমন বাদ দিলে যে অষ্টাদশ বৎসর থাকে তার মধ্যে শেষ দ্বাদশ বৎসর স্থায়ীভাবেই চৈতন্যদেব নীলাচলে অবস্থান করেন : অর্থাৎ ১৫২২ খ্রীস্টাব্দ থেকে শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন। অন্তত পক্ষে ১৫২১ খ্রীস্টাব্দে তিনি যে পুরীতে ছিলেন না তা বোধগম্য হয় চৈতন্যচরিতামৃত থেকেই। সুতরাং ১৫১০ থেকে ১৫২১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে প্রতাপরুদ্রদেব চৈতন্যদেবের কৃপা লাভ করেন।

ইতিহাস প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারে।

ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন যে, ১৪৯৩ খ্রীস্টাব্দে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণের পর থেকে অন্ততপক্ষে ১৫১৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত হুসেন শাহ উড়িষ্যার রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। [*History of Medieval Bengal : pg. 51*]। ড. মজুমদার আরও বলেন যে, হুসেন শাহ একবার পুরী পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে মন্দিরের দেবমূর্তি ভঙ্গ করেন : প্রতাপরুদ্রও গৌড়ের কিছু অঞ্চল অধিকার করেছিলেন।

অধ্যাপক প্রভাত মুখার্জী বলেছেন যে, নিজের শাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য প্রতাপরুদ্র দক্ষিণে যাত্রা করেন এবং ১৫১০ খ্রীস্টাব্দের শেষ পর্যন্ত সেখানেই থেকে যান। প্রতাপরুদ্রের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে হুসেন শাহ পুরী পর্যন্ত অগ্রসর হন। দেবমূর্তি ধ্বংস করেন—এই সময়েই চৈতন্যদেব নীলাচলে আসেন। অধ্যাপক মুখার্জীর মতে চৈতন্যদেব নীলাচলে আসেন ১৫১০ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে। অনুমিত হয় যে হুসেন শাহের গৌড় আক্রমণের কাল ১৫১০ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসের পর। [The Gajapati Kings of Orissa : pg. 74-76] ১৫১০ থেকে ১৫১৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত নানা সময়ের যুদ্ধে হুসেন শাহ উড়িষ্যার রাজার অধিকার থেকে ৪০ মাইল লম্বা সামান্য অঞ্চল দখল করে নেন।

অধ্যাপক মুখার্জী আরও জানিয়েছেন যে গজপতি প্রতাপরুদ্রের বিরুদ্ধে কৃষ্ণদেব রায় তিনটি বড় রকম আক্রমণ চালান : উদয়গিরির দুর্গ কৃষ্ণদেব রায়ের অধিকারে আসে

১৫১৪খ্রীস্টাব্দের ৯ই জুন, গজপতি নিজে সসৈন্যে যুদ্ধে গিয়ে পরাজিত হন [পৃ. ৭৮]। দ্বিতীয় আক্রমণ হয় কোণ্ডাভেডু দখলের জন্য ; তৃতীয় আক্রমণে কৃষ্ণদেব বিজয়ওয়াড়া অধিকার ক'রে কোণ্ডাপাল্লা অবরোধ করেন—বিরাট বাহিনী নিয়ে এসেও প্রতাপরুদ্র পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। রায়ের সৈন্যবাহিনী শ্রীকুর্মও অধিকার ক'রে নেন। গজপতি শান্তি চুক্তি করতে বাধ্য হন—চুক্তি হয় ১৫১৯ খ্রীস্টাব্দে ৮ই আগস্টের পূর্বে। স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, হুসেন শাহ মারা যান ১৫১৮ খ্রীস্টাব্দে। প্রতাপরুদ্র জীবনের অবশিষ্ট কাল ধর্মকর্মে নিবিষ্ট ছিলেন।

সিওয়েলও বলেছেন, কৃষ্ণদেব রায় কোণ্ডাভেডু অধিকার করেন ১৫১৫ খ্রীস্টাব্দে এবং পরের বৎসর আশে পাশের অঞ্চলে যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন তিনি। [*R. Sewell : The Forgotten Empire : Vijayanagar : pg. 136*]

নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর মতে কৃষ্ণদেব রায় উদয়গিরির দুর্গ অবরোধ করেন ১৫১৩ খ্রীস্টাব্দে এবং এক থেকে দেড় বৎসর অবরোধের পর দুর্গ অধিকৃত হয়। এরপর অবরোধ করা হয় কোণ্ডাভেডু দুর্গ —অনেক মাস অবরোধের পর দুর্গের পতন ঘটে। কৃষ্ণদেব রায় কটক পর্যন্ত আসেন এবং শেষ পর্যন্ত দুই রাজার মধ্যে শান্তি চুক্তি স্থাপিত হয়। [*A History of South India : K. A. Nilkanta Sastri : pg. 280-83*]।

দক্ষিণ ভারত থেকে চৈতন্যদেব ফিরেছিলেন ১৫১২ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে অথবা ১৫১৩ খ্রীস্টাব্দে। হুসেন শাহ এবং কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে যুদ্ধে প্রতাপরুদ্রকে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয় অন্তত পক্ষে ১৫১৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। অধ্যাপক মুখার্জী এমন কথাও বলেছেন যে, প্রতাপরুদ্র ১৫১০ খ্রীস্টাব্দে দক্ষিণদেশে শক্তি বৃদ্ধি করতে যান বটে এবং সেই বৎসরের শেষে অথবা ১৫১১ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে দ্রুতগতিতে ফিরে আসেন হুসেন শাহকে বাধা দিতে। পুনরায় দ্রুত তাঁকে ফিরে যেতে হয় দক্ষিণে, কৃষ্ণদেব রায়ের মুখোমুখি হতে। অন্তত ১৫১৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এভাবে টানা পোড়েন ক'রে পরিশ্রান্ত হতে হয় গজপতিকে

সুতরাং ইতিহাসের পরোক্ষ সাক্ষ্য এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য করে যে, গজপতি প্রতাপরুদ্রকে চৈতন্যদেব কৃপা করেন ১৫১৫ খ্রীস্টাব্দের পর এবং ১৫২১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে। ১৫১৯ খ্রীস্টাব্দে কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে তার শান্তি চুক্তি সমাপ্ত হয়। চৈতন্যদেবের কৃপার কাল ১৫১৯ থেকে ১৫২১ ও হতে পারে। অভ্যন্তরীণ পদস্থ রাজকর্মচারীদের বিশ্বাসঘাতকতায় এবং পরপর যুদ্ধে পরাজয় ধার্মিক, সংস্কৃতিবান নম্র বিনয়ী গজপতিকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে একেবারে ধর্মের জগতে অপসারিত ক'রে নিয়ে গিয়েছিল একথা মনে করা অস্বাভাবিক নয়। তাঁকে কৃপা করতে স্বয়ং চৈতন্যদেবও যেভাবে বিলম্ব করেছিলেন তাতে বিশ্বাস করা যুক্তিসঙ্গত যে তিনি কৃপা লাভ করেন ১৫১৫-১৬ খ্রীস্টাব্দের পর।

শ্রীচৈতন্যের ভারত পর্যটন

শ্রীচৈতন্যজীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি অধিকাংশ চৈতন্য-চরিতেই অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ। তুলনামূলক পাঠ-পদ্ধতির প্রয়োগেই এই অস্পষ্টতা ও অসম্পূর্ণতা অনেকটা দূর হতে পারে।

দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্থানের অনুক্রম বহুবার লঙ্ঘন করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি—

সেই সব তীর্থের ক্রম কহিতে না পারি। দক্ষিণ-বামে তীর্থ-গমন হয় ফেরাফিরি ॥
অতএব নাম মাত্র করিয়ে গণন। কহিতে না পারি তার যথা অনুক্রম ॥
[চৈ. চ.ঃ মধ্য/৯ম পঃ]

বৃন্দাবনদাসও লিখেছেন—

এসব কথার অনুক্রম নাহি জানি। যে-তে-মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি ॥
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের পায়ে মোর নমস্কার। ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥
[চৈ. ভা.ঃ অন্ত্য/৪ অধ্যায়]

চৈতন্যভাগবতে চৈতন্যদেবের দক্ষিণ ভ্রমণের কেবলমাত্র সূত্রাকারে উল্লেখ আছে আদি-খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে—

শেষখণ্ডে সেতুবন্ধে গেলা গৌররায়। ঝারিখণ্ড দিয়া পুন গেল মথুরায় ॥
শেষখণ্ডে রামানন্দ রায়ের উদ্ধার।

বৃন্দাবনদাস আদিখণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ে নিত্যানন্দের পৃথিবী পর্যটনের যে বর্ণনা করেছেন, তাতে অনুক্রমের কোন বালাই নেই। পশ্চিম ভারতের দ্বারকার পর দক্ষিণ ভারতের (মহীশূরের) মৎস্যতীর্থ, শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী, তারপরই আবার উত্তরভারতের কুরুক্ষেত্র ও পশ্চিমভারতের প্রভাস; হরিদ্বারের পরই সপ্তগোদাবরী, রামেশ্বরের পরই বিজয়ানগর, তারপর মায়াপুরী (হরিদ্বার), তারপর আবার অবন্তী ও গোদাবরী।

ঘূর্ণিবাত্যার পক্ষেও বোধহয় এ ভাবে ভ্রমণ সম্ভব নয়। বৃন্দাবনদাসের ভৌগোলিক জ্ঞানের অভাব যেমন এতে সূচিত হয়, তেমনই তাঁর সংগৃহীত তথ্যের উৎসের নির্ভর-যোগ্যতার অভাবও এতে প্রকট হয়ে উঠেছে।

যদি আমরা কৃষ্ণদাস কবিরাজ পরিবেশিত দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্ত সতর্কভাবে লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাব এই বৃত্তান্তে প্রথমবারের সঙ্গে অন্য কোন একবারের দক্ষিণ ভ্রমণ মিশে গেছে।

চৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য লীলা-৭ম পরিচ্ছেদ) দক্ষিণ ভ্রমণের উদ্যোগপর্বটি স্মরণ করা যাক। নিত্যানন্দ চৈতন্যদেবকে বলছেন 'একাকী যাইবে তুমি, কে ইহা সহয়' ॥

চৈতন্যদেব বললেন, 'আমি একাই যাব, কেননা, 'তোমা সবার গাঢ়-স্নেহে আমার কার্য ভঙ্গ ॥' দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বললেন জগদানন্দ ও দামোদর পণ্ডিতের কথা—

জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে। যেই কহে, সেই ভয়ে চাহিয়ে করিতে ॥
কভু যদি ইহার বাক্য করিয়ে অন্যথা। ক্রোধে তিন দিন মোরে নাহি কহে কথা ॥

এবং—'আমি ত' সন্ন্যাসী, দামোদর-ব্রহ্মচারী। সদা রহে আমার উপর শিক্ষা-দণ্ড ধরি'।

অন্ত্যলীলার দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে জগদানন্দের 'বিষয়-ভুঞ্জানো'র ব্যাপার। শিবানন্দ যে-বছর তার কনিষ্ঠপুত্রকে (কর্ণপুরকে) নিয়ে এসেছেন (১৫২৪ খ্রীস্টাব্দে কর্ণপুরের জন্ম—গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন ঃ পৃ. ১৩) তার 'পূর্ব্ববর্ষে জগদানন্দ 'আই' দেখিবারে। প্রভু-আজ্ঞা লঞা আইলা নদীয়া নগরে ॥' এই সময়ই শিবানন্দ সেনের কাছ থেকে কলসীভরা চন্দনতেল নিয়ে এসেছিলেন তিনি। সেই তেল

ব্যবহারে চৈতন্যদেব রাজী না হওয়ায় জগদানন্দ রেগে সেই কলসী আছাড় মেরে ভেঙে ফেলেছিলেন এবং—

তৈল ভাঙ্গি' সেই পথে নিজ-ঘর গিয়া। শুইয়া রহিলা ঘরে কপাট খিলিয়া ॥
তৃতীয় দিবসে প্রভু তাঁর দ্বারে যাঞা। 'উঠহ পণ্ডিত,' করি' কহেন ডাকিয়া ॥
আজি ভিক্ষা দিবা আমায় করিয়া রন্ধনে। মধ্যাহ্নে আসিমু, এবে যাই দরশনে ॥
[অন্ত্য/১২ পঃ]

এরপর আরেকবার চৈতন্যদেবকে কলার শরলায় শয়ন করতে দেখে জগদানন্দ শিমুলতুলো দিয়ে একটি বালিশ তৈরি ক'রে গোবিন্দের হাতে দিলেন এবং 'প্রভুরে শোয়াইহ ইহায়'—তাহারে কহিলা'।

তুলোর বালিশ দেখে ক্রুদ্ধ হলেন চৈতন্যদেব, বালিশ সরিয়ে কলার শরলাতেই শয়ন করলেন। স্বরূপ দামোদর বললেন, 'শয্যা উপেক্ষিলে পণ্ডিত দুঃখ পাবে ভারি'। তখন,—প্রভু কহেন,—'খাট এক আনহ পাড়িতে। জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে ॥ [অন্ত্য/১৩ পঃ]

সুতরাং ১৫১০ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দক্ষিণ ভ্রমণের অনেক পরে ১৫২৪ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে জগদানন্দের বিষয়ভুঞ্জানোর ব্যাপারটি এবং তিন দিন কথা না-বলার ব্যাপারটি ঘটেছিল। এই ঘটনার উল্লেখ করে চৈতন্যদেব দক্ষিণ ভ্রমণে একা যেতে চাইলে, সে দক্ষিণ ভ্রমণ নিশ্চিতই ১৫১০ খ্রীস্টাব্দের পরে কোন এক সময়ের—এই সিদ্ধান্ত করা ছাড়া উপায় থাকে না।

দামোদরের 'শিক্ষাদণ্ড' ব্যাপারটি এবার লক্ষ্য করা যাক। অন্ত্যলীলার ৩য় পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে—

পুরুষোত্তমে এক উড়িয়া ব্রাহ্মণ কুমার। পিতৃশূন্য, মহাসুন্দর, মৃদু ব্যবহার ॥
প্রভুস্থানে নিত্য আইসে, করে নমস্কার। প্রভু সনে বাত্ কহে, প্রভু প্রাণ তার ॥

পণ্ডিত দামোদর প্রথমতঃ সেই বালককে বারবার নিষেধ করলেন। কিন্তু 'প্রভুরে না দেখিলে সেই রহিতে না পারে' ॥ আরেকদিন সেই বালক 'প্রভুস্থানে আইলা' এবং 'গোসাঞি তারে প্রীতি করি বার্ত্তা পুছিলা' ॥ এবার আর দামোদরের সহ্য হল না। বালক উঠে গেলে দামোদর বলতে লাগলেন—

'গোসাঞি,' 'গোসাঞি' এবে জানিমু 'গোসাঞি' ॥
'এবে গোসাঞির গুণ সব লোকে গাইবে।
গোসাঞি প্রতিষ্ঠা সব পুরুষোত্তমে হইবে ॥

চৈতন্যদেব জানতে চাইলেন দামোদরের বক্তব্য। দামোদর বললেন-

পণ্ডিত হঞা মনে কেনে বিচার না কর ?
রাণ্ডী ব্রাহ্মণীর বালকে প্রীতি কেনে কর ?
যদ্যপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতী। তথাপি তাহার দোষ—সুন্দরী যুবতী ॥
তুমি হ পরমযুবা, পরম সুন্দর। লোকের কানাকানি বাতে দেহ অবসর ॥

এহেন বক্তব্য শুনে চৈতন্যদেব নিঃসন্দেহে চমৎকৃত হলেন। তিনি বললেন—

আমা হৈতে যে না হয়, সে তোমা হৈতে হয়। আমারে করিলা দণ্ড আন কেবা হয় ॥

পণ্ডিতকে তিনি নদীয়ায় পাঠিয়ে দিলেন—

মাতার গৃহে রহ যাই মাতার চরণে। তোমার আগে নাহি কার স্বচ্ছন্দাচরণে॥

এই হলো দামোদরের 'শিক্ষাদণ্ড'। এ ঘটনা চৈতন্যদেবের ব্রজপর্যটনের পরবর্তীকালের অর্থাৎ ১৫১৬ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ের।

মধ্যলীলার ৭ম পরিচ্ছেদে দক্ষিণযাত্রার প্রাক্‌কালে শ্রীচৈতন্য এ ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ১৫১০ খ্রীস্টাব্দের দক্ষিণ ভ্রমণের প্রাক্‌কালে ১৫১৬ বা ১৫২৪ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ের ঘটনার উল্লেখ কি ক'রে সম্ভব? অথচ কৃষ্ণদাস কবিরাজ যখন বলছেন—

মাঘ শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস। ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস॥
চৈত্রে রহি কৈল সার্বভৌম বিমোচন। বৈশাখের প্রথমে দক্ষিণ যাইতে হৈল মন॥
[চৈ. চ.ঃ মধ্য ৭ম পঃ]

তখন ১৫১০ খ্রীস্টাব্দের দক্ষিণযাত্রাই যে বর্ণিত হচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ থাকে না।

সুতরাং এই সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত যে, চরিতামৃত পুঁথি চুরি যাবার ফলেই হোক, আর যে কারণেই হোক, চরিতামৃতে বর্ণিত দক্ষিণ ভ্রমণ প্রসঙ্গে ১৫১০ খ্রীস্টাব্দের দক্ষিণ ভ্রমণের সঙ্গে পরবর্তী আরেকবারের বা একাধিকবারের দক্ষিণ ভ্রমণ কাহিনী মিশে গেছে।

দক্ষিণ ভ্রমণ বলা হলেও আসলে শ্রীচৈতন্য পশ্চিম ভারতও পর্যটন করেছিলেন। এই ভারত-পর্যটনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যায় গোবিন্দ দাস (কর্মকার)-এর করচায়। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে শান্তিপুরের পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী প্রাচীন পুঁথির অনুলিপি থেকে এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এ অধ্যায়ে এই গ্রন্থটিই হবে আমাদের প্রধান অবলম্বন।

শ্রীচৈতন্যের এই ভারততীর্থ-পরিক্রমা ঐতিহাসিক ঘটনা। ড. বিমানবিহারী মজুমদার হিসেব করে দেখিয়েছেন, ১৪৩২ এবং ১৪৩৩ শকে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ (চৈতন্যচরিতের উপাদান ঃ পৃ. ২০)। অর্থাৎ এ হলো ১৫১০ থেকে ১৫১২ খ্রীস্টাব্দের ঘটনা। এই দু বছরের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেই ওই ঘটনাকে স্থাপন ক'রে বিশ্লেষণ করতে হবে।

আমরা আগেই জেনেছি যে, ১৫১০ খ্রীস্টাব্দে শ্রীচৈতন্য যখন পুরীতে এলেন, তখন উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্র তাঁর রাজ্যের দক্ষিণ সীমায় বিজয়নগরের সঙ্গে যুদ্ধরত। বৃন্দাবন দাস লিখেছেন--

যে সময়ে ঈশ্বর আইলা নীলাচলে। তখনে প্রতাপরুদ্র নাহিক উৎকলে॥
যুদ্ধ রসে গিয়াছেন বিজয়ানগরে। অতএব প্রভু না দেখিলেন সেইবারে॥
[চৈ. ভা.ঃ অন্ত্য ৩য় অধ্যায়]

ঐতিহাসিক নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী লিখেছেন, প্রতাপরুদ্র ১৪৯৬ থেকে ১৫১২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দক্ষিণে তাঁর প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখেন [*A History of South India* Sastri: pg. 261]।

গৌড় থেকে পুরীতে আসার পথে বিবদমান দুই পক্ষের (গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের এবং উড়িষ্যার গজপতি প্রতাপরুদ্রের) সৈন্য সমাবেশের মধ্য দিয়ে চৈতন্যদেব এসেছিলেন (কর্ণপুরের 'চৈতন্য চন্দ্রোদয়' ষষ্ঠ অঙ্ক)। উড়িষ্যার উত্তরের ন্যায়

দাক্ষিণেও তখন যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি। তারই মধ্যে তিনি চলেছেন প্রতাপরুদ্রের রাজ্যসীমা পার হয়ে বিজয়নগরাধিপতি কৃষ্ণদেব রায়ের রাজ্যসীমার মধ্য দিয়ে।

কন্যাকুমারীর পর যখন তিনি উত্তর মুখে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পাশ দিয়ে যাচ্ছেন, তখন পশ্চিম উপকূলে কালিকট থেকে গোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে পর্তুগীজদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোচিনে কান্নানোরে তারা দুর্গ গড়েছে এবং খোদ লিসবনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমান দক্ষতায় কোচিনে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতের কারখানা স্থাপন করেছে [*Ibid, pg. 325*]।

আবার এই সময় দক্ষিণ ভারতে *Ummattur* এর বিদ্রোহী নায়ক• গঙ্গ রায়ের সঙ্গে কৃষ্ণদেব রায়ের যুদ্ধ চলছে [*Ibid. pg. 270*] এবং বিজাপুর সুলতানীতেও চলছে অভ্যন্তরীণ গোলমাল [*Ibid. pg. 269*]।

এই সব ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই চৈতন্যদেবের ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্ত বিচার করে দেখতে হবে। নতুবা কোন্ পথ ধরে তিনি গিয়েছিলেন, কোন্ পথে তাঁর যাওয়া সম্ভব ছিল, এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা সম্ভব নয়। এদিকে সত্যনির্ণয়ে প্রথম প্রয়াসী হন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়।

শাস্ত্রী মহাশয় ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে *The Calcutta Review* পত্রিকার *CVII* খণ্ডে ১৭২-১৮৪ পৃ.) *Topography of Govinda Dasa's Diary* নামক প্রবন্ধে গোবিন্দ কর্মকারের করচার ভৌগোলিক প্রামাণিকতা ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন।

এই করচা সম্পর্কে ড. দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন—"আমরা গোবিন্দ দাসের করচাখানিকে চৈতন্যচরিত সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া মনে করি। চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি পুস্তক চৈতন্য প্রভুর তিরোধানের অনেক পরে লিখিত হইয়াছিল।—গোবিন্দ দাস মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে দুই বৎসর ভ্রমণ করিয়াছিলেন ; এই দুই বৎসরের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।"

[সাহিত্য, আষাঢ় ১৩০৮ : পৃ. ১৭০]

দীনেশচন্দ্রের পর অধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র দে করচার প্রামাণিকতা বিষয়ে মূল্যবান আলোচনা করেন তাঁর 'গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লী' গ্রন্থে।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন, শ্রীচৈতন্য ও গোবিন্দ কর্মকার এই ভারত পর্যটনে মোটামুটি সমুদ্রের উপকূল ধরেই গিয়েছিলেন এবং বঙ্গ থেকে সিন্ধু পর্যন্ত উপকূলস্থ দেশগুলির প্রায় সবই ছিল তখনই হিন্দুদের অধীনে। এই দুষ্প্রাপ্য প্রবন্ধটির প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধৃত হল।-–"গোবিন্দ দাসের করচা যে কালে লিখিত হইয়াছিল, সেকাল ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারতের, ইতিহাসের দিক দিয়া অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখা যায় বহুসংখ্যক স্বাধীন রাষ্ট্র আপন আপন স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া এক বিশাল সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হইল, তারপর সেই সাম্রাজ্য ভাঙিয়া আবার অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সৃষ্টি হইল। এ দেশের ইতিহাস বলিতে এই। ১৩০৯ সালে প্রায় সমগ্র ভারতই পাঠান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল ; অথচ ১৩৫১ সালে মহম্মদ তুঘলক ওরফে জুনাখানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যের পতন হয়। উত্তর ভারত প্রায় কুড়িটি স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হয়—কোন কোনটি হিন্দু, অবশিষ্ট মুসলমান। কিন্তু দক্ষিণ ভারত ও

দাক্ষিণাত্যে পাঠান সাম্রাজ্যের পতনের পর দুইটি বৃহৎ স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হইল—বিদারের বাহমনী রাজ্য এবং বিজয়নগরের হিন্দুরাজ্য। বাহমনী রাজ্য তাপ্তী নদী হইতে কৃষ্ণানদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, বিজয়নগর সাম্রাজ্যের বিস্তার ছিল কৃষ্ণানদী হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত।

"গোবিন্দের করচা ১৫০৮-৯ সালে লিখিত হইয়াছিল। বাহমনী রাজ্যে তখন অস্তিত্ব বজায় রাখিবার শেষ লড়াই চলিতেছে। বিদ্রোহী সেনাপতিরা ইতিমধ্যে সাম্রাজ্যের কিছু অঞ্চল অধিকার করিয়া তিনটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কুড়ি বৎসরেরও অধিক হইল বিজাপুর, আহম্মদনগর এবং বেরার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কুতুবশাহীরা কাশিম বারির মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছে, তাহা হইলেই বাহমনী সাম্রাজ্যের নামেমাত্র অধীনতাও ত্যাগ করিতে পারিবে। পক্ষান্তরে কাশিম বারি স্বয়ং বাহমনী সাম্রাজ্যের রাজধানীতেই রাজ্য গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট।

"চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যেসব হিন্দু রাজা সায়ন, মাধব প্রমুখ মহাজ্ঞানীদের নির্দেশে দক্ষিণ ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া হিন্দুধর্ম ও হিন্দু প্রতিষ্ঠান গুলিতে নূতন প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দুর্বল বংশধরেরা এ সময় শক্তিমান ও ধুরন্ধর মন্ত্রীদের হাতের পুতুলে পরিণত হইয়াছেন।

"সুতরাং হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকল রাজ্যের রাজধানীতে তখন পরিস্থিতি অশান্ত এবং অপরাধের উৎস মুখ উন্মুক্ত। সীমান্ত অঞ্চলের উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ তখন শিথিল হইয়া পড়িতেছিল এবং ছোটখাট সর্দারেরা এইসব দূরবর্তী অঞ্চলের উপরে নিজেদের অধিকার সাব্যস্ত করিতেছিল।

"চট্টগ্রাম হইতে গঙ্গার উত্তর পর্যন্ত প্রসারিত বাংলার উপকূল ভাগের অধিকাংশ ছিল সুন্দরবন এলাকার হিন্দু ভূস্বামীদের হাতে। ইঁহারাই যাট বৎসর পর সুন্দরবন এলাকার যশোহরে বিক্রমাদিত্য ও তাঁহাব পুত্র প্রতাপাদিত্যের বশ্যতা স্বীকার করে। উড়িয়াগণ তখন পর্যন্ত মুসলমানেব আনুগত্য একেবারেই স্বীকার করেন নাই, গঙ্গার মোহানা হইতে গোদাবরীব মোহানা পর্যন্ত সমগ্র উপকূল ভাগ তাঁহাদের অধিকারে ছিল।

"গোদাবরী ও কৃষ্ণানদীর মধ্যবর্তী উপকূল ভাগে কোন রাজনৈতিক সুস্থিতি ছিল না। এই অঞ্চলের অন্তর্গত ওয়রঙ্গল রাজ্য ১৪৩৪ সালে আহম্মদ শাহ্ বাহমনী কর্তৃক ধ্বংস হইয়াছিল। কিন্তু রাজধানী শহরটি তখনও ছিল অপরাজিত; হিন্দু রাজারা একের পর এক জীবন দিয়াও মুসলমান আগ্রাসনের প্রতিরোধ করিতেছিলেন।

"কৃষ্ণা ও কাবেরীর মোহানার মধ্যবর্তী প্রদেশে বিজয়নগরের রাজাদের একচ্ছত্র আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল এবং গোবিন্দের ভ্রমণের প্রায় সমকালে রাজ্যের মধ্যে প্রবল অশান্তি উত্তেজনা থাকিলেও, সমগ্র সাম্রাজ্য অটুট ছিল।

"কাবেরীর পর তাঞ্জোর ও মাদুরা রাজ্য, রামনাথ, সেতুপতি ও পদ্মকোটের নায়কদের এলাকা, তারপর কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত কেরল দেশ—ছোট ছোট হিন্দু রাজাদের

অধীনে ছিল ; এই রাজারা প্রায় সকলেই বিজয়নগরের আনুগত্য স্বীকার করিতেন। কেরলের উত্তরে উপকূলস্থ গুবাকবন বা গোয়া দীর্ঘকাল হিন্দু-মুসলমান রাজ্যগুলির মধ্যে বিবাদের কারণ হইয়াছিল। গোয়া দখলের প্রথমদিকের যুদ্ধে প্রসিদ্ধ হিন্দুপণ্ডিত মাধবাচার্য্য সেনাপতিত্ব দান করেন এবং অসাধারণ রণনৈপুণ্যে মুসলমানদের দীর্ঘকাল কোণঠাসা করিয়া রাখেন। পর্তুগীজেরা মাত্র দশ বৎসর পূর্বে ভারতে আসিয়াছিল ; তাহারাও এই গুরুত্বপূর্ণ শহরটির উপর তাহাদের লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। গোয়ার উত্তরে সহ্যাদ্রি ও কোঙ্কন পরে মামুদ গাওয়ানের হস্তগত হইলেও, তখন পর্যন্ত হিন্দুদের হাতেই ছিল। গুজরাটের উপকূলভাগ অংশতঃ আমেদাবাদের রাজাদের দখলে থাকিলেও গুজরাটনৃপতি মাহ্মুদ বেগারা সম্প্রতি জুনাগড় বিজয়ের সুবাদে পশ্চিমে সমুদ্র পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। দিউর দক্ষিণে অবশ্য ইহাদের আধিপত্য ছিল না এবং গুজরাটের দক্ষিণ উপকূল হইতে পশ্চিম কাথিয়াবাড়ের পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত উপকূল এলাকা হিন্দুদের হাতেই ছিল, কেননা এই অঞ্চলেই ছিল তাহাদের পবিত্রতম কয়েকটি তীর্থ।"

সুতরাং মোটামুটি হিন্দু এলাকার উপর দিয়েই চৈতন্য ভারত পর্যটন করেছিলেন। আগ্রাসী মুসলিম শক্তির সামনে হিন্দুদের সংহত করার লক্ষ্য নিয়েই কি এই নবীন সন্ন্যাসী এগিয়েছিলেন?

গোবিন্দের করচায় চৈতন্যদেবের তীর্থ পর্যটনকালে কয়েকজন রাজার প্রসঙ্গ আছে। এঁদের মধ্যে দুজন চৈতন্যদেবের সামনে এসেছেন—একজন ত্রিবঙ্কুদেশের রুদ্রপতি অপরজন বরোদার 'গোবিন্দসেবক' রাজা। [এ অধ্যায়ে 'করচা'র উদ্ধৃতাংশে করচার আদি সংস্করণের পৃষ্ঠাঙ্ক এবং নব সংস্করণের পৃষ্ঠাঙ্ক পরপর দেওয়া হল]।

ত্রিবঙ্কুদেশে—

'এদেশের রাজা কত আগ্রহ করিয়া। প্রভুকে লইতে দিলা লোক পাঠাইয়া ॥
প্রভু বলে সেথা মোর নাহি প্রয়োজন। বিষয়ীর কাছে আমি না করি গমন ॥
রাজদূত বলে শুন সন্ন্যাসি ঠাকুর। কেন নাহি যাবে পাবে সম্পত্তি প্রচুর ॥
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু বলিলা বচন। শুন রাজদূত ধনে নাহি প্রয়োজন ॥
বিষয়ের কীট যারা তাদের সংস্রবে। কভু নাহি যাই মুহি কি হবে বিভবে ॥ ১১১ ৪৪
ধনমদে মত্ত যারা ভুলি তত্ত্বকথা। বিষয় নরকে তারা থাকয়ে সর্ব্বথা ॥
অনিত্য শরীর ধনী ইহা নাহি জানে। জীবনের সার্থক বলিয়া ধনে মানে ॥ ১১২/৪৪

তারপর যখন রাজা রুদ্রপতি এসে বলছেন—

না বুঝিয়া ডাকিয়াছিলাম আপনারে। সেই অপরাধ মোর ক্ষম এইবারে ॥
জ্ঞান শিক্ষা দেহ মোরে অধম তারণ। শোক দুঃখ পায় জীব কিসের কারণ ॥ ১১২/৪৪

তখন মহাপ্রভু তাকে জ্ঞানযোগে শিক্ষা না দিয়ে সরাসরি প্রেমযোগে দীক্ষা দিলেন—

প্রভু কহে রাজা তুমি বড় ভাগ্যবান। ভাগবত জান তুমি কি কহিব আন ॥
নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত তুমি বড় জ্ঞানী। রাধাকৃষ্ণ বিনা আমি কিছু নাহি জানি ॥
কহিতে কৃষ্ণের নাম প্রেম উপজিল। দরদর অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল ॥
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত প্রভু অমনি উঠিয়া। নাচিতে লাগিল দুই বাহু পশারিয়া ॥

গোরা বলে হরিবোল অজ্ঞান হইয়া। নাচিতে নাচিতে পড়ে আছাড় খাইয়া॥
পাছাড়িয়া রাজা তবে প্রভুরে তুলিলা। সেই সঙ্গে মহারাজ মাতিয়া উঠিলা॥
হরি বলি মহারাজ নাচিতে লাগিল। নয়নের জলে তাঁর হৃদয় ভাসিল॥ ১১৩/৪৫
দেখিয়া রাজার ভক্তি আমার নিমাই। কোল দিয়া রাজারে বলেন এস ভাই॥
হরিনামে যার চক্ষে বহে অশ্রুধারা। সেইজন হয় মোর নয়নের তারা।
দেখিয়া তোমার ভক্তি রাজা মহাশয়। জুড়াল আমার প্রাণ জানিহ নিশ্চয়॥
এত বলি মহারাজে বিদায় করিয়া। স্নান করিবারে প্রভু গেলেন চলিয়া॥ ১১৪/৪৫

এরপর বরোদার রাজার প্রসঙ্গ। বরোদায় মহাপ্রভুর সঙ্গী নারোজীর দেহান্তর হয়।

নারোজীরে কোলে করি প্রভু বিশ্বম্ভর। তমালের তল হৈতে করে স্থানান্তর॥
ভিক্ষা করি নরোজীর সমাধি হইল। সমাধি বেচিয়া প্রভু কীর্ত্তন করিল॥
মন্দিরেতে রাজা বলে ভিক্ষা করিবারে। প্রভু বলে ভিক্ষা পাই গৃহস্থের দ্বারে॥
বিলাসের ভিক্ষায় নাহিক প্রয়োজন। তব দ্বারে ভিক্ষা নাহি চাহি এ কারণ॥
হাত জোড়ি রাজা কহে ভিক্ষা লইবারে। অগত্যা লইতে ভিক্ষা কহিলা আমারে॥
প্রভুর ইঙ্গিতে তবে ভূপতির ঠাঁই। সামান্যলোকের ন্যায় মুষ্টি ভিক্ষা চাই।
ভিক্ষা দিয়া মহারাজ করিলা গমন। নিত্যক্রিয়া গোরাচাঁদ করে সমাপন॥ ১৬০ ৬২

এই ভারত পর্যটন কালে রাজা-প্রজা, পণ্ডিত-মূর্খ, ভক্ত-অভক্ত এমন কি নটী ও সমাজপরিত্যক্তা নারীরাও পেয়েছিল তাঁর দিব্যকরুণার স্পর্শ।

পুরীতে সার্বভৌমকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদী করার পর শ্রীচৈতন্য যখন দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে বার হলেন, অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতরা তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে আসবেন, এটা স্বাভাবিক। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে মাধ্বসম্প্রদায়ের মঠাধীশের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ববিচারেব ঘটনার বর্ণনা থাকলেও অদ্বৈতবাদী কোন তাত্ত্বিকের সঙ্গে অনুরূপ বিচারের কোন ঘটনার উল্লেখ নেই। অথচ গৌড়ীয় সম্প্রদায় নিজেদের পরিচয় দেন 'মাধ্বগৌড়ীয়' ব'লে।

দক্ষিণ ভারতে শঙ্করপন্থীদের প্রচারিত অদ্বৈতমত খণ্ডন করে শ্রীচৈতন্য যে ভক্তিমত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে গোবিন্দ কবি প্রণীত শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয় কাব্যে ঃ—

'পয়স্বিনীরোধসি বোধসাগবঃ ক্রমাদ্বিশশ্রাম চ শঙ্করাশ্রমে॥ ২৮
স শাঙ্করীয়ৈঃ সহসং বদন্ মুদা তদা তদদ্বৈতমতং বিখণ্ডয়ন্।
সমাদধে ভক্তিমতং স্বযুক্তিতিস্তদীয় সূত্রার্থমপি প্রকাশয়ন্॥ ২৯, দশম সর্গ।

ঠিক এই কথাই আছে গোবিন্দেব করচায়—

'শিঙারির মঠে থাকে শঙ্করের চেলা। সেইখানে গিয়া প্রভু করিলেন মেলা॥
শঙ্করের শিষ্য যত একত্র হইয়া। বিচার করিতে বসে তত্ত্ব বিচারিয়া॥
বিচারে সবল চেলা মানে পরাজয়॥ ১১৫-৬ ৪৬

যে-সব অদ্বৈতবাদী এসেছেন তত্ত্ববিচার করতে, তাঁরা শ্রীচৈতন্যের সাহচর্যে এসে তর্কাতীত উপলব্ধিতে ধন্য হয়েছেন, কারও বা চিন্তার মোড় ফিরে গেছে শ্রীচৈতন্যের দুএকটি কথায় বা প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে। করচায় চৈতন্যদেবকে প্রচণ্ড তার্কিক মূর্তিতে

আঁকা হয় নি, বরং তর্কে তাঁর অনীহা প্রকাশ পেয়েছে। অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতরা যখন পীড়াপীড়ি করেছেন, তখন দু'একটি কথায় তিনি দ্বৈতাদ্বৈত বা অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। মহাপ্রভুর সাহচর্য্যধন্য শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী "চৈতন্যচন্দ্রামৃতে" এই কথাই বলেছেন—'দূরাদেব দহন্ কুতর্কশলভান্ কোটীন্দু সংশীতলো…২০৫। 'দূর হইতে কুতর্করূপ পতঙ্গ দহনকারী, কোটি চন্দ্র অপেক্ষাও শীতল…।'
গোবিন্দের করচায় মহাপ্রভুর এই বিচার বিমুখ ভাবমূর্তিটি বড় সুন্দর। রামেশ্বর তীর্থে—

প্রভুরে দেখিয়া এক পণ্ডিত উদাসী। বিচার করিতে বড় হৈলা অভিলাষী।
প্রভু বলে বিচার না করিবারে চাই। হইলাম বিচারে পরাস্ত তব ঠাঁই ॥
আশ্চর্য্য বিনয় তাঁর হেরিয়া নয়নে। অজ্ঞান হইয়া ন্যাসী ভাবে মনে মনে ॥
প্রভু বলে কি ভাবিছ সন্ন্যাসী ঠাকুর। আতাল পাতাল কথা সব কর দূর ॥
আতাল পাতাল দূর করি ভক্তি ভরে। কৃষ্ণগুণ গাও ভাই বিশুদ্ধ অন্তরে ॥

করচায় উল্লেখিত ঐ সব অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতেরা ঐতিহাসিক ব্যক্তি। বেদান্ত দর্শনের ইতিহাসে তাঁরা প্রথিতযশা।

(১) ঢুণ্ঢিরামতীর্থ :—

রামানন্দ সাক্ষাৎকারের পর মহাপ্রভু ত্রিমন্দনগরে এসে বৌদ্ধ পণ্ডিত রামগিরিকে ভক্তিপথের পথিক করলেন। তারপর—

বিচার করিতে শেষে হয়ে অভিলাষী। ঢুণ্ঢি রামতীর্থ আসে তুঙ্গভদ্রাবাসী ॥
অহঙ্কারে সদামত্ত পণ্ডিতাভিমানী। নাহি বুঝে ভক্তিমার্গ শুষ্কতর্কে জ্ঞানী ॥
বড়ই পণ্ডিত বটে ঢুণ্ঢিরাম হয়। বিচার করিতে কিন্তু পায় বড় ভয় ॥
ঢুণ্ঢিরাম স্বামী গিয়া করিতে বিচার। অশ্রু ফেলি ধরণী লোটায় বারবার ॥
প্রভু কহে শুন শুন ঢুণ্ঢিরাম স্বামী। তোমার সহিত তর্কে হারিলাম আমি ॥
জয়পত্র লিখে আমি দেই সঙ্গোপনে। হারিল চৈতন্য এবে তোমার সদনে ॥
বাণীর কৃপায় তুমি পণ্ডিত গোঁসাই। কার সাধ্য তর্কশাস্ত্রে জিনে তব ঠাঁই ॥
ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল বেদান্ত দর্শন। সর্বশাস্ত্রে অধিকারী তুমি গো সুজন ॥
মূরখ সন্ন্যাসী মুঁহি কিছু নাহি জানি। বারবার তোমার নিকটে হারি মানি ॥
আগেকার ঢুণ্ঢি হতে তুমি সুপণ্ডিত। তোমার পাণ্ডিত্য হয় ভুবনে বিদিত ॥
এত বলি ঢুণ্ঢিরাম করিলা বিদায়। যাইতে না চায় ঢুণ্ঢি চারিদিকে চায় ॥ ৫৪/২৩
ইতি উতি চেয়ে ঢুণ্ঢি প্রভুর চরণে। লোটাইয়া পড়িলেক অতি শুদ্ধ মনে ॥ ৫৫/২৪

'করচা'র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণে ড. দীনেশচন্দ্র সেন পাদটীকায় (পৃ. ২৩) মন্তব্য করেছেন," 'ঢুণ্ঢি' সম্ভবত: নাম নহে, উপাধি।" 'বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস (স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী প্রণীত, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত, ১৩৩২ সংস্করণ) গ্রন্থের ৭৮৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত একটি শ্লোকে 'ঢুণ্ঢি' শব্দটির উল্লেখ পাচ্ছি।—

শ্রীগৌর্য্যাং সকলার্থদং নিজপদাম্ভোজেন মুক্তিপ্রদং
প্রৌঢ়ং বিঘ্নবনং হরন্তমনঘং শ্রীঢুণ্ঢিতুণ্ডাসিনা।
বন্দে চর্ম্ম কপালিকোপকরণৈর্বৈরাগ্য সৌখ্যাৎপরং
নাস্তীতি প্রদিশন্তমন্তবিধুরং শ্রীকাশিকেশং শিবম্ ॥

শ্লোকটি শাংকর ভাষ্যের টীকাকার গোবিন্দানন্দের 'ভাষ্যরত্ন প্রভা'র মঙ্গলাচরণের অন্তর্গত। ভাষ্যে তিনি নৃসিংহাশ্রমের উক্তি উদ্ধার করেছেন। "নৃসিংহাশ্রম ষোড়শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন" (বেদান্ত দর্শনের ইতিহাসঃ পৃ. ৭৮৮)।

সুতরাং গোবিন্দানন্দ ও ষোড়শ শতাব্দীর এবং শ্লোকে উল্লেখিত শ্রীঢুণ্ডি তাঁর পূর্ববর্তী এবং ইনি করচার উল্লেখিত 'ঢুণ্ডি' হওয়াও অসম্ভব নয়।

(২) দণ্ডিস্বামী রামানন্দ ঃ

এরপর মহাপ্রভুর সঙ্গে বিচার করতে আসেন বেংকটনগরের অদ্বৈতবাদী দণ্ডিস্বামী রামানন্দ। করচায় এই প্রসঙ্গের বর্ণনা—

তারপর প্রভু মোর বেংকটনগরে। উপনীত হৈল গিয়া দিবা দ্বিপ্রহরে ॥
সেইখানে ছিল এক পণ্ডিত গোঁসাই। বেদান্তে পণ্ডিত বড় তুল্য তার নাই ॥
বিচার করিতে চাহে পণ্ডিতপ্রবর। হারিলাম বলি প্রভু করয়ে উত্তর ॥
তথাপি না ছাড়ে স্বামী বিচার করিতে। বদন বিকাসি প্রভু লাগিলা হাসিতে ॥ ৬৩ ২৮
অদ্বৈতবাদের কথা স্বামী যত কয়। দ্বৈতাদ্বৈতবাদ তুলি চৈতন্য বুঝায় ॥
অবশেষে ঘোরতর বিচার বাঁধিল। ক্রমে ক্রমে দণ্ডিস্বামী হারি মানি নিল ॥
রামানন্দ নাম তার বড়ই পণ্ডিত। হরিনামে রামানন্দ হইলা দীক্ষিত ॥
হরিনাম সুধা কর্ণে দিলেন ঢালিয়া। পড়িল স্বামীর মনে ভক্তি উছলিয়া ॥
রামানন্দ স্বামী তবে প্রণাম করিয়া। প্রভুর আজ্ঞায় মঠে গেলেন ফিরিয়া ॥
সকল শিষ্যেরে স্বামী হরিনাম দিলা। ভক্তি রসে মন তাঁর মাতিয়া উঠিলা ॥
তিনদিন থাকি প্রভু বেংকটনগরে। অকপটে হরিনাম দেন ঘরে ঘরে ॥ ৬৭ ২৮

"বেদান্ত দর্শনের ইতিহাসে" 'ভাষ্যরত্নপ্রভা'কার গোবিন্দানন্দের শিষ্য আচার্য রামানন্দ সরস্বতীর প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। গোবিন্দানন্দ 'ভাষ্যরত্নপ্রভা'য় নৃসিংহাশ্রমের বাক্য উদ্ধার করেছেন। "নৃসিংহাশ্রম ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।" (বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস. পৃ. ৭৮৮)। সুতরাং গোবিন্দানন্দ ও তাঁর শিষ্য রামানন্দ সরস্বতীর পক্ষে ষোড়শ শতাব্দীতে বর্তমান থাকা সম্ভব। রামানন্দ সরস্বতী "স্বকৃত বিবরণোপন্যাসের সমাপ্তিতে আপনাকে গোবিন্দানন্দের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।"

'শ্রীশ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে' (পৃ. ১৬৬০) সংকলয়িতা শ্রীহরিদাস দাস শ্রীরামানন্দতীর্থ স্বামী কৃত 'প্রেম ভক্তিস্তোত্রে'র পরিচয় দিয়েছেন ঃ—

"প্রেমভক্তিস্তোত্র--শ্রীরামানন্দতীর্থস্বামিকৃত গদ্যপদ্যে শ্রীচৈতন্য স্তোত্র। স্বকৃত টিপ্পনীযুক্ত ৯৪ শ্লোকে গ্রথিত। উপক্রমে—'নিত্যানন্দাভিধানঃ সকলসুখকর। কেবলানন্দরূপো, বিষ্ণুশ্চাদ্বৈতনামা নিরবধি ভজতি প্রেমভাবৈকসারো। হৃষ্টা গঙ্গোত্তমাঙ্গা ক্ষিপতি শতদলং যস্য পাদারবিন্দং, তং চৈতন্যাখ্যরূপং তরুণরবিরুচিং প্রেমবীজং ভজেহহম্।' ॥১॥ ইহাতে গ্রন্থকার শাস্ত্রপ্রমাণে শ্রীচৈতন্যের সর্বেশ্বরত্বাদি প্রতিপাদন করিয়াছেন"। — করচায় ইনিও উদ্দিষ্ট হতে পারেন।

(৩) সদানন্দ ঃ

সেই বলা হয়েছে রামতীর্থ সদানন্দের বেদান্তসারের টীকা রচনা করেছিলেন। এই বেদান্তসার প্রণেতা সদানন্দের সঙ্গেও চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ হয়েছিল। করচার বিবরণে

আছে, কালতীর্থে বরাহদেবকে নতিস্তুতি করে নন্দা ও ভদ্রা নদীর সন্ধিস্থানে গিয়ে স্নান করিলেন মহাপ্রভু।

সেই তীর্থস্বামী সদানন্দপুরী হয়। বড়ই পণ্ডিত তেঁহ হৈল পরিচয় ॥
তুলিলা অদ্বৈতবাদ সদানন্দ পুরী। এক তর্কে পুরীর ভাঙ্গিল ভারিভুরি ॥
অবশেষে সদানন্দ আশ্চর্য্য হইয়া। ভক্তিভরে প্রভুপদে পড়ে লোটাইয়া ॥
তাঁরে ভক্তিতত্ত্ব দিয়া সন্ন্যাসী আমার। চাঁই পল্লী তীর্থে যান দেখিতে আচার ॥ ৮১।৩৩

'বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস' গ্রন্থে অদ্বৈতবাদী সদানন্দের বিস্তারিত পরিচয় আছে। সদানন্দ 'বেদান্তসার' প্রণেতা ও শঙ্করাচার্যের জীবনচরিতলেখক। "এই সদানন্দের সময় কালিকা প্রেসে প্রকাশিত 'বেদান্তসার' গ্রন্থের ভূমিকায় নিরূপিত হইয়াছে। ইনি ১৫শ শতাব্দীর লোক।" (তদেব: পাদটীকায় সম্পাদকীয় মন্তব্য পৃ. ৯৪)। "গীতার উপর সদানন্দ বিরচিত শ্লোকবদ্ধ 'ভাবপ্রকাশ' নামক টীকা (পুণা) আছে।" (তদেবঃ পৃ. ১৮১)

সদানন্দের 'বেদান্তসার' সেকালের খুবই বিখ্যাত গ্রন্থ। "টীকাকার নৃসিংহ সরস্বতী ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বেদান্তসারের টীকা 'সুবোধিনী' প্রণয়ন করেন। বেদান্তসারের অন্য টীকাকার মীমাংসক আপদেব। তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর লোক। রামতীর্থ স্বামীও অন্যতম টীকাকার। বেদান্তসারে 'পঞ্চদশী' হইতে বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, সুতরাং ইহা বিদ্যারণ্যের পরবর্তী। চতুর্দশ শতাব্দী বিদ্যারণ্যের কাল। আমাদের বিবেচনায় সদানন্দের অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ"।

[তদেব: পৃ. ৭২৩-২৪]

পূর্বোদ্ধৃত সম্পাদকীয় মন্তব্য স্মরণ রেখে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে সদানন্দ ১৫শ শতাব্দীর লোক এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও তিনি বর্তমান। ১৫১০ খ্রীস্টাব্দে মহাপ্রভুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। এই কালনির্ণয় সেদিক থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

গোবিন্দ কর্মকারের কড়চায় শ্রীচৈতন্যের নটী বারাঙ্গনা উদ্ধার প্রসঙ্গ আছে। এতে কোন কোন ভদ্রমহোদয়ের ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়েছে। তাঁরা বলেছেন, 'এর চেয়ে জঘন্য মিথ্যাচার আর কিছু হতে পারে না'। বলাবাহুল্য এই সংস্কারান্ধ মাপকাঠি দিয়ে চৈতন্যচরিত্রকে মাপতে চাই না আমরা।

যীশুখ্রীস্ট কেন পাপীতাপী বারাঙ্গনাদের সঙ্গে মেশেন, খাওয়া দাওয়া করেন? প্রশ্ন করেছিল তখনকার সংস্কারান্ধ সমাজ।

'And when the Pharisees saw it, they said unto his disciples, why eateth your Master with publicans and sinners?'

যীশুখ্রীস্ট সে কথা শুনে বলেছিলেন—'যারা সুস্থ তাদের বৈদ্যের প্রয়োজন হয় না—যারা অসুস্থ, তাদেরই প্রয়োজন'—'But when Jesus heard that, he said unto them, They that be whole need not a physician, but they that are sick.'

তিনি বলেছিলেন, 'শোন তোমরা, ন্যায় নীতিপরায়ণদের জন্য আমি আসি নি, এসেছি পাপীদের অনুতাপের দিকে নিয়ে যেতে; আমি তাদের বর্জন করব না, বরং

করব। শুনে যাও একথা, এবং বুঝে দেখার চেষ্টা করো, এর কি মানে'।—'But go ye and learn what that meaneth, I will have mercy, and not sacrifice : for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance.
[St. Matthew. chapter 9.]

চৈতন্যদেবের জীবনেও এই সত্যই উদ্ভাসিত। চৈতন্যচরিতের এ দিকটির যথার্থ অনুধাবন করেছেন আরেক প্রেমিক ও বীর্যবান সন্ন্যাসী—স্বামী বিবেকানন্দ। চৈতন্যের প্রেমধর্ম সম্পর্কে তিনি বলেছেন—"His love knew no bounds. The saint or the sinner, the Hindu or the Mohammedan, the pure or the impure, the prostitute, the street-walker—all had a share in his love, all had a share in his mercy."
[Complete Works, Vol. 3, p. 226, Birth Centenary Edition]

সেকালে পবিত্রচেতা মানুষদের চারিত্রিক দৃঢ়তা পরখ করতে বেশ্যা পাঠানো একটা সাধারণ রীতি ছিল। হরিদাসের ক্ষেত্রে বেশ্যা পাঠিয়েছিলেন বেনাপোলের দেশাধ্যক্ষ রামচন্দ্র খান। গোবিন্দের করচায় দক্ষিণ ভ্রমণকালে অনুরূপভাবে মহাপ্রভুর কাছে বেশ্যা পাঠিয়েছিলেন সিদ্ধ বটেশ্বরের ধনী তীর্থরাম।—

"হেনকালে আইলা সেথা তীর্থধনবান ॥ ৫৫/২৪
দুইজন বেশ্যা সঙ্গে আইলা দেখিতে। সন্ন্যাসীর ভারিভুরি পরীক্ষা করিতে ॥
সত্য বাই লক্ষ্মীবাই নামে বেশ্যাদ্বয়। প্রভুর নিকটে আসি কত কথা কয় ॥
কত রঙ্গ করে লক্ষ্মী সত্যবালা হাসে। সত্যবালা হাসি মুখে বসে প্রভুপাশে ॥
কাঁচলি খুলিয়া সত্য দেখাইলা স্তন। সত্যারে করিলা প্রভু মাতৃসম্বোধন ॥
থরথরি কাঁপে সত্য প্রভুর বচনে। ইহা দেখি লক্ষ্মী বড় ভয় পায় মনে ॥
কিছুই বিকার নাহি প্রভুর মনেতে। ধেয়ে গিয়া সত্যবালা পড়ে চরণেতে ॥
কেন অপরাধী কর আমারে জননি। এইমাত্র বলি প্রভু পড়িলা ধরণী ॥ ৫৬/২৪
হরিনামে মত্ত হয়ে নাচে গোরা রায়। অঙ্গ হতে অদভুত তেজ বাহিরায় ॥
ইহা দেখি সেই ধনী মনে চমকিল। চরণতলেতে পড়ি আশ্রয় লইল ॥
চরণে দলেন তারে নাহি বাহ্যজ্ঞান। হরি বলে বাহু তুলে নাচে আগুয়ান ॥
সত্যারে বাহুতে ছাঁদি বলে বল হরি। হরি বল প্রাণেশ্বর মুকুন্দ মুরারি ॥৫৭ ২৪-২৫
তীর্থরাম ধনী তবে চরণে পড়িয়া। আকুল হইল কত কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
কান্দিতে কান্দিতে যবে ভক্তি উপজিল। অমনি ধরিয়া হাত প্রভু আলিঙ্গিল ॥
প্রভু কহে তৃণসম গণহ বৈভবে। ভক্তিধন অমূল্য রতন পাবে তবে" ॥ ৫৮/২৫

এরপরের ঘটনাস্থল মহারাষ্ট্র। 'খণ্ডবা'র দেবালয়ের পার্শ্বস্থিত 'মুরারি পল্লী'তে গিয়ে হরিনাম দিয়েছিলেন চৈতন্যদেব। এই 'মুরারি' বা 'মুরলী'দের সম্পর্কে কিছু তথ্য পরিবেশন করেছেন দুর্গাচরণ ভৌত তাঁর 'ভারতপ্রদক্ষিণ' গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন—"খণ্ডবা মহারাষ্ট্রীয়দেব কুলস্বামী ইনি শিবের অবতার বিশেষ। মন্দিরের বাহিরে খণ্ডবার মহা অসি রক্ষিত আছে। এই খড়্গের সহিত মুরলীগণের বিবাহ হইয়া থাকে। হরিদ্রা প্রদান করিয়া কার্য সম্পূর্ণ করা হয়। কুনবি প্রভৃতি অশিক্ষিত জাতির সন্তান না হইলে মানিয়া থাকে,—আমার সন্তান হইলে প্রথমটি খন্ডবাকে দান

করিব। মনস্কামনা সিদ্ধ হইলে কন্যাটি আনিয়া মহাদেবের সহিত বিবাহ দেওয়াইয়া তাহার গলদেশে তাগা বাঁধিয়া বাটী লইয়া যায়। তাহার আর অপর পুরুষের সহিত বিবাহ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, দেবতার সেবার জন্য, পিতামাতা তাহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দেয়। পুত্র সন্তানও, দেবতাকে দান করিয়া বিদায় দিয়া থাকে। ঐরূপ স্ত্রীর নাম 'মুরলী' ও পুরুষের নাম 'বঘা' বা বাঘিয়া'।··· ব্যভিচার তাহাদিগকে অবশ্যই করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন তাহারা নৃত্যগীতের ব্যবসাও করে" (ভারত প্রদক্ষিণ, পৃ. ২৪৪-৪৬)।

এই 'মুরলী'দেরই হরিনাম দিয়েছিলেন মহাপ্রভু! করচার বর্ণনা—

'মুরারি-পল্লীর মধ্যে মোর প্রভু গিয়া। পবিত্র করিল সবে হরিনাম দিয়া ॥
রমণীগণের দুঃখ সহিতে না পারি। উদ্ধার করিতে চাহে যতেক মুরারি ॥···
নারীগণে বলে প্রভু কর হরিনাম। নাম বলে অবশ্য পাইবে নিত্যধাম ॥··
কৃষ্ণ পতি হইলে না রবে ভবভয়। কৃষ্ণ সকলের পতি জানহ নিশ্চয় ॥ ··
উপদেশ শুনি যত খাণ্ডবার নারী। প্রভুর নিকটে দাড়াইলা সারি সারি ॥
আসিয়া ইন্দিরা বাই বরযোড়ে কয়। দয়া কর আমারে সন্ন্যাসী মহাশয় ॥
বৃদ্ধ হইয়াছি মুহি কুকর্ম করিয়া। উদ্ধার করহ মোরে পদধূলি দিয়া ॥
এত বলি ইন্দিরা ধূলায় লুটি যায়। নাম দিয়া প্রভু উদ্ধারিল ইন্দিরায় ॥
সেই দিন হৈতে যত খাণ্ডবার নারী। মত্ত হৈলা হরিনামে চক্ষে বহে বারি' ॥
১৪৩/৫৫

এর পরের ঘটনাস্থল গুজরাটের ঘোগা গ্রাম। 'ঈশ্বরের প্রেমে মত্ত নবীন সন্ন্যাসী'কে দেখে ঘোগাবাসী যখন বিস্ময়-স্তম্ভিত, তখন—

'একজন দুষ্ট আসি করি হানা পানা। প্রভুরে বলিলা কেন কর প্রবঞ্চনা ॥
গ্রাম্য লোক ভুলাইয়া অর্থ লবে হরি। তাই বেড়াইছ তুমি হরিধ্বনি করি ॥
সন্ন্যাসীর পরীক্ষা লইতে আসিয়াছি। কত শত কপট সন্ন্যাসী দেখিয়াছি ॥
সে পাষণ্ড এই কথা কহিলা যখন। প্রহার করিতে তারে চাহে গ্রাম্যজন ॥
প্রভু বলে ভাই সব মারিবে কাহারে। হরিনাম সুধাপান করাও ইহারে ॥ ১৬৮/৬৬
এস সাধু মোর কাছে হরিনাম দিব। তোমার পাপের ভার উতারিয়া নিব ॥
এত বলি মহাপ্রভু তার কাছে গিয়া। হরিনাম সুধা কর্ণে দিলেন ঢালিয়া ॥' ১৬৯।৬৬

বারমুখী বেশ্যা তার ঘরের জানালা থেকে এই দৃশ্য দেখছিল। মহাপ্রভুর করুণা-মাখা মূর্তি তাকে আকুল করে তুলল। দীর্ঘকেশ ছেদন করে সামান্য বসন পরে সে এসে করজোড়ে দাঁড়াল প্রভুর সামনে।

'প্রভু বলে বারমুখী দুই চারি কথা। তোমারে কহিয়া দেই করহ সর্ব্বথা ॥
এই স্থানে করি তুমি তুলসী কানন। তার মাঝে থাকি কর কৃষ্ণের সাধন ॥
তুমি কৃষ্ণ তুমি হরি বারমুখী বলে। এই মাত্র বলি পড়ে প্রভু পদতলে ॥
বারমুখী পদতলে যখন পড়িল। তিন চারি পদ প্রভু অমনি হটিল ॥ ১৭১।৬৭
আর যত লোক ছিল কাছে দাঁড়াইয়া। ধন্য ধন্য করে সবে বেশ্যারে দেখিয়া ॥
বারমুখী কুলটারে প্রভু ভক্তি দিয়া। সোমনাথ দেখিবারে চলিল ধাইয়া' ॥১৭২-৩।৬৭

কেবল তীর্থ পরিক্রমাই যে মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য ছিল না, ব্যাপক জনসংযোগও যে

তাঁর লক্ষ্য ছিল, তা করচার বিবরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। কেবল পণ্ডিত দার্শনিক যোগী সন্ন্যাসী নয়, এই যাত্রা-পথের দুধারে সাধারণ মানুষ ভীড় করে এসেছে, সেই 'কনকদ্যুতি যতীন্দ্রে'র প্রেমময় ব্যক্তিত্বের দিব্য স্পর্শে তারা চমৎকৃত হয়েছে, সারাজীবনের পক্ষে অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা মনের মণিকোঠায় সঞ্চয় করেছে।—

বসিয়া আছেন প্রভু অঙ্গ নাহি নড়ে। নয়নের কোণ বাহি অশ্রুধারা পড়ে ॥
লোমাঞ্চিত কলেবর পুলক অন্তরে। ভাব দেখি গ্রাম্যলোক কত স্তব করে ॥
কেহ বলে মোর গৃহে চলহ সন্ন্যাসী। কেহ বলে তোমারে দেখিতে ভালবাসি ॥
কেহ বলে এ সন্ন্যাসী মানুষ ত নয়। ইহারে দেখিয়া কেন এত ভক্তি হয় ॥
একজন বুড়া আসি বলে ভক্তি ভরে। কোথায় সন্ন্যাসী আছে দেখাও আমারে ॥
তাহার আগ্রহ দেখি মোর গোরা রায়। তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার কাছে যায় ॥
প্রভুর সম্মুখে বৃদ্ধ প্রণাম করিয়া। ফল মূল চূণা আনি দেয় যোগাইয়া ॥

[আদি সং ঃ ১১০]

কেবল তাঁর অষ্টসাত্ত্বিক ভাব নয়, তাঁর নিতান্ত লৌকিক আচরণও চমৎকৃত করত জনপদবাসীদের। মুন্নানগরে—

তথাকার একজন অতি দুঃখী নারী। সেই বৃক্ষতলে কান্দে চক্ষে বহে বারি ॥
যবে যাত্রা করে প্রভু যাইবার তরে। সেই বৃদ্ধা কেঁদে অন্ন বস্ত্র ভিক্ষা করে ॥
পহিরণে ছিন্ন বাস পেটে অন্ন নাই। তারে দেখি দাঁড়াইলা চৈতন্য গোঁসাই ॥
তার ভাব দেখে প্রভু মনেতে বুঝিয়া। ইতি উতি ভিক্ষা মাগে ঈষৎ হাসিয়া ॥
বলে মোরে ভিক্ষা দেহ মুন্নাবাসী ভাই। অন্ন বস্ত্র ভিক্ষা পেলে তবে চলে যাই ॥
মুন্নাবাসী নরনারী আনন্দে ভাসিয়া। রাশি রাশি অন্ন বস্ত্র দিলেক আনিয়া ॥
সবে বলে পথের সম্বল তরে চায়। এ কারণ রাশি রাশি আনিয়া যোগায় ॥
প্রভু কহে শুন শুন মুন্নাবাসিগণ। তোমাদের ভিক্ষা আমি করিনু গ্রহণ ॥
বৃক্ষতলে এই যে দুখিনী বসে আছে। এই সব অন্ন বস্ত্র দেহ ওর কাছে ॥
দয়া দেখে লোক সব আশ্চর্য্য হইল। কেহ বলে বৃদ্ধালাগি ভিক্ষা মাগি নিল ॥

(তদেব ঃ ৬৫)

দ্বারকায়—'কিবা জ্ঞানী কিবা মূর্খ সকলে আসিয়া।
পুলকিত হৈল সবে প্রভুরে দেখিয়া ॥ ১৯২

এবং, একদিন পাণ্ডাগণ আনন্দ করিয়া। মহামহোৎসব করে ভোগ লাগাইয়া ॥
অতিথি বৈষ্ণবগণে করি নিমন্ত্রণ। ক্ষীর দধি পুরী আদি করয়ে বণ্টন ॥
পশুদের মধ্যে গিয়া গোরা গুণমণি। প্রসাদ বণ্টক প্রভু করেন আপনি ॥

[তদেব ঃ ১৯৫]

মানুষের প্রতি এই সহানুভূতি, এই অপরিসীম ভালবাসাই তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এই প্রেমের দিব্য প্রকাশেই মানুষ তাঁকে ভগবানের আসনে বসিয়েছে; অবশ্য তাঁর গীত, নৃত্য, দেহের দিব্য লাবণ্য ও পদ্মগন্ধও সেকালের মানুষকে কম মুগ্ধ করে নি। দক্ষিণ ভারতের এক অজ্ঞাত পল্লীতে এক দরিদ্র বিপ্রের আতিথেয়তা প্রসঙ্গে গোবিন্দ কর্মকার লিখেছেন—

'অতি অজ্ঞাত পল্লী সব দুঃখী অধিবাসী। সেইখানে গিয়া বসে নিমাই সন্ন্যাসী।

বড়ই দরিদ্র হয় একই ব্রাহ্মণ। ভিক্ষা করি কোনরূপে কাটায় জীবন ॥
ভিক্ষা করিবারে আমি তার গৃহে যাই। বিপ্র বলে ক্ষণেক অপেক্ষা কর ভাই ॥
কিছুক্ষণ বৈস হেথা ফিরে না যাইবে। অতিথি ফিরিলে মোর নরক হইবে ॥
ভিক্ষা মাগি এনে দিব ভিক্ষা তব ঠাঁই। কিছুকাল এখানে অপেক্ষা কর ভাই ॥
এত বলি সেই বিপ্র ভিক্ষায় চলিল। দুটি নারিকেল আনি মোরেভিক্ষা দিল ॥
ভিক্ষা আনি প্রভুরে যোগাই বৃক্ষতলে। ফলভোগ লাগাইলা প্রভু কুতুহলে ॥
[তদেব ঃ ১২৩]

সাধারণ পরিব্রাজক হলে সেই ফলভোগে তৃপ্ত হয়ে পথ চলতেন। কিন্তু মহাপ্রভু চান ভারতের সর্বত্র কর্মী মানুষ, ভাবুক মানুষ। তাই—

'ব্রাহ্মণের কথা শুনি মোর গোরা রায়। সন্ধ্যার সময় বিপ্রে দেখিবারে যায় ॥
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী দুটি থাকে সেই স্থানে। গোপালের সেবা লাগি ভিক্ষা মেগে আনে ॥
আপনার ঘরে বিপ্র প্রভুরে দেখিয়া। জোড় হস্তে দাঁড়াইলা সম্মুখে আসিয়া ॥
বিপ্র বলে কি দিয়া পূজিব অতিথিরে। কেমনে বলিব প্রভু যাহ তুমি ফিরে ॥
গোপালের সেবা লাগি আছি এইখানে। ভিক্ষা করে সেবা করি আমরা দুজনে ॥
আসন নাহিক মোর কি দিব বসিতে ব্রাহ্মণী বলিলা বিপ্র মাথা দাও পেতে ॥
বিদ্যুৎ খেলিছে দেখ অতিথির পায়। তুলসী আনিয়া দেহ অতিথির গায় ॥
তাড়াতাড়ি বিপ্র তবে তুলসী আনিয়া। প্রভুর চরণে দিতে গেলেন ধাইয়া ॥
হাত ধরি বিপ্রে তবে চৈতন্য বুঝায়। তুলসী অর্পণ কর গোপালের পায় ॥
[তদেব ঃ ১২৪]

বিপ্র বলে ভাগ্য মানি তোমার কৃপায়। সামান্য মানুষ তুমি নহ দয়াময় ॥
তব অঙ্গে সৌদামিনী খেলা করে কেন। তব দেহে পদ্মগন্ধ অনুমানি হেন ॥
তুমি যদি ভগবান নহ দয়াময়। তবে কেন তব অঙ্গে পদ্মগন্ধ বয় ॥
মোর মাথে তুলে দেহ তোমার চরণ। এত বলি মাথা পাতি দিলেন ব্রাহ্মণ ॥
এই বাক্যে দশনেতে রসনা কাটিয়া। দয়াল চৈতন্যদেব গেলেন পিছিয়া ॥
ব্যাকুল হইয়া বিপ্র ব্রাহ্মণীর সাথে। ধাইয়া গিয়া পদতলে নোয়াইলা মাথে ॥
বাহু পশারিয়া প্রভু ব্রাহ্মণে তুলিলা। তারপরে ভক্তিভরে গান আরম্ভিলা ॥
ব্রাহ্মণের গৃহ যেন হৈল বৃন্দাবন। হরিনাম শুনিবারে আসে গ্রামাজন ॥ [তদেব ঃ১২৫]
দয়াল চৈতন্য এই গান আরম্ভিল। সেই সঙ্গে শ্রোতা সব মাতিয়া উঠিল ॥
নাম শুনি গ্রাম্যলোক প্রভুর বদনে। গড়াগড়ি দেয় সবে প্রভুর চরণে ॥
গাইতে গাইতে গান রাত্রি পোহাইল। প্রাতঃকালে মোর প্রভু বিদায় হইল ॥
বিদায় লইয়া যবে প্রভু বাহিরায়। তাকাইয়া রহে লোক পুতুলের প্রায় ॥ [তদেব ১২৬]

প্রেমিক সন্ন্যাসীর দিব্য ব্যক্তিত্বের এই চৌম্বক স্পর্শ যে দিব্যভাবের বিচ্ছুরণ ঘটাত, তার অনুধ্যান একমাত্র ড. দীনেশচন্দ্র সেনের ভাষায় সম্ভব—"প্রেম পৃথিবীতে একবার মাত্র রূপ গ্রহণ করিয়াছিল"। গোবিন্দের ভাষায়—'যেই জন প্রভুরে দেখয়ে একবার। চলিয়া যাবার শক্তি না হয় তাহার' ॥

এই প্রেমিক পুরুষ, কেউ তাঁকে ঈশ্বর বললে, স্বভাবতঃই সংকুচিত হতেন। ভারত

পর্যটন কালে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের লোক তাঁকে ভগবান কৃষ্ণ ব'লে মনে করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার প্রতিবাদ করেছেন। দক্ষিণ ভারতে—

'ছটফটি করিতে লাগিলা ন্যাসিবর। প্রভুরে নেহারি বলে তুমি যে ঈশ্বর ॥
সন্ন্যাসীর বাক্যে প্রভু কর্ণে দিয়া হাত। বারবার বলে ন্যাসী ছাড় ইহ বাত' ॥ ৭৬

অন্যত্র, 'যোগী বলে তুমিই আমার কৃষ্ণ হবে। পুন আসি প্রভু মোরে দেখা দিবে কবে ॥
প্রভু বলে এই বাণী না কহিও আর। বৃন্দাবন পতি কৃষ্ণ এই ত বিচার' ॥

এবং দ্বারকা থেকে ফেরার পথে—

'ভর্গ বলে তুমি কৃষ্ণ তুমি মোর হরি। ভিক্ষা দেহ চরণ স্মরিয়া যেন মরি' ॥···
প্রভু বলে ভর্গ তুমি কেন হেন কহ। কেমনে এমন কথা আমারে বলহ ॥
পথে পথে ভ্রমি মুহি হয়ে উদাসীন। অন্ন নাই বস্ত্র নাই অতি দীন হীন ॥
ভিক্ষার লাগিয়া মুহি ফিরি দ্বারে দ্বারে। হেন বাক্য আর কভু না কহ আমারে' ॥১৯৮

গোবিন্দ কর্মকার তাঁর করচায় প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চৈতন্যচরিত এঁকেছেন, তাই তার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। পরবর্তীকালে যেসব বিষয় নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে তারও সদুত্তর মেলে করচায়। জাতিভেদ সম্পর্কে শ্রীচৈতন্যের দৃষ্টি ভঙ্গী এমনই একটি বিষয়।

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে শ্রীচৈতন্যের সুস্পষ্ট ঘোষণা লিপিবদ্ধ হয়েছে—
'মোর জাতি, মোর সেবকের জাতি—নাই'।

অথচ কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে নানা স্থলে দেখা যায় শ্রীচৈতন্যের খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে অব্রাহ্মণ স্পর্শ না ঘটে, সেদিকে কবি অতিরিক্ত সচেতন। দক্ষিণ যাত্রার কালে গোবিন্দ কর্মকার ও কৃষ্ণদাস বিপ্র দু'জনেই প্রভুর সেবক হয়ে সঙ্গে গিয়েছিলেন। এই কৃষ্ণদাসের পরিচয় দিয়েছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ—
'কৃষ্ণদাস-নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ। যারে সঙ্গে লৈয়া কৈল দক্ষিণ গমন' ॥ [আ|১০|১৪৫]

গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দের সাধ্যসাধন তত্ত্ব পরিবেশনার কালেও কৃষ্ণদাস কবিরাজ অতি সাবধানে এক বৈদিক ব্রাহ্মণকে দিয়ে প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়েছেন। শূদ্র রামানন্দকে আলিঙ্গন করা যায়। তাঁকে 'মহা-ভাগবতোত্তম' বলা যায়, কিন্তু তাঁর অন্ন গ্রহণ করা চলে না! অবশ্য এমনও হতে পারে যে রামানন্দই নিজগৃহে মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করার সাহস পান নি।

মহাপ্রভুর বৃন্দাবন ভ্রমণ কালেও সঙ্গী-হয়েছেন ব্রাহ্মণ বলভদ্র ভট্টাচার্য।
এবং 'মথুরার যত লোক ব্রাহ্মণ সজ্জন। ভট্টাচার্য্য স্থানে আসি 'করে নিমন্ত্রণ' ॥

অথচ বৃন্দাবনদাসের চৈতনাভাগবতে দেখা যায় খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সন্ন্যাসী হবার আগেই নিমাই জাতিভেদ না মেনে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন।—

কেহো বোলে "ব্রাহ্মণের নহে নৃত্য ধর্ম। পড়িয়াও এগুলা করয়ে হেন কর্ম ॥
চালকলা মুদ্গ দধি একত্র করিয়া। জাতি-নাশ করি খায় একত্র হইয়া" ॥

[মধ্য খণ্ড ঃ অষ্টম অধ্যায়]

সুতরাং এ ক্ষেত্রে বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্পষ্টতঃ পরস্পর বিরোধী। এ বিষয়ে করচার সাক্ষ্য তাই অত্যন্ত মূল্যবান। গোবিন্দ কর্মকার যা বলেছেন, তাতে দেখা যায়, শচীমায়ের রন্ধন নৈপুণ্য তাঁর পুত্রেও সঞ্চারিত হয়েছিল এবং সন্ন্যাসী

হবার পর থেকে তিনি সর্বদা স্বপাকে খেতেন, অব্রাহ্মণের ঘরেও অতিথি হয়েছেন, তীর্থ পর্যটন কালে গোবিন্দ বা তাঁর সঙ্গীরা ভিক্ষা ক'রে অন্ন-ফলমূল যা আনতেন, তা-ই ভোগ হিসাবে ঈশ্বরে নিবেদন ক'রে তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা প্রসাদ পেতেন।

নবীন সন্ন্যাসী শান্তিপুর থেকে নীলাচল যাবার পথে দামোদরের পারে কাশী মিশ্রের ঘরে নিজেই রেঁধেছেন—

শাক সূপ নানা বস্তু রন্ধন করিয়া। একত্র করিলা প্রভু আনন্দে মাতিয়া ॥

হাজিপুর গ্রামে—

অর্ধেক রজনী গেল এই মত করি। তারপরে ভিক্ষা অন্ন পাকাইলা হরি ॥
নিম্বসুক্তা ঘৃত আর করলার ভাজা। ভোগ লাগাইলা মোর নদিয়ার রাজা ॥
মুষ্টিমেয় প্রসাদ পাইলা গৌরহরি। অনন্তর বসিলাম মুহি পত্র করি ॥

দক্ষিণ ভারতে—

ভক্তিসহ 'বটেশ্বর' প্রভু প্রণমিলা। অনাহারে সেইখানে রজনী যাপিলা ॥
প্রভাতে যাইলা প্রভু স্নান করিবারে। ভিক্ষা করিবারে মুহি ফিরি দ্বারে দ্বারে ॥
ভিক্ষা মাগি আইলাম মধ্যাহ্ন সময়ে। পাক করি সেবা করে মোর গোরা রায়ে ॥

বেঙ্কটনগর ছাড়িয়ে গাছের তলায় অনাহারে তিন রাত কাটাবার পর—

চতুর্থ দিবসে এক রমণী আসিয়া। আতিথ্য করিলা তবে আটা চূণা দিয়া ॥
আর এক বৃদ্ধ নারী দুগ্ধ আনি দিল। আটা দুধে গুলি প্রভু ভোগ লাগাইল ॥

কাবেরী নদীর পারে—

স্নান করি কাবেরীতে গৌরাঙ্গ কিশোর। হরিনাম সুধাপানে হইলা বিভোর ॥
অপরাহ্নে মোরে বলে ভিক্ষা করিবারে। ভিক্ষা লাগি যাইলাম নগর মাঝারে ॥
থোড়া থোড়া চূণা আটা সংগ্রহ করিয়া। প্রভুর সম্মুখে আনি দিলাম ধরিয়া ॥
রুটি পাকাইয়া প্রভু লাগাইলা ভোগ। প্রসাদ পাইয়া মোর হৈল উপযোগ ॥

যে-কালে বর্ণাভিমানী শিখাসূত্রধারী ব্যক্তিরা শূদ্রের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলতেন, সেকালেই সন্ন্যাসীর আদর্শ ছিল ভিন্নতর। মহানির্বাণতন্ত্রে অষ্টমোল্লাসে বলা হয়েছে, 'সন্ন্যাসী হবেন কীটে নরে দেবতায় সমদৃষ্টি, সব কিছুই তাঁর কাছে ব্রহ্মস্বরূপ। বিপ্রের অন্ন বা চণ্ডালের অন্ন তিনি নির্বিচারে গ্রহণ করবেন' !—

সর্বত্র সমদৃষ্টিঃ স্যাৎ কীটে দৈবে তথা নরে।
সর্বং ব্রহ্মেতি জানীয়াৎ পরিব্রাট্ সর্বকর্মসু ॥
বিপ্রান্নং শ্বপচান্নং বা যস্মাৎ তস্মাৎ সমানীতম্।
দেশং কালং তথা চান্নমশ্নীয়াদবিচারয়ন্ ॥

সুতরাং সন্ন্যাসী নিমাইকে বর্ণাশ্রমীয় অনুশাসনে বাঁধার যে চেষ্টা চৈতন্যচরিতামৃতে লক্ষ্য করা যায়, তা অর্থহীন এবং স্পষ্টতঃই চৈতন্য চরিত্র বিরোধী।

চৈতন্যদেবের ভারত পর্যটন সংক্রান্ত আরেকটি অমীমাংসিত প্রশ্ন তিনি দ্বারকা গিয়েছিলেন কিনা।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণনা অনুসারে শ্রীচৈতন্য দক্ষিণে কন্যাকুমারী পর্যন্ত গিয়ে মালাবার উপকূল ('মল্লার দেশ'—মধ্য ৯।২২৪) ধরে উত্তর দিকে যেতে থাকেন, ক্রমে ক্রমে মহীশূরে ('শৃঙ্গেরি মঠ'—মধ্য ৯।২৪৪), মহারাষ্ট্র ('পাণ্ডরপুর'—মধ্য ৯।২৮২)

অতিক্রম করে উত্তর-পশ্চিম ভারতে 'মাহিষ্মতীপুর' (পূর্ব গুজরাটের ব্রোচ্ জেলায় কার্ত্তবীর্য্যার্জুনের স্থান'—অনুভাষ্য : পৃ. ৪৯৯ গৌড়ীয় মঠ সংস্করণ) এবং 'ধনুস্তীর্থ' (মধ্য ৯।৩১১—'গুজরাট জিলায় ভৃগুতীর্থ বা ব্রোচ'—গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান : পৃ. ১৪৮৯-৯০) পর্যন্ত গিয়ে—

সপ্ত গোদাবরী আইলা করি' তীর্থ বহুতর। পুনরপি আইলা প্রভু বিদ্যানগর ॥

সেখানে রায় রামানন্দের সঙ্গে দেখা ক'রে তিনি নীলাচলে ফিরে আসেন।

গোবিন্দ কর্মকারের করচা অনুসারে শ্রীচৈতন্য বরোদা হয়ে দ্বারকায় গিয়েছিলেন। 'ভৃগুতীর্থ' পার হয়ে—

'বরোদানগরে যায় গোরা বিনোদিয়া' ॥

নদীপার হয়ে মোর গোরা বিনোদিয়া। আমেদাবাদের কাছে পৌহুছিলা গিয়া।
কিছুদূর গিয়া দেখি নদী শুভ্রামতী ॥ ঘোগা নামে গণ্ড গ্রামে আসিয়া পৌছায় ॥
সোমনাথ দেখিবারে চলিল ধাইয়া ॥

সোমনাথ ছাড়ি মোরা জুনাগড়ে যাই। বড় গ্রাম বটে কিন্তু কোন তীর্থ নাই ॥
নিকটে গুণার গিরি অতি মনোহর। তাহার নিকটে যায় প্রভু বিশ্বম্ভর ॥
নিবটে অমরাপুরী গোপীতলা নাম। সেইখানে যাই সবে আনন্দের ধাম ॥
ইহাকে প্রভাস তীর্থ বলে সর্বজনে। প্রভাস দেখিয়া বড় প্রীতি পাই মনে ॥
প্রভাসের দক্ষিণ ভাগেতে মোরা যাই। সেইখানে গিয়া কুণ্ড দেখিবারে পাই ॥
এইখানে ইষ্ট গোষ্ঠি তিনদিন করি। যাইতে কহিলা পরে দ্বারকা নগরী ॥
এই রূপে পক্ষকাল ইষ্টগোষ্ঠী করি। পরদিন ছাড়ে প্রভু দ্বারকা নগরী ॥

কেবলমাত্র গোবিন্দের করচাতেই দ্বারকা ভ্রমণের উল্লেখ আছে, তা নয়। গোবিন্দের করচায় দ্বারকা নগরীতে পক্ষকাল ইষ্টগোষ্ঠির যে বিস্তৃত বিবরণ আছে, সে রকম বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া না গেলেও, দ্বারকা ভ্রমণের উল্লেখ আছে অন্য কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থে।

(১) জয়ানন্দ বলেছেন—ত্রিভট্ট সৌরাষ্ট্র শিবকাঞ্চী বিষ্ণুকাঞ্চী।
বিজয়া নগর দিয়া গেলেন বিরিঞ্চী ॥ [চৈ. ম. পৃ. ১১৮].

জয়ানন্দ 'দ্বারকা' না বলে 'সৌরাষ্ট্র' বলেছেন। দ্বারকা সৌরাষ্ট্রেরই অন্তর্গত।

(২) কবিকঙ্কন মুকুন্দ তাঁর চণ্ডীমঙ্গলের বন্দনা অংশে 'চৈতন্য বন্দনা'য় লিখেছেন—
অযোধ্যা মথুরা মায়া যথা হরি পদছায়া। কাশী কাঞ্চী অবন্তী দ্বারিকা।
ত্রিগর্ত্ত লাহোর দিল্লী ভ্রমিলা অনেক পল্লী। করি প্রভু মুক্তির সাধিকা ॥

(৩) ওড়িয়া ভাষায় লিখিত দিবাকর দাসের 'জগন্নাথ চরিতামৃতে' চৈতন্যদেব বলছেন—
মধুপুর গোপনগর। বৃন্দাবন দ্বারকাপুর ॥
গঙ্গাদ্বার গঙ্গাসঙ্গম। অযোধ্যা বদরিকাশ্রম ॥
কাশীপুরী ত যাইঅছি। ওহা সমস্ত মুঁ দেখিছি ॥

সুপ্রাচীন কাল থেকে দ্বারকা (দ্বারাবতী) মোক্ষদায়িকা তীর্থ হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে—

'অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারবতীচৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ ॥

[পদ্মপুরাণ, ভূমি খণ্ড। শব্দকল্পদ্রুম পৃ. ৩৮৬]

এবং সর্বতীর্থপরা শ্রেষ্ঠা দ্বারকা বহুপুণ্যদা।
যস্যাং প্রবেশমাত্রেণ নরাণাং জন্মখণ্ডনম্ ॥ [ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ঃ ১০৪ অধ্যায়]

চৈতন্য চরিতামৃতে (মধ্য ঃ পৃ. ২১) সনাতনকে শিক্ষাদানকালে দ্বারকা মহিমা বর্ণনা ক'রে শ্রীচৈতন্য নিজেই বলেছেন—

'ত্র্যধীশ্বর'-শব্দের অর্থ গূঢ় আর হয়। 'ত্রি' শব্দে কৃষ্ণের তিন লোক কয় ॥
গোলোকাখ্য গোকুল, মথুরা, দ্বারাবতী। এই তিনলোকে কৃষ্ণের সহজে নিত্য স্থিতি ॥

সুতরাং তিনি গুজরাটের ব্রোচ (মাহিষ্মতীপুর ও ধনুস্তীর্থ) পর্যন্ত গিয়ে দ্বারকা না দেখেই ফিরে এলেন একথা বিশ্বাস করা কঠিন। অবশ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ মাহিষ্মতী-পুরের নিকটবর্তী 'নানা তীর্থ' (মধ্য ৯।৩১০) ভ্রমণের কথা বলেছেন এবং কতকগুলি তীর্থের নাম অনুল্লেখিত রেখে লিখেছেন—

সপ্ত গোদাবরী আইলা করি' তীর্থ বহুতর। [মধ্য ৯।৩১৮]

কিন্তু দ্বারকার মত প্রসিদ্ধ তীর্থের স্পষ্ট উল্লেখই তাঁর কাছে প্রত্যাশিত। চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের পুঁথিহরণ বৃত্তান্ত সত্য হলে এর একটা ব্যাখ্যা মেলে। হরণোত্তর-কালে পুঁথিটি ওলট পালট, বিকৃত ও খণ্ডিত হওয়া খুবই সম্ভব।

আরেকটি দিক থেকে বিষয়টি দেখা চলে। বৃহদ্ভাগবতামৃতে সনাতন গোস্বামী শ্রীনারদের যে চরিত্রচিত্রণ করেছেন, তার সঙ্গে শ্রীচৈতন্য চরিত্রের সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে অঙ্কিত নারদচরিত্র এখানে স্মরণীয়। ১৩০ অধ্যায়ে সনৎ কুমার নারদকে বলছেন— নির্গচ্ছ তপসে ভ্রাতস্ত্যজ মায়াময়ীং প্রিয়াং।
সুপুণ্যে ভারতে বর্ষে তপসা ভজ মাধবং ॥

[অনুবাদ ঃ "ভ্রাতঃ! তপস্যার্থ বহির্গত হও। মায়াময়ী প্রিয়াকে পরিত্যাগ কর। এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতে তপশ্চরণ করিয়া মাধবকে ভজনা কর ॥]

নারদ তখন 'ত্যক্ত্বা মায়াময়ীং ভার্য্যাং ভারতং তপসে যযৌ ॥'

নারদের মত শ্রীচৈতন্যও মায়াময়ী প্রিয়াকে ত্যাগ ক'রে ভারতে তপশ্চরণ ক'রে মাধবের ভজনা করেছিলেন, নারদের মত তাঁরও কণ্ঠে ছিল 'হরের্নামৈব কেবলম্'। সুতরাং বৃহদ্ভাগবতামৃতে শ্রীনারদ চরিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে সনাতন চৈতন্য-চরিত দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকলে তাতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। সনাতন বলেছেন— নারদ স্বয়ং প্রয়াগের দশাশ্বমেধ তীর্থ থেকে দ্বারাবতী পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন--

স্বয়ং প্রয়াগস্য দশাশ্বমেধ, তীর্থাদিকে দ্বারবতীপরান্তে।
সম্ভাষিতানাং বিষয়ে ভ্রমিত্বা, পূর্ণার্থতাং শ্রীমদনুগ্রহেণ ॥
[বৃহদ্ভাগবতামৃত-১।৭।১৩৩]

[অনুবাদ ঃ "মুনিবর স্বয়ং প্রয়াগের দশাশ্বমেধ তীর্থ হইতে দ্বারাবতী পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়া বিপ্রাদি যে যে ভক্তের সহিত সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীভগবানের অনুগ্রহে পূর্ণার্থতা প্রাপ্ত হইয়াছেন‥ "]

এই শ্লোকের স্বকৃত টীকায় সনাতন গোস্বামী লিখেছেন—"আদি শব্দেন দাক্ষিণাত্য মহারাজমারভ্য শ্রীমদ্‌জবান্তান্তেন সম্ভাষিতাঃ সর্বে গ্রাহ্যাঃ।"— "এখানে 'আদি' পদে

দাক্ষিণাত্য মহারাজ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বারকায় শ্রীউদ্ধব পর্য্যন্ত সকল ভক্তকেই গ্রহণ করিতে হইবে"।

এই দক্ষিণদেশের রাজা সম্পর্কে সনাতন অন্যত্র লিখেছেন—

'কিন্তু দক্ষিণদেশে যো মহারাজো বিরাজতে।
স হি কৃষ্ণকৃপাপাত্রং যস্য দেশে সুরালয়াঃ ॥
রাজধানী সমীপে চ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
সাক্ষাদিবাস্তে ভগবান্ কারুণ্যাং স্থিরতাং গতঃ ॥
বিষ্ণোর্নিবেদিতৈস্তৈস্তু সর্বে তদ্দেশবাসিনঃ।
বৈদেশিকাশ্চ বহবো ভোজ্যন্তে তেন সাদরম্ ॥
পুণ্ডরীকাক্ষদেবস্য তস্য দর্শনলোভতঃ।
মহাপ্রসাদরূপান্নাদ্যুপভোগ সুখাপ্তিতঃ ॥
সাধু সঙ্গীত লাভাচ্চ নানাদেশাৎ সমাগতাঃ।
নিবসন্তি সদা তত্র সন্তো বিষ্ণুপরায়ণাঃ ॥

[অনুবাদ ঃ "কিন্তু দক্ষিণ দেশে যে মহারাজ বিরাজ করিতেছেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র। তাঁহার রাজ্যমধ্যে বহু দেবালয় আছে। তাঁহার রাজধানী সমীপে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীভগবান কৃপা করিয়া স্থির মূর্তি পরিগ্রহ পূর্বক সাক্ষাৎ অবস্থান করিতেছেন। রাজা শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদিত সেই সকল উপচার দ্বারা সমবেত বৈদেশিক ও স্বদেশবাসী বহু বহু ব্যক্তিকে আদরের সহিত ভোজন করাইয়া থাকেন। সেই পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবানের দর্শনলোভে এবং মহাপ্রসাদরূপ অন্নাদিভোজন-সুখ লাভের জন্য ও সাধুসঙ্গ অভিলাষে নানাদেশ হইতে সমাগত বিষ্ণুপরায়ণ সাধুসকল নিয়ত সেই স্থানে অবস্থান করিয়া থাকেন" (ভক্তিরত্ন গোস্বামী অনূদিত)।]

উড়িষ্যার রাজধানী কটক। কটকের সমীপে পুরীতে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ জগন্নাথ। সেখানেই মহাপ্রসাদরূপ অন্নাদি ভোজন-সুখ লাভ করা যায়। সুতরাং সনাতন অঙ্কিত শ্রীনারদ যখন এই 'দাক্ষিণাত্য মহারাজ' থেকে আরম্ভ ক'রে দ্বারকার উদ্ধবাদি পর্যন্ত সবল ভক্তের সঙ্গে সম্ভাষণ করেছেন, তখন এ অনুমান অসঙ্গত নয় যে, শ্রীচৈতন্যের নীলাচল থেকে দ্বারকা পর্যন্ত যাত্রার কথা সনাতনের অজানা ছিল না।
গোবিন্দের করচায় দ্বারকায় চৈতন্যদেবের বর্ণনা—

হরিবোল হরিবোল বলিতে বলিতে। ক্রমে উতরিয়া প্রভু হেলিতে দুলিতে ॥
কোথা হে দ্বারকাধীশ এই কথা বলি। অশ্রুজলে ভাসাইলা দ্বারাবতী স্থলী ॥
কদম্বের ন্যায় শিহরিল কলেবর। উলটি পালটি পড়ি ধূলায় ধূসর ॥
ভাবে মাতোয়ারা প্রভু ঢুলু ঢুলু চায়। দ্বারকাধীশের আগে ধরণি লোটায় ॥
চারিদিকে পড়ে যেন ভক্তি উছলিয়া। ফুলে ফুলে কান্দে মোর গোরা বিনোদিয়া ॥
নয়ন মুদিয়া কভু অন্তরেতে চায়। অন্তরের মধ্যে যেন কি দেখিতে পায় ॥
কখন বা উর্দ্ধমুখে তাকাইয়া রহে। নয়ন হইতে অশ্রু দরদর বহে ॥
কৃষ্ণেরে দেখিয়া তনু পুলকে পূরিল। এক দৃষ্টে তাঁর প্রতি চাহিয়া রহিল ॥
'বৃহদ্ভাগবতামৃতে' নারদ যখন দ্বারকাধীশের প্রাসাদে প্রবেশ করছেন, তখন—

"শ্রীমুনি পূর্বাভ্যাস বশতঃ প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিলেন বটে, কিন্তু তৎকালে তাঁহাকে দেখিয়া ভূতাবিষ্ট বা মহা উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।"—

'পূর্বাভ্যাসাদিবাভ্যাসং প্রাসাধাস্যগতো মুনিঃ।

ভূতাবিষ্টো মহোন্মাদগৃহীতশ্চ যথেতরঃ॥

এবং "তিনি কখনও স্খলিত, কখনও ভূতলে পতিত, কখনও বা চেষ্টারহিত হইতে লাগিলেন; আবার আর্তবৎ কখনও লুণ্ঠন, কখনও বা রোদন করিতে লাগিলেন; কখনও চীৎকার, কখনও দ্রুতগতিতে গমন, কখনও গান ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। কখনও বা যুগপৎ সমস্ত প্রেমবিকার প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন।"

ভূমৌ ক্বাপি স্খলতি পততি ক্বাপি তিষ্ঠত্যচেষ্টঃ।

ক্বাপ্যুৎকম্পং ভজতি লুঠতি ক্বাপি রোদিত্যথার্তঃ।

ক্বাপ্যাক্রোশন্ দ্রুতিভিরয়তে গায়তি ক্বাপি নৃত্যম্।

সর্ব্বং ক্বাপি শ্রয়তি যুগপৎ প্রেমসম্পদ্বিকারম্' ॥

সনাতন নারদের এ মূর্তি নিঃসন্দেহে শ্রীচৈতন্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। দ্বারকাধীশকে দেখে নারদের ও শ্রীচৈতন্যের প্রেমবিকার একইভাবে বর্ণিত হয়েছে। করচায় 'উলটি পালটি পড়ি ধূলায় ধূসর'; এখানে 'ভূমৌ ক্বাপি স্খলতি পততি ক্বাপি'। করচায় 'কখনও বা উর্দ্ধমুখে তাকাইয়া রহে'; এখানে 'তিষ্ঠত্যচেষ্টঃ'। 'ক্বাপ্যুৎকম্পং'—'কদম্বের ন্যায় শিহরিল কলেবর'। 'লুঠতি'—'দ্বারকাধীশের আগে ধরণী লোটায়'। 'রোদিত্যথার্তঃ'—'ফুলে ফুলে কান্দে মোর গোরা বিনোদিয়া'।

সুতরাং আলোচনায় দেখা গেল—

(১) কৃষ্ণদাস কবিরাজের মুদ্রিত কাব্যে দ্বারকা ভ্রমণ প্রসঙ্গ না থাকলেও মাহিষ্মতী-পুর ও ধনুস্তীর্থের পর 'বহুতর তীর্থে'র প্রসঙ্গ আছে। করচায় উল্লেখিত বরোদা, ঘোগা, সোমনাথ, গুণার, অমরাপুরী গোপীতলা, প্রভাসতীর্থ দ্বারকা ইত্যাদি ওই 'বহুতর তীর্থ' হওয়া সম্ভব।

(২) জয়ানন্দ, কবিকঙ্কন মুকুন্দ ও দিবাকর দাস তাঁদের গ্রন্থে শ্রচৈতন্যের দ্বারকা ভ্রমণের উল্লেখ করেছেন।

(৩) চরিতামৃতে শ্রীচৈতন্য সনাতন শিক্ষায় দ্বারকা মহিমা কীর্তন করেছেন। সেক্ষেত্রে তিনি দ্বারকায় না গিয়ে দ্বারকার পাশ দিয়ে চলে আসবেন, এ অস্বাভাবিক।

(৪) সনাতন গোস্বামীর বৃহদ্ভাগবতামৃতের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ—নারদের নীলাচল থেকে দ্বারকা-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত করচার এই প্রসঙ্গের সমর্থক।

ভারততীর্থ পরিক্রমায় বেরিয়ে শ্রীচৈতন্য প্রথমে পুরী থেকে এলেন আলালনাথে। সার্বভৌম নিত্যানন্দ প্রমুখ ভক্তরা আলালনাথ পর্যন্ত শ্রীচৈত্যদেব সঙ্গে সঙ্গে এলেন।

ক্রমে ক্রমে আলালনাথের শ্রীমন্দিরে। পেঁহুছিনু মোরা সব অতি ধীরে ধীরে॥
আলালনাথেরে হেরি ভাব উথলিল। অশ্রুজলে সে স্থানের মাটি ভিজাইল।
পরদিন প্রাতে সবে লইয়া বিদায়। তিনজনে বাহিরিনু দক্ষিণ যাত্রায়॥
এইকালে সার্ব্বভৌম বলে ধীরে ধীরে। মিলিবে রায়ের সঙ্গে গোদাবরী তীরে॥
শুনি প্রভু গোদাবরী তীরেতে ধাইল। সেই স্থানে রামানন্দ আসিয়া মিলিল॥
রায়ের নিকট হৈতে লইয়া বিদায়। ত্রিমন্দনগরে প্রভু প্রবেশ করয়॥

বহু বৌদ্ধ বাস করে ত্রিমন্দনগরে। আসিয়া মিলিল সবে গৌরাঙ্গ সুন্দরে॥···
বৌদ্ধগণ বিচারেতে পরাস্ত মানিল। পণ্ডিত দর্শক সবে হাসিতে লাগিল॥
বৌদ্ধগণের পতি রামগিরি রায়। প্রণমিয়া বলে পথ দেখাও আমায়॥
হাসিয়া চৈতন্য প্রভু কৃপা করি কয়। মাথার ঠাকুর তুমি রামগিরি রায়॥
হরি বলি পুলকিত হয় যেই জন। মাথার ঠাকুর সেই এই ত সাধন॥
শুনিয়া প্রভুর বাণী রামগিরি রায়। অমনি আছাড় খেয়ে পড়িল ধরায়॥
পণ্ডিতের শিরোমণি যত বৌদ্ধগণ। রামগিরি পথে সবে করিলা গমন॥

রায় রামানন্দের রাজধানী ছিল গোদাবরী তীরে রাজমহেন্দ্রীতে। রাজমহেন্দ্রীর প্রায় ১৮ মাইল দক্ষিণে 'মন্দপল্লী' এখনও বর্তমান। এরপর পন্থগুহা পেরিয়ে সারাদিন দ্রুতবেগে বহু পথ হেঁটে শ্রীচৈন্য এলেন অক্ষয় বট ও বটেশ্বর শিবের কাছে। এখানে করচার বিবরণ—

অক্ষয় নামেতে বট বহুদূরে ছিল। সন্ধ্যাকালে সেই স্থানে প্রভু উত্তরিল॥
বটেশ্বর নামে শিব আছেন তথায়। ভক্তি করি সেখানে গোরাচাঁদ ধায়॥
ভক্তি সহ বটেশ্বর প্রভু প্রণমিলা। অনাহারে সেইখানে রজনী যাপিলা॥
সাত দিন গোঁয়াইনু এই বটেশ্বরে। নন্দীশ্বরে যাই চল দর্শনের তরে॥
এই কথা শুনি কাঁধে লইলাম খড়ি। চলিলাম প্রভু সনে বটেশ্বর ছাড়ি॥
পথে যেতে যেতে এক বিশাল জঙ্গল। দেখিয়া আমার মন হইল বিকল॥
দশ ক্রোশ ব্যাপিয়া সে জঙ্গল বিথার। উপজিল ভাবনা কেমনে হব পার॥

জঙ্গল পার হয়ে মুন্নানগর হয়ে বেঙ্কটনগর, সেখান থেকে বগুলা অরণ্যে পন্থভীলকে কৃপা ক'রে গিরীশ্বর শিব দর্শন ক'রে ত্রিপদীনগরে এসে শ্রীচৈতন্য শ্রীরামের মূর্তি'র বন্দনা করলেন।

'জঙ্গল পার হৈয়া মুন্নানগরের পাশে। বৃক্ষতলে বসিলেন বিশ্রামের আশে॥
এইভাবে রাত্রি গেল নিদ্রা না আইল। প্রাতে উঠি প্রভু মোর দক্ষিণে চলিল॥
তারপর প্রভু মোর বেঙ্কটনগরে। উপনীত হৈল গিয়া দিবা দ্বিপ্রহরে॥
তিনদিন থাকি প্রভু বেঙ্কটনগরে। অকপট হরিনাম দেন ঘরে ঘরে॥···
না শুনিলা কারো কথা চৈতন্য গোঁসাই। ধাইল বগুলোপানে পন্থভীল ঠাঁই॥
তথা হৈতে তিন ক্রোশ আছয়ে মন্দির। গিরীশ্বর নামে লিঙ্গ স্থাপিত বিধির॥
মন্দিরের তিনভিত পর্ব্বতে বেষ্টিত। দক্ষিণ ভাগেতে বিল্ববৃক্ষ বিরাজিত॥
নিজ হস্তে বিল্বদল তুলি প্রভু মোর। অঞ্জলি দিলেন শিবে প্রেমেতে বিভোর॥
তারপরে ত্রিপদীনগরে প্রভু যায়। শ্রীরামের মূর্ত্তি দেখি পড়িলা ধূলায়॥

মাদ্রাজের কিছু দক্ষিণে (৩৫ মাইল) চিংলিপুট ষ্টেশনের ৯ মাইল দূরে তিরু-কালিকুণ্ডাম পাহাড়ে বেদ গিরীশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। 'ত্রিপদী' তিরুপতি হওয়াই সম্ভব। এখানে শ্রীরামের বৃহৎ দেবালয় আছে। ত্রিপদীনগরের পর—

"পানা নরসিংহে প্রভু দেখিবারে ধায়॥
নৃসিংহদেবের ভোগ লাগে চিনিপানা। পানা নরসিংহ বলি ডাকে সর্বজনা॥
নৃসিংহের স্তব করে প্রভু দয়াময়। ইহা দেখি লোক সব মানিল বিস্ময়॥
নৃসিংহের অধিকারী মাধবেন্দ্র ভুজা। নিত্য আসি নরসিংহ দেবে করে পূজা।

তুলসীর মালা আনি দিলা প্রভুর গলে। মালা পরি প্রভু মোর হরি হরি বলে ॥
শর্করের পানা মোরে দিলা আনাইয়া। পিয়ে পিয়ে খাই পানা উদর পূরিয়া।

সতীশচন্দ্র দে মহাশয় লিখেছেন—

"গোদাবরীতীর্থের অর্থাৎ রাজমহেন্দ্রীর পরে পানা নরসিংহে চৈতন্যদেব সম্ভবতঃ গমন করিয়াছিলেন। পানা-নরসিংহ অর্থাৎ মঙ্গলগিরি বেজওয়াদা হইতে ৭ মাইল দক্ষিণে। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতেও ত্রিপদী হইতে পানা নরসিংহ এবং পানা-নরসিংহ হইতে কাঞ্চীতে (Coonjeeveram) আসিবার কথা লিখিত আছে। তাহা হইলে কি চৈতন্যদেব প্রথমে পানা-নরসিংহ তীর্থের কথা শুনেন নাই? ত্রিপদীতে আসিয়া কি উহা শুনিয়া ছিলেন? রাজমহেন্দ্রীর প্রায় ৮০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বেজওয়াদা। বেজওয়াদা অন্ততঃ দুই শত মাইল দক্ষিণে তিরুপতি অথবা ত্রিপদী।"

আমাদের মনে হয় কৃষ্ণানদীর সন্নিহিত (প্রতাপরুদ্রের রাজ্যসীমা কৃষ্ণানদীর দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল—"the boundary of the Gajapati Kingdom continued to be to the south of the Krishna river." Nilkanta Sastri : *A History of South India* (*g. 266*) মঙ্গলগিরি থেকে পানা-নরসিংহ বিগ্রহ সরিয়ে নিয়ে ওড়িশারাজ প্রতাপরুদ্রের নাগালের বাইরে দুশো মাইল দক্ষিণে তিরুপতিতে কোন স্থানে রাখা হয়েছিল। এস্থানটি ছিল বিজয়নগরের রাজধানী-সংলগ্ন এলাকা, সুতরাং সুরক্ষিত।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "*The Topography of Govinda Das's Diary*" প্রবন্ধে লিখেছেন—"Tirupati in the Chandragiri Taluk, North-Arcot district, is a range of low hills. There was a temple of Nrisinha in the lower range of the hills, whose favourite beverage was sarbat. The temple seems not to exist at the persent day, but there is a post dedicated to Nrisinha, with a stone inscription close by." (*The Calcutta Review*, Vol CVII July 1898)

এতে মনে হয়, সাময়িকভাবে পানা-নরসিংহ বিগ্রহ এখানে এনে পরে আবার যথাস্থানে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

পানা নৃসিংহ দর্শনের পর তাঁরা এলেন বিষ্ণুকাঞ্চীধাম।—

আঁখি মুদি বলে প্রভু মুখে হরিনাম। ক্রমে আসি উপনীত বিষ্ণুকাঞ্চীধাম ॥
ভবভূতি নামে শেঠী বিষ্ণুকাঞ্চী-স্থানে। লক্ষ্মীনারায়ণ সেবা করয়ে যতনে ॥

এরপর পক্ষতীর্থ ভদ্রানদীতে স্নান করে কালতীর্থে এসে মহাপ্রভু বরাহমূর্তি দর্শন করলেন।—

ভদ্রানদী তীর হৈতে পঞ্চক্রোশ দূরে। কালতীর্থ নামে তীর্থ পোলো নিঃরে।
বরাহদেবের মূর্তি আশ্চর্যগঠন। যাহা হেরি মুগ্ধ হয় মুনিঋষিগণ ॥

কাঞ্চী থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে সমুদ্রতীরে মামল্লপুরম্। Zimmer মামল্লপুরমের আদি বরাহগুহার বিবরণ দিয়ে লিখেছেন-

" ·in the Adi Varaha cave at Mamallapuram, he Visnu)

is shown rescuing the goddess Earth from the depths of the primeval Ocean." [*The Art of Indian Asia : Indian Sculpture. g. 356-7*]

ভৌগোলিক অনুক্রম অনুসারে করচায় উল্লেখিত বরাহদেব মামল্লপুরমের এই আদি বরাহ হওয়া সম্ভব। এরপর করচার বিবরণ—

পঞ্চক্রোশ দক্ষিণেতে সন্ধিতীর্থ আছে। যাত্রা করিলেন প্রভু মুহি পাছে পাছে ॥
নন্দা ভদ্রা দুই নদী মিলেছে সেখানে। স্নান করিলেন গিয়া সেই সন্ধিস্থানে ॥

এখানে অদ্বৈতবাদী সদানন্দ পুরীকে ভক্তিপথে আনয়ন করে চৈতন্যদেব চাঁইপল্লী-তীর্থে গেলেন।

'তাঁরে ভক্তিতত্ত্ব দিয়া সন্ন্যাসী আমার। চাঁইপল্লীতীর্থে যান দেখিতে আচার ॥

করচায় এরপরের স্থান যথাক্রমে শৃগালী, নাগর ও তাঞ্জোর।

শৃগালী ভৈরবী নামে আর এক মুরতি। নদীর কূলেতে হয় তাঁহার বসতি ॥
ভক্তি সহকারে করি শৃগালী দর্শন। কাবেরীর কূলে গেলা শচীর নন্দন ॥
স্নান করি কাবেরীতে গৌরাঙ্গ কিশোর। হরিনাম সুধাপানে হইলা বিভোর ॥
অপরাহ্নে মোরে বলে ভিক্ষা করিবারে। ভিক্ষা লাগি যাইলাম নগর মাঝারে ॥
আমার দয়াল প্রভু নাগর নগরে। প্রাতে উঠি চলিলেন কৃষ্ণপ্রেমভরে ॥
ধূলামাখা জটাবাঁধা অন্যকথা নাই। পথে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি চলিছে নিমাই ॥
নাগরনগরে আছে শ্রীরামলক্ষ্মণ। সেইখানে গিয়া প্রভু করিলা বন্দন ॥
নগরেতে বহুতর লোক করে বাস। সেইখানে হরিনাম করিলা প্রকাশ ॥
তিনদিন নৃত্যগীত সেইখানে করে। এই কথা প্রচারিল নগরে নগরে ॥
যাত্রা করিবার কালে সন্ন্যাসিপ্রবর। ইঙ্গিত করিলা মোরে উঠিতে সত্বর ॥
খড়ম দুখানি লই মাথায় বাঁধিয়া। দুহু কাঁধে লইলাম দুইটি খাড়িয়া ॥
কুলবধূ ধায় কত দেখিতে প্রভুরে। তাঞ্জোর নগরে চলে সাতক্রোশ দূরে ॥

করচায় তাঞ্জোরে রাধাকৃষ্ণ মূর্তি দর্শনের পর গো-সমাজ-শিব ও কুম্ভকর্ণ-কর্পরের উল্লেখ আছে।

ধলেশ্বর নামে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ। তাঞ্জোরে থাকেন করি কৃষ্ণের সেবন ॥
রাধাকৃষ্ণ মূর্তি আছে তাহার মন্দিরে। সেইখানে মোর গোরা গেলা ধীরে ধীরে ॥
ধলেশ্বর ব্রাহ্মণের আঙ্গিনার মাঝে। প্রকাণ্ড বকুল বৃক্ষ তথায় বিরাজে ॥
তথি রহে বহুতর বৈষ্ণব সন্ন্যাসী। যে স্থান দেখিলে হয় গৃহস্থ উদাসী ॥
গো সমাজ শিব রহে তার বাম ভাগে। শিব দরশন কৈলা প্রভু অনুরাগে ॥
তাহার নিয়ড়ে ছিল রম্য সরোবর। পথ দেখাইয়া দিলা বিপ্র ধলেশ্বর ॥
কুম্ভকর্ণ কর্পরেতে সরোবর হয়। সরসী দেখিয়া প্রভু মানিলা বিস্ময়।

"কথিত আছে, অমৃতপূর্ণ একটি কুম্ভ প্রলয়পয়োধিজলে ভাসমান হইয়া এইস্থানে আসিয়াছিল এবং সৃষ্টির আদি হইতে সুদীর্ঘকাল এখানে ছিল। একদা ঐ কুম্ভের কাণা ভাঙ্গিয়া অমৃত গড়াইয়া পড়িতেছিল, তাহা দেখিয়া মহাদেব কুম্ভস্থিত সমস্ত অমৃতপান করেন এবং তদবধি কুম্ভেশ্বর নাম ধারণ করেন। এই নিমিত্ত স্থানটির নামও কুম্ভকোণম্ হইয়াছে।" [দক্ষিণভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ, পৃ. ১০৮]

কুম্ভকোণম্ প্রসঙ্গে সতীশচন্দ্র দে মহাশয় লিখেছেন—

"তিরুবাদীর প্রায় ৮ ক্রোশ উত্তরপূর্বে কোম্বকণম্ অথবা কুম্ভকর্ণ-কর্পর সরোবর (কুম্বকোণমের মহামখম সরোবর) দেখিয়া চৈতন্যদেব বিস্মিত হইলেন—কুম্ভকর্ণ কর্পরেতে সরোবর হয়। সরসী দেখিয়া প্রভু মানিলা বিস্ময়॥

কুম্ভকোণমের ডাক্তার নাগরাজ শর্ম্মা লিখিয়াছেন—"Kumbhaghonam has absolutely nothing to do with Kumbha Karna. Kumbha means a a pot; 'Ghona (literally, nose) here indicates 'neck.' Kumbhaghona is thus the sacred spot where the nectar pot floating in cosmic floods stood still after the subsiding of the inundation, and where it was pierced by Lord Siva by means of an arrow."

চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে 'কুম্ভকর্ণ-কপাল'। করচায় বলা হয়েছে 'কুম্ভকর্ণ-কর্পর' অর্থাৎ কলসীর কানা ভাঙা। অর্থাৎ কুম্ভকোণমে প্রচলিত কিম্বদন্তী অনুসারে করচায় নামের উল্লেখটি যথাযথ।

কুম্ভকর্ণকর্পর সরোবরের পর মহাপ্রভু চণ্ডালু গিরি, পদ্মকোট, চণ্ডেশ্বর শিব দর্শন করলেন এবং পক্ষকাল ধরে বিশাল অরণ্য অতিক্রম করে ত্রিচিনোপল্লীর তিনমাইল উত্তরে শ্রীরঙ্গমে পেঁছোলেন।

করচায় রঙ্গধামে নরসিংহ দেবের মূর্তির বর্ণনা দিয়ে গোবিন্দ লিখেছেন—

রঙ্গধামে নরসিংহ দেবের মূরতি। হেরিলে পাষণ্ডীচিত্তে উপজে ভকতি॥
প্রহলাদ অঞ্জলি বান্ধি সম্মুখে তাহার। করিছেন প্রভু দৈত্যরাজের সংহার॥
এমন মূরতি আমি কভু দেখি নাই। পাগল হইল হেরি চৈতন্য গোসাই॥

শ্রীরঙ্গমের নৃসিংহ মূর্ত্তির কথা কুম্ভকোণমের খ্যাতনামা নাগরাজ শর্ম্মা মহাশয়ও লিখিয়াছেন, "Rangadhama is the famous South Indian place of pilgrimage known as Srirangam. The Deity is Vishnu. The sacred name is Ranganatha. The figure of Narasimha slaying Hiranya kasipu with Prahlada standing with folded hands is in a cocoanut-grove near the eastern gate of the temple." (তুলনীয়: 'প্রহ্লাদ অঞ্জলি বান্ধি সম্মুখে তাহার'।···করচা) [গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লী পৃ. ৪১৩.]

এরপর করচার বিবরণ—

ঋষভ পর্বত তবে করিলা গমন॥
ঋষভ পর্ব্বতে থাকে পরানন্দ পুরী। তাহারে দেখিতে প্রভু হৈল আগুসারী॥
পুরী সহ কৃষ্ণকথা বহুত করিলা। অতঃপর রামনাথ নগরে আইলা॥
রামনাথ নগরেতে রামের চরণ। হেরিয়া করিলা প্রভু অশ্রু বরষণ॥
রামেশ্বর তীর্থে গিয়া তথি স্নান করি। শিব দরশন করে মোর গৌরহরি॥
রামেশ্বর নামে শিব আশ্চর্য্য গঠন। শিব দেখি মহাপ্রভু করিলা বন্দন॥
তিন দিন সেতুবন্ধে করিয়া কীর্ত্তন। বামে চলে মাধবীবন করিতে দর্শন॥

মাধবীবনের পর তত্ত্বকুণ্ডীতে স্নান ক'রে তাম্রপর্ণী পার হয়ে সমুদ্রের ধারে তাঁরা কন্যাকুমারী দেখতে চললেন।—

তত্ত্বকুণ্ডী নামে তীর্থ আছে সেই স্থানে। স্নান করিবারে প্রভু চলিলা সেখানে॥

তারপরে তাম্রপর্ণী নদী দেখা দিল। স্নান করিবারে প্রভু সেখানে চলিল ॥
মাঘী পূর্ণিমার দিনে তাম্রপর্ণী ধারে। বহুত অতিথি আসে স্নান করিবারে ॥
সেই স্থানে একপক্ষ অপেক্ষা করিয়া। মাঘী পূর্ণিমার দিন স্নান করি গিয়া ॥
তাম্রপর্ণী পার হয়ে সমুদ্রের ধারে। প্রভু কন্যাকুমারী চলিল দেখিবারে ॥

কন্যাকুমারীর পর এক সন্ন্যাসী দলের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য সাতল পর্ব্বত হয়ে ত্রিবঙ্কু-নগরে এলেন।

স্নান করি বড় এক সন্ন্যাসীর দল। ফিরিয়া চলিল তারা পর্ব্বত সাতল ॥…
পঞ্চদশ ক্রোশ গিয়া মিলিল সাতল। সেইখানে স্থিতি করে সন্ন্যাসীর দল ॥
সন্ন্যাসি ঠাকুর সব প্রভাতে উঠিয়া। চলিলা ত্রিবঙ্কু দেশে পর্ব্বত ভেদিয়া ॥
ত্রিবঙ্কু দেশের রাজা বড় পুণ্যবান্। পালন করেন প্রজা পুত্রের সমান ॥…
নগরের তিন স্থানে অন্নচ্ছত্র হয়। অতিথি পথিক আসি সেই ছত্রে রয় ॥

এই 'ত্রিবঙ্কুদেশে'র উপর দিয়ে যাওয়ার সময় গোবিন্দ কর্মকার বলেছেন—

পর্বতে বেষ্টিত দেশ দেখিতে সুন্দর। ঝরণার জল চলে অতি মনোহর ॥
বড় বড় নিম্ববৃক্ষ চারিদিকে হয়। আশ্চর্য্য তাহার শোভা কহনে না যায় ॥
রামগিরি নামে গিরি আছে সেইখানে। আশ্চর্য্য মহিমা তার সকলে বাখানে ॥
সবে বলে রামচন্দ্র ইহার উপরে। সীতাসহ তিন দিন আসি বাস করে ॥
লঙ্কার সমর জিনি রাম গুণধাম। এই গিরিকুটে উঠি করেন বিশ্রাম ॥
সীতাসহ রামচন্দ্র ঠাকুর লক্ষ্মণ। এই খানে বিরাম করেন তিন জন ॥
শুনিয়া প্রভুর মনে লালসা বাড়িল। সেই স্থান দেখিবারে পর্বতে উঠিল ॥
যেই স্থানে রামসীতা বিশ্রাম করিলা। সেইখানে মোর গোরা প্রণমিলা ॥
ভক্তিসহ সেই রামগিরি নিরখিতে। কতশত লোক উঠে প্রভুর সহিতে ॥

মেঘদূতের রামগিরির বর্ণনায়ও রাম-সীতা অনুষঙ্গ আছে।—
'যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু' ॥ অগস্ত্যের নামে যেমন দক্ষিণ ভারতে নানা স্থানে নানা কুণ্ড, পল্লী, আশ্রম ইত্যাদি আছে, রামচন্দ্রের নামের সঙ্গে জড়িয়েও একাধিক গিরিপুরী ইত্যাদি আছে। এক রামগিরি আছে শ্রীরঙ্গপত্তন থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে। রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন—Dr. Buchanon left Seringapatam on his way back to Bangalore ·· Ramgiri was the next important place on the way. [*Economic Hist. of British India. pg. 204*]

একটি 'রামপুর' আছে করচা বর্ণিত স্থানে অর্থাৎ ত্রিবাঙ্কুরের মধ্যে। এই রামপুরের পাশে একটি গিরিও আছে। এই স্থলটিকেই করচা বর্ণিত রামগিরি বলে অনুমান ক'রে সতীশচন্দ্র লিখেছেন—"রামগিরি পর্ব্বত কোচিনের প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে রামপুরম্ সন্নিহিত ৩১৬৬ ফিট উঁচা পর্বত হইতে পারে।—"

রামগিরির পর একপক্ষকাল হেঁটে তাঁরা পয়োষ্ণি নগরে এলেন এবং শিবনারায়ণ দেখলেন। এরপর এলেন শিঙারির মঠে।

আড়ে দীঘে এই দেশ বড়ই বিস্তর। এক পক্ষকাল গেল তাহার ভিতর ॥
তারপর পয়োষ্ণি নগরে প্রবেশিলা। শিবনারায়ণ দেখি প্রফুল্ল হইলা ॥

শিঙারির মঠে থাকে শঙ্করের চেলা। সেইখানে গিয়া প্রভু করিলেন মেলা।
শঙ্করের শিষ্য যত একত্র হইয়া। বিচার করিতে বসে তত্ত্ব বিচারিয়া।
বিচারে সকল চেলা মানে পরাজয়। মঠ হইতে মৎস্যতীর্থ দেখিবারে যায়।।

রামগিরি (রামপুরম্) ছিল কোচিনের দক্ষিণ-পূর্বে। এখন তাঁরা কোচিন বন্দরের পূর্ব দিয়ে উত্তরমুখে চলেছেন। এ অঞ্চলটি কালিকট বন্দরের দক্ষিণে।

উক্ত 'শিঙারির মঠ'কে মহীশূরের কাদুর জেলার শৃঙ্গেরী মঠ ব'লে মনে করলে ভুল করা হবে। কেননা করচায় 'পয়োষ্ণি' (বর্তমান 'পোন্নানি') তে 'শিবনারায়ণ' দেখেই তাঁরা শিঙারির মঠে এসেছেন এবং এখান থেকে মৎস্যতীর্থ দেখতে গেছেন। পোন্নানির উত্তর পূর্বে মনন্তোদ্দি নগরে বিখ্যাত মৎস্যতীর্থ অবস্থিত।

শিঙারির মঠ শৃঙ্গেরী না হলে এটি কোথাকার মঠ? এর উত্তর পাওয়া যাবে কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণনায়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন—'শৃঙ্গেরি মঠে আইলা শঙ্করাচার্য্য স্থানে' (চৈ. চঃ মধ্য, ৯।২৪৪)। 'শঙ্করাচার্য স্থান' বলতে যদি শঙ্করাচার্যের জন্মস্থানকে বোঝান হয়ে থাকে, তাহলে কিন্তু উল্লেখিত স্থানগুলির ভৌগোলিক অনুক্রম ঠিক থাকে। শঙ্করাচার্যের জন্মস্থান 'কালদী' এই এলাকায় অবস্থিত। এখানে একটি কৃষ্ণের মন্দির আছে। শঙ্করাচার্য স্বয়ং এই মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মহীশূরের শৃঙ্গেরি মঠের অধ্যক্ষ এই মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং এখানকার সেবাপূজার তত্ত্বাবধান করেন। এই হিসাবেই গোবিন্দ কালদীর মঠকে 'শিঙারির মঠ' বলে থাকতে পারেন।
শিঙারির মঠ থেকে তাঁরা 'মৎস্যতীর্থ দেখিবারে যায়'। এবং—

মৎস্যতীর্থ করি প্রভু কাচাড়ে আইলা। কাচাড়তে ভগবতী দর্শন করিলা।।
এইখানে কৃষ্ণাপুত্রী ভদ্রা নামে নদী। স্নান করি চলি গেলা নাগপঞ্চপদী।।
এথাকার লোক সব রামভক্ত হয়। এই স্থানে প্রভু ভিক্ষা করিবারে কয়।।
তিন বাড়ী ফিরিলাম ভিক্ষা করিবারে। আটা ভিক্ষা দিলা সবে বহুত আমারে।।
এই স্থানে প্রভু মোর ত্রিরাত্রি থাকিয়া। চিতোল চলিলা সবে পর্ব্বত ভেদিয়া।।

এই চিতোল (cheitalli) কুর্গের একটি উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য স্থান। চিতোলের পর—'কাবেরীর জন্মস্থান হয় কোটিগিরি। সেইখানে উপনীত নানা দেশ ফিরি'।।

এখানেই একটি প্রশ্নের সমাধান ক'রে নেওয়া প্রয়োজন। করচা অনুসারে পোন্নানীর পর থেকেই চৈতন্যদেব সমুদ্র উপকূল ধরে না গিয়ে উত্তর-পূর্বে গিয়ে কুর্গের মধ্যদিয়ে উত্তর পূর্বে বিজাপুরের মধ্য দিয়ে গেছেন। এর কারণ কি?

কারণটি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক। শ্রীচৈতন্যদেব পুরী থেকে যাত্রা করেছিলেন ১৫১০ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে ('বৈশাখের সপ্তম দিবসে')। মাঘী পূর্ণিমায় তিনি তাম্রপর্ণীতে স্নান ক'রে 'কন্যাকুমারী চলিল দেখিবারে'। সুতরাং ১৫১১-র ফেব্রুয়ারী (মাঘ) মাসে চৈতন্যদেব ভারতের দক্ষিণতম প্রান্তে এসে পেঁ'ছেছেন--সময় লেগেছে মোটামুটি দশ মাস। এরপর আট মাস লেগেছে পশ্চিমভারতে দ্বারকা হয়ে বরদা নগরে ফিরে আসতে, কেননা গোবিন্দ লিখেছেন—'আশ্বিনের শেষ দিনে বরদা নগরে। ফিরে আসি প্রভু মোর হরিনাম করে।' তাহ'লে শ্রীচৈতন্য ১৫১১

সালের ফেব্রুয়ারী থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত কন্যাকুমারী থেকে গুজরাট ভ্রমণ করেছেন।

এ সময়ের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে কেন মহাপ্রভু কুর্গের পর পশ্চিম উপকূলভাগ দিয়ে না গিয়ে সহ্যাগিরিকে বাঁয়ে রেখে উত্তর-পূর্ব দিয়ে গেছেন।

বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রসারণের সময় তখন। ১৪৯৬ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে বিজয়নগরাধিপতি নরস নায়ক (১৪৯১-১৫০৩ খ্রীঃ) দক্ষিণে অভিযান করে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ পদানত করেন এবং স্থানীয় চোল ও চেরবংশীয় রাজাদের বিজয় নগরের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন।

কৃষ্ণদেব রায় ১৫০৯ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর আগে রাজা বীর নরসিংহের (১৫০৫-১৫০৯) সময়ই পশ্চিম উপকূলে পর্তুগীজরা আস্তানা নিয়েছে। বীর নরসিংহ Cannanore (পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত)-এ পর্তুগীজ অধিনায়ক Almeida-র কাছে প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছেন, উদ্দেশ্য—পর্তুগীজদের সাহায্যে সেনাবাহিনীর সুষ্ঠুতর সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা এবং অশ্বারোহী বাহিনীর জন্য অশ্ব সংগ্রহ করা। কিন্তু Almeida ভাটকলে দুর্গ গড়ার অনুমতি চাইলে তিনি নীরব রইলেন।

কৃষ্ণদেব রায়ের (১৫০৯-২৯ খ্রীঃ) রাজত্বকালে পর্তুগীজ অধিনায়ক আলবুকার্ক ১৫১০ খ্রীস্টাব্দের শেষে বিজাপুর বাহিনীকে হঠিয়ে দিয়ে গোয়া দখল করেন। আলবুকার্ক প্রস্তাব পাঠান, কালিকটের জামোরিনের বিরুদ্ধে বিজয়নগর তাঁকে সাহায্য করলে, তিনিও বিজয়নগরকে সাহায্য করবেন—আরবী ও পারসী ঘোড়া বিজাপুরকে একটিও না দিয়ে সব দেবেন বিজয়নগরকে। পর্তুগীজ প্রতিনিধিদল এল বিজয়নগরে, কৃষ্ণদেবের কাছে অনুমতি চাইল ভাটকলে দুর্গ গড়ার—এবার তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর হল। [*A History of South India, Nilakanta Sastri, pg. 267-269*]

সুতরাং ১৫১১ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারীর পর শ্রীচৈতন্য যখন কন্যাকুমারী থেকে ত্রিবাঙ্কুর বা কেরলের দক্ষিণপূর্ব দিয়ে উত্তর দিকে যাচ্ছেন, তখন পশ্চিম উপকূলে কালিকট থেকে গোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে পর্তুগীজদের সামরিক প্রভুত্ব মোটামুটি স্বীকৃত হয়েছে। ভাটকলে তারা দুর্গস্থাপনে তৎপর হয়েছে। এর আগেই তারা কোচিনে দুর্গ গড়েছে এবং জাহাজ মেরামতের ও নির্মাণের কারখানা তৈরি করেছে। এখানে তারা লিসবনীয় দক্ষতায় জাহাজ মেরামত ও নির্মাণ করত। এ ছাড়া *Cannanore*—এও পর্তুগীজদের একটি শক্তিশালী দুর্গ ছিল—এখানেই তাদের আমদানী করা আরবী-পারসী ঘোড়া-বোঝাই জাহাজ এসে ভিড়ত। (*A History of South India, Nilakanta Sastri, pg. 325*)

সুতরাং কোচিনের নিকটবর্তী উপকূল ভাগ এবং কালিকট থেকে ভাটকল গোয়া পর্যন্ত প্রসারিত উপকূলভাগ ১৫১০-১১ খ্রীস্টাব্দে তীর্থযাত্রীদের পক্ষে নিরাপদ ছিল না ব'লেই মনে হয়। অন্যান্য তীর্থযাত্রীদের নির্দেশ মত তাঁরা ওই উপকূলভাগ এড়িয়ে চলবেন—এটাই স্বাভাবিক। উপকূলভাগের মত ভিতরের ভূ-ভাগেও যুদ্ধবিগ্রহ চলছিল, কিন্তু ১৫১০-১১ খ্রীস্টাব্দে কৃষ্ণদেব রায়ের আধিপত্য এ এলাকায় প্রতিষ্ঠিত।

১৫০৯ খ্রীস্টাব্দে বাহমনী সুলতানের বাহিনীকে বিদারে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে কৃষ্ণদেব সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদের যুদ্ধের সাধ মিটিয়েছেন। বিজাপুরের ইয়ুসুফ আদিল খান কোবিলকোণ্ডার যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। ইয়ুসুফ আদিলখানের নাবালক পুত্র ইসমাইল আদিল শাহ্ নামে মাত্র বিজাপুরের সুলতান হলেন। প্রকৃত ক্ষমতা রইল সুলতানের অভিভাবক কামাল খানের হাতে। ১৫১১ খ্রীস্টাব্দে কৃষ্ণদেব বিজাপুর ও বাহমনী সুলতানদের অন্তর্বিবাদের সুযোগ নিয়ে রায়চরে দোয়াব আক্রমণ ক'রে রায়চুর দুর্গ দখল করেন। কামাল খান কৃষ্ণদেবের সঙ্গে পর্তুগীজদের বন্ধুত্বের কথা স্মরণ রেখে তেমন কোন বাধা দিলেন না। ১৫১১ খ্রীস্টাব্দে মে মাসে কামাল খান ইসমাইলের মায়ের নিযুক্ত আততায়ীর হাতে মারা গেলেন। বিজাপুরের অভ্যন্তরেই গোলমাল পাকিয়ে তুলল কামালখানের বন্ধু স্থানীয় পারসীক ও খোরাসানী আমীর ওমরাহরা। কৃষ্ণদেব রায়চুর দখল করে গুলবর্গা আক্রমণ করলেন, আমির বারিদকে পরাজিত ক রে শহর দখল করলেন। গুলবর্গা থেকে এগিয়ে গিয়ে কৃষ্ণদেব বিদার জয় করলেন, দ্বিতীয় মাহমুদকে মুক্তি দিয়ে 'যবন রাজ্য সংস্থাপক' উপাধি গ্রহণ করলেন। [*A History of South India, Nilkanta Sastri, pg. 269*]

একমাত্র *Ummattur* এর বিদ্রোহী নায়ক গঙ্গরায়ের সঙ্গে কৃষ্ণদেব রায়ের যুদ্ধ চলেছিল ১৫১০ খ্রীস্টাব্দের আগষ্ট থেকে ১৫১২ খ্রীস্টাব্দের শেষ পর্যন্ত। [*A History of South India, pg. 270*]

অর্থাৎ ১৫১১ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারীর পর চৈতন্যদেব যখন উত্তরে যাত্রা সুরু করলেন তখন *Ummattur* এ যুদ্ধ চলছে। কন্যাকুমারী থেকে *Ummattur* এর সমতলিক দূরত্ব ৩০০ মাইলের কিছু বেশি। কন্যাকুমারীতে ফেব্রুয়ারীতে এসে থাকলে এখানে আসতে দেরী ক'রে হলেও মার্চ মাসের বেশী লাগবার কথা নয়। এ সময় এখানে যুদ্ধ চলছে। কাজেই পশ্চিম উপকূলভাগে না গিয়ে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পূর্ব দিয়ে আবার উম্মত্তুরকে পূবে রেখে কুর্গের পার্বত্য অঞ্চল দিয়ে চৈতন্যদেবকে যেতে হয়েছে।

ঐতিহাসিক এই প্রেক্ষাপট থেকে এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে পড়ে যে কৃষ্ণদেব রায় বিজাপুর সাম্রাজ্যের অন্তর্গত যে এলাকা (রায়চুর দোয়াব) সাময়িকভাবে জয় করেছিলেন, শ্রীচৈতন্য সেই এলাকার উপর দিয়েই পুনায় বা পূর্ণনগরে আসেন। করচায় বিজাপুরে পর্বতের উপর শিবদুর্গা দেখার কথা আছে। এই বিজাপুরের পর্বত বিজাপুর সাম্রাজ্যের অন্তর্গত কোন পর্বত, সহ্যাগিরির নিকটেই এর অবস্থান। কেননা, করচায় বলা হয়েছে এই পর্বত থেকে নেমেই উত্তরে তাঁরা সহ্যকুলাচল দেখতে পেলেন।

পর্বত হইতে নামি চৈতন্য গোঁসাই। চলিলা উত্তরে মুঁহি পিছেপিছে যাই ॥
একেবারে দেখা গেল সহ্যকুলাচল। কুলাচল দেখি প্রভু আনন্দে বিহবল ॥

এরপর উত্তরমুখী যাত্রায় উত্তর দক্ষিণে লম্বালম্বি প্রসারিত সহ্যাগিরিকে বাঁয়ে রেখে শ্রীচৈতন্য এগিয়েছেন।

'দুই দিবারাত্রি যায় পর্বত ভেদিয়া। তার মধ্যে গ্রাম পুরী না পাই খুঁজিয়া ॥
বড়ই দুর্গম পথ চলিতে না পারি। কেবল কদম্ব বৃক্ষ দেখি সারি সারি ॥
কদম্বের গাছ দেখি প্রভু মোরে বলে। মোর কৃষ্ণ কেলি করে এই বৃক্ষতলে ॥
এই বলি কান্দিয়া আকুল প্রভু মোর। দুলিতে দুলিতে চলে কৃষ্ণপ্রেমে ভোর' ॥

নীলকান্ত শাস্ত্রী লিখেছেন তামিল ঐতিহ্য অনুসারে সুব্রহ্মণ্য কদম্বগাছে বাস করেন। Svami Mahasena (i. e. Subrahmanya) whom Tamil tradition regarded as dwelling in the Kadamba tree." (*A History of South India*. *pg. 97*) । কোটিগিরি ব্রহ্মগিরির Subrahmanya range-এর অন্তর্গত। সুতরাং কোটিগিরির পর গোবিন্দ কদম্ব বৃক্ষের সারি দেখতে পেয়েছেন। এ ছাড়া, মহিশুরের এ অঞ্চলে এককালে কদম্ব বংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন। এই রাজারা পরবর্তী পল্লব রাজাদের মত উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণে গিয়ে রাজত্ব কবতে থাকেন এবং দক্ষিণভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে থাকেন। কদম্বরা তামিল ঐতিহ্য অনুসারে কদম্ব গাছের প্রতি তাঁদের ভক্তি প্রচার করেন।

এরপর কাণ্ডার দেশের কাছে শোভে নীলগিরি। অপরাহ্নে সেইখানে যাই ধীরি ধীরি ॥
কিবা শোভা পায় আহা নীল গিরিরাজে। ধ্যানে মগ্ন যেন মহাপুরুষ বিরাজে ॥
কত শত গুহা তার নিম্নে শোভা পায়। আশ্চর্য্য তাহার ভাব শোভিছে চূড়ায় ॥
বড় বড় বৃক্ষ তার শিরে আরোহিয়া। চামর ব্যজন করে বাতাসে দুলিয়া ॥
ঝড় ঝড় শব্দে পড়ে ঝরণার জল। তাহা দেখি বাড়িল মনের কুতূহল ॥
·· রজনীতে কত লতা ধগধগি জ্বলে। গাছে গাছে জোনাকী জ্বলিছে দলে দলে ॥
ক্ষুদ্র এক নদী বহে ঝুরু ঝুরু স্বরে। তার ধারে বসি প্রভু সন্ধ্যাপূজা করে ॥
রজনীতে বসি গিয়া এক বৃক্ষতলে। আজি রাত্রি যাপ ইহ প্রভু মোরে বলে ॥

কর্ণাটক বা কাণ্ডার দেশের কাছে এই নীলগিরির অবস্থান। আসলে এটি সহ্য-গিরির একাংশ। এখানে 'নীল' শব্দটির গিরির বিশেষণ। গোবিন্দ অন্যত্রও সহ্যগিরির বর্ণনায় 'নীল' বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন।—

তপনীয় সালচয়ভাজি বহু সরসি যোজমায়তে। ·
ধবলিত পত্র নবচন্দ্ররুচি·· ভর্টবিধূত চামরম্'। [সালুভাভ্যুদয়ম্, ৬ষ্ঠ সর্গ]

'ধবলিত পত্র নবচন্দ্ররুচি' আর 'রজনীতে কত লতা ধগধগি জ্বলে'—এর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। করচায় 'চামর ব্যজন করে বাতাসে দুলিয়া'—এখানে "ভর্টবিধূত চামরম্'। এখান থেকে—'প্রাতে উঠি যাই মোরা গুর্জরী নগরে।
বহুতর লোক এথা সুখে বাস করে ॥

এইখানে বহু অট্টালিকা শোভা পায়। নগরের ধারে গিয়া বৈসে গোরারায় ॥
এখানে অগস্ত্যকুণ্ড নামে কুণ্ড হয়। কুণ্ডে স্নান করি হৈলা আনন্দ উদয় ॥
এরপর—গুর্জরীনগর ছাড়ি মোর গোরারায়। পূর্ণনগর প্রভু যাইবারে চায় ॥
সাতদিন ইষ্টগোষ্ঠী কভু না করিলা। একেবারে বিজাপুরে পর্ব্বত উঠিলা' ॥
এবং 'এইখানে পর্ব্বতের শিখরে উঠিয়া। আনন্দ পাইলা হরগৌরী নিরখিয়া' ॥

আগেই বলেছি, এই 'বিজাপুরে পর্বত' বিজাপুর সাম্রাজ্যের অন্তর্গত (এবং সাময়িকভাবে বিজয়নগরাধিপতি কৃষ্ণদেব রায় অধিকৃত অঞ্চলে অবস্থিত) একটি পর্বত, করচায় একে সহ্যকুলাচল সংলগ্ন বলা হয়েছে এবং উত্তর কর্ণাটকের 'বাদামী'র সঙ্গে এই জায়গাটির বর্ণনা মিলে যায়। বাদামীতে এক নম্বর গুহায় নৃত্যরত শিবের মূর্তি অর্ধনারীশ্বর শিবমূর্তি দু নম্বরগুহায় বিষ্ণুর বরাহ মূর্তি তিন নম্বর গুহায়

শিবদুর্গামূর্তি সর্পকুণ্ডলীর উপর উপবিষ্ট বিষ্ণুমূর্তি ও ত্রিবিক্রম বিষ্ণুমূর্তি চালুক্য শিল্পকৃতির চমৎকার নিদর্শন। এখান থেকে—

'চলিলা উত্তরে সহ্যাগিরি ত্যাগ করি। অপার আনন্দ মুখে বলে হরি হরি॥
ক্রমে গোরাচাঁদ পূর্ণনগরে আইলা। বহুত পণ্ডিত তথা আসি ঝাঁকি দিলা॥
অচ্ছসর নামে এক জলাশয় আছে। বসিলা নিমাই মোব গিয়া তার কাছে॥
বিস্তৃত বকুল বৃক্ষ শোভে তদুপরি। মোর প্রভু বৈসে তার তলে আড্ডা করি॥
একই পণ্ডিত ভাগবত ব্যাখ্যা করে। তাহা শুনি প্রভুর নয়নে অশ্রু ঝরে॥

ব্রহ্মপুরাণে দক্ষিণাপথের প্রসিদ্ধ জনপদরূপে পূর্ণ কেরল ইত্যাদির উল্লেখ আছে—
'তথাপরে জনপদা দক্ষিণাপথবাসিনঃ। পূর্ণাশ্চ কেরলাশ্চৈব গোলাঙ্গুলাস্তথৈব চ॥

[পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত ব্রহ্মপুরাণ, পৃ. ১৩০]

করচায় পূর্ণনগরী ছাড়িয়ে যে জায়গাগুলির উল্লেখ আছে, সেগুলি পুনার নিকটবর্তী।

প্রভু বলে কোন তীর্থে যাব অতঃপর। পথ বাতালিয়া দেহ কোথা ভোলেশ্বর॥
পাটস গ্রামের কাছে আছে গোরঘাট। সেইখানে ভোলেশ্বর নামে মহাপাট॥
ভোলেশ্বরে মহাদেব করেন বিরাজ। এই উপদেশ দিলা তুম্নু মহারাজ॥

ভারত প্রদক্ষিণ গ্রন্থের লেখক বোম্বাই ভ্রমণ কালে 'ভুলেশ্বর' মহাদেব দর্শন করেছেন। "ভুলেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে বহুজন সমাগম হইয়া থাকে। শিবলিঙ্গের উপর অর্দ্ধমণ ঘৃতের জমাট শিরোভূষণ দেখিলাম। বোধহয় কাহারও মানত ছিল।"

[শ্রীদুর্গাচরণ ভূতি, ভারত প্রদক্ষিণ: পৃ. ২০২]

'ভোলেশ্বর দরশন করি গোরা রায়। নিকটে দেবলেশ্বর দেখিবারে ধায়॥
বিরাজে দেবলেশ্বর পর্বত উপরি। তার বহুদূরে শোভে জিজুরী নগরী॥
খাণ্ডবা নামেতে দেব আছে জিজুরীতে। প্রভুর সহিতে যাই খাণ্ডবা দেখিতে॥'

খাণ্ডবা দেখে মহাপ্রভু চোরানন্দীবন হয়ে খণ্ডলার দিকে চললেন।

তার পরে চোরানন্দীকানন হইতে। যাত্রা করি চলে প্রভু খণ্ডলা দেখিতে॥

শিশিরকুমার লিখেছেন, "সেই চোরানন্দী, এখন উহা 'কিরকি' উপনগর, সেখানে বম্বের লাটসাহেব বাস করেন।" খণ্ডলাতেই আছে মুলানদী।

মুলানদী বহে এথা অতি বেগবতী। খণ্ডলায় গিয়া প্রভু কহে মোর প্রতি॥
প্রভু বলে এই নদী পুণ্য তীর্থ হয়। এখানে করিলে স্নান পাপ হবে ক্ষয়'॥

'রুদ্র যামলে'ও আছে—মহীস্থতীর্থে বিমলে জলে মুদা মুলাম্বুজে স্নাতি সম্মুক্তিভাগ্ ভবেৎ [শব্দকল্পদ্রুম—পৃ. ১০৫৯]।

খণ্ডলার পর—

প্রভাতে উঠিয়া প্রভু নাসিক নগরে। চলিলা করিতে তীর্থ বিশুদ্ধ অন্তরে॥
এইখানেই গোদাবরী নদীর উৎস। নাসিকের উত্তরে 'ত্রিমুক' বা ত্র্যম্বক।—
ইহার উত্তরভাগে ত্রিমুকের কাছে। রামের কুটীর ক্ষেত্র বিদ্যমান আছে॥
সেইখানে মহাপ্রভু করিয়া গমন। স্তব স্তুতি করি শেষে করিলা কীর্ত্তন॥

গোবিন্দ 'ত্রিমুক' দেখে পঞ্চবটীতে এসেছেন।—

'তারপর পঞ্চবটী করিয়া প্রবেশ। লক্ষ্মণের প্রতিষ্ঠিত দেখিলা গণেশ॥

তারপর—'পঞ্চবটী তেয়াগিয়া মোর গৌরহরি। প্রভাতে চলিয়া যায় দমন নগরী॥

একদিন দমন নগরে না রহিল। দমন ছাড়িয়া প্রভু উত্তরে চলিল ॥
তারপর পক্ষকালে ভ্রমিয়া। পথে পথে কাটাইলা গোরা বিনোদিয়া ॥
ক্রমে ক্রমে সুরথের রাজ্যে চলি যায়। অষ্টভুজা দেখি প্রভু ধরণী লুটায় ॥
অষ্টভুজা ভগবতী দেখিয়া নয়নে। তিনদিন বাস করে প্রভু সেই থানে ॥
অষ্টভুজা প্রতিষ্ঠিত সুরথ রাজার। ভগবতী দেখি হৈল আনন্দ অপার ॥

এই দমন নগরী দক্ষিণ গুজরাটের অন্তর্গত। তখনও এখানে পর্তুগীজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

গুজরাটের মাহমুদ শাহ্ বেগারা (১৪৫৯-১৫১১ খ্রীঃ) এবং মিশরের সুলতানের সম্মিলিত নৌ-বাহিনী দিউ, দমন পেরিয়ে বম্বের দক্ষিণে 'চৌল' (*Choul*) বন্দরে পর্তুগীজ নৌ-বাহিনীকে আক্রমণ ও পরাস্ত করে। বেগারার পর গুজরাটের রাজা হন দ্বিতীয় মোজাফ্ফার শাহ্ (১৫১১-১৫২৬ খ্রীঃ)। চৈতন্যদেব 'আশ্বিনের শেষ দিনে' অর্থাৎ ১৫১১ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবরের মাঝামাঝি বরোদা নগরী ছেড়ে রায় রামানন্দের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন—'আশ্বিনের শেষ দিনে বরদা নগরে। ফিরে আসি প্রভু মোর হরিনাম করে ॥'
করচায় দ্বারকায় ১৫ দিন ইষ্টগোষ্ঠি ছাড়া অন্যান্য স্থানেরও কতকগুলি দিনের হিসাব আছে।—

তিন সন্ধ্যা স্নান করি তাপতীর জলে। বামন দেবের মূর্তি দেখিবারে চলে ॥ ··
জাফেরাবাদের দিকে প্রভু চলি যায়। বহু কষ্টে তিন দিনে পেঁাছায় তথায়।
প্রভাতে উঠিয়া মোরা সোমনাথে যাই। ছয়দিন পরে গিয়া সেখানে পেঁাছাই।
জুনাগড়ে দুইদিন কাটে গোরা রায়।
এইরূপে সাতদিনে ধম্বিধর ঝারি। পার হয়ে যাই সবে আনন্দ বিথারি। ··
প্রভাসের দক্ষিণভাগেতে মোরা যাই। এইখানে ইষ্টগোষ্ঠী তিনদিন করি। ··
এইরূপে পক্ষকাল ইষ্টগোষ্ঠী করি। পরদিন ছাড়ে প্রভু দ্বারকা নগরী।···

এখানে ৪০ দিনেরও বেশী গুজরাটে তীর্থ ভ্রমণের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং মহাপ্রভু সেপ্টেম্বরের গোড়াতেই দমনে এসেছিলেন। এবং মোটামুটি দেড়মাস কাল (১৫১১-র সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরের মাঝামাঝি) লেগেছে গুজরাটের তীর্থ পরিক্রমায়।

সুরাটে—'স্তুতিনতি ভবানীরে করি গোরা রায়। মহাতীর্থ তাপতী নদীর দিকে ধায়'। *Gujarat State Gazetteer* (Surat District) গ্রন্থে 'তাপ্তী'কেই 'তাপী' বলা হয় এবং এই গ্রন্থের *The People and their Culture* শীর্ষক অধ্যায়ে জানানো হয়েছে যে এখানকার লোকেরা পঞ্চায়তন উপাসক, শক্তি এখানে ভবানী বা মাতা। [*pg. 948-9, pg. 239*]

সতীশচন্দ্র লিখেছেন—"সুরথ রাজা যিনি দুর্গাপূজা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন তাঁহার সহিত সুরাটের সম্বন্ধ আছে ইহা প্রবাদ" [গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লীঃ পৃ. ৪৪৪]। মহাপ্রভুর গুজরাট ভ্রমণের পরের বছর সুরাট পর্তুগীজদের হাতে লুণ্ঠিত হয়।
করচায় সুরাটে ভবানীকে নতি স্তুতির পর—

ভঁরোচ নগরে যজ্ঞ কুণ্ড দেখিবারে। তাপতী ছাড়িয়া যায় নর্ম্মদার ধারে ॥

ভ'রোচেতে যজ্ঞকুণ্ড বলিরাজা করে। কুণ্ড দেখিবারে যায় প্রফুল্ল অন্তরে ॥
প্রকাণ্ড কুণ্ডের খাত দেখিয়া নয়নে। অপার আনন্দ হইল চৈতন্যের মনে ॥

সতীশচন্দ্র লিখেছেন—"ব্রোচ সুরাটের উত্তরপূবে; ভৃগুক্ষেত্র—ভরুকচ্ছ—*Greek-Bary gaza*; বরোচ, ব্রোচ। মেহতা মহাশয় (*Mr. J. B. Mehta*) ব্রোচ হইতে লিখিয়াছেন যে বামনদেবের মন্দির এক্ষণেও ব্রোচে আছে, এবং নর্মদার উপরে যে বলীরাজার যজ্ঞকুণ্ড ছিল, তাহা নর্ম্মদার জলপ্লাবনে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখানে ভৃগুঋষির একটি প্রাচীন মন্দির আছে এবং চৈতন্যদেবের সমসাময়িক বল্লভাচার্য্যের একটি বৈঠক (মঠ) আছে।" [গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লীঃ পৃ. ৪৪৬ পাদটীকা]

সুরাট থেকে ভ'রোচ নগরে গিয়ে মহাপ্রভু ও গোবিন্দ বলিরাজার যজ্ঞকুণ্ড দেখলেন; তারপর—

মহাতীর্থ নর্ম্মদায় সিনান করিয়া। বরোদা নগরে যায় গোরা বিনোদিয়া ॥
বরোদার পূর্বভাগে ডাঁকোরজী ঠাকুর। ডাঁকোরজী দেখিতে ইচ্ছা হইল প্রভুর ॥
ডাঁকোরজীর আঙ্গিনায় প্রকাণ্ড তমাল। তার নিম্নে দাণ্ডাইলা শচীর দুলাল ॥

এরপর বরোদার রাজার প্রসঙ্গ।

ডাঁকোরজী দেখিয়া প্রভু নতিস্তুতি করি। ফিরিয়া আইলা পুনঃ বরোদানগরী ॥

বরোদা ছাড়িয়ে মহাপ্রভু ও গোবিন্দ এলেন মহনদীর পারে।—

পশ্চিমেতে প্রভাতে উঠিয়া চলে যাই। কিছুদূর গিয়া মোরা মহানদী পাই ॥
নদীপার হয়ে মোর গোরা বিনোদিয়া। আমেদাবাদের কাছে পোঁহুছিলা গিয়া ॥
আশ্চর্য্য আমেদাবাদ জাঁকের শহর। কতই উদ্যান কত গৃহ মনোহর ॥
বড় বড় অট্টালিকা মধ্যে শোভা পায়। নিরত দেশের লোক অতিথি সেবায় ॥
প্রভু বলে না যাইব গৃহীর আগারে। আজি রাত্রি কাটাইব নন্দনীর ধারে ॥
নন্দনী বাগান এক বাগিচা সুন্দর। তার ধারে আড্ডা করে প্রভু বিশ্বম্ভর ॥
আমেদাবাদের মধ্যে বহু লোক জুটি। প্রভুরে দেখিতে সব আসে গুটিগুটি ॥
এত বলি পরদিন গোরা বিনোদিয়া। চলিলা পশ্চিম ভাগে নগর ছাড়িয়া ॥
কিছুদূরে গিয়া দেখি নদী শুভ্রমতী।
সিনান করিয়া প্রভু ধীরে ধীরে যায়। ঘোগা নামে গণ্ডগ্রামে আসিয়া পেঁছায় ॥

আহমদ শাহের রাজত্বকালে (খ্রীঃ ১৪১২—১৪৪৩) সোমনাথ মন্দির শেষবারের মত বিধ্বস্ত হয় এবং বৃটিশ শাসন কালে ইন্দোরের অহল্যাবাই নতুন জায়গায় বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করেন। ১৫১১ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে তাই মহাপ্রভু সোমনাথ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ মাত্র দেখতে পান। সোমনাথের পর জুনাগড়।

সোমনাথ ছাড়ি মোরা জুনাগড়ে যাই। বড় গ্রাম বটে কিন্তু কোন তীর্থ নাই ॥
চারিদিকে বহু অট্টালিকা শোভাপায়। জুনাগড়ে দুই দিন কাটে গোরা রায় ॥
রণছোড়জীর সেবা আছে এক ঠাই। সন্ধ্যাকালে দর্শন করিতে তথা যাই ॥
মিরাজী নামেতে বিপ্রবর সেবা করে। মোরা গিয়া উপস্থিত হই তার ঘরে ॥
ভক্তিসহ মিরা জিউ আদর করিল। তাহার বাড়িতে প্রভু রজনী যাপিল ॥
দুগ্ধ চিনি আটা আনি ব্রাহ্মণ যোগায়। আনন্দ করিয়া প্রভু রজনী কাটায় ॥

মাহ্মুদ শাহ বেগারার রাজত্বকালে (১৪৫৯-১৫১১ খ্রীঃ) গির্ণার বা জুনাগড়ের

রাজপুত রাজা মুসলমান ধর্মগ্রহণে বাধ্য হন। ধর্মান্তরিত এই রাজার রাজ্যে এসেছিলেন মহাপ্রভু এবং এখানেই রণছোড়জীর সেবা দেখতে পান মিরাজী বিপ্রের গৃহে। সেখান থেকে—

নিকটে গুণার গিরি অতি মনোহর। তাহার নিকটে যায় প্রভু বিশ্বম্ভর।

গুণারের উচ্চতম শৃঙ্গ—'গুরু দত্তাত্রেয়' এখানেই উঠেছিলেন মহাপ্রভু ও গোবিন্দ। এখানে পাণ্ডারা বলে ওই চরণচিহ্ন শ্রীকৃষ্ণের। তখন—

পদচিহ্নে রাখি শির গোরা বিনোদিয়া। তদুপরি বারবার পড়ে লোটাইয়া ॥
পদপ্রক্ষিণ করে করতালি দিয়া। কটিবন্ধ জটাবন্ধ পড়িল খসিয়া ॥

এরপর—

পর্বত হইতে নামি মোরা গোরা রায়। ভদ্র নামে নদী তীরে রজনী কাটায় ॥
প্রভাতে উঠিয়া সবে নদী পারে যাই। ধন্বিধর ঝারি ক্রমে দেখিবারে পাই ॥
পরদিন যাই চলে প্রভাতে উঠিয়া। একদল যাত্রী পথে আসিছে ফিরিয়া ॥
পথমধ্যে দেখা যবে হৈল দুই দলে। আনন্দেতে হরিধ্বনি করিল সকলে ॥
এইরূপে সাতদিনে ধন্বিধর ঝারি। পার হয়ে যাই সবে আনন্দ বিথারি ॥

সতীশচন্দ্রের গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে এখন ধন্বিধর ঝাড়ি নামে কোন অরণ্য সেখানে নেই, এখন তার নাম মাণ্ডোয়া পার্বত্য প্রদেশ। গীর ও গির্নার সমেত অরণ্য এলাকা বর্তমান কালেও গুজরাটের দ্বিতীয় বৃহৎ অরণ্য।

এই বনের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে—

"গুটি কত ফল লই প্রভুর কারণ। অপরাহ্নে প্রভু ফল করে নিবেদন ॥
দুই চারি ফল তবে আস্বাদ করিয়া। মোদের খাইতে বলে গোরা বিনোদিয়া ॥
উদর পুরিয়া ফল যত পারি খাই। খড়িয়ার মধ্যে লই আর যত পাই ॥
জঙ্গলের পাশে স্থান ঘেরা খুঁটি দিয়া। সেইস্থানে প্রবেশিলা গোরা বিনোদিয়া ॥
কাষ্ঠ আনি সন্ন্যাসীরা আগুন জ্বালিল। করতালি দিয়া প্রভু গান আরম্ভিল ॥
মাঝে মাঝে রাজা স্থান দিয়াছে করিয়া। সেইস্থানে প্রভু সঙ্গে উতরাই গিয়া ॥
বন্য কাষ্ঠে ঘেরা স্থান ঘর দ্বার নাই। সন্ন্যাসীরা এইখানে বসিলা সবাই ॥
করতালি দিয়া প্রভু নাম আরম্ভিল। নাম শুনি সন্ন্যাসীরা মাতিয়া উঠিল ॥
কাষ্ঠ আহরিয়া দিলা অগ্নিকুণ্ড জ্বালি।
পরদিন প্রাতঃকালে হরিধ্বনি করি। বাহির হইলা গোরা স্মরিয়া শ্রীহরি ॥
যত পথ যাই তত জঙ্গল গভীর। দেখিলে সে ঝারিখণ্ড কাঁপয়ে শরীর ॥
নানাবিধ ফল আনি সংগ্রহ করিয়া। পূজা করি ভোগ দেয় গোরা বিনোদিয়া ॥
মধ্যাহ্নে সারিয়া কাজ মোরা চলে যাই। অপরাহ্নে গিয়া সবে আর আড্ডা পাই॥

'ধন্বিধর ঝারি' অতিক্রম করতে লাগল সাতদিন।

নিকটে অমরাপুরী গোপীতলা নাম। সেইখানে যাই সবে আনন্দের ধাম ॥
ইহাকে প্রভাসতীর্থ বলে সর্বজনে। প্রভাস দেখিয়া বড় প্রীতি পাই মনে ॥
যদুগণ যেখানে ত্যজিল কলেবর। সেইখানে প্রভু গিয়া কান্দিলা বিস্তর ॥
মধুপানে মত্ত হয়ে যত যদুবীর। পরস্পর যুদ্ধ করি ত্যজিল শরীর ॥
কেবা নিজ কেবা পর না করি গণন। কৃষ্ণের ইচ্ছায় মরে যদুবীরগণ ॥

চারুদেষ্ণ সুরোষ্ণ সাত্যকি যুযুধান। শাম্ব গদ প্রভৃতি যতেক মতিমান॥
পরস্পর যুদ্ধ করি মরে সেইখানে। বিরস বদনে প্রভু কান্দে সেই স্থানে॥
প্রভাসের দক্ষিণ ভাগেতে মোরা যাই। সেইখানে গিয়া কুণ্ড দেখিবারে পাই॥…
এইখানে ইষ্টগোষ্ঠি তিনদিন করি। যাইতে কহিলা পরে দ্বারকা নগরী॥…
সাগরের খাড়ি পাই চারিদিন পরে। পার হৈতে হইবেক দড়ার উপরে"॥

দ্বারকা থেকে ফেরার পথে—

'খাড়ীর নিকটে চলে মোর গোরারায়। আশ্বিনের শেষ দিনে বরদানগরে।
ফিরে আসি প্রভু মোর হরিনাম করে।
'ষোলদিন পরে আসি নর্ম্মদার তীরে। স্নান করি সবে মোরা নর্ম্মদার নীরে॥
পরদিন নর্ম্মদার ধারে ধারে যাই। দোহদ নগরে গিয়া সকলে পৌঁছাই॥…
প্রভাতে উঠিয়া কুক্ষী নগরেতে যাই। অনেক বৈষ্ণব এথা দেখিবারে পাই॥…
দুইদিন পরে যাই জঙ্গল ছাড়িয়া। আমঝোরা নগরেতে পৌঁহুছাই গিয়া॥
লক্ষণের কুণ্ড এক আছে এইখানে। প্রভাতে শুনিয়া মোরা যাই তথা স্নানে॥…
পরদিন যাই বিন্ধ্যগিরির উপর। সেইখানে শোভা পায় মন্দুরা নগর॥
তপস্বীর সঙ্গে প্রভু ইষ্টগোষ্ঠী করি। পর্ব্বতের নিম্নে আসে মণ্ডল নগরী॥…
বামে শোভে বিন্ধ্যগিরি নর্ম্মদা ডাহিনে। তথা হৈতে দেবঘর যাই তিন দিনে॥
ত্রিশ ক্রোশ দূরে হয় শিবানী নগর। দুইদিনে সেইখানে যায় বিশ্বম্ভর॥
মহল পর্ব্বত শিবানীর পূর্ব্বভাগে। সেইখানে যায় প্রভু কৃষ্ণ অনুরাগে॥

সতীশচন্দ্র লিখেছেন—"মাণ্ডোগড় ও মণ্ডলেশ্বর হইতে দেওগড় (গোবিন্দের 'দেবঘর') প্রায় ২৪০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এতদূর পথ চৈতন্যদেবের তিনদিনে অতিক্রম করা সম্ভব হইতে পারেনা, কিন্তু তিনি মণ্ডলেশ্বর হইতে বিন্ধ্যগিরি 'বামে' এবং নর্ম্মদা নদীকে 'ডাহিনে' রাখিয়া--'বামে শোভে বিন্ধ্যগিরি নর্ম্মদা ডাহিনে'— সম্ভবতঃ হোসেঙ্গাবাদের নিকট আসিয়া নর্ম্মদা পার হইয়া, নর্ম্মদা হইতে তিনদিনে দেবঘর [দেওগাড়ে] আসিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, কারণ হোসেঙ্গাবাদ হইতে দেওগড় দক্ষিণপূর্ব্বে প্রায় ৮০ মাইল। দেওগড় হইতে শিবানী [শিওনী] প্রায় ত্রিশ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত।" [গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লী ঃ পৃ. ৪৬২-৪৬৩]

এই পথেই শ্রীচৈতন্য রায়পুর পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে দক্ষিণে গোদাবরী তীরে গিয়ে রামানন্দের সঙ্গে দেখা করেন; আবার উত্তরে গিয়ে স্বর্ণগড় সম্বলপুর পেরিয়ে রসালকুণ্ডে আসেন।

রসালকুণ্ডের পরই মহাপ্রভু ঋষিকুল্যা নদীর তীর থেকে আলালনাথে চলে আসেন এবং সেখান থেকে পুরীতে ফিরে তাঁর যাত্রা শেষ হয়।

স্পষ্টতঃ, শাস্ত্রবিহিত পুণ্য সঞ্চয় উদ্দেশ্য হলে, এই ভারত পর্যটনকালে শ্রীচৈতন্য পুণ্যলোভী সাধারণ তীর্থযাত্রীর মতই আচরণ করতেন। তা তিনি করেন নি। আগ্রাসী মুসলমান রাজশক্তির আক্রমণে হিন্দুধর্ম যখন বিপর্যস্ত প্রায়, যখন পূর্বভারতে হুসেন শাহী ফৌজের আক্রমণে, দক্ষিণ ভারতে বাহমনী বিজাপুর সুলতানদের অভিযানে এবং উত্তর ভারতে সেকেন্দর লোদীর দৌরাত্ম্যে হিন্দুধর্ম ও শিল্প সংস্কৃতির উপর মারাত্মক আঘাত আসছে, সেই অশান্ত সময়ে সমুদ্রের উপকূল ভাগ ধ'রে একের

পর এক হিন্দু রাজত্বের উপর দিয়ে চলেছেন তিনি—পুরী থেকে দ্বারকা পর্যন্ত—রাজা প্রজা আবাল বৃদ্ধ নরনারী সকলকে নতুন আশায় উদ্দীপ্ত করেছেন, জাতীয় অনৈক্যের মূলে যে জাতিভেদ, তা দূরে ঠেলে নব মানবতার উদার ব্যাপ্ত ক্ষেত্রে আহ্বান করেছেন অস্পৃশ্য অচ্ছুৎদের—যার অভিঘাতে দক্ষিণ ভারতে জৈনধর্মের ভিৎ পর্যন্ত টলে গেল—এ সবের পিছনে খণ্ড বিচ্ছিন্ন হিন্দুরাজ্যগুলিকে সংহত ও মৈত্রীভাবাপন্ন করার কোন সচেতন ইচ্ছা তাঁর মধ্যে ছিল কিনা আমরা জানি না, কিন্তু এই ভ্রমণের মধ্য দিয়ে এই সব অঞ্চলের ব্যক্তি ও সমষ্টি মনে তিনি যে শুভবোধ ও শক্তি সঞ্চার করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শ্রীচৈতন্যজীবনের অন্ত্যপর্ব

'শেষের বারো বছর তাঁর বাহ্যিক চেতনাই ছিল না'—শ্রীচৈতন্যের শেষ জীবন সম্পর্কে এ ধারণা সাধারণ স্তরে ত বটেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা ঐতিহাসিকের গ্রন্থেও লক্ষ্য করা যায়। এ জাতীয় ধারণার মূলে রয়েছে কৃষ্ণদাস কবিরাজের দু'য়েকটি অসতর্ক উক্তি—

তার শেষ যেই রহে দ্বাদশ বৎসর। কৃষ্ণের বিরহলীলা প্রভুর অন্তর॥
নিরন্তর রাত্রি-দিন বিরহ উন্মাদে। হাসে কান্দে নাচে গায় পরম বিষাদে॥
[চৈ. চঃ মধ্য ১।৫১-১]

কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতের সতর্ক পাঠকের কাছে এটি নিতান্ত অতিশয়োক্তি ব'লে মনে হবে। কেননা, কৃষ্ণদাস তাঁর গ্রন্থের অন্ত্যলীলায় স্পষ্ট ক'রেই বলেছেন—

কভু ভাবে মগ্ন, কভু অর্দ্ধ বাহ্যস্ফূর্তি।
কভু বাহ্যস্ফূর্তি—তিন রীতে প্রভু স্থিতি। [অন্ত্য ১৫।৫]

বস্তুতঃ অন্ত্যলীলার ২০টি পরিচ্ছেদের মাত্র শেষ সাতটি পরিচ্ছেদে কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্যের ভাবোন্মাদের বিবরণ দিয়েছেন এবং তারও মধ্যে আবার—'বাহ্যস্ফূর্তি'র কথা আছে।

অবশ্য, চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলায় পাঠকের সমস্ত প্রত্যাশা পূরণ হয় না। যে-মানুষটি অত্যন্ত সমাজ সচেতন, ভক্তির পবিত্র ভূমিতে যিনি বর্ণভেদ জাতিভেদ ভুলিয়ে সর্বশ্রেণীর মানুষকে মিলিয়ে দিয়েছেন, শাস্ত্রাচারের ঊর্ধে স্থান দিয়েছেন মানবিকতাকে, তাঁর দীর্ঘ উড়িষ্যা বাস কালে উড়িয়া সমাজ ও সাহিত্যে তাঁর ব্যক্তি-চরিত্র ও প্রচারিত ধর্মমতের কি প্রভাব পড়েছিল, সে সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল অপূর্ণ থেকে যায়। এরকম একটি দিব্য মানুষকে শুধুমাত্র ভাবোন্মাদের কবলিত ক'রে ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসার পথই কেবল রোধ করা হয়। চৈতন্যচরিতামৃতের লেখক অন্ত্যলীলার বাস্তব তথ্যাল্পতা ঢাকতে চেয়েছেন ভাবোন্মাদের দোহাই দিয়ে। তথ্যাল্পতার কারণেই অন্ত্যলীলায় চৈতন্যের চেয়ে বেশি জায়গা নিয়েছেন চৈতন্যপার্ষদেরা, এমন কি চৈতন্য আবির্ভাবের পূর্বেকার ঘটনাও [তৃতীয় পরিচ্ছেদে হরিদাস ও অদ্বৈত

প্রসঙ্গ] স্থান পেয়েছে। অন্ত্যলীলার দশটি পরিচ্ছেদ জুড়ে রয়েছে অদ্বৈত-হরিদাস-নিত্যানন্দ-শিবানন্দ-রামানন্দ-রূপ-সনাতন-রঘুনাথদাস-বল্লভভট্ট-রামচন্দ্রপুরী-গোপীনাথ পট্টনায়ক ইত্যাদি পার্ষদদের প্রাধান্য।

চরিতামৃতের অন্ত্যলীলার কোন কোন উক্তি ও ঘটনা ঐতিহাসিক বিচারে গ্রহণ করা চলে না। ড. বিমানবিহারী মজুমদার দেখিয়েছেন,—(১) কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে 'বিদগ্ধমাধব' নিয়ে রূপগোস্বামী ও রামানন্দের মধ্যে আলোচনা হয় মোটামুটি ১৪৩৮ শকে। অথচ 'বিদগ্ধমাধব' ১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দ বা ১৪৫৫ শকে চৈতন্য তিরোভাবের পর রচিত। "তাহা হইলে ১৪৩৮ শকে রামানন্দের সহিত ইহার আলোচনা কিরূপে হইতে পারে?" [চৈ. চ. উঃ পৃ. ৩৮৬] (২) 'ললিত মাধব' নাটক ১৫৩৭ খ্রীস্টাব্দে লিখিত হয়। কৃষ্ণদাস লিখেছেন—

শ্রীচৈতন্য শ্রীরূপকে আদেশ করলেন : কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে।
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যায় কাঁহাতে॥ [অন্ত্য ১।৬১]

অথচ ললিতমাধবে প্রথম তিন অঙ্ক বাদ দিয়ে পরবর্তী সাতটি অঙ্কের ঘটনা ব্রজের বাইরে ঘটেছে। সুতরাং কৃষ্ণদাস কথিত "এই উক্তির সহিত ললিতমাধব বর্ণিত ঘটনার সামঞ্জস্য করা বড়ই কঠিন"। [চৈ.চ.উঃ পৃ. ৩৮৭]

(৩) শ্রীচৈতন্যের সমুদ্রপতন লীলা [অন্ত্য ১৮] অন্য কোন গ্রন্থে নেই। এ ছাড়া ভাবাবেশে শ্রীচৈতন্যের এক একখানি হাত দেড়গজ লম্বা হয়ে যাওয়া [অন্ত্য ১৮], তিন দুয়ারে কপাট লাগানো থাকা সত্ত্বেও শ্রীচৈতন্যের বাইরে বেরিয়ে যাওয়া [অন্ত্য ১৭]—এই ঘটনাগুলি কৃষ্ণদাসের স্বকপোলকল্পিত।

(৪) চরিতামৃতের বর্ণনায় মনে হয় শিক্ষাষ্টকের আটটি শ্লোকই শ্রীচৈতন্য কোন এক সময়ে বসে স্বরূপ ও রামানন্দকে বলেছেন [অন্ত্য ২০]। কিন্তু "শিক্ষাষ্টকের সব কয়টি শ্লোক এক ভাবের নয় ; সুতরাং এক সময়ে সব কয়টি রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না"। [চৈ. চ. উঃ পৃ. ৩৯৩]

(৫) শ্রীচৈতন্যের ভাবোন্মাদ বর্ণনা করিতে যাইয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিজের লেখা (১৫৬০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি) গোবিন্দলীলামৃতের বহু শ্লোক শ্রীচৈতন্যের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন'। [চৈ. চ. উঃ পৃ. ৩৯২]

কৃষ্ণদাস বাস্তব তথ্যাল্পতার ফাঁক এইভাবে অতিশয়োক্তি, অলৌকিকতা, স্বাধীন কল্পনা ও কালানৌচিত্যের আশ্রয় নিয়ে ভরাট করতে চেয়েছেন।

অবশ্য এরই পাশাপাশি, কৃষ্ণদাস অন্ত্যলীলায় এমন সব ঘটনার সমাবেশ করেছেন, যাতে শ্রীচৈতন্যের বাহ্যজ্ঞান রহিত অবস্থা নয়, বরং তাঁর বাস্তব পরিবেশ সচেতনতার বহুমুখী পরিচয় আছে ; এসব ক্ষেত্রে কখনো তিনি শচীদুলাল রূপে মাকে জগন্নাথের প্রসাদী বস্ত্র ও মিষ্টান্ন পাঠাচ্ছেন, কখনো লোকশিক্ষা দিচ্ছেন চন্দনতেল, শিমুলতুলোর বালিশ প্রত্যাখ্যান ক'রে, কখনো শিশুর প্রতি বাৎসল্য প্রকাশ করছেন, কখনো ভক্তদের নিয়ে জলক্রীড়ায় মেতে উঠছেন, কখনো গুণ্ডিচা মার্জন করছেন বা শ্রীমন্দিরে কীর্তন করছেন, কখনো ভক্তগৃহে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করছেন, কখনও দার্শনিক আলোচনা করছেন, কখনও কাব্যনাটক আস্বাদ করছেন।

চৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যলীলার তিনটি প্রসঙ্গ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রায়

শেষ পর্যন্তই যে তাঁর বাহ্যিক চেতনা পুরো দস্তুর ছিল, এই তিনটি ঘটনা-প্রসঙ্গই তার প্রমাণ। এক, ছোট হরিদাস বর্জন প্রসঙ্গ [অন্ত্য ২]। প্রকৃতি সম্ভাষণের [?] অপরাধে শ্রীচৈতন্য ছোট হরিদাসকে বর্জন করেন এবং হরিদাসের প্রতি তাঁর বিমুখতা এক বছর পরেও দূর হয় নি—এই মতে হরিদাসের এক বৎসর গেল। তবু মহাপ্রভুর মনে প্রসাদ নহিল ॥ [অন্ত্য ২।১৪৫]। এ কি তাঁর বাহ্যচেতনার অভাবের নিদর্শন ?

দুই, গোপীনাথ পট্টনায়ক প্রসঙ্গ [অন্ত্য ৯]। রায় রামানন্দের ভাই গোপীনাথ পট্টনায়ক মালজ্যাঠা দণ্ডপাটের তহশীলদার, তিনি রাজপ্রাপ্য দুইলক্ষ কাহন কৌড়ি আত্মসাৎ করার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলে এবং তাঁর পরিবারের বাণীনাথ প্রমুখ সকলকে বন্দী করা হলে,—

তবে স্বরূপাদি গোসাঞির ভক্তগণ। প্রভুর চরণে সবে কৈলা নিবেদন ॥
"রামানন্দ রায়ের গোষ্ঠীসব তোমার 'দাস'। তোমার উচিত নহে করিতে উদাস" ॥
শুনি মহাপ্রভু কহে সক্রোধ বচনে। "মোরে আজ্ঞা দেহ সবে, যাঙ রাজস্থানে।
তোমা সবার এই মত,—রাজঠাঞি যাঞা। কৌড়ি মাগি' লই আঁচল পাতিয়া" ॥
হেনকালে আর লোক আইল ধাঞা। খড়্গের উপরে গোপীনাথে দিতেছে ডারিয়া ॥
শুনি' প্রভুর গণ প্রভুরে করে অনুনয়। প্রভু কহে,—"আমি ভিক্ষুক, আমা হৈতে কিছু নয়" ॥

শেষ পর্যন্ত রাজা প্রতাপরুদ্রের কাছে আবেদন করা হলে তিনি প্রাপ্যের বিনিময়ে অশ্বগ্রহণে রাজী হয়ে গোপীনাথের প্রাণদণ্ড মকুব করলেন। এই সব উপদ্রবে বিরক্ত হয়ে শ্রীচৈতন্য বললেন—ইহাঁ রহিতে নারি, যামু আলালনাথ।
নানা উপদ্রব ইহাঁ, না পাই স্বাস্থ্য ॥ [অন্ত্য ৯।৬০]

তিনি অপরাধীকে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দিতে চান না। কেননা, রাজার বর্ত্তন খায়, আর চুরি করে। রাজদণ্ড্য হয় সেই শাস্ত্রের বিচারে ॥ রাজ কড়ি নাহি দেয়, আমারে ফুকারে। এই মহাদুঃখ ইহাঁ কে সহিতে পারে ?' অতএব, 'আলালনাথ যাই, তাঁহা নিশ্চিন্তে রহিমু। বিষয়ীর ভালমন্দ বার্ত্তা না শুনিমু' ॥ অন্ত্য ৯।৯৩

কাশীমিশ্রের নিকট এ সংবাদ শুনে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে রাজা প্রতাপরুদ্র গোপীনাথকে তার স্বপদে বহাল রাখলেন এবং বেতন দ্বিগুণ ক'রে দিলেন। এসব শুনে—
'প্রভু কহে,—"কাশীমিশ্র, কি তুমি করিলা ? রাজপ্রতিগ্রহ তুমি আমা করাইলা ?"
মিশ্র কহে,—"শুন প্রভু, রাজার বচনে। অকপটে রাজা এই কৈলা নিবেদনে ॥
'প্রভু যেন নাহি জানেন, রাজা আমার লাগিয়া। দুই লক্ষ কাহন কৌড়ি দিলেক ছাড়িয়া ॥
ভবানন্দের পুত্র সব—মোর প্রিয়তম। ইহাঁ সবাকারে আমি দেখি আত্মসম" ॥অন্ত্য৯।১২০

শ্রীচৈতন্যের পক্ষে অত্যন্ত বিরক্তিকর এই ধরনের ঘটনা আরও ঘটেছে। কমলাকান্ত বিশ্বাস নামে অদ্বৈত আচার্যের এক অনুচর আচার্যের অজ্ঞাতে রাজা প্রতাপরুদ্রকে এক পত্র পাঠিয়ে দেয়। পত্রের বিষয়—অদ্বৈত আচার্যের 'কিছু হইয়াছে ঋণ। ঋণ শোধিবারে চাহি মুদ্রা শত তিন' ॥ [চৈ. চঃ আদি ১২।৩২,]

ঘটনাচক্রে সেই চিঠি এসে পড়ল চৈতন্যের হাতে। এবং 'পত্র পড়িয়া প্রভুর মনে হৈল দুঃখ'। গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল,—ইহাঁ আজি হৈতে।
বাউলিয়া 'বিশ্বাসে' এথা না দিবে আসিতে' ॥ [তদেবঃ আদি ১২।৩৬,]

সত্যই কি লজ্জাকর পরিস্থিতি ! এই ভাবেই তাঁর নীলাচল বাসকালে গৌড়ীয়া ও ওড়িয়া ভক্তদের কারো কারো বিত্তবাসনা তাঁর বিরক্তি ও ক্ষোভের কারণ ঘটিয়েছে। ভাবাবেশে মজে বাহ্যজ্ঞান রহিত হয়ে কাল কাটাবেন—এমন সাধ্য কি ? বিত্তলোলুপ ভক্তরা তাঁর সে উপায় রাখেন নি।

অন্ত্যলীলার তৃতীয় উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ কবি কর্ণপুর 'পরমানন্দ দাস' সেনের জন্ম সংক্রান্ত। ১৫৪২ খ্রীস্টাব্দে কবি কর্ণপুর তাঁর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য রচনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত মহাকাব্যের পুঁথির (পুঁথি নং ২৩৮৯) লিপিকর বিষ্ণুদাস লিখেছেন কর্ণপুর ১৬ বছর বয়সে ঐ গ্রন্থ রচনা করেন। এ তথ্য দিয়েছেন ড. বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর চৈতন্যচরিতের উপাদান গ্রন্থে (পৃ. ৯৭)। এ হিসেবে ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দে কর্ণপুরের জন্ম। (মতান্তরে তাঁর জন্ম ১৫২৪-এ)।

অন্ত্যলীলার ১২ পরিচ্ছেদে আছে—'স্ত্রীসব দূরে হৈতে কৈলা প্রভুর দরশন'। কিন্তু শিবানন্দ সেনের পত্নী যে সন্তানসম্ভবা, তা প্রভুর দৃষ্টি এড়ায় নি। তিনি বলেছেন শিবানন্দকে—

'এবার তোমার যেই হইবে কুমার। 'পুরীদাস' বলি নাম ধরিহ তাহার' ॥ অন্ত্য ১২।৪৭

এই শিশু যখন সাত বছরের, তখন শিবানন্দ তাকে নিয়ে রথযাত্রা উপলক্ষে পুরী এলেন। চৈতন্য বারবার বলতে লাগলেন, 'কৃষ্ণ কহ'। বালক কিছুতেই কৃষ্ণনাম নেয় না। একদিন চৈতন্য বললেন—'পড়, পুরীদাস'। তখন সেই সাত বছরের শিশু একটি কৃষ্ণ প্রশস্তিমূলক শ্লোক আবৃত্তি করল। অধ্যয়ন হীন বালকের এই কাণ্ড দেখে সকলে চমৎকৃত হলেন।

গৌড়ীয় ভক্তরা চারমাস চৈতন্যের সঙ্গে থেকে গৌড়দেশে ফিরে গেলেন। কৃষ্ণদাস লিখেছেন—'ভক্তগণ প্রভু সঙ্গে রহে চারিমাসে।

প্রভু আজ্ঞা দিলা সবে গেলা গৌড়দেশে' ॥

এবং, 'তাঁ-সবার সঙ্গে প্রভুর ছিল বাহ্যজ্ঞান। তাঁরা গেলে পুনঃ হৈলা উন্মাদ প্রধান' ॥

[অন্ত্য ১৬]

এ হল কবি কর্ণপুর পুরীদাসের সাত বছর বয়সের অর্থাৎ ১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দের কথা। এই বছরই চৈতন্যদেবের তিরোভাব ঘটে। সাত বছর আগে, পরিপূর্ণ বাহ্যজ্ঞান ছিল বলেই শ্রীচৈতন্য, শিবানন্দ-পত্নী দূরে থেকে প্রণাম করলেও, তাঁর সন্তান সম্ভাবনা লক্ষ্য করেছিলেন, ভাবী সন্তানের নামকরণ করেছিলেন, 'পুরীদাস' ব'লে কৌতুক করেছিলেন। আর এখন, শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের বছরেও, কৃষ্ণদাস স্পষ্টভাবেই বলছেন, 'তাঁ-সবার সঙ্গে প্রভুর ছিল বাহ্যজ্ঞান'।

আমরাও তাই বলি। শ্রীচৈতন্য ভাবাবেশে কখনও কখনও বাহ্যজ্ঞান হারালেও, মোটামুটিভাবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর বাহ্যজ্ঞান অটুট ছিল—কৃষ্ণদাস কবিরাজ বর্ণিত উপরিউক্ত ঘটনাগুলি তার স্পষ্ট প্রমাণ। সুতরাং 'শেষের বারো বছর তাঁর বাহ্যিক চেতনাই ছিল না' —এ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যিনি এ ধারণা ব্যক্ত করেছেন, তিনি অবশ্য নিজেই নিজেকে সংশোধন করে বলেছেন, "শেষের বারোবৎসর তাঁর প্রায়ই কোন বাহ্যজ্ঞান থাকত না"। এইসঙ্গে তিনি আরো বলেছেন, "বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কথা তিনি ভেবেছিলেন

বটে, কিন্তু তাঁর মতো ঈশ্বরপ্রেমিক ভাবরসে আত্মলীন সাধক-ভক্তের পক্ষে এই সমস্ত বাস্তব ব্যাপার সম্বন্ধে সক্রিয় হওয়া সব সময়ে সম্ভব ছিল না"।

শ্রীচৈতন্য জীবনের অন্ত্যপর্বের ঘটনাগুলি সতর্কভাবে লক্ষ্য করলে শ্রীচৈতন্যকে কেবল আত্মলীন সাধক-ভক্ত ব'লে ভাবা কঠিন হয়ে পড়ে। তিনি বৈষ্ণব অবৈষ্ণব সকল মানুষের কথা ভেবেছেন এবং তাঁর ভাবধারার বাস্তব প্রচারে যে যথেষ্ট মনোযোগী ছিলেন, এবং এ মনোযোগ যে তাঁর জীবনের অন্তিম পর্বেও শিথিল হয় নি, তার বহু প্রমাণ আছে।

বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রসারে শ্রীচৈতন্যের সক্রিয়তা কেমন ছিল, তার পরিচয় নেওয়া যাক। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা থেকে শ্রীচৈতন্যের প্রচার সচেতনতার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধৃত হল।

বৃন্দাবন থেকে পুরীতে ফিরে আসার পর অর্থাৎ ১৫১৬ খ্রীস্টাব্দে শ্রীচৈতন্য রূপ-গোস্বামী প্রসঙ্গে স্বরূপকে বলছেন: 'প্রভু কহে, "ইঁহো আমায় প্রয়াগে মিলিল।
যোগ্যপাত্র জানি 'মোর কৃপা ত' হইল॥
তবে শক্তি সঞ্চারি আমি কৈলু উপদেশ।
তুমি হ কহিও ইহাঁয় রসের বিশেষ"॥ [অন্ত্য ১]

রূপকে বৃন্দাবন যাবার উপদেশ দিয়ে তিনি বলছেন—

"বৃন্দাবনে যাহ তুমি, রহিহ বৃন্দাবনে। একবার ইহাঁ পাঠাইহ সনাতনে॥
ব্রজে যাই 'রসশাস্ত্র করিহ নিরূপণ। লুপ্ত-তীর্থ সব তাঁহা করিহ প্রচারণ॥
কৃষ্ণসেবা, রসভক্তি করিহ প্রচার। আমিহ দেখিতে তাঁহা যাইমু একবার"॥ [অন্ত্য১]

অন্ত্য ৩ পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্য কলিকালে যবন উদ্ধারের উপায় সম্পর্কে চিন্তা করেছেন। হরিদাসকে বলেছেন—হরিদাস, কলিকালে যবন অপার।...
ইহার সবার কোন্ মতে হইবে নিস্তার?

অন্ত্য ৪ পরিচ্ছেদে সনাতন পুরীতে এসে দেহত্যাগের সংকল্প করলে তাঁকে নিবৃত্ত করে বলেছেন—

তোমার শরীর—মোর প্রধান সাধন। এ শরীরে সাধিমু আমি বহু প্রয়োজন॥
কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপ্রেম সেবা-প্রবর্তন। লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার আর বৈরাগ্য-শিক্ষণ॥
নিজ প্রিয়স্থান মোর—মথুরা-বৃন্দাবন। তাহাঁ এত ধর্ম চাহি করিতে প্রচারণ।
এত সব কর্ম আমি যে দেহে করিমু। তাহা ছাড়িতে চাহ তুমি, কেমনে সহিমু?

এখানে দেখা যাচ্ছে, ভাবসাধনায় আত্মলীন হয়ে থাকার পাত্র তিনি ছিলেন না, ধর্মপ্রচারের জন্য উপযুক্ত লোককে উপযুক্ত ক্ষেত্রে পাঠানোর ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সচেতনভাবে একটা পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করেছেন। বৃন্দাবনে গিয়ে কি কি করণীয়, শ্রীচৈতন্য সে সব সনাতনকে শিখিয়ে দিয়েছেন—

দোলযাত্রা দেখি' প্রভু তাঁরে বিদায় দিলা। বৃন্দাবনে যে করিবেন, সব শিখাইলা॥
[অন্ত্যঃ ৪ ২০৭]

অন্ত্য ৭ পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্য বল্লভভট্টের অহমিকা দূর করে তাঁকে আত্মসাৎ করেছেন। শোনা যায়, স্বীয় পার্ষদ গদাধর পণ্ডিতের নিকট বল্লভভট্টের মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন তিনি। এর মধ্যে প্রচার স্বার্থ ও সচেতনতা ছিল না—একথা বলা চলে না।

অন্ত্য ১১ পরিচ্ছেদে হরিদাসের তিরোভাব ও অন্ত্যেষ্টি বর্ণিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্যের এ সময়কার আচরণ বিশেষ লক্ষণীয়।—

হরিদাসের তনু প্রভু কোলে উঠাঞা। অঙ্গনে নাচেন প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা॥

এবং 'হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।

'হরিদাস আছিল পৃথিবীর শিরোমনি'। তাহা বিনা রত্নশূন্যা হইল মেদিনী॥

জয় জয় হরিদাস 'বলি' কর হরিধ্বনি'। এত বলি মহাপ্রভু নাচেন আপনি॥

জাতিভেদ-কলুষিত সমাজের সামনে শ্রীচৈতন্য নিজভাবধারা প্রচারে এখানে যথেষ্ট সক্রিয়। যবন হরিদাসের পাদোদক পান করিয়ে তিনি দৃষ্টান্ত রাখতে চেয়েছেন।

অন্ত্য ১২ পরিচ্ছেদে কবি কর্ণপূরের জন্মের পরের (অর্থাৎ ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দের পরের) ঘটনা বিবৃত হয়েছে। কেননা 'শিবানন্দ তিনপুত্রে গোসাঞিরে মিলাইলা'। এবং শিবানন্দের তৃতীয় পুত্রই কবি কর্ণপূর (পরমানন্দ দাস)। ১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দে শ্রীচৈতন্যের তিরোধান। তিরোধানের মাত্র ছ-সাত বছর আগেও গৌড়ে ধর্মপ্রচারের ব্যাপারে তাঁর উদ্বেগ—নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিলু গৌড়েতে রহিতে।

আজ্ঞা লঙ্ঘি আইলা, কি পারি বলিতে?

নিত্যানন্দকে তিনি ইতোপূর্বে গৌড়ে প্রেমভক্তি প্রচারের ভার দিয়ে বলেছিলেন -

যাহ গৌড়দেশে। অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে॥ [মধ্য ১৫]

১৫১৫-১৬ খ্রীস্টাব্দে পুরীতে রূপগোস্বামীকে তিনি বলেছিলেন, বৃন্দাবনে গিয়ে কৃষ্ণসেবা, রসভক্তি করিহ প্রচার। আমিহ দেখিতে তাহাঁ যাইমু একবার'। [অন্ত্য ১।২১৯]

১৫২৫-২৬ খ্রীস্টাব্দে জগদানন্দ যখন বৃন্দাবন চলেছেন, তখনও শ্রীচৈতন্যের মনের অভিপ্রায়, বৃন্দাবনে গিয়ে কিছুদিন থেকে ভক্তিপ্রচার কেমন চলেছে দেখবেন। তাই জগদানন্দকে দিয়ে তিনি খবর পাঠাচ্ছেন— আমিই আসিতেছি, কহিহ সনাতনে।

আমার তরে একস্থান করে বৃন্দাবনে॥ [অন্ত্য ১৩]

যাঁরা শ্রীচৈতন্যকে অনুক্ষণ ভাবোন্মাদে বাহ্যজ্ঞানরহিত ক'রে রাখতে চান, তাঁরা চৈতন্য তিরোধানের মাত্র কয়েক বছর আগে প্রেমভক্তি প্রচারে এই আগ্রহের দিকটা দেখেও দেখতে চান না, কেননা এতে তাঁদের যত্নপোষিত ধারণার ভিত্তি টলে যায়। কেউ আবার বলেন, মহাপ্রভুর এই বৃন্দাবনগমন প্রকটলীলায় নয়, অপ্রকটে অথবা সূক্ষ্ম শরীরে। এ রকম ভাষ্যেরও পথ মেরে রেখেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। কেননা তাঁর পরিবেশিত তথ্যে আছে—জগদানন্দ মহাপ্রভুর সন্দেশ কহিলা সনাতনে।

'আমিহ আসিতেছি রহিতে, করিহ একস্থানে'॥

এবং সনাতন—প্রভুর নিমিত্ত একস্থান মনে বিচারিলা।

দ্বাদশাদিত্য টিলায় এক মঠ পাইলা॥

সেই স্থান রাখিলা গোসাঞি সংস্কার করিয়া।

মঠের আগে রাখিলা এক চালি বান্ধিয়া॥ [অন্ত্য ১৩]

প্রভুর সূক্ষ্ম শরীরে আবির্ভাবের জন্য 'চালি বা চালাঘর বেঁধে রাখার প্রয়োজন হয় কি ক'রে, তা বোঝার মত সূক্ষ্ম দৃষ্টি আমাদের নেই, তা নির্দ্বিধায় স্বীকার করাই ভাল। আমরা স্থূল বাস্তবদৃষ্টিতে এইটুকু দেখতে পাই যে, ১৫১৫ খ্রীস্টাব্দের শেষে শ্রীচৈতন্যের বৃন্দাবনযাত্রার পর আরেকবার বৃন্দাবনযাত্রার উল্লেখ আছে কবি

কর্ণপুরের কৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্যেও। কর্ণপুর লিখেছেন, চৈতন্যবিরহ সহ্য করতে না পেরে চৈতন্যের বৃন্দাবন গমনের পর রামানন্দ দেহত্যাগ করেন—

স্থিত্বা তত্র শ্রীমদ্রো গৌরচন্দ্রঃ কিঞ্চিৎ কালং তেন ভূয়োহধ্বনৈব।
কালিন্দীয়ং তীরমেব প্রতস্থে বিচ্ছেদার্তাংস্তত্র তাংস্তান্ বিধায়॥
রামানন্দস্তদ্বিয়োগাধিপীড়াক্ষীণ ক্ষীণস্তত্যজেহসূন্ মহাত্মা।
বিচ্ছেদে স্যাদ্‌যোগ্যমেতচ্চরিত্রং প্রেম্নস্তাবত্তাদৃশস্যাস্য নূনং॥ [সর্গ ২০]

অর্থাৎ "শোভাময় গৌরচন্দ্র সেই স্থানে (নীলাচলে) কিছুকাল অবস্থান করতঃ পুনর্বার তত্রত্য লোক সকলকে বিচ্ছেদার্ত করিয়া সেই পথে কালিন্দীতীরে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর মহাত্মা রামানন্দ রায় গৌরাঙ্গ বিয়োগ জনিত মনঃপীড়ায় অত্যন্ত ক্ষীণাঙ্গ হওত প্রাণত্যাগ করিলেন। আহা! তাদৃশ অলৌকিক এই প্রেমবিচ্ছেদের ইহাই চরিত্র, নিশ্চয় ইহাই উপযুক্ত হয়।" [রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন অনূদিত]

প্রথমবারের বৃন্দাবনযাত্রা এ নয়। কেননা প্রথমবার বৃন্দাবন থেকে ফিরে এসে শ্রীচৈতন্য রথযাত্রার সময় সনাতনকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন রামানন্দ প্রমুখ বৈষ্ণবদের সঙ্গে।

"বর্ষার চারিমাস রহিলা সব নিজভক্তগণে।
সবা-সঙ্গে প্রভু মিলাইলা সনাতনে॥
পুরী, ভারতী, স্বরূপ, পণ্ডিত গদাধর।
সার্বভৌম, রামানন্দ, জগদানন্দ, শঙ্কর॥
কাশীশ্বর, গোবিন্দাদি যত ভক্তগণ।
সবা-সনে সনাতনের করাইলা মিলন॥ [অন্ত্য ৪]

চৈতন্যচরিতামৃত পড়ে মনে হয় স্বরূপ দামোদর ও রামানন্দ প্রায় শেষ পর্যন্ত শ্রীচৈতন্যের সঙ্গী ছিলেন। সুতরাং কর্ণপুর উল্লেখিত ওই বৃন্দাবনগমন নিশ্চিতভাবে শ্রীচৈতন্যজীবনের শেষ দিকের ঘটনা।

সুতরাং কৃষ্ণদাস কবিরাজ পরিবেশিত তথ্য—বৃন্দাবনে গোস্বামীদের প্রচারকর্ম পর্যবেক্ষণের জন্য শ্রীচৈতন্যের বৃন্দাবনযাত্রার কথা স্পষ্টভাবেই দেখিয়ে দেয়, অন্ত্যপর্বে শ্রীচৈতন্যের মধ্যে সাধকের আত্মলীনতা এবং প্রেমভক্তিপ্রচারের কর্মমুখিতার সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটেছিল; তাঁর ভাবজীবন কর্মজীবনকে দুর্বল করে নি, বলিষ্ঠ করেছে।

শ্রীচৈতন্যের একাধিকবার দক্ষিণ ভ্রমণের কথা আছে চৈতন্যচরিত গ্রন্থগুলিতে। চৈতন্যভৃত্য গোবিন্দ কর্মকার তাঁর করচায় দক্ষিণে যাবার সময় একবার, এবং দ্বারকা থেকে ফেরার সময় আরেকবার—এই দুবার গোদাবরীতীরে চৈতন্য-রামানন্দ সাক্ষাৎকারের কথা বলেছেন। কবি কর্ণপুর তাঁর মহাকাব্যে লিখেছেন, সদ্য দক্ষিণ প্রত্যাগত চৈতন্যদেব স্নানযাত্রার সময় (স্নানযাত্রা থেকে রথযাত্রার মধ্যবর্তী সময়ে জগন্নাথ গূঢ়ভাবে থাকেন) জগন্নাথের দর্শন না পেয়ে দুঃখিত হয়ে পুনরায় গোদাবরী তীরে গিয়ে রামানন্দের সঙ্গে মিলিত হলেন। এ প্রসঙ্গে ড. বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন "কবি কর্ণপুরের পরবর্তী অন্যান্য লেখকগণ প্রভুর দ্বিতীয়বার রামানন্দ মিলনের জন্য যাতায়াতের কথা না লিখিলেও এ সম্বন্ধে শিবানন্দ সেনের পুত্রের

কথা অবিশ্বাস করিতে পারিলাম না।" [চৈতন্যচরিতের উপাদান : পৃ. ১৮-১৯]।
জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলে আছে—

দবির খাশে কৃপা করিয়া গৌরচন্দ্র। মথুরা দেখিআ তবে গেলা সেতুবন্ধ ॥
'শিবকাঞ্চি বিষ্ণুকাঞ্চি মধ্যে মহারণ্য। দ্রাবিড় ডাহিনে থুঞা চলিলা চৈতন্য ॥

[চৈ. ম. : ২৬, ২৭। তীর্থ-২]

ড. বিমানবিহারীর হিসাব মতে ১৫১৫-র সেপ্টেম্বরে ঝারিখণ্ড পথে বৃন্দাবনযাত্রা, ১৫১৬-র মে মাসে নীলাচল প্রত্যাবর্তন [চৈতন্যচরিতের উপাদান : পৃ. ২০]। এরপর কোন একবারের দক্ষিণযাত্রার কথা উল্লেখ করেছেন জয়ানন্দ। জয়ানন্দের তথ্যের প্রামাণিকতা অনেকে স্বীকার করেন না। কিন্তু এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য অন্য সাক্ষ্য প্রমাণ আছে।

কবি কর্ণপূরের চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের ৭ম অঙ্কের দৃশ্যে দেখা যায় কর্ণাটপতির অমাত্য মল্লভট্ট প্রতাপরুদ্রের কাছে এসে রাজার প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন – "আপনার মত সুহৃদ্ যার, তাঁর সতত কুশল। কিন্তু সম্প্রতি তাঁর অধিক কুশল।" রাজা বলেছেন, 'সে কি রকম?' মল্লভট্ট বলেছেন—"তীর্থযাত্রী 'কনকদ্যুতি যতীন্দ্রে'র কথা শুনে কর্ণাটপতি তাঁর চরিত্র অবগত হতে ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণদের পাঠিয়েছিলেন; সেতুবন্ধ থেকে তারা ফিরে আসার পর তাদের মুখে তাঁর অলৌকিক চরিতকথা জেনে তিনি ভবদহন জ্বালা বিস্মৃত হয়েছেন।"

কর্ণাটপতি কৃষ্ণদেব রায় ও উড়িষ্যাপতি প্রতাপরুদ্রদেবের মধ্যে যে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক এখানে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, ঐতিহাসিক কালবিচারে তা ১৫১৬-র আগে হওয়া সম্ভব নয়।

১৪৯৬ খ্রীস্টাব্দে পিতা পুরুষোত্তমদেবের মৃত্যুর পর প্রতাপরুদ্র উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১৪৯৯ খ্রীস্টাব্দে বিজয়নগরাধিপতি নরস নায়কের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। নরস নায়ক ১৫০৩ খ্রীস্টাব্দে মারা যান। তারপর একে একে বীর নরসিংহ [১৫০৫-৯ খ্রীঃ] ও কৃষ্ণদেব রায় [১৫০৯-২৯ খ্রীঃ] কর্ণাটের বিজয়নগরের রাজা হন। ১৪৯৬ থেকে ১৫১২ খ্রীঃ পর্যন্ত প্রতাপরুদ্র দক্ষিণে তাঁর প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখেন। শ্রীচৈতন্য ১৫১০ এ যখন নীলাচলে আসেন, তখন প্রতাপরুদ্র দক্ষিণে যুদ্ধরত। ১৫১৩ থেকে যুদ্ধে প্রতাপরুদ্রের পরাজয় ঘটতে থাকে। কৃষ্ণদেব রায় ও প্রতাপরুদ্রের এই যুদ্ধ শেষ হয় ১৫১৬ খ্রীস্টাব্দে। প্রতাপরুদ্র সন্ধিপ্রার্থনা করে কৃষ্ণদেবকে নিজের কন্যা দান করেন। সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করে কৃষ্ণদেব কৃষ্ণানদীর উত্তরের সমস্ত অঞ্চল প্রতাপরুদ্রকে ফিরিয়ে দেন।

কৃষ্ণদেব রায়ের একটি লিপিতে দেখা যায়, গজপতি প্রতাপরুদ্রের পুত্র বীরভদ্র ১৫১৬ খ্রীস্টাব্দে কৃষ্ণদেব রায় ও প্রতাপরুদ্রের যৌথ নির্দেশে কৃষ্ণদেবের প্রাপ্য বিবাহ-যৌতুকাদি তাঁর লিঙ্গদহলিস্থিত প্রাসাদে পাঠিয়ে দিয়েছেন—

"Dravila Mandaleshvara Gajapati Pratapa:Rudra-Maharaya's son Virabhadra Maharaya who in 1516 [the year of the record], on being directed by Krishna Raya and Pratapa Rudra Maharaya, remitted the marriage dues payable to his palace in the Lingadalialli

country." [*Mysore State Gazetteer*, Chitradurga District, pg. 50-51]

সুতরাং 'চৈতন্য চন্দ্রোদয়ে' কৃষ্ণদেব রায় ও গজপতি প্রতাপরুদ্রের মধ্যে যে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে, তা ১৫১৬ খ্রীস্টাব্দের আগে সম্ভব নয়। ১৫১৬-র পর থেকে ১৫২৯-এ কৃষ্ণদেব রায়ের মৃত্যু পর্যন্ত এই সম্পর্ক বজায় ছিল বলে মনে হয়। ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দের একটি লিপিতে কৃষ্ণদেব রায় ও প্রতাপরুদ্রদেব যুগ্মদাতারূপে উল্লেখিত হয়েছেন। রাও সাহেব হরেকৃষ্ণ শাস্ত্রী Madras Epigraphical Report (1912-13)-এর ৫৮ অনুচ্ছেদে লিখেছেন—"In my report for 1908-09, p 118, paragraph 70, reference was made to an inscription of Saka 1448 from Undavilli in which Krishnaraya and Virarudra Pratapadeva Gajapati appeared as donors, simultaneously".

সুতরাং বলা যায়, ১৫১৬ খ্রীস্টাব্দের পর, যখন কৃষ্ণদেব রায় ও প্রতাপরুদ্রদেবের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়েছে, তখন মহাপ্রভু (কনকদ্যুতি যতীন্দ্র) আরেকবার দক্ষিণ ভ্রমণে গিয়েছিলেন। এখানে Epigraphica Carnatica-য় উদ্ধৃত যোগীকোত্রি শিলা শাসনের কথা উল্লেখ করতে হয় (চৈ. চ. উঃ পাদটীকা পৃ. ৩৬৪)। এখানে কর্ণাটরাজ অচ্যুতদেবের রাজত্বকালে চৈতন্যদেবকে দুটিগ্রাম দানের কথা বলা হয়েছে। অচ্যুতদেবের রাজত্বকাল ১৫২৯-৪২ খ্রীস্টাব্দ (*A History of South India* p. 301)। ড. বিমানবিহারী মজুমদার এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন "মহাপ্রভু লীলা সম্বরণের তিন বৎসর পূর্বে দান গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না" (তদেব)।

এই মন্তব্যের পিছনেও সেই একই ধারণা কাজ করেছে যে, লীলা সম্বরণের কাছাকাছি সময়ে শেষ কয়েক বছর চৈতন্য বাহ্যজ্ঞান ও কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলেন। এই ধারণা যে অমূলক তা আমরা দেখিয়েছি।

প্রচলিত চৈতন্যচরিতগ্রন্থগুলি নানাদিক থেকেই অসম্পূর্ণ। চৈতন্য জীবনের অন্ত্যপর্বে চৈতন্যচরিতামৃতের তথ্যাল্পতার কথা বলেছি। আজ প্রয়োজন চরিতগ্রন্থের অতিরিক্ত নানা উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই অসম্পূর্ণতা যথাসাধ্য দূর করা। এই কারণে আমরা শিলাশাসনের সাক্ষ্যটি অগ্রাহ্য করতে পারি না। বরং বলতে পারি, অন্ত্যপর্বে অনুক্ষণ ভাবোন্মাদের ধারণাটি যখন ভিত্তিহীন, তখন ১৫২৫-২৬ খ্রীস্টাব্দে শ্রীচৈতন্যের দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন যাওয়া এবং দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বার দক্ষিণ ভারতে যাওয়া— কোনটাই অসম্ভব নয়। কোন চৈতন্যচরিতগ্রন্থই যখন শ্রীচৈতন্য জীবনের সামগ্রিক রূপটি ফুটিয়ে তুলতে পারে নি, তখন ইতিহাস ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পূরক তথ্যগুলি যুক্তিবিচারের মাপকাঠিতে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। অন্ততঃ ভাবোন্মাদের ওজর দেখিয়ে কোন তথ্যকে বর্জন করা চলবে না।

বাংলা চৈতন্যচরিত গ্রন্থগুলির অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে একথা বলাই যথেষ্ট হবে যে, শ্রীচৈতন্যের আসাম ভ্রমণ এবং নীলাচল বাসকালে 'পঞ্চসখা' প্রসঙ্গে বাংলা চৈতন্য চরিতকারেরা প্রায় নীরব। আমরা এখানে বিশেষভাবে উড়িষ্যার পঞ্চসখা প্রসঙ্গের উল্লেখ করব, কেননা এই পঞ্চসখা শ্রীচৈতন্যের অন্ত্যলীলার সহচর এবং শ্রীচৈতন্য-প্রেরণা তাঁদের মধ্য দিয়ে সক্রিয় হয়ে ষোড়শ শতকের উড়িষ্যার সমাজ ও সাহিত্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

এই পঞ্চসখাকে শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ লীলাপরিকর বলে অভিহিত করে কটক রেভেনশ্য কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক স্বর্গীয় আর্তবল্লভ মহান্তি লিখেছেন- -"ভক্তহৃদয়র দুঃখ নিবারণ, পাপর উচ্ছেদসাধন ও সাধুংক পরিত্রাণ ছলরে ভগবান হরি 'স্বলীলা' আস্বাদন নিমিত্ত শুদ্ধ চৈতন্য প্রেমমূর্তি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ মানববিগ্রহ পরিগ্রহ পূর্বক ধরাধামরে অবতীর্ণ হেলে।.. স্বলীলা আস্বাদন ক্রিয়ারে স্বীয় পরিকর বর্গংকর উপস্থিতি অপরিত্যাজ্য সেহি পরিকরবর্গ মধ্য ধরাধামরে অবতীর্ণ হোইথিলে।

"পুণ্যভূমি উৎকলখণ্ডরে যে মধুর প্রেমলীলার উল্লোল কল্লোল প্রবাহিত হোইথিলা তাহার প্রধান কারণ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ও তাহাংকর পরিকরবর্গ। সেহি পরিকরবর্গ দুই শ্রেণীরে বিভক্ত, যথা --অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ। পঞ্চসখা তথা পঞ্চশাখা— বলরাম, জগন্নাথ, যশোবন্ত, অনন্ত ও অচ্যুতানন্দ। অচ্যুতংক মতরে সেমানে প্রভুংকর অন্তরঙ্গ সখা।"

[অর্থাৎ, "ভক্তহৃদয়ের দুঃখ নিবারণ, পাপের উচ্ছেদ সাধন ও সাধুর পরিত্রাণ ছলে ভগবান হরি 'নিজলীলা' আস্বাদনের জন্য শুদ্ধ চৈতন্য প্রেমমূর্তি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপ মানববিগ্রহ রূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন। নিজলীলা আস্বাদনে স্বীয় পরিকরবর্গের উপস্থিতি অপরিত্যাজ্য সেই পরিকরবর্গও ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন। পুণ্যভূমি উৎকলখণ্ডে যে মধুর প্রেমলীলার হিল্লোল কল্লোল প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহার প্রধান কারণ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ও তাঁহার পরিকরবর্গ। সেই পরিকরবর্গ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা —অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ। পঞ্চসখা তথা পঞ্চশাখা বলরাম, জগন্নাথ, যশোবন্ত, অনন্ত ও অচ্যুতানন্দ। অচ্যুতের মতে তাঁহারা প্রভুর অন্তরঙ্গ সখা।"

ওড়িষী ভাষা ও সাহিত্যে পঞ্চসখার অবদান সম্পর্কে ওড়িয়া পণ্ডিত শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস জানিয়েছেন- "ওড়িষী ভাষার প্রকৃত স্রষ্টা সারলা দাস। তাঁর ওড়িয়া মহাভারতে একালে প্রচলিত ওড়িষী তদ্ভব শব্দের অধিকাংশই ব্যবহৃত হয়। জাতীয় চেতনা ও ঐক্যের ক্ষেত্রে ভাষার ভূমিকা মনে রেখে বলা যায় ওড়িষী সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেই চেতনার স্রষ্টা সারলা দাস। রাজদরবারে যখন সংস্কৃতের পৃষ্ঠপোষকতা চলছিল, তখনই রাজদরবারে থেকে দূরে সুদূর গ্রামাঞ্চলে বসে সারলা দাস জাতিকে এক নবচেতনা ও নবীন আশ্বাস দান করেছিলেন। উড়িষ্যার মানুষ এখন নিজের মুখের ভাষায় নিজেকে প্রকাশের পথ খুঁজে পেল। এবং সারলা দাস যে মহাব্রতের সূচনা করেছিলেন, তা সম্পূর্ণ ও সম্পন্ন করলেন পঞ্চসখা" ["And what Sarala Dasa had initiated was completed by the Panchasakha"--'Balarama Das' : Sahitya Akademi 1982, pg. 84]।

বলরাম দাসের জগমোহন রামায়ণ, জগন্নাথ দাসের ভাগবত এবং অচ্যুতানন্দের হরিবংশ এবং বলরাম জগন্নাথের গীতা অনুবাদ তৎকালীন কথ্য ওড়িষী ভাষার নবদিগন্ত উন্মোচন করেছিল ['Balarama Das's Jagamohan Ramayana, Jagannatha Das's Bhagavata and Achyntananda's Harivamsa as well as the Gita translations of Balarama and Jagannatha were creations that raised the then spoken Oriya language to new heights'. Ibid. pg. 85]।

পঞ্চসখার এই উদ্দীপিত ভূমিকার অন্তরালে আছেন শ্রীচৈতন্য। ওড়িয়া চৈতন্য

ভাগবত প্রণেতা ঈশ্বর দাস স্পষ্ট ভাবেই জানিয়েছেন, চৈতন্যপ্রেরণাতেই পঞ্চসখা এই সব রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন।—

'জণ জণরে শাড়ী দেই। কহন্তি চৈতন্য গোসাঁই।
পুরাণ গীত রস কর। যাহা লেখিব গ্রন্থসার।
অবতারিক যেতে কথা। লিখন কর শাস্ত্র পোথা'।
'পঞ্চশাখা এ নীলগিরি। সেবা করন্তি দেবহরি।
পুরাণ কলে গীতরস। অবতার গীত প্রকাশ। [ঈশ্বরদাস ঃ চৈ. ভা., ৫৪ অধ্যায়]

জগন্নাথ দাসের ওড়িয়া ভাগবত সম্পর্কে বঙ্গীয় সমালোচক প্রিয়রঞ্জন সেন লিখেছেন "উড়িষ্যার গ্রামে গ্রামে এই ভাগবতের প্রচার আছে। প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে আমাদের দেশের চণ্ডীমণ্ডপের মত ভাগবতটুঙ্গী আছে। যে একেবারে নিরক্ষর, সেও শুনিয়া শুনিয়া ভাগবত শিখিয়াছে [ওড়িয়া সাহিত্য ঃ পৃ. ২১]। ওড়িআ সাহিত্যর ইতিহাস গ্রন্থে ড. মায়াধর মানসিংহ বঙ্গীয় সমালোচক বিজয়চন্দ্র মজুমদারের মন্তব্য উদ্ধৃত ক'রে বলেছেন— "মজুমদার যথার্থরে কহিছন্তি—লোকে যেতে বেলে জানিলে যে এ পরি গ্রন্থ ওড়িআ ভাষারে প্রাপ্তব্য হেলানি, সেমানে অসাধারণ উৎসাহরে লাগি পড়িলে ওড়িআ শিখিবাকু, কেবল জগন্নাথঙ্ক ভাগবত পড়িবা পাইঁ। কেবল এহি কারণরু বঙ্গলা অপেক্ষা উৎকলরে সাক্ষরতা অধিক ব্যাপক। বহুকাল পূর্বে স্কুল ইনিস্পেক্টর শ্রীভূদেব মুখার্জী এহি ব্যাপার সরকারী রিপোর্টরে লেখি জনাইথিলে।" অর্থাৎ "মজুমদার যথার্থই বলিয়াছেন—লোকে যখন জানিল এইরূপ গ্রন্থ ওড়িষী ভাষায় পাওয়া যাইতেছে, তাহারা অসাধারণ উৎসাহে ওড়িষী শিখিতে লাগিয়া পড়িল, কেবল জগন্নাথের ভাগবত পড়িবার জন্য। কেবল এই কারণে বাংলা অপেক্ষা উৎকলে সাক্ষরতা অনেক বেশি। বহুকাল পূর্বে স্কুল পরিদর্শক শ্রীভূদেব মুখার্জী এই ব্যাপার সরকারী রিপোর্টে লিখিয়া জানাইয়া ছিলেন" [ওড়িআ সাহিত্যর ইতিহাস ঃ পৃ. ১৪৪]।

পঞ্চসখার অন্যতম অচ্যুতানন্দ সম্পর্কে ড. মানসিংহ লিখেছেন—"পঞ্চসখামানঙ্ক ভিতরে এহি নিম্নবয় সখা জনকহিঁ প্রকৃত সমাজসেবক থিলে। সম্ভ্রান্ত করণকুলরে জন্মগ্রহণ করি মধ্য সে আজি কৈবর্ত ও গোপালমানঙ্কর গোষ্ঠীগুরু ও গোষ্ঠী-দেবতারূপে ওড়িশার চারি আড়ে পূজিত। সে নিজর জন্ম-জাতির অহমিকা পরিত্যাগ করি নিম্নশ্রেণীর সেহিমানঙ্ক মধ্যরে একত্র বাস করিথিলে ও প্রথম থর পইঁ সেহি নিরক্ষর, অবহেলিত সম্প্রদায় মানঙ্কু সে পর্য্যন্ত অলভ্য মন্ত্র ও শাস্ত্র অযাচিত ভাবরে পরিবেষিত করি দেইথিলে। সে পর্য্যন্ত এ সবু কেবল ব্রাহ্মণ ও উচ্চ সম্প্রদায় মানঙ্ক ভিতরে আবদ্ধ থিলা। অচ্যুতানন্দ কৈবর্ত্তমানঙ্ক আধ্যাত্মিক উন্নতি পইঁ কৈবর্তগীতা ও গোপাল মানঙ্ক সামাজিক শিক্ষা পাইঁ গোপালঙ্ক ওগাল পর্য্যায় লেখিলে। সে কালরে এ প্রকার সামাজিক স্পর্শ-কারতা অত্যন্ত বিরল"। অর্থাৎ—"পঞ্চসখাদের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ এই সখা ছিলেন প্রকৃত সমাজসেবক। সম্ভ্রান্ত করণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি আজ কৈবর্ত্ত ও গোপাল (গোয়ালা) দের গোষ্ঠীগুরু ও গোষ্ঠীদেবতা রূপে উড়িষ্যার সর্বত্র পূজিত। তিনি নিজের জন্মগত জাতি-অহমিকা পরিত্যাগ করিয়া নিম্নশ্রেণীর সেই লোকজনের মধ্যে একত্র বাস করিয়াছিলেন এবং সেই নিরক্ষর অবহেলিত সম্প্রদায়গুলিকে সে-পর্যন্ত-অলভ্য মন্ত্র ও শাস্ত্র অযাচিতভাবে সেই প্রথম

পরিবেশন করিয়াছিলেন। সে পর্যন্ত এসব কেবল ব্রাহ্মণ ও উচ্চ সম্প্রদায়গুলির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। অচ্যুতানন্দ কৈবর্ত্তদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য 'কৈবর্ত্তগীতা' ও গোপালদের সামাজিক শিক্ষার নিমিত্ত 'গোপালঙ্ক ওগাল' লিখিলেন। সেকালে এ প্রকার সামাজিক সচেতনতা ছিল অত্যন্ত বিরল" [ওড়িআ সাহিত্যর ইতিহাসঃ পৃ. ১৬১]।

এইভাবে পঞ্চসখার রচনা ও কর্মের মধ্য দিয়ে ষোড়শ শতকের ওড়িষী সাহিত্যে ও সমাজে এক নব জাগরণ এসেছিল। এই জাগরণের প্রেরণামূলে ছিলেন শ্রীচৈতন্য। এ সম্পর্কে পঞ্চসখা রচনায় মেলে দ্বিধাহীন স্বীকৃতি।

শ্রীচৈতন্য কলিযুগে কৃষ্ণ হেলে জাত।
তাঙ্ক সঙ্গে চারি সখা হোইলু যে জাত।
[অচ্যুতানন্দ-গুরুভক্তি গীতা, প্রথম খণ্ড ঃ দ্বাত্রিংশ ছান্দ। ৩৬]
শিশু যে অচ্যুত যশোবন্ত বলরাম।
শূদ্রকুল উদ্ধারিবু অ্যন্তে চারিজন। [তদেবঃ ত্রয়ত্রিংশ ছান্দ।১২৮]

অচ্যুতানন্দ তাঁর শিষ্যদের বলেছেন সেই করুণাভরা প্রেরণার কথা—

কলিযুগে শ্রীচৈতন্য খোল নৃত্য করে। শ্রীচৈতন্য লীলা করে পাদে পাদে ফেরে॥
চৈতন্য করুণা, যে তুম্ভঙ্কু দন্তি করে। বার গোপ রাহাসরে অট তুম্ভ সরে॥
[তদেব. ২য় খণ্ডঃ ৯ম পটল।]

অধ্যাপক আর্তবল্লভ মহান্তির গণনা অনুসারে অচ্যুতানন্দের জন্ম ১৫১১ বা ১৫১২ খ্রীস্টাব্দে। পাঁচবছর বয়সে হাতে খড়ির ('পাঞ্চ বরষে বিদ্যাকর্ম করিণ' শূন্যসংহিতা) পর তাঁর পিতা দীনবন্ধু তাঁকে নিয়ে পুরীতে চৈতন্যদেবের নিকট যান এবং সেখানে তিনি চৈতন্য সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হন। তাঁর দেওয়া গুরু প্রণালী নিম্নরূপ চৈতন্যদেব-সারঙ্গ গোসাই-শ্যাম গোসাই-নবকিশোর-সনাতন (=চরণদাস)—অচ্যুতানন্দ। [তদেব. ১ম খণ্ডঃ প্রথম ছান্দ]। দীক্ষার সময় অচ্যুতানন্দের বয়স পাঁচবছর হলে, এ ঘটনা ১৫১৬-১৭ খ্রীস্টাব্দের। এর আগেই, এবং পঞ্চসখাদের মধ্যে সর্বপ্রথম, বলরাম দাস চৈতন্য শরণ গ্রহণ করেন। গোবিন্দ কবির গৌরকৃষ্ণোদয় কাব্যে বলা হয়েছে, দক্ষিণ ভ্রমণের পর চৈতন্যদেব পুরীতে ফিরে এলে, বাসুদেব সার্বভৌম বলরামাদি ভক্তদের মহাপ্রভুর আশ্রয়ে নিয়ে আসেন।—'যে চাপ্যান্যে তদনুবলরামাখ্যদাসাদি ভক্তা। ভেজুশ্চৈনং শরণমখিলাঃ সার্বভৌমানুনীতাঃ। [শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়, একাদশ সর্গ।৫]
এ তাহলে ১৫১২ খ্রীস্টাব্দের কথা। বলরামকে দীক্ষা দেন হৃদয়ানন্দ। বলরাম আবার দীক্ষা দেন জগন্নাথ দাসকে। দিবাকর দাস প্রণীত জগন্নাথ চরিতামৃত কাব্যে জগন্নাথ দাসের গুরুপ্রণালী এই রকম চৈতন্য-গৌরীদাস-হৃদয়ানন্দ-বলরাম-জগন্নাথ [গুরুপ্রণালীবন্দনাঃ ১ম অধ্যায়]। এই কাব্যের ২৪ অধ্যায়ে দিবাকর দাস লিখেছেন, জগন্নাথ দাস—'ষড়বরষ নিরন্তর। সেবিলে চৈতন্যপয়র'। এ নিশ্চয় চৈতন্য জীবৎকালের শেষ ছয় বছর। কেননা, চৈতন্যদেবের জীবৎকালে তাঁর সঙ্গে জগন্নাথ দাসের ছাড়াছাড়ি হওয়ার কোন প্রসঙ্গ ওড়িআ বা বাংলা কোন জীবনী গ্রন্থে নেই ; 'জগন্নাথ চরিতামৃতে' বরং আছে, গৌড়ীয় ভক্তদের বারংবার আহ্বান ও অনুরোধ উপেক্ষা ক'রে শ্রীচৈতন্য পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে 'অতিবড়' জগন্নাথ দাসের সংশ্রবে থাকাই পছন্দ করেছিলেন। সুতরাং ছ'বছর নিরন্তর চৈতন্যের পদসেবা ক'রে থাকলে চৈতন্য তিরোধানের ছ'বছর

আগে অর্থাৎ ১৫২৭-২৮ খ্রীস্টাব্দে জগন্নাথ দাস বলরাম দাসের নিকট দীক্ষা নিয়ে চৈতন্য শরণ নেন।

মোটের উপর, চৈতন্যজীবনের অন্ত্যপর্বেই শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় পঞ্চসখা সমগ্র উড়িষ্যার সাহিত্যে সমাজে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করেন। ঈশ্বরদাসের চৈতন্য ভাগবতে প্রেরণাময় চৈতন্যের যে চিত্র আঁকা হয়েছে, তা আত্মলীন সাধকের নয়, সচেতন ধর্মপ্রবক্তার ও কর্মীর। তিনি পঞ্চসখাকে গ্রন্থাদি রচনায় উৎসাহিত করেছেন, আবার কে কি লিখলেন, সে বিষয়ে খোঁজখবরও নিয়েছেন। –

কটকে চৈতন্য গোসাঁই। আনন্দে হর্ষিত হোই।
পঞ্চসখাঙ্কু আজ্ঞা দেলে। কি গ্রন্থ কবিছ বোইলে'।

উত্তরে পঞ্চসখা জানালেন তাঁরা কে কি গ্রন্থ করেছেন।

য়ে আজ্ঞা শুনি বলরাম। চিন্তিণ শ্রীপুরুষোত্তম।
বাল্মিকঙ্ক কলা গ্রন্থ। শ্রী রামায়ণ যে উকত।
সপত কাণ্ড গীতরম। শুনিন সমস্ত হরষ।
বোলন্তি বিপ্র নরনাথ। পুরাণ কলে ভাগবত'। [৫৯ অধ্যায়]

কাশী থেকে পণ্ডিত জগন্নাথের লেখা বেদান্তসার গ্রন্থ নিয়ে এসেছিলেন শ্রীচৈতন্য। বলরাম তা ওড়িষী ভাষায় অনুবাদ করেছেন।

সিদ্ধান্ত বেদান্তর সার।
যে শাস্ত্র লেখি জগন্নাথ। বারাণসীরে প্রাণ হত।
যে শাস্ত্র চৈতন্য গোসাঁই। সঙ্গতে অচ্ছন্তি অণাই'।
সমস্ত বসাই গায়ন। শুনি হরষ সর্বজন'।

বলরামের গ্রন্থের নাম বেদান্ত সার গুপ্তগীতা। এ গ্রন্থ সম্পর্কে চিত্তরঞ্জন দাস তাঁর গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। ['Balarama Das'—pg. 55]

পঞ্চসখার অন্যতম অনন্ত জানালেন, তিনি লিখেছেন—

ভবিষ্য পুরাণ উকত। আগত লেখিছন্তি গীত।
অচ্যুত যশোবন্ত কই। পুছন্তি চৈতন্য গোসাঁই।
কি শাস্ত্র করি অছ গীত। শুনিণ মুকত পতিত।
এ আজ্ঞা শুণি দুই দাস। গীতরে নাম পরকাশ॥
নানাদি গীত রসময়ে শুনি আনন্দ দেবরায়ে।

এরপর ডাকলেন জগন্নাথ দাসকে।—

পুণি ডাকন্তি সখী আস। শুণ হে জগন্নাথ দাস।
নাম মহিমা গীতরস। কি শাস্ত্র করিছ প্রকাশ'। 'সখী' জগন্নাথ দাস বললেন—
নিত্যস্থলর যে বারতা। উদ্ধব পাদুকা সংহিতা॥
চৌষঠি অধ্যা ভাগবত। সে অটে পুরাণ উকত।
শুণি হরষ শ্রীচৈতন্য। গোলোক প্রেম রসমান॥
সমস্ত ব্যাখ্যান উকত। হরষ শুণন্তি সমস্ত। ৫৯ অধ্যায়

ঈশ্বর দাসের এই বিবরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় শ্রীচৈতন্যই পঞ্চসখাকে ওড়িষী ভাষায় এইসব গ্রন্থ রচনায় উৎসাহ দিয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য জীবনের অন্ত্যপর্বের এই

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকটি সম্পর্কে বঙ্গীয় বিদগ্ধজনেরা প্রায় অন্ধকারে আছেন, তার মূলে রয়েছে তাঁদের সমাদৃত 'ভাবোন্মাদ' তত্ত্ব। শ্রীচৈতন্যপ্রেরণায় কেবল শান্তিপুর ডুবু ডুবু এবং নদেই ভেসে যায় নি, উড়িষ্যাতেও এসেছিল এক নবজাগরণ এবং সেযুগের ওড়িয়া সাহিত্য তারই ফসল— এ সম্পর্কে বঙ্গীয় ভক্ত পাঠকদের কোন সম্যক ধারণা নেই, কেননা তাঁরা ধরে নিয়েছেন শ্রীচৈতন্য শেষ জীবন প্রায় ভাবোন্মাদেই কাটিয়েছেন।

একদিকে বর্তমান বঙ্গীয় পণ্ডিতদের তথ্যানুসন্ধানে এই অনীহা, অপরদিকে বর্তমান ওড়িয়া পণ্ডিতদের অনেকের মধ্যে পঞ্চসখাকে চৈতন্য প্রভাব মুক্ত করে দেখাবার প্রবণতা এর ফলে জমে উঠেছে অপসিদ্ধান্তের পাহাড়। এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বৈষ্ণব সাহিত্য বিশেষজ্ঞ ড বিমানবিহারী মজুমদার। পঞ্চসখা সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য জীবনের অন্ত্যপর্বের সম্পূর্ণ সমন্বয়ী ধর্মকর্মই প্রকাশিত আমাদের এই মতের অনুকূলে তাঁর মন্তব্যটি উদ্ধৃত করি।

"শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এক দল ভক্ত শ্রীচৈতন্যের মুখ দিয়া শূন্যবাদ, একদল যৌগিক বা তান্ত্রিক সাধনা, একদল কৃষ্ণভাব, একদল গোপীভাবের কথা বলাইয়াছেন। উড়িষ্যার অচ্যুতানন্দ ও শ্রীখণ্ডের নরহরি রূপ সনাতন অপেক্ষা শ্রীচৈতন্যের কম অন্তরঙ্গ ছিলেন না, জয়ানন্দও শ্রীচৈতন্যের বেশী পরবর্তী নহেন। এরূপ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকের পক্ষে অচ্যুতানন্দ, নরহরি, জয়ানন্দ প্রভৃতির মত শ্রীচৈতন্যের মত নহে, রূপ সনাতন এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ বর্ণিত মতই সত্য নহে এরূপ নির্দেশ করা নিরাপদ নহে [চৈতন্যচরিতের উপাদান ° প ২২৬]।

কেবল উড়িষ্যায় নয় সমগ্র দক্ষিণ ভারতীয় সমাজে ও সাহিত্যেও চৈতন্য প্রভাব ছিল গভীর ও ব্যাপক। দক্ষিণ ভারতে জৈনধর্মের প্রভাব হ্রাসের অন্যতম কারণ শ্রীচৈতন্য প্রচারিত কৃষ্ণভক্তির প্লাবন। *A History of Kanarese Literature* গ্রন্থে E P. Rice জৈনধর্মের প্রভাব হ্রাসের অন্যান্য কারণের উল্লেখ করে শেষে লিখেছেন "And finally in the sixteenth century, a wave of Vaishnava enthusiasm inspired by Chaitanya preaching the doctrine of Krishna Bhakti, swept over the Peninsula, and completed the alienation of the people from the austere taching of the Jainas" [p 21]। অর্থাৎ—"এবং সর্বশেষে ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্য প্রচারিত কৃষ্ণ ভক্তিবাদের প্রভাবে বৈষ্ণবীয় ভাববন্যা বয়ে গেল দেশের উপর দিয়ে এবং জৈনধর্মের কৃচ্ছ্রতা থেকে জনচিত্তকে সরিয়ে আনল সম্পূর্ণ ভাবে"। এই গ্রন্থেই Popular Devotional Songs শিরোনামায় Rice লিখেছেন "বৈষ্ণব 'দাসে'রা বা ভিক্ষুক গায়কেরা ছোট ছোট ত্রিপদীতে রচিত গান গেয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়ে কৃষ্ণপূজাকে জনপ্রিয় ক'রে তুলেছিলেন। এঁদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন মধ্বাচার্য ও চৈতন্য—যিনি ১৫১০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে দক্ষিণ ভারতের সব বিখ্যাত মন্দির দর্শন করেছিলেন এবং সর্বত্র মানুষকে শিখিয়েছিলেন হরিনাম নিতে।" ["They received their inspiration from Madhvacharya .. and from Chaitanya, who about 1510, visited all the chief shrines

of South India, teaching men everywhere to chant the name of Hari." pg. 57]

এই একই কথা লিখেছেন দক্ষিণ ভারতের স্বনামধন্য ঐতিহাসিক নীলকান্ত শাস্ত্রী —"Popular songs in regale metre by dasas (mendicant singers) was another form of Vaishnava Liturature in Kannada in this period. These singers got their inspiration from Madhvacharya and Vyasaraya, and the visit of Chaitanya to the South in 1510 did much to stimulate the growth of this popular type of song."

[*A History of South India* : pg. 393]

এই দাসগায়কেরা তথাকথিত নিম্নবর্ণের হলেও সমাজে সকল বর্ণের মানুষের শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হয়েছিলেন। *The Folk Songs of Southern India* গ্রন্থে Charles E. Gover সম্পাদকীয় ভূমিকায় জানিয়েছেন, "No questions of caste entered into the matter—None dared to despise the 'Slave of God" [Inroduction, page XIII-XV]

চৈতন্য প্রভাবে ষোড়শ শতকের এই দাস গায়কেরা যে চৈতন্যপন্থী হয়েছিলেন তা বোঝা যায় দক্ষিণ ভারতের মহীশূর কুর্গ অঞ্চলের 'সাতানি' (চৈতন্য=সাতানি) সম্প্রদায়ের ইতিহাস থেকে। সাতানিরা এ অঞ্চলের ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে সংখ্যা গরিষ্ঠতায় দ্বিতীয়। এঁরা হোলিয় ও অন্যান্য নিম্নবর্ণের মানুষের পৌরোহিত্য করেন। এঁরা বিষ্ণুকে কৃষ্ণমূর্তিতে উপাসনা করেন এবং এঁরা চৈতন্যের সম্প্রদায়ভুক্ত। সাধারণতঃ এঁরা বৈষ্ণব মন্দিরে সেবামূলক কাজে নিযুক্ত থাকেন—পুজোর ফুল তোলা, মশাল বহন করা, নগরকীর্তন এই সব কাজ করেন। এঁরা নিজেদের 'বাংলার বৈষ্ণব' বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন।—"The Satani are the next most numerouss religious sect. They are regarded as priests by the Holeya and other inferior castes They are votaries of Vishnu especially in the form of Krishna, and are followers of Chaitanya. As a rule they are engaged in the service of Vaishnava temples, and are flower gatherers, torch bearers, and strolling musicians. They call them seleves Vaishnavas, the Baisnabs of Bengal." [Imperial Gazettee of India—Mysore & Coorg (1908) pg. 48]

উপরিলিখিত তথ্যগুলি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে দক্ষিণ ভারতের ধর্মে সাহিত্যে ও সমাজ জীবনে চৈতন্যপ্রভাব কত গভীর। মহাপ্রভুর দিব্যসঙ্গ লাভের সৌভাগ্য দক্ষিণ ভারতের মানুষের কয়েকবারই হয়েছিল—বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণ সেই দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। ১৫২৯ খ্রীস্টাব্দে অচ্যুতদেব রায়ের রাজত্বকালে যোগীকোট্ট, শিলাশাসনে চৈতন্যদেবকে যে গ্রামদানের কথা বলা হয়েছে, তা চৈতন্যদেবের উপস্থিতিতে হয়ে থাকলে এই দক্ষিণযাত্রা তাঁর জীবনের অন্ত্যপর্বেও কর্মতৎপরতার পরিচায়ক।

এ ছাড়া, শ্রীচৈতন্য ও সমসাময়িক বিভিন্ন ধর্মীয় মহাপুরুষের সাক্ষাৎকার এই অন্ত্যপর্বেরই ঘটনা। বল্লভাচারী সম্প্রদায় গুরু ও পুষ্টি মার্গের প্রবর্তক বল্লভাচার্য

(১৪৭৯-১৫৩১ খ্রীঃ) ও শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎকার-বৃত্তান্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর গ্রন্থের অন্ত্য ৭ পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন।

প্রসিদ্ধ অসমীয়া মহাপুরুষ শঙ্করদেবের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের মিলন বৃত্তান্ত আছে মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়ের তিনখানি প্রাচীন গ্রন্থে—রামচরণ ঠাকুর, দৈত্যারি ঠাকুর ও ভূষণ দ্বিজকবি রচিত তিনখানি 'শঙ্কর চরিত' কাব্যে। দামোদরীয়া সম্প্রদায়ভুক্ত রামকান্ত দ্বিজের গুরুলীলা গ্রন্থেও শঙ্কর চৈতন্যের মিলন প্রসঙ্গ আছে।

ভূষণ দ্বিজকবি লিখেছেন—শঙ্করদেব বৃন্দাবন থেকে শ্রীক্ষেত্রে আসেন এবং সেখানে কিছুদিন থাকেন। এ সময় চৈতন্য গোঁসাইর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, দুজনেই দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকেন—'দুইকো দুই চাহিলা নাহিক সম্ভাষণ'। দ্বিজরাম রায় গুরুলীলায় লিখেছেন—দুজনে দুজনকে অভিবাদন ক'রে 'পূর্বাপর পুছিলন্ত কথা যত যত'। দু'জনে পূর্বাপর কথা হলে বুঝতে হবে উভয়ে উভয়ের পূর্বপরিচিত। ড. বিমানবিহারী মজুমদার বলেছেন, প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে শঙ্করদেব ৩২ বছর বয়সে প্রথমবার তীর্থ করতে বার হন। বারো বছর ভ্রমণের পর ১৫০৭ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে অদ্বৈত আচার্যের সঙ্গে শঙ্করদেবের দেখা হয়ে থাকতে পারে। তিনি অদ্বৈতের নিকট ভাগবত পাঠ করেন। [চৈতন্য চরিতের উপাদান ঃ পৃ. ৫১০] দ্বিজরাম রায় লিখেছেন—শঙ্করদেব তাঁর 'একশরণ' ধর্ম বুঝেছেন চৈতন্যের নিকট।—

শঙ্কর আগে না মাতিলা মহাজ্ঞানী।
কমণ্ডলু জল ঢালি বুঝাইলা আপনি ॥
শঙ্করেও বুঝিলন্ত সেই অনুমানে।
এক যে শরণধর্ম চৈতন্যর স্থানে ॥

আসামের প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে শঙ্কর দ্বিতীয়বার তীর্থভ্রমণে গিয়ে যখন পুরীতে ছিলেন, তখন ১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব হয়। সাধারণত ধরা হয়ে থাকে শঙ্করদেব জ্ঞাননিষ্ঠ সাধক ছিলেন, তাঁর অনুরাগ ছিল দাস্যভাবে, মাধুর্যভাবে নয়। কিন্তু তাঁর লেখা গোপীভাবের ও মধুর রসের উৎকৃষ্ট অনেক পদ অন্য কথা বলে। চৈতন্য নিজেকে গোপীভর্তার চরণকমলের 'দাসদাসানুদাস' বলেছেন। এই দাস্যভাবের সঙ্গে তাঁর মধুর ভাবের কোন অসহযোগ ছিল না। শঙ্করদেবও লোকশিক্ষার্থে দাসভাবের উপর জোর দিলেও গোপীনাথ কৃষ্ণের প্রসঙ্গে মধুর রস ও পরকীয়া রতির কথাও বলেছেন, এবং 'আজু যত নাগরী / করত নয়ন ভারি / মুখ পঙ্কজ মধুপানা—ইত্যাদি পদ লিখেছেন। এক্ষেত্রে তিনি চৈতন্য দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারেন। সেক্ষেত্রে পুরীধামে চৈতন্য জীবনের অন্ত্যপর্বে উভয়ের সাক্ষাৎকারের একটা গূঢ় তাৎপর্য ধরা পড়ে এবং শঙ্কর চৈতন্য সাক্ষাৎকার ঘটনাটি অন্ত্যপর্বের ঘটনা হিসাবে বিশেষ গুরুত্বলাভ করে।

শিখগুরু নানকের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গ আছে ওড়িষী সাহিত্যে ঈশ্বরদাসের চৈতন্যভাগবতে। ঈশ্বরদাসের মতে নানক পুরীতে চৈতন্য মণ্ডলীর সঙ্গে একত্রে কীর্তন ও নৃত্য করেছিলেন।

'শ্রীনিবাস যে বিশ্বম্ভর কীর্তন মধ্যে বিহার
নানক সারঙ্গ এ দুই রূপ সনাতন দুই ভাই,
জগাই মাধাই একত্র কীর্তন করান্ত এ নৃত্য ॥ [৬১ অধ্যায়]

ড. বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন "নানকের জীবনকাল ১৪৬৯ হইতে ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। সুতরাং তিনি শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক। নানকের সহিত শ্রীচৈতন্যের দেখা সাক্ষাৎ হওয়া খুবই সম্ভব। সে সম্বন্ধে শিখদের ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে কোন প্রবাদ প্রচলিত নাই। এক্ষেত্রে ঈশ্বরদাসের বর্ণনা কতদূর সত্য বলা কঠিন।" [চৈতন্যচরিতের উপাদান ঃ পৃ. ৫০০]

নানক যে শ্রীচৈতন্যের জীবনের অন্ত্যপর্বে পুরীতে এসেছিলেন এ সম্পর্কে অবশ্য নানকের জীবনীগ্রন্থে তথ্য পাওয়া যায়। Dr. Gopal Singh তাঁর *Guru Nanak* গ্রন্থে লিখেছেন "The Guru now returned by the river Brahmaputra and proceeded towards Puri on the Bay of Bengal where Vishnu or Krishna is worshipped as Jagannatha or the Lord of the Universe" ...[pg. 32], এর আগে বৃন্দাবনে নানক কৃষ্ণলীলা বিষয়ক অভিনয় দেখেছেন— "When the Guru Visited Vrindavana, another great centre of Hindu Pilgrimage, he saw some showmen enact Krishnalila।" [Ibid. p. 20], এ ঘটনা শ্রীচৈতন্যের বৃন্দাবন ও লুপ্ততীর্থ উদ্ধারের পরবর্তীকালের হওয়াই সম্ভব অর্থাৎ ১৫১৫-১৬ খ্রীস্টাব্দের পরবর্তী। আবার নানকের পুরীভ্রমণ নিঃসন্দেহে ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দের আগেকার ঘটনা, কেননা গোপাল সিংয়ের গ্রন্থে দেখা যায়, পুরী থেকে গুরু পাঞ্জাবে তালবন্দীতে ফিরলেন এবং এরপরই দ্বিতীয়বার তীর্থযাত্রায় বার হলে সৈয়দপুরে ভারত আক্রমণকারী বাবরের বাহিনীর হাতে গুরুনানক এবং তাঁর নিত্যসঙ্গী মর্দানা বন্দী হন (Ibid. pg. 45)। বাবরের ভারতে প্রবেশের ঘটনাটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ এবং ঘটনাকাল ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দ। সুতরাং নানকের পুরী আগমন ১৫১৬ থেকে ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেকার ঘটনা। এই পরিপ্রেক্ষিতে ঈশ্বরদাস উল্লেখিত নানক-চৈতন্য সাক্ষাৎকার ও অন্তরঙ্গতার চিত্রটি অমূলক বলা চলে না।

সম্ভবতঃ বিখ্যাত সন্তগায়ক কবিরের সঙ্গেও চৈতন্যের যোগাযোগ হয়েছিল। অসমিয়া কবি রামচরণ ঠাকুর লিখেছেন- কবিরের মৃতদেহ নিয়ে তাঁর হিন্দু-মুসলমান শিষ্যদের মধ্যে বিবাদ বাঁধে, তখন শ্রীচৈতন্য এসে ওই শব কাঁধে করে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেন।—

চৈতন্য গোসাই হেন কথা শুনিলন্ত।
শীঘ্র বেগ করি তেঁহো খেদি আসিলন্ত ॥
কবিরর শব তুলি কান্ধত লইলন্ত।
চৈতন্য গোসাই তাঙক ভাসালা গঙ্গাত ॥

ড. বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন—"কবির ১৫১৮ খ্রীস্টাব্দে পরলোক গমন করেন বলিয়া কথিত হয়।... শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের বিবরণ (২।১৬।২৭১ ও ২।১৭।২) বিশ্বাস করিলে বলিতে হয় যে শ্রীচৈতন্য তাঁহার সন্ন্যাসের ষষ্ঠ বর্ষে অর্থাৎ ১৫১৫ খ্রীস্টাব্দে শরৎকালে বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করেন ও ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দের ফাল্গুন ও

চৈত্র মাসে কাশীতে ছিলেন। ১৫১৬ ও ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ব্যবধান বেশী নহে। চরিতামৃতের বিবরণ অথবা কবিরের মৃত্যুর তারিখ নির্দেশে দুই-এক বৎসর এদিক ওদিক হওয়া বিচিত্র নহে। সুতরাং কাল হিসাবে এ ঘটনা ঘটা অসম্ভব নহে।"

[চৈতন্য চরিতের উপাদান, পৃ: ৫২৪]

মধ্যযুগীয় ধর্মগুরুদের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের এইসব সাক্ষাৎকারের অনুসরণে অনুসন্ধান চালালে চৈতন্যচরিতের নবদিগন্ত উন্মোচিত হওয়ার সম্ভাবনা। একমাত্র তখনই চৈতন্যজীবনের অন্ত্যপর্ব সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে। তার আগে ভাবোন্মাদ অস্ত্রের খিল তুলে এদিকের পথটি অর্গলিত করা সুবিবেচনার কাজ হবে না।

শ্রীচৈতন্য জীবনের অন্ত্যপর্বের শেষতম ঘটনা তাঁর দেহাবসান। এটি এমন গভীর রহস্যে ঢাকা পড়ে আছে যে এ ঘটনা স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ে আলোচনার যোগ্য। আপাতত আমরা উপরিলিখিত আলোচনার ভিত্তিতে অন্ত্যপর্বের ঘটনাগুলির একটি কালপঞ্জী নির্ণয়ের চেষ্টা করলাম।

শ্রীচৈতন্যজীবনের অন্ত্যপর্ব ১৫১৫ ১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দ

১৫১৫ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	নীলাচল থেকে শ্রীচৈতন্যের বৃন্দাবন গমন।
১৫১৬ খ্রীঃ মার্চ-এপ্রিল	বৃন্দাবন-প্রয়াগের পর কাশীতে অবস্থান।
মে	পুরী প্রত্যাবর্তন। নীলাচল থেকে রূপের গৌড়যাত্রা। সনাতনকে শিক্ষাদান।
১৫১৬-১৮ খ্রীঃ (আনুমানিক)	কাশীতে চৈতন্যকর্তৃক সন্ত কবিরের শবদেহ গঙ্গায় বিসর্জন।
	প্রতাপরুদ্র-কৃষ্ণদেব রায়ে সন্ধি স্থাপন: বিজয়নগর অধিপতি কৃষ্ণদেব রায়ের শ্রীচৈতন্যচরিত্রমহিমা অবগতি।
১৫২০ খ্রীঃ (আঃ	পুরীতে নানক-চৈতন্য সাক্ষাৎকার।
১৫২৬ খ্রীঃ	পুরীতে চৈতন্য-শিবানন্দ সাক্ষাৎকার। শিবানন্দপুত্র কর্ণপুরের জন্ম সম্ভাবনায় চৈতন্য কর্তৃক ভাবী সন্তানের 'পুরীদাস' নামকরণ।
১৫২৬-২৭ খ্রীঃ (আঃ)	গোস্বামীদের প্রচার পরিদর্শনে শ্রীচৈতন্যের দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন গমন।
১৫২৭-২৮ খ্রীঃ	ওড়িষী পঞ্চসখার অন্যতম জগন্নাথ দাসের চৈতন্য শরণ গ্রহণ।
১৫২৯ খ্রীঃ	চৈতন্যদেবকে দক্ষিণী ভক্তদের দক্ষিণ ভারতের দুটি গ্রাম দান। শ্রীচৈতন্যের দক্ষিণ ভ্রমণ (আঃ)।
১৫৩৩ খ্রীঃ	পুরীতে শ্রীচৈতন্য ও বালক পুরীদাস সাক্ষাৎকার। পুরীতে শ্রীচৈতন্য ও শঙ্করদেব সাক্ষাৎকার। চৈতন্য তিরোভাব।

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব রহস্য

শ্রীচৈতন্য জীবনের শেষতম ঘটনা তাঁর দেহবসান। পঞ্চদশ ষোড়শ শতকের বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রাণ পুরুষ কি ভাবে দেহত্যাগ করলেন, তা গভীর রহস্যে আবৃত। ভাবী গবেষকের পক্ষে এটি একটি গভীর ও ব্যাপক অনুসন্ধানের বিষয়।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ এ সম্পর্কে এই মাত্র বলেছেন 'চৌদ্দশতপঞ্চান্নে হৈলা অন্তর্ধান' (আদি। ১৩)। কখন কি ভাবে কোথায় এ ঘটনা ঘটল, সে সম্পর্কে কৃষ্ণদাস একটি কথাও বলেন নি। বৃন্দাবনদাসও এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব। তাত্ত্বিকেরা এ বিষয়ে পরস্পর বিরোধী নানা কথা বলেছেন। কেউ বলেছেন, লোকান্তরের ব্যাপারটি বেদনাদায়ক ও অসহনীয় ব'লেই জীবনীকারেরা এ ব্যাপারের বর্ণনা দেন নি। কেউ বলেছেন, ঈশ্বরাবতার শ্রীচৈতন্যের সাধারণ লৌকিক জনের মত লৌকিক মৃত্যু হতে পারে না। কারো মতে শ্রীচৈতন্য জগন্নাথ বিগ্রহের মধ্যে অন্তর্হিত হন। আবাব কারো মতে তিনি সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে সমুদ্রেই বিলীন হয়ে যান।

এক এক করে এই মতগুলির আলোচনা করা যাক। প্রথম কথাই হল, বৃন্দাবন দাস বা কৃষ্ণদাস কবিরাজ কি এ ব্যাপারে আদৌ নীরব ছিলেন? ড. বিমানবিহারী মজুমদার ও ড. সুকুমার সেনের মত বিদগ্ধজনের মত হল, চৈতন্যভাগবতের পরিসমাপ্তি অত্যন্ত আকস্মিক। সুতরাং বৃন্দাবনদাসের মূল পুথির শেষাংশে লোকান্তর বর্ণনা ছিল না—একথা জোর দিয়ে বলা চলে না। চৈতন্যচরিতামৃত সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। দ্বিতীয়তঃ কেবল বেদনাদায়ক ব'লেই কি লোকান্তরের বর্ণনা না দিয়ে থাকতে পারতেন কৃষ্ণদাস? কৃষ্ণদাস কবিরাজ ছিলেন তত্ত্বজ্ঞানী এবং তিনি ভালো ভাবেই জানতেন চৈতন্যের প্রকটলীলার পরে আছে তাঁর অনন্ত অপ্রকটলীলা। প্রকট থেকে অপ্রকটে উত্তরণ তাত্ত্বিকের কাছে খুব বেদনাদায়ক হতে পারে না, কেননা তত্ত্বজ্ঞানী ভক্ত প্রভুর ইচ্ছা মেনে নিয়ে তাঁর অপ্রকট লীলারসও আস্বাদ করতে পারেন।

দেবকল্প মানবের লৌকিক মৃত্যুর অসম্ভাব্যতা সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, এই মতবাদীরা প্রাচীন অবতারদের জীবনকথা ভুলে যান। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম মৃত্যু সম্পর্কে ভাগবতে কোন অলৌকিকতা নেই। বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে নিতান্ত লৌকিক ভাবেই তাঁর জন্ম এবং জরা ব্যাধের নিক্ষিপ্ত তীরের আঘাতে তাঁর লৌকিক মৃত্যু। জন্ম মৃত্যুর এই লৌকিক ও স্বাভাবিক বর্ণনায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গৌরব হ্রাস পায় নি। ভাগবত ভক্ত বৈষ্ণবেরা চৈতন্যের লৌকিক মৃত্যু বর্ণনায় ক্ষুব্ধ হবেন কেন?

সৌভাগ্যবশতঃ চৈতন্য জীবনীকারদের মধ্যে কেউ কেউ চৈতন্যের লোকান্তরের বাস্তব সম্মত বিবরণ দিয়েছেন। জয়ানন্দে আছে—

আষাঢ় বঞ্চিতা (পঞ্চমী?) রথ বিজয় নাচিতে।
ইটাল বাজিল বাম পায় আচম্বিতে॥
নরেন্দ্রের জলে সর্ব পারিষদ সঙ্গে।
চৈতন্য করিল জলক্রীড়া নানারঙ্গে॥

চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠি দিবসে।
সেই লক্ষে টোটাএ শয়ন অবশেষে॥
পণ্ডিত গোসাঞিকে কহিল সর্বকথা।
কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্বথা॥
মায়া শরীর থাকিল ভূমে পড়ি।
চৈতন্য বৈকুণ্ঠ গেলা জম্বুদ্বীপ ছাড়ি॥ [জয়ানন্দ : চৈ. ম.: উত্তরখণ্ড]

বলা হয়ে থাকে নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবেরা এই লৌকিক লোকান্তর বর্ণনায় জয়ানন্দ-কাব্যকে অনাদর ক'রে থাকেন। নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব বলতে কাকে ধরবু, কাকে বাদ দেব, তার মাপকাঠিই বা কি হবে? আধুনিক সমালোচকদের এই জাতীয় ধারণার ভিত্তি কি, তা বোঝা যায় না। নিত্যানন্দবংশাবতংস সিদ্ধান্ত বাচস্পতি শ্যামলাল গোস্বামি-প্রভু তাঁর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর (৪২১ চৈতন্যাব্দে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) গ্রন্থে জয়ানন্দ পরিবেশিত তথ্যটি যথেষ্ট সমাদরে গ্রহণ ক'রে গ্রন্থ সমাপ্তিতে লিখেছেন - "একদিন রথাগ্রে নৃত্য করিতে করিতে প্রভুর পদনখে আঘাত লাগিল। উক্ত আঘাতকে ছল করিয়া প্রভু লোকলীলা সংবরণের অভিলাষ করিলেন" (পৃ. ৬৩৫)।

সুতরাং জয়ানন্দের কাব্যে চৈতন্য তিরোভাবের বাস্তব একটি কারণ নির্দেশিত হওয়ায় গোঁড়া বৈষ্ণব সমাজে কাব্যটি উপেক্ষিত হয়েছে, এমত ঠিক নয়। আসলে এই জাতীয় বিচার বিভ্রাটের মূলে আছে তত্ত্বজ্ঞান নয়, তত্ত্বাভিমান। এই সব তত্ত্বাভিমানী মনে করেন লৌকিক মৃত্যু হলে মহাপুরুষের মহিমার অপহ্নব হয়। এঁরা ভুলে যান 'কৃষ্ণের যতেক লীলা সর্বোত্তম নরলীলা'- এক্ষেত্রে 'নর' অর্থে স্বাভাবিক মানুষই উদ্দিষ্ট। নরলীলায় তাঁর জন্ম মানবের মত, মানবীমায়ের গর্ভে, মৃত্যুও হয় সাধারণ মানুষের মত। মধ্বাচার্য-সম্প্রদায়ে এই কথাটি বলা হয়েছে স্পষ্টভাবে -- "The honest teacher Sri Madhvacharya has said, that when Gods incarnate themselves on earth, they appear and act like human beings. In explaining the text মানুষং চ স্বাধ্যায প্রবচনে চ of the Taittiriya Upanishad, he says– মানুষং মানুষো ধর্মো। দেবা অপি হি মানুষে। মনুষ্যবৎ প্রবর্তন্তে। নৈবৈশ্বর্য প্রকাশিন ইতি চ॥ though he (Sri Madhvacharya) claimed to be an incarnation of Vayu, he acted only like a human being on earth and said that was the rule of conduct of the Devas while on earth." [B. Venkoba Rao, pg.xxi—xxii 'Introduction to 'Sri Vyasayogicaritam']

এবার চৈতন্যচরিতে লোকান্তর বর্ণনার দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক।
লোচনদাসের চৈতন্য মঙ্গলে আছে—

আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে। নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিশ্বাসে।
সত্যত্রেতা দ্বাপর সে কলিযুগ আর। বিশেষতঃ কলিযুগে সংকীর্তন সার॥
কৃপা কর জগন্নাথ পতিত পাবন। কলিযুগ আইল এই দেহ ত শরণ॥
এবোল বলিয়া সেই ত্রিজগত রায়। বাহু ভিড়ি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ায়।

তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে। জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে ॥
গুঞ্জাবাড়ীতে ছিল পাণ্ডা যে ব্রাহ্মণ। কি কি বলি সত্বরে সে আইল তখন ॥
বিপ্রে দেখি ভক্ত কহে শুনহ পড়িছা। ঘুচাহ কপাট প্রভু দেখি বড় ইচ্ছা ॥
ভক্ত আর্তি দেখি পড়িছা কহয়ে কথন। গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে প্রভুর হৈল অদর্শন ॥
সাক্ষাতে দেখিল গৌর প্রভুর মিলন। নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্বজন ॥
এবোল শুনিয়া ভক্ত করে হাহাকার। শ্রীমুখচন্দ্রিমা প্রভুর না দেখিব আর ॥…
শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজা শুনিল শ্রবণে। পরিবার সহ রাজা হরিল চেতনে" ॥

[রাধানাথ কাবাসী সম্পাদিত চৈ. ম.ঃ শেষখণ্ড, ৩১০-৩১৯]

ঈশান নাগরের অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থে আছে

একদিন গোরা জগন্নাথে নিরখিয়া। শ্রী মন্দিরে প্রবেশিল 'হা নাথ' বলিয়া ॥
প্রবেশ মাত্রেতে দ্বার স্বয়ং রুদ্ধ হৈল। ভক্তগণ মনে বহু আশঙ্কা জন্মিল ॥
কিছুকাল পরে স্বয়ং কপাট খুলিল। গৌরাঙ্গাপ্রকট সভে অনুমান বৈল ॥

(একবিংশ পরিচ্ছেদ)

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে নরহরি চক্রবর্তী চৈতন্য অন্তর্ধানের স্থান নির্ণয় ক'রে লিখেছেন, মধুঠাকুর নরোত্তমকে বলছেন—

ওহে নরোত্তম এই স্থানে গৌরহরি। না জানি পণ্ডিতে কি কহিল ধীরি ধীরি ॥
প্রবেশিলা এই গোপীনাথের মন্দিরে। হৈলা অদর্শন পুনঃ না আইলা বাহিরে ॥

[অষ্টম পরিচ্ছেদ]

ওড়িষী সাহিত্যেও চৈতন্য তিরোধান সম্পর্কে বিচিত্র মূল্যবান তথ্য আছে।

শ্রীচৈতন্যের ওড়িষী পঞ্চশিষ্য বা পঞ্চসখার অন্যতম অচ্যুতানন্দ শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথ অঙ্গে লীন হওয়ার কথা লিখেছেন—

চৈতন্য ঠাকুর মহানৃত্যকার রাধা রাধা ধ্বনি কলে।
জগন্নাথ মহাপ্রভু শ্রীঅঙ্গে বিদ্যুন্‌ প্রায় মিশি গলে ॥ (শূন্য সংহিতা ৯)

অন্যত্র অচ্যুতানন্দ লিখেছেন

কল্পবট মূলে নীল সুন্দর গিরিরে
সুন্দর রূপরে বিজে শঙ্খচক্র করে ॥
চিহ্নিলে চৈতন্য যে ব্রহ্মাণ্ড কর্তা হরি।
কলারে কলা মিশিলা নাহিলা সে বারি ॥

(শূন্যসংহিতা, তৃতীয় অধ্যায়, প্রথম ভাগ)'

দিবাকর দাস তাঁর জগন্নাথ চরিতামৃত কাব্যে লিখেছেন-

মহাপ্রভু— বিচার কলে হৃদয়র। এ কলিকাল বলীয়ার।
থিবার উচিত নুহই। নিজধামকু যিবি মুহিঁ।
এমন্ত ভাবি শ্রীচৈতন্য। শ্রীজগন্নাথ অঙ্গে লীন ॥
গোপন হোইলে স্বদেহে। দেখি কাহার দৃষ্টি নোহে ॥
পূর্বে যহিরু আসিথিলে। লেউটি সে অঙ্গে মিশিলে' ॥

[সপ্তম অধ্যায়]

ঈশ্বরদাসের চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে আছে, চন্দনযাত্রার সময় ভাবাবিষ্ট শ্রীচৈতন্য

জগন্নাথকে চন্দন দেবার সময় তাঁর হাত থেকে চন্দনপাত্র পড়ে যায় এবং শ্রীচৈতন্য শ্রীজগন্নাথের বিস্তৃত শ্রীমুখে প্রবেশ করেন এবং জগন্নাথ বিগ্রহের গর্ভে লীন হয়ে যান।

ঈশ্বরদাস তাঁর গ্রন্থের পরিশেষে একটি অধ্যায় (৬৫ অধ্যায়) সংযোজিত ক'রে লিখেছেন, জগন্নাথ মন্দিরের মুক্তি-মণ্ডপে 'চৈতন্য ভাগবত' পাঠ শুনে সকলে যখন গ্রন্থকারের প্রশংসা করছেন সেই সময় মহাপ্রভুর সন্ন্যাসীপার্ষদ বাসুদেব তীর্থ উপস্থিত ভক্তবৈষ্ণবদের কথা মানলেন না,—প্রভু অঙ্গে চৈতন্য মিশি। তীর্থংক মনকু ন আসি ॥
বৈষ্ণবে প্রমাণ করন্তি। সন্ন্যাসী কেভেঁ ন মানন্তি ॥

মণ্ডপের এক প্রান্তে ঈশ্বরদাসকে দেখতে পেয়ে তিনি বললেন, শ্রীচৈতন্য জগন্নাথ অঙ্গে লীন হয়েছেন একথা লিখলে কেন?—

শ্রীজগন্নাথ অঙ্গে লীন। কাহুঁ লেখিল এ বচন।

তখন ঈশ্বরদাসের মুখে কথা আসেনা। শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরদাস স্বীকার করলেন শ্রীগুরুবচনে তিনি একথা লিখেছেন এবং তত্ত্বজ্ঞানের দিক থেকেই এ ঘটনা ধর্তব্য।

বোলই শূণিমা গোসাঁই। চিত্তকু বোধ যাউ নাহিঁ।
তাহিঁ কি প্রবোধ কহিবি। সমস্তে শূণ আত্মা ভাবি।
এথকু শ্রীগুরুবচন। শূন্যে দর্শন তত্ত্বজ্ঞান।
দর্শনে প্রভু আজ্ঞা হোই। সভারে শূন্যে শূনিলই।

শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথ অঙ্গে লীন হওয়ার কথা মন্দিরের ভিতর থেকে কেউ উচ্চরবে ঘোষণা করলে তা আকাশবাণী রূপে গ্রহণ করতে কোন বাধা নেই, তত্ত্বের দৃষ্টিতে ঠিকই আছে। চৈতন্যকে জগন্নাথের অভিন্ন ব'লে মনে করলে চৈতন্যের জগন্নাথে লীন হওয়ায় তত্ত্বের দিক থেকে অস্বাভাবিক কিছু নেই। কিন্তু এতো আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন! চৈতন্যের মায়াশরীরের কি হলো? ঈশ্বর দাস জানিয়েছেন

শ্রীজগন্নাথ কলেবর। একাত্মা একাঙ্গ শরীর।
সমস্তে এমন্ত দেখন্তি। মায়া শরীর ন জাণন্তি ॥
চৈতন্য পিণ্ড সিংহাসন। দেখন্তি ত্রৈলোক্য মোহন।
ক্ষেত্র পালঙ্কু আজ্ঞা দেই। এ পিণ্ড নিঅ বেগ কই ॥
অন্তর্ক্ষে নেই গঙ্গাজল। মেলিণ দিঅ ক্ষেত্রপাল ॥
শ্রীজগন্নাথ আজ্ঞা পাই। অন্তর্ক্ষে নেলে শব বহি ॥
গঙ্গারে মেলি দেলে শব। সে শব হোইলাক জীব।
চৈতন্য রূপ প্রকাশিলে। গঙ্গারে লীন হোই গলে ॥
কেহু ন জানে এহু রস। ভক্তঙ্ক মুখরে প্রকাশ ॥
লেখন নাহিঁ শাস্ত্র পোথা। অত্যন্ত গুপ্ত এহু কথা ॥
এহা ন জাণি বিদুজন। য়েকা জাণন্তি সংকর্ষণ ॥
সুসাধু জ্ঞানী এ জাণন্তি। গতাগতিকু বিস্মরন্তি ॥ (৬৫ অধ্যায়)

অর্থাৎ, জগন্নাথের সামনেই চৈতন্য দেহ পড়েছিল। তখন জগন্নাথের আজ্ঞায় শবদেহ অন্তরীক্ষে (কাঁধে করে?) বহন ক'রে নিয়ে গিয়ে গঙ্গায় (প্রাচীনদীতে) বিসর্জন

দেওয়া হল। এ অতি গোপন কথা। কেবল সুসাধু জ্ঞানীরা একথা জানতেন কিন্তু কালক্রমে লোকে একথা বিস্মৃত হলো।

৬৪ অধ্যায়ে ঈশ্বর দাস লিখেছেন জগন্নাথের গায়ে চৈতন্য চন্দন লেপন করলে জগন্নাথ সন্তুষ্ট হয়ে মুখ ব্যাদান করলেন এবং সেই মুখ-গহ্বরের মধ্যে চৈতন্য অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তখন জগন্নাথ চৈতন্যের রূপ পরিগ্রহ করলেন। সব শুনে রাজার ক্রোধের সীমা রইল না ঃ 'রাজন ক্রোধ কে কহিব। তাহা জানিলে বাসুদেব'। বাসুদেব (জগন্নাথ) নিজেই তখন প্রতাপরুদ্র ও নিত্যানন্দকে বললেন, 'তো দুহু ক্রোধ দূর কর। চন্দনযাত্রা মোর সার'। [৬৪ অধ্যায়] রাজা বাইরে এসে সকলকে সান্ত্বনা দিলেন। সকলে 'ক্রোধ' সম্বরণ করলেন 'সমস্তে ক্রোধ সাম্ভালিলে'।

ওড়িআ কবি গোবিন্দ প্রণীত সংস্কৃত চৈতন্যচরিত 'গৌর কৃষ্ণোদয়' কাব্যে (অষ্টাদশ সর্গে) আছে—মাঘ মাসে মহাপ্রভু স্বধামে প্রস্থানে ইচ্ছুক হলেন—'অভূৎ যাতুকামঃ স্বধাম'। ফাল্গুনের শুক্লা একাদশীতে তিনি 'একনিষ্ঠো বভূব'। সমুদ্র তীরে কুটীরে তিনি সমাধি মগ্ন হলেন। পাঁচদিন এইভাবে কাটল। পঞ্চম দিনে সন্ধ্যা-বেলায় সমাধি ভেঙে উঠে তিনি সকলকে ডেকে পাঠালেন। শ্রীকৃষ্ণ-নাম গান আরম্ভ হল।

মহাপ্রভু একটি শ্লোক আবৃত্তি করলেন, তারপরই 'ক্ষৌণীং ত্যক্ত্বা ক্ষণরুচিরিবান্ত-র্দধে গৌরকৃষ্ণঃ'—ক্ষণ প্রভার ন্যায় গৌরকৃষ্ণ অন্তর্হিত হলেন।

ওড়িআ কবি সদানন্দ কবিসূর্য ব্রহ্ম তাঁর 'প্রেমতরঙ্গিনী' কাব্যে চৈতন্যের অন্তর্ধানের বিষয়ে লিখেছেন—'অষ্ট চালিশ বরষে অন্তর্ধন টোটা গোপীনাথ স্থানে' (৩৬ অধ্যায়)।

চৈতন্যের অন্তর্ধান বিষয়ে এই সব তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে অন্তর্ধানের স্থান কাল ও ধরন সম্পর্কে নানাজনের নানা মত। স্থান সম্পর্কে বিভিন্ন মত ঃ

১. জগন্নাথ মন্দির	বলেছেন অচ্যুতানন্দ, দিবাকর দাস, ঈশ্বর দাস, ঈশান নাগর।
২. গুণ্ডিচা বাড়ী	বলেছেন লোচন দাস।
৩. টোটা (গোপীনাথ ?)	বলেছেন জয়ানন্দ।
৪. গোপীনথের মন্দির	বলেছেন নরহরি ও সদানন্দ।
৫. সমুদ্রতীরে কুটীর	বলেছেন গোবিন্দ।

সময় তারিখ সম্পর্কে বিভিন্ন মত ঃ

১. বৈশাখ মাস, সন্ধ্যা	
২. বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়া	বলেছেন ঈশ্বর দাস।
৩. আষাঢ় মাসের শুক্লা সপ্তমী রাত দশটা	বলেছেন জয়ানন্দ।
৪. আষাঢ় মাসের শুক্লা সপ্তমী, রবিবার বেলা তৃতীয় প্রহর	বলেছেন লোচনদাস।
৫. ফাল্গুনী পূর্ণিমা, সন্ধ্যাবেলা	বলেছেন গোবিন্দ।

দেহাবসানের ধরন সম্পর্কে বিভিন্ন মত ঃ

১. প্রতাপরুদ্রের উপস্থিতিতে জগন্নাথ অঙ্গে লীন হওয়া	বলেছেন অচ্যুতানন্দ।
২. সবার অলক্ষ্যে জগন্নাথ বিগ্রহে বিলীন হওয়া	বলেছেন দিবাকর দাস।

৩. জগন্নাথের হা-করা মুখের মধ্যে অদৃশ্য হওয়া — বলেছেন ঈশ্বর দাস।
৪. বাঁ পায়ে মারাত্মক আঘাতের ফলে মৃত্যু — বলেছেন জয়ানন্দ।
৫. গুণ্ডিচা বাড়ীতে অদৃশ্য হওয়া এবং জগন্নাথ অঙ্গে লীন হওয়া — বলেছেন লোচনদাস।
৬. জগন্নাথ মন্দিরের অভ্যন্তরে অদৃশ্য হওয়া — বলেছেন ঈশান নাগর।
৭. ভক্ত অনুগামীদের সামনে সমুদ্রতীরে বিদ্যুৎ ঝলকের মত অন্তর্হিত হওয়া — বলেছেন গোবিন্দ।

তিরোধানের স্থান কাল ও ধরন নিয়ে এত মতান্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত অবধারিত হয়ে পড়ে যে এই সব বর্ণনার কোনটিই সম্পূর্ণ সত্য নয়, কোন কোনটি আংশিক সত্য হলেও হতে পারে। একটি ব্যাপার কিন্তু নিশ্চিত। চৈতন্যের অনুগামীরা তাঁর দেহ পাননি। ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতীর দাক্ষিণ ভারতীয় শিষ্য ড. সচ্চিদানন্দ যথার্থ বলেছেন—"Now the puzzling question is, as to the whereabouts of his body. Had his followers got possession of it? It is very difficult to say anything on the point. The dead bodies of all the followers of Sri Chaitanya, almost without a single exception, have been buried with great caution and zealous care, and temples have been raised over their graves, which are till now the object of daily worship···The King would have built a second Jagannath Temple over the body of his God Sri Chaitanya. His followers would have guarded and worshipped it with all the fervour of their hearts. The room in which he lived is itself an object of worship and is constantly visited by Hindus in their thousands with reverence and affection. His tomb would have been the most consolatory possession of the bereaved King and the hundreds of Sri Chaitanya's weeping followers many of whom died of unbearable grief at his passing away.

[*Sri Chaitanya Mahaprabhu*, Ist edn. pg. 215-6]

অর্থাৎ—"সবচেয়ে হতবুদ্ধিকর প্রশ্ন হল, তাঁর দেহের কি হল? তাঁর অনুগামী ভক্তরা কি তাঁর দেহ হাতে পেয়েছিল? এ ব্যাপারে কিছু বলা খুবই কঠিন। শ্রীচৈতন্যের প্রায় প্রতিটি পার্ষদের দেহ অতিযত্নে সমাহিত হয়েছে এবং সমাধির উপর মন্দির তুলে নিত্য পূজার ব্যবস্থা করা হয়েছে।...রাজা হয়ত তাঁর ভগবান শ্রীচৈতন্যের দেহের উপর আরেকটি জগন্নাথ মন্দির তুলতেন। অনুগামী ভক্তরা সে সমাধিকে চোখের মণির মত রক্ষা করত ও পূজো করত। যে ঘরটিতে তিনি থাকতেন, সে ঘরখানি (গম্ভীরা)-তে আজও হাজার হাজার হিন্দু অনবরত আসছেন শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্ঘ্য নিয়ে; ঘরখানিই পূজার সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে। তাঁর সমাধি থাকলে, তা হতো শোকার্ত রাজার মস্ত সান্ত্বনার স্থল। তাঁকে হারিয়ে তাঁর শত শত পার্ষদের অনেকে অসহনীয় শোকে কাঁদতে কাঁদতে ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন; চৈতন্য-সমাধি তাঁদেরও হতো মস্ত বড় সান্ত্বনা।"

এমন কি হতে পারে যে,চৈতন্যদেবের দেহ হাতে পেয়েছিল রাজা প্রতাপরুদ্রের শক্তিশালী কোন প্রতিপক্ষ, এমন প্রতিপক্ষ যে বা যারা প্রতাপরুদ্রকে সরিয়ে সিংহাসন দখল করার ইচ্ছা পোষণ করত, রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য খুনও করতে পারত এবং রাজার শত্রুপক্ষের সঙ্গে হাত মেলাতেও ইতস্ততঃ করত না ? এ রকম ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের পক্ষে যুদ্ধে পরাজয় এবং জাতির সামরিক মর্যাদাহানির জন্য রাজার বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলা অথবা সব কিছুর জন্য রাজা ও চৈতন্যকে দায়ী করা কি অসম্ভব ছিল ?

এর উত্তর পেতে হলে সে-কালের ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কে অবহিত হতে হবে।

শ্রীচৈতন্য ১৫১০ খ্রীস্টাব্দে পুরীতে এসেছিলেন। সেই সময় উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। কৃষ্ণদেব রায় ১৫০৯ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে বসার সময় থেকেই উভয় রাজ্যের মধ্যে ছোটখাট যুদ্ধ বিগ্রহ চলছিল এবং এ কারণে ১৫০৯ খ্রীস্টাব্দ থেকেই প্রতাপরুদ্র ছিলেন দাক্ষিণে।

১৫১০ খ্রীস্টাব্দের প্রথমদিকে শ্রীচৈতন্য তীর্থ পর্যটনে বার হয়ে মোটামুটি উপকূল ভাগ ধরে পুরী থেকে কন্যাকুমারী হয়ে দ্বারকায় পেঁাছেছিলেন এবং সেখান থেকে নর্মদার তীর বরাবর তিনি পুরীতে ফিরে আসেন ১৫১২ খ্রীস্টাব্দে।

তার আগেই, প্রতাপরুদ্রের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহে'র সেনাদল উড়িষ্যার উত্তর সীমানা অতিক্রম করে। এ সম্পর্কে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক N. B. Roy তাঁর Ala-ud-din Hussain Shah প্রবন্ধে লিখেছেন—

"According to the Madla Panji, the chronicle of the Jagannath temple, Shah Ismail Ghazi issued out of his base at Mandaran in Arambagh district about 1508 9 and swept onward in a lightning campaign to Puri, raiding Jajpur and Katak on the way, and distroying many Hindu temples. The resounding victory was celebrated by the issue of coins stamped in the name of Jajnagar: Orissa. At the news of the sudden burst of the Muslim army, Gajapati Prataprudra returned from the campaign in the South and drove back the invading force until he reached Mandaran near Arambagh. The fortress was beseized by the exultant Oriya army, but they failed to take it owing to the treachery of an officer named Govinda Vidyadhar"

অর্থাৎ—"জগন্নাথ মন্দিরের নথি 'মাদলা পাঞ্জী'তে আছে, ১৫০৮-৯ খ্রীস্টাব্দে আরামবাগ জেলার মন্দারণ শিবির থেকে বেরিয়ে শাহ ইসমাইল গাজী বিদ্যুৎগতিতে যাজপুর-কটকে অভিযান চালিয়ে বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস ক'রে পুরী পর্যন্ত এগিয়ে যান। এই যুদ্ধ জয়ের স্মারক মুদ্রায় যাজনগর উড়িষ্যার উল্লেখ করা হয়। মুসলমান সেনাদলের এই আকস্মিক অভিযানের খবর পেয়ে গজপতি প্রতাপরুদ্র তাঁর দাক্ষিণ অভিযান থেকে ফিরে আসেন এবং আগ্রাসী মুসলিম বাহিনীর পিছু ধাওয়া ক'রে আরামবাগের নিকটে মন্দারণ পর্যন্ত চলে আসেন। বিজয়ী ওড়িয়া বাহিনী মন্দারণ দুর্গ অবরোধ করে কিন্তু গোবিন্দ বিদ্যাধর নামক জনৈক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর বিশ্বাসঘাতকতায় শেষ পর্যন্ত দুর্গটি অধিকার করতে ব্যর্থ হয়।"

অধ্যাপক প্রভাত মুখার্জী জানিয়েছেন—"গোবিন্দ কটক দুর্গের অধ্যক্ষ ছিল। উড়িষ্যার পতনের জন্য যে বিশ্বাসঘাতক গোষ্ঠী আংশিকভাবে দায়ী, তাদের প্রধান এই গোবিন্দ।"

"Govinda was the commandant of the fort of Cuttack. He was the first of that group of traitors who were partly responsible for the fall of Orissa." [*The Gajapati Kings of Orissa*]

প্রতাপরুদ্র বিশ্বাসঘাতক বিদ্যাধরকে শাস্তি দেন নি, তাকে উচ্চতর পদ ও ধন সম্পদ দান ক'রে তার মন জয় করতে চেয়েছেন। 'মাদলা পাঞ্জী'তে আছে "বহুত সৎকৃত তাহাংকু রাজা কলে। কনক স্নাহান করাইলে, বিদ্যাধর পদরে রাজা তাহাংকু সাড়ী দেলে, পাত্র কলে। তাহাংকু মূলে রাজা রাজ্যভার দেলে।" [মাদলা পাঞ্জী, প্রাচী সংস্করণ, পৃ. ৫২-৫৩]

রাজা তাকে কনক-স্নান করিয়ে 'রাজা'র পদ দান করলেন। 'রাজ্যভার' কথাটির অর্থ অধ্যাপক প্রভাত মুখোপাধ্যায় করেছেন 'সমগ্র রাজ্যের ভার' [***Medieval Vaishnavism in Orissa.*** **pg. 173**] এবং বলেছেন মাদলা পাঞ্জীর এ তথ্য অনৈতিহাসিক। এ বিষয়ে আমরা কিছু নতুন তথ্য পেয়েছি যাতে দেখা যায়, সমগ্র রাজ্যের নয়, কলিঙ্গ প্রদেশ বা রাজ্যের ভার দেওয়া হয়েছিল বিদ্যাধরকে।

বিজয়নগরাধিপতি কৃষ্ণদেব রায়ের গুরু শ্রী ব্যাসরায়ের সংস্কৃত জীবনী 'শ্রীব্যাসযোগিচরিতম্' [রচনাকাল আঃ ১৫৩৫ খ্রীঃ] গ্রন্থে বিদ্যাধর পাত্রকে 'কলিঙ্গাধিপতি' রূপে উল্লেখ করা হয়েছে—'বিদ্যাধর পাত্র নামা কলিঙ্গাধিপতিঃ' [পঞ্চম অধ্যায়]। এবং বলা হয়েছে কলিঙ্গাধিপতি বিদ্যাধর পাত্র কৃষ্ণদেব রায়ের নিকট একটি দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ প্রেরণ করেন; গুরু শ্রীব্যাসরায় অতিদ্রুত ওই গ্রন্থের একটি সুন্দর ভাষ্য রচনা করলে কৃষ্ণদেব রায় চমৎকৃত হন। 'শ্রীব্যাসযোগিচরিতম্' এর সম্পাদক **B. Venkoba Rao** এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, কলিঙ্গাধিপতির উল্লেখের ধরন দেখে বোঝা যায় কলিঙ্গ যুদ্ধ তখন শেষ হয়েছে—**"The manner of the reference to the lord of Kalinga shows that the Kalinga war was then over."** [***Introduction,*** **para 132**]

বিদ্যাধর পাত্র কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে ঠিক কোন্ সময়ে এই ধরনের যোগাযোগ করেছিলেন, সে বিষয়ে আমরা অবশ্য শ্রীযুক্ত রাওয়ের মত নিশ্চিত হতে পারি না। বিদ্যাধরের মত উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও অভিসন্ধিপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে কলিঙ্গ যুদ্ধ চলার সময়ও কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রেখে চলা অসম্ভব নয়। বিদ্যাধরের বিশ্বাসঘাতকতায় প্রতাপরুদ্রের পক্ষে মন্দারণ দুর্গ দখল করা সম্ভব হয় নি। কলিঙ্গ যুদ্ধের হতাশাব্যঞ্জক ফলাফলের পিছনেও কলিঙ্গাধিপতি বিদ্যাধরের প্রতাপরুদ্র-বিরোধী ভূমিকা থাকা অসম্ভব নয়।

কলিঙ্গ যুদ্ধে কৃষ্ণদেব রায় ১৫১৪ খ্রীস্টাব্দে উদয়গিরি দখল করলেন এবং ১৫১৫ খ্রীস্টাব্দে জয় করলেন গুন্টুর জেলার কোণ্ডবীড়ু। তিনি রাজপুত্র বীরভদ্রকে বন্দী করলেন এবং সীমৃহাচলম্ পর্যন্ত এগিয়ে এলেন। প্রতাপরুদ্র অপমানজনক শর্তে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। গোদাবরীর দক্ষিণে সমস্ত রাজ্য তাঁর হাতছাড়া হয়ে গেল।

এইভাবে উড়িষ্যার রাজনৈতিক মর্যাদা হ্রাসের পিছনে চৈতন্য বা তাঁর ধর্ম কতটা

দায়ী অথবা আদৌ দায়ী কিনা তা নিয়ে মতভেদ থাকাই স্বাভাবিক। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ওড়িয়া জাতির সামরিক দক্ষতা হ্রাসের জন্য চৈতন্য প্রচারিত ধর্ম এবং ওই ধর্মের প্রতি রাজা প্রতাপরুদ্রের অনুরাগকে দায়ী করেছেন। সাম্প্রতিক কালেও উড়িষ্যার বিদ্বৎ সমাজের একাংশ উড়িষ্যার রাজনৈতিক স্বাধীনতা লোপের জন্য চৈতন্যকে দায়ী ক'রে থাকেন। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, দেশকে যারা ভিতর থেকে দুর্বল করে দিয়েছিল, সেই বিশ্বাসঘাতক গোবিন্দ বিদ্যাধর বা অন্যান্যদের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁরা একটি কথাও বলেন না।

উড়িষ্যার ইতিহাস থেকে জানা যায়, এই গোবিন্দ বিদ্যাধর অত্যন্ত হীন চরিত্রের মানুষ ছিল এবং প্রতাপরুদ্রের অনুগ্রহে অর্থ ও ক্ষমতা লাভ ক'রে সে ১৫৪০ খ্রীস্টাব্দে প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর পরেই তাঁর দুই পুত্র কালুয়া দেব (১৫৪০-৪১ খ্রীঃ) কে হত্যা ক'রে সিংহাসন দখল করে। আবার বিদ্যাধরের নাতি নরসিংহকে হত্যা ক'রে তাঁর সেনাপতি মুকুন্দদেব হরিচন্দন সিংহাসনে বসে। এইভাবে গুপ্ত হত্যা ও অন্তর্ঘাতে দেশ ও জাতি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু পূর্বোক্ত পণ্ডিতেরা এদিকে দৃক্‌পাত না ক'রে রাখালদাসের মন্তব্যটিকে নির্বিচারে গ্রহণ ক'রে ওড়িয়া জাতির পতনের জন্য চৈতন্য ও চৈতন্যধর্মকে দায়ী ক'রে থাকেন।

আমরা অবশ্য নিশ্চিত ক'রে বলতে পারি না যে, গোবিন্দ বিদ্যাধর বা তার সমগোত্রীয় কেউ চৈতন্যকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু তৎকালীন উড়িষ্যার রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ থেকে একথা জোর দিয়ে বলা চলে যে, সেকালে শ্রীচৈতন্য অধিকাংশ উড়িষ্যাবাসীর উপাস্য হয়ে উঠলেও, (১) জনগণ ও রাজার উপর তাঁর ক্রমবর্ধমান প্রভাবে কিছু সংখ্যক মানুষ আশঙ্কিত হয়েছিল, (২) 'জগন্নাথ দারুব্রহ্ম, আর চৈতন্য তাঁর সচল বিগ্রহ'—এই জাতীয় প্রচার জগন্নাথ সেবকদের একাংশের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, (৩) চৈতন্য ও তাঁর সহচরদের জাতিভেদ বিরোধী প্রচার ও ক্রিয়াকর্মে ব্রাহ্মণ পুরোহিত সম্প্রদায়ের জীবিকায় এবং সামাজিক মান মর্যাদায় ঘা পড়েছিল—দলিত সর্পের মত তারা হিংস্র হয়ে উঠেছিল; এবং (৪) বিদ্যাধরের মত অভিসন্ধিপরায়ণ রাজনীতিক ও শক্তিশালী প্রতিপক্ষ এই সব বিক্ষুব্ধ ধর্মান্ধদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল—এটাই স্বাভাবিক; এই অশুভ আঁতাতের মধ্যেই সম্ভবত নিহিত আছে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের মূল কারণ।

ঐতিহাসিক ও সামাজিক পটভূমির এই পরিচয়ের ভিত্তিতে চৈতন্য তিরোভাবের বিবৃতগুলি আরেকবার পরখ করা যেতে পারে।

জয়ানন্দ চৈতন্যের দেহাবসানের একটা বাস্তবানুগ বিবরণ দিয়েছেন এবং বলেছেন তাঁর মায়া শরীর টোটার মাটিতে পড়ে ছিল। কিন্তু তাঁর কথামত সত্যই যদি এ ঘটনা গদাধর পণ্ডিতের সামনে ঘটত, তাহলে চৈতন্যের শবদেহের সদ্‌গতি বা সমাধি বিষয়ে বঙ্গীয় বৈষ্ণবদের নিশ্ছিদ্র অজ্ঞতা সম্ভবপর হতো না। উপরন্তু শ্রীকৃষ্ণের বামপদে জরাব্যাধের শরাঘাত এবং চৈতন্যের বাঁ পায়ে 'ইটাল' বা ইটের টুকরোর আঘাত—এতে যেন কৃষ্ণ-চৈতন্য সমীকরণের তত্ত্বটিকেই বড় ক'রে তুলে ধরেছেন জয়ানন্দ।

লোচন বলেছেন, চৈতন্য নিজ জনদের বাইরে রেখে মন্দিরে প্রবেশ করা মাত্র 'তখনে দুয়ারে নিজ লাগিল কপাট'। ভক্তদের থেকে এইভাবে কি তাঁকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নেওয়া

হয়েছিল? উপরন্তু লক্ষণীয়, মন্দিরের ভিতর থেকে একজন 'পড়িছা' বা পুরোহিত ঘোষণা করল জগন্নাথের অঙ্গে চৈতন্য বিলীন হয়ে গেছেন। ভক্তবৃন্দ, রাজগুরু কাশী মিশ্র এবং অন্যান্য অনেকে বিলাপ করতে লাগলেন, রাজা স্বয়ং সংবাদ শুনে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন, কিন্তু চৈতন্যের পার্থিব দেহ সম্পর্কে কেউ কোন অনুসন্ধান করলেন না। জগন্নাথ অঙ্গে বিলীন হওয়ার সংবাদটি ছড়িয়ে দেওয়ার পিছনে কূটকৌশলী কোন চক্রের চতুর পরিকল্পনার অস্তিত্ব কি অসম্ভব? জগন্নাথের 'সচল বিগ্রহ'কে জগন্নাথ আত্মসাৎ করেছেন, 'সচল বিগ্রহ'বাদী ভক্তরা একথা অস্বীকার করতে পারবেন না এবং জগন্নাথ অঙ্গে বিলীন হওয়ার পর মায়া শরীরের খোঁজখবর করা নিতান্ত অশাস্ত্রীয় ও অধার্মিক ব্যাপার হবে সম্ভবতঃ এই ছিল সেই চতুর চক্রের চিন্তাধারা!

ঈশান নাগর বলেছেন—

প্রবেশ মাত্রেতে দ্বার স্বয়ং রুদ্ধ হৈল।
ভক্তগণ মনে বহু আশঙ্কা জন্মিল॥

এই আশঙ্কার কারণ কি? আবার মন্দির দ্বার খোলা মাত্র 'গৌরাঙ্গাপ্রকট সভে অনুমান কৈল'।—এরই বা কারণ কি? তবে কি সেই অশুভ ঘটনার পূর্বাভাস কেউ কেউ পেয়েছিলেন?

ওড়িয়া গ্রন্থগুলিতে এই বিগ্রহে লীন হওয়ার তত্ত্বই সমর্থিত হয়েছে। ঈশ্বর দাসের চৈতন্য ভাগবত অনুসারে সেকালের একটি মাত্র মানুষ, বাসুদেব তীর্থ, এর সত্যতায় সন্দিহান হয়েছিলেন এবং প্রকাশ্যে মুক্তিমণ্ডপে এ নিয়ে তর্ক বিতর্ক করেছিলেন। অবশ্য তখন চৈতন্য তিরোভাবের পর অন্ততঃ 'একশ' বছর কেটে গেছে [অধ্যাপক প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের মতে ঈশ্বরদাস সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগে চৈতন্য-ভাগবত রচনা করেন; ড. বিমানবিহারী মজুমদারের হিসেব অনুসারে ঈশ্বর দাসের গ্রন্থ চৈতন্যতিরোভাবের ১৫০/১৭৫ বছর পরে লিখিত হয়]। এই কাল ব্যবধানই সম্ভবতঃ ঈশ্বরদাসকে দিয়েছিল সেই নিরাপত্তা যার ভিত্তিতে তিনি চৈতন্যের পার্থিব দেহের পরিণতি সম্পর্কে অলৌকিকতার মোড়কে মুড়ে কিছু বাস্তব তথ্য পরিবেশনে সাহসী হয়েছেন। ঈশ্বর দাসের মতে, লোকলোচনের অন্তরালে পুরী থেকে বহু দূরে নদীগর্ভে চৈতন্যের পার্থিব দেহ বিসর্জন দেওয়া হয়। তাঁর মতে প্রতাপরুদ্র এ ব্যাপারে কিছু জানতেন না। তিনি বলেছেন, তিরোধানের খবর পেয়ে রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন='রাজন ক্রোধ কে কহিব'। চৈতন্যতিরোধানের পিছনে কোন অপরাধমূলক চক্রান্ত না থাকলে রাজা ক্রুদ্ধ হলেন কেন? সব কিছু স্বাভাবিক থাকলে রাজাকে গোপন করা হলো কেন? ঈশ্বর দাসের বিবরণীতে স্পষ্ট আভাস মেলে, রুদ্ধদ্বার মন্দিরের মধ্যে চক্রান্তকারীরা সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং তাদেরি কেউ কেউ যখন জগন্নাথ অঙ্গে চৈতন্যের বিলীন হওয়ার কথা ঘোষণা করতে থাকে, অন্যান্যরা তখন গোপনে সে দেহ বহন ক'রে নিয়ে গিয়ে বহু মাইল দূরে নদীতে বিসর্জন দেয়।

ঈশ্বর দাস বলেছেন তিনি তাঁর গুরুর কাছে চৈতন্যদেহ বিসর্জনের 'অত্যন্ত গুপ্ত এহু কথা' শুনেছেন। চৈতন্য তিরোধানের পর ঈশ্বর দাসের কাল পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ

একশ' দেড়শ' বছর এ কথা গুপ্ত রইল কিভাবে? হয়ত এর আগে যাঁরা জানতেন, রাজদণ্ডের ভয়ে তাঁরা একথা প্রকাশ করতেন না। অত্যন্ত ক্ষমতাশালী, রাজকীয় মর্যাদার অধিকারী কেউ এ সবের মূলে না থাকলে এমন নিশ্ছিদ্র গোপনীয়তা এবং সমকালীন ভক্ত কবিদের চৈতন্যদেহ বা চৈতন্য সমাধি সম্পর্কে এমন লৌহ কঠিন নীরবতা সম্ভব হতো না। এ সবই আবার প্রতাপরুদ্রের পুত্রহন্তা, সিংহাসন দখলকারী ও ভোই বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দ বিদ্যাধরের দিকে সন্দেহের তীর-ফলকটি সঞ্চালিত করে।

শ্রীচৈতন্যের কয়েকশো বছর আগে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রবক্তা শ্রীরামানুজ বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে পুরীতে এসেছিলেন। তাঁকেও যে বিষম পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল তার প্রমাণ আছে প্রপন্নামৃত নামক সংস্কৃত গ্রন্থে। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে, শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীরামানুজস্বামীকে 'একরাত্রে পুরুষোত্তম থেকে কূর্মতীর্থে টেনে ফেলে দিয়েছিলেন' [চৈতন্যচরিতামৃত, গৌড়ীয় মঠ সং, অমৃতপ্রবাহভাষ্য, মধ্য ৭/১১৩]। এই কিংবদন্তীর তাৎপর্য সম্ভবত এই যে, জগন্নাথ ক্ষেত্রে রামানুজ ধর্মপ্রচার করতে এলে জগন্নাথ সেবকদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বেধেছিল। 'টেনে ফেলে দেওয়া' কথাটির মধ্যে সেই বিরোধ ও বর্জনের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।

ওড়িয়া জনগণের উপর রামানুজের তুলনায় চৈতন্যের প্রভাব ছিল নিঃসন্দেহে অনেক বেশি। জনগণের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার কথা মনে রেখে তাই ষড়যন্ত্রকারীদের অনেক অনেক ভেবে চিন্তে মাথা খাটিয়ে গোপনে কাজ করতে হয়েছে। আষাঢ় মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথি অন্তর্ধানের সময় হলে বুঝতে হবে, রথযাত্রার উৎসবে যখন দেশের মানুষ অতিব্যস্ত, তাদের সেই ব্যস্ততারই সুযোগ নিতে চেয়েছে ষড়যন্ত্রকারীরা।

পরিশেষে আমরা অসংকোচে বলতে পারি, শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্যের যবনিকা সম্পূর্ণ উন্মোচিত করার মত নিশ্চিত কোন তথ্য প্রমাণ এখনও আমাদের হাতে আসেনি। এ আলোচনায় আমাদের উদ্দেশ্য ছিল অন্তর্ধানের পিছনে অপরাধমূলক ক্রিয়াকাণ্ডের সম্ভাব্যতা বিচার করা। আমরা তৎকালীন সাহিত্য, সমাজ ও রাজনীতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ক'রে দেখলাম যে, তা আদৌ অসম্ভব ছিল না।

১৩. শ্রীচৈতন্য ও উত্তরকাল

চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী ভক্তকবি প্রবোধানন্দ সরস্বতী শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর নানা সম্প্রদায়ের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন—"হা শ্রীচৈতন্য! কোথায় গমন করিলে? তোমার সেই নির্মল পরমোজ্জ্বল-রস ভক্তিমার্গ আর কোন স্থানে দৃষ্ট হইতেছে না; বরং কোন সম্প্রদায়ে কর্মজড়তা, কোন সম্প্রদায়ে জপ-তপ-যোগাদি, কোন সম্প্রদায়ে শ্রীগোবিন্দার্চনে বিকার, কোন স্থানে বা জ্ঞান বিষয়ে অভিমান এবং কোথাও বা পরমোজ্জ্বল ভক্তি বাঙমাত্রে অবস্থান করিতেছেন এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।"

[শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত : ৩৮ শ্লোক]

উজ্জ্বল আলো হঠাৎ নিভে গেলে অন্ধকার অত্যন্ত গাঢ় মনে হওয়া স্বাভাবিক। চৈতন্যের দিব্যভাবের আলোকিত পরিমণ্ডলের বাসিন্দা প্রবোধানন্দ। চৈতন্য তিরোধানে তাঁর শোকদীর্ণ অন্তরে গভীর অন্ধকারের অনুভব স্বাভাবিক। কিন্তু প্রবোধানন্দের হতাশাজাত অতিশয়োক্তির সম্ভাব্যতা স্বীকার ক'রেও তাঁর বক্তব্যের মূল বস্তুটিকে উপেক্ষা করা যায় না। চৈতন্যের তিরোভাবের অল্পকাল মধ্যেই 'হরিদাস'দের মধ্যে ফিরে এসেছে জাতিভেদ, মর্যাদা রক্ষার দোহাই দিয়ে বামুন-বৈষ্ণব নিজেকে প্রণম্য করেছে শূদ্র-বৈষ্ণবের কাছে, জমিজমার মালিক হয়ে গদীয়ান বৈষ্ণবেরা ভোগী হয়ে শরীকী বিবাদও শুরু ক'রে দিয়েছে। বিত্তবাসনার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিয়েছে শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন এবং এই প্রয়োজনেই এসেছে আত্মম্ভরী প্রচার যার পরিণতি শাখাগত কোন্দল।

এই শাখাগত কোন্দলের পিছনে উপরন্তু ছিল বৈষ্ণব ইতিহাসে শ্রীচৈতন্য, অদ্বৈত, নিত্যানন্দের প্রাধান্যের তারতম্য নিয়ে তাঁদের অনুবর্তীদের মতান্তর। এ বিষয়ে শ্রীহেমচন্দ্র সরকার যথার্থ লিখেছেন—"অদ্বৈতাচার্য্য, নিত্যানন্দ, হরিদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব সাধকগণ যে-কোনও ধর্মসম্প্রদায়ের অলঙ্কার রূপে গণ্য হইবার যোগ্য এবং ষোড়শ শতাব্দীর ভক্তি আন্দোলনে তাঁহাদের কার্য ও প্রভাব নিতান্ত অল্প ছিল না। তথাপি বয়সে প্রাচীন এবং কালে প্রথম হইলেও ষোড়শ শতাব্দীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মান্দোলন অদ্বৈতাচার্যের নামে প্রসিদ্ধ না হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের নামেই পরিচিত।

"আপাতদৃষ্টিতে ইহা অন্যায় এবং অযৌক্তিক বলিয়া মনে হইতে পারে। বোধহয় সমসাময়িক বৈষ্ণবগণের মধ্যে এ বিষয় লইয়া কিঞ্চিৎ মনোমালিন্যও ঘটিয়াছিল। তৎকালীন বৈষ্ণব ইতিহাসে শ্রীচৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্যের স্থান লইয়া অনুবর্তীগণের মধ্যে বাদানুবাদের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। কেহ কেহ শ্রীঅদ্বৈতাচার্যকে বৈষ্ণব মণ্ডলীর নেতা রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আবার কেহ নিত্যানন্দকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধান পুরুষ বলিয়া প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। অপরদিকে ইহাদিগকে সাধারণের চক্ষুতে হীন করিবারও চেষ্টা হইয়াছিল। যথা—

এই অবতারে কেহো গৌরচন্দ্র গায়।
নিত্যানন্দ নাম শুনি উঠিয়া পলায়॥

[চৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড, ৩য় অধ্যায়]

"যাহা হউক মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, জনসাধারণের সরল এবং স্বাভাবিক বিচার অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানেও অজ্ঞাতসারে নিরপেক্ষ সত্য আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা

করিয়াছে। যেমন খৃষ্টীয় ধর্ম বিধানে বাপ্তিস্ট জন পূর্ববর্তী এবং সেণ্ট পল অসাধারণ প্রচারক হইলেও ঈশা প্রবর্তক গণ্য হইয়াছেন, সেইরূপ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে অদ্বৈতাচার্য পূর্বগামী এবং নিত্যানন্দ তেজস্বী প্রচারক হইলেও চৈতন্যদেবই প্রবর্তক রূপে সম্মানিত হইয়াছেন। জনসাধারণের এই সহজ বিচার ইতিহাস অনুমোদন করিয়াছে।”

[গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও শ্রীচৈতন্যদেব, ঃ পৃ. ২০-২১]

এ বিষয়ে ড. সুকুমার সেন লিখেছেন—“নিত্যানন্দের তিরোধানের পর বাঙ্গালার বৈষ্ণব মহান্তেরা অদ্বৈতকেই প্রধান নেতা বলিয়া মানিতেন। কিন্তু নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্রের শৈশবাবস্থা উত্তীর্ণ হইতে না হইতে দলাদলি দেখা দিল। নিত্যানন্দের কনিষ্ঠ পত্নী, বীরভদ্রের বিমাতা জাহ্নবা অত্যন্ত প্রভাবশালিনী নারী ছিলেন। নিত্যানন্দের অবর্তমানে তাঁহার অনুচরেরা জাহ্নবাকেই প্রভু বলিয়া মানিত।... নিত্যানন্দের তিরোধানের পরে বীরভদ্রের দীক্ষাকাল উপস্থিত হইলে তিনি শান্তিপুরে গিয়া অদ্বৈতের নিকট দীক্ষা লইতে উদ্যোগ করিয়াছিলেন কিন্তু ‘নর্তক’ গোপাল ও মীনকেতন রামদাস প্রভৃতি তাঁহাকে শান্তিপুরের পথ হইতে ফিরাইয়া আনেন এবং বিমাতার কাছে দীক্ষা লওয়ান [‘নিত্যানন্দবংশবিস্তার’—বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষৎ সংগৃহীত প্রাচীন পুথি, পৃ. ১৪ কখ]। এই ভাবে অদ্বৈতের জীবৎ কালেই বাঙ্গালার বৈষ্ণব সমাজ দ্বিধাবিভক্ত হইয়া গেল। নিত্যানন্দের পরে তাঁহার স্থান লইলেন জাহ্নবা এবং জাহ্নবার স্থান বীরভদ্র। বীরভদ্রের পর তাঁহার সন্ততি ‘শ্রীপাট’ খড়দহে গুরুবংশ প্রতানিত করিলেন। অদ্বৈতের পরে সীতা শান্তিপুরে প্রধান হইলেন। তাঁহার পরে অদ্বৈতের পুত্রেরা গুরু হইলেন।...আরও কিছু কিছু গুরু পরম্পরার সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায়। শ্রীখণ্ডের রাজবৈদ্য মুকুন্দ দাস। তাঁহার অনুজ নরহরি দাস সরকার এবং পুত্র রঘুনন্দন দাস তিন জনেই চৈতন্যের প্রিয়ভক্ত ছিলেন। নরহরির ও রঘুনন্দনের বহু শিষ্য প্রশিষ্য ছিল” [বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ঃ পৃ. ২৮৩-৪]।

যে-কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের ইতিহাসে দেখা যায়, প্রেরণার জোয়ার-মূলের প্রধান পুরুষটির অবর্তমানে অনুবর্তীদের ক্রিয়াকাণ্ডে ভাঁটার বিপরীতমুখী টান লাগে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে চৈতন্য প্রেরণা সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। কিন্তু ভাঁটার টান লাগলেও নদীতটে জোয়ার জলের দাগ মুছে যায় না বা জোয়ার জলের স্নেহরসের উর্বরা অবদানকে অস্বীকারও করা যায় না। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে আদর্শের অবনমন সত্ত্বেও চৈতন্য কীর্তির সেই উন্নত পথরেখা চির অম্লান। সেই কীর্তি সেই প্রতিভা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ে নয়, বাঙালী তথা সমগ্র ভারতীয় জনমানসে স্থায়ী প্রভাব রেখেছে।

সম্প্রদায়গত ইতিহাসের কথা এবং চৈতন্যের জীবনকর্মের কথা মনে রেখে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে চৈতন্য প্রেমভক্তি-প্রচার ও বিতরণের ক্ষেত্রে কোন সাম্প্রদায়িক গণ্ডী স্বীকার করেন নি। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁকে ‘স্বসম্প্রদায়সহস্রাধিদৈব’ ব’লে বন্দনা করেছেন। কিন্তু তা উত্তরকালের কথা। এবং লক্ষণীয়, শ্রীজীব ‘গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়’ বলেন নি। বলেছেন ‘স্ব-সম্প্রদায়’—যার মধ্যে পরবর্তীকালের গৌড়ীয় বৈষ্ণব, ওড়িষী বৈষ্ণব ইত্যাদি সকলেই আছেন। শ্রীজীবের মতে চৈতন্যের ভগবত্তা গৌড়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, সুহ্ম ও উৎকলীয় মহানুভবদের মধ্যে মহাপ্রসিদ্ধ—“গৌড়বরেন্দ্র বঙ্গ

সন্ধ্যাৎ কলিঙ্গাদি দেশীয়ানাং মহাপ্রসিদ্ধে"। 'স্বসম্প্রদায়' বলতে এখানে হয়ত চৈতন্য অনুরাগী জনসমষ্টিকেই বোঝাচ্ছে।

আসলে শ্রীচৈতন্যকে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের গণ্ডীতে আবদ্ধ করা চলে না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে "যে সাধন-ভজন-রীতি অধিকাংশ ব্যক্তি অনুসরণ করেন, তাহার প্রবর্তক হইতেছেন শ্রীরূপ গোস্বামী" [চৈতন্যচরিতের উপাদান ঃ পৃ. ১৪৫] এবং এই সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতবাদ "শ্রীজীব গোস্বামীর ব্যক্তিত্ব দ্বারা অনুপ্রাণিত। বাঙ্গালা দেশে ব্রজমণ্ডলের সিদ্ধান্ত প্রচারের প্রধান উদ্যোক্তা শ্রীজীব গোস্বামী। শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ও শ্যামানন্দ শ্রীজীবের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন ও তাঁহারই আদেশে গোস্বামি গ্রন্থ সমূহ বাঙ্গালা দেশে আনিয়া তাহাদের পঠন-পাঠন প্রচলন করেন। [তদেব ঃ পৃ. ১৫৩]

বৃন্দাবনের গোস্বামিরা মধুররসের উপাসনা প্রচার করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ যাঁদের নাম শ্রীচৈতন্য ও গদাধর শাখায় উল্লেখ করেছেন, তাঁরা সকলেই মধুর রসের উপাসক ছিলেন। কবিকর্ণপূর তাঁদের ব্রজের সখা, সখী ও মঞ্জরীরূপে উল্লেখ করেছেন। বৃন্দাবনের গোস্বামিরা নিজেদের সখীর অনুগত মঞ্জরী ভেবে সাধনা করতেন। রূপ গোস্বামীর 'চাটুপুষ্পাঞ্জলি' ও নরোত্তম ঠাকুরের 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'য় মঞ্জরীভাব-সাধনার যে পরিচয় আছে তাতে দেখা যায়, সাধক ভক্তদের 'সাধ্য' হল সখীদের ও প্রধান প্রধান মঞ্জরীদের অনুগত হয়ে রাধাকৃষ্ণের সেবা করা।

কিন্তু বৃন্দাবনের গোস্বামিদের বা তাঁদের অনুগত শ্রীনিবাস, নরোত্তম ইত্যাদির গ্রন্থে পুরুষ-সাধকদের নারীবেশ ধারণের কোন কথা নেই। অথচ অদ্বৈতাচার্যের স্ত্রী সীতাদেবীর দুই শিষ্য নন্দরাম সিংহ ও যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্তী নারীবেশ ধারণ করে যথাক্রমে নন্দিনী ও জঙ্গলী নাম গ্রহণ করেন। এঁদের নাম কবিকর্ণপুরের 'গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা'য় পাওয়া যায়। নবদ্বীপের চরণদাস বাবাজীর সমাজবাড়ীর অধ্যক্ষ 'ললিতাসখী' নামে স্ত্রীবেশ ধারণ করে সাধনা করতেন।

বৃন্দাবনের গোস্বামিরা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যকে অভিন্ন জেনেও শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করতেন এবং কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গ্রন্থাদি রচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন। বাংলার নরহরি সরকার, শিবানন্দ সেন এবং দাক্ষিণভারতীয় প্রবোধানন্দ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যকে অভিন্ন জেনে শ্রীচৈতন্যেরই উপাসনা করতেন। এঁদের বলা হয়েছে 'গৌর-পারম্যবাদী'। কৃষ্ণলীলার অনুরূপ গৌরলীলা বর্ণনা ছিল এঁদের উদ্দেশ্য। এই পথেই কৃষ্ণের নাগরালির অনুকরণে 'গৌরনাগরে'র উদ্ভব হয়।

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে পাঠিয়েছিলেন প্রেমধর্ম প্রচার করার জন্য নিত্যানন্দ প্রেমধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের উপাসনা প্রচার করেন।-

চৈতন্য সেব, চৈতন্য গাও, লও চৈতন্য নাম।
চৈতন্যে যে ভক্তি করে ; সেই মোর প্রাণ।
এইমত লোকে চৈতন্য ভক্তি লওয়াইল।
দীন হীন নিন্দকাদি সভারে নিস্তারিল॥

[চৈ. চ. : মধ্য/১/২৪-২৫

কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্য সেব চৈতন্য গাও' বললেও মূলতঃ গানটিতে আছেন 'গৌরাঙ্গ'-

ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নামরে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণরে।

গৌড়মণ্ডলের গৌর-পারম্যবাদীরা যতিবেশধারী চৈতন্যকে পূর্ণ এবং নবদ্বীপের কিশোর গৌরাঙ্গ মূর্তিকে চৈতন্যের পূর্ণতম বা শ্রেষ্ঠ রূপে মনে করতেন। এঁদের মধ্যে গৌর-নাগরবাদীরা মধুর রসের উপাসক। আর নিত্যানন্দের ছিল সখ্যভাব। গৌরাঙ্গের গোষ্ঠলীলার সখারূপে নিত্যানন্দ পার্ষদেরা গোপবেশধারণ করতেন—'নিত্যানন্দগণাঃ সর্বে গোপাল গোপবেশিন [গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ১৪]।

উড়িষ্যায় 'পঞ্চসখা' বলরাম, জগন্নাথ, অচ্যুত যশোবন্ত ও অনন্ত—এঁরাও ছিলেন সখ্যভাবের সাধক। এঁরাও ছিলেন চৈতন্যের পার্ষদ। অচ্যুতানন্দ পঞ্চসখার সঙ্গে চৈতন্যের ঘনিষ্ঠতার কথা লিখেছেন—

বৈষ্ণব মণ্ডলী খোল করতাল বজাই বোলন্তি হরি।
চৈতন্য ঠাকুর মহানৃত্যকার দণ্ডকমণ্ডলুধারী।
অনন্ত অচ্যুত ঘেনি যশোবন্ত বলরাম জগন্নাথ।
এ পঞ্চ সখাহিঁ নৃত্য করি গলে গৌরাঙ্গচন্দ্র সঙ্গত ॥

[শূন্যসংহিতা, ১ম অধ্যায়।]

পঞ্চসখা সম্পর্কে ড. বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন—"ইহারা পূর্বে বৌদ্ধভাবপন্ন ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের কৃপাপ্রাপ্তির পরও ব্রজের প্রেমধর্ম সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করেন নাই।" [চৈতন্যচরিতের উপাদান : পৃ. ৪৯৪] পঞ্চসখা সাহিত্যে শূন্যবাদ আছে ব'লেই এই সিদ্ধান্ত। কিন্তু ব্রজমণ্ডলের সনাতন গোস্বামীর শ্রীকৃষ্ণ বন্দনায়ও কি শূন্যবাদ নেই? শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবে সনাতন লিখেছেন—

নির্বিকারাপরিচ্ছিন্ন নির্বিশেষ নিরঞ্জন।
অব্যক্ত সত্য ব্রহ্ম এ পরম জ্যোতিরক্ষর ॥

সনাতনের কৃষ্ণ নির্বিশেষ নিরঞ্জন জ্যোতিস্বরূপ। আর অচ্যুতানন্দের শূন্য জ্যোতিস্বরূপ ব্রহ্ম—

দেখিলে যে শূণ্যব্রহ্ম স্বয়ং জ্যোতি হোই।
ঘটে ঘটে বিজে এহি শূন্য কায়া দেহী ॥

[শূন্যসংহিতা, ১০ম অধ্যায়]

অচ্যুতানন্দের শূন্যস্থলী নিত্যরাসের নিত্যবৃন্দাবন। জয়দেবের 'চল সখি কুঞ্জং' এর অনুকরণে অচ্যুতানন্দ লিখেছেন 'সখি গো সুধা বহি পড়ুছি, রাধাঅঙ্গরে শ্রীকৃষ্ণ লুচিছি। ...সখি গো চাল নিত্য দেখিবা, নিত্যরাহাস দর্শন করিবা [নিত্যরাহাস চতুর্থ ছান্দ]

সুতরাং নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পঞ্চ সখাকে চৈতন্যপরিকরই বলতে হবে। ব্রজের প্রেম-ধর্ম পঞ্চসখা নেন নি, এ কথা ঠিক নয়; হতে পারে চৈতন্য পরবর্তীকালের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বিধিবিধানের সঙ্গে তাঁদের অঙ্গাঙ্গী মিল নেই। এতে চৈতন্যের সমন্বয়ী প্রতিভারই পরিচয় মেলে। জীব গোস্বামীর কথাটিকে একটু ঘুরিয়ে যদি বলি, তিনি স্ব-সম্প্রদায়ের সহস্র সহস্র জনের অধিদেবতাই ছিলেন না, সহস্র সম্প্রদায়ের মানুষও ছিল তাঁর স্বকীয় তিনি তাঁদেরও ছিলেন অধিদেবতা, তাহলেই ঠিক বলা হয়।

একটা কথা বোধকরি স্পষ্ট ক'রে বলার প্রয়োজন আছে। 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম'' নামক কোন ধর্ম শ্রীচৈতন্যের জীবৎকালে ছিল না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বিধি-বিধানের প্রতিক্রিয়ায় বর্তমান ওড়িষী বিদ্বৎসমাজ স্বতন্ত্র ওড়িষী বৈষ্ণব ধর্মের কথা বলেছেন। শ্রীচৈতন্যের সময় বৈষ্ণব ছিল, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব বা ওড়িষী বৈষ্ণব বলে কিছু ছিল না। এই কারণে বর্তমান গৌড়ীয় বৈষ্ণব বা ওড়িষী বৈষ্ণবে যে ভেদের কথা বলা হয়ে থাকে, তার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীচৈতন্য বা তার অনুগামীদের বিচার করলে ভুল হবে। বর্তমান ওড়িষী সমালোচকেরা এই ভুলটিই করে থাকেন। তাঁরা বর্তমান গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের বিধি বিধানকে শ্রীচৈতন্যের বিধিবিধান বলে মনে করেন এবং সেই হিসাবেই পঞ্চসখা বা ওড়িষী বৈষ্ণব সমাজের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের বিভেদ হেতু 'চৈতন্য ধর্ম'' থেকে পঞ্চসখা বা ওড়িষী বৈষ্ণব ধর্মকে আলাদা ব'লে ধরে নেন।

একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে। 'পঞ্চসখা-ওড়িআ সাহিত্য' গ্রন্থে (পৃ.৩১) অধ্যাপক ড. দেবেন্দ্র মহান্তি লিখেছেন, 'উৎকলীয় বৈষ্ণবমানঙ্ক মতরে পুরুষোত্তম ক্ষেত্র বা শ্রীক্ষেত্র হেউছি নিত্যক্ষেত্র এবং অন্য ক্ষেত্রমানঙ্কর উৎপত্তি তাহা হোইঅছি। গোড়ীয় বৈষ্ণবমানঙ্ক ঠারুমতরে বৃন্দাবন হিঁ সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র'। অর্থাৎ উৎকলীয় বৈষ্ণবদের মতে পুরুষোত্তম ক্ষেত্র বা শ্রীক্ষেত্র হল নিত্যক্ষেত্র এবং অন্য ক্ষেত্রগুলির উৎপত্তি তা থেকে হয়েছে। গোড়ীয় বৈষ্ণবদের মতে বৃন্দাবনই সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র।

এই যে 'ধাম' নিয়ে বিবাদ—এ নিতান্ত পরবর্তীকালের। পূর্বাচার্যরা কেউই বলেন নি, 'আমার বৃন্দাবন বড়, তোমার পুরুষোত্তম ছোট'; তাঁরা বলেছেন বৃন্দাবন 'অখিলাত্মভূতো' নিখিল চরাচরই নিখিলেশের লীলাক্ষেত্র; জগতের কোথায় তাঁর বাস নেই?

সনাতনের বৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থে ব্রহ্মা নারদকে বলেছেন—

তদর্থং ভাগবৎ পূজাং কারয়ামি করোমি চ।
আবাসো জগদীশস্য তস্য ন ক্ব বিদ্যতে॥ [১/২/৬৩]

"তারপর, 'আমার লোকের মধ্যে যে বৈকুণ্ঠলোক' বলিয়াছ, তাহাও অসাধারণ নহে। কারণ, সেই ভগবানের বাস কোন্ স্থানেই বা নাই? অপিচ তিনি অন্তরে বাহিরে সর্বত্রই বিরাজমান রহিয়াছেন।" [ভক্তিরত্ন গোস্বামী অনূদিত]

এই গ্রন্থেই অন্যত্র আছে—

যস্য শ্রী ভগবৎ প্রাপ্ত্যাবুৎকটেচ্ছা যতো ভবেৎ।
স তত্রৈব লভেতামুং ন তু বাসাহস্য লাভকৃৎ॥ [১/৪/৩৪]

"যাহার যে স্থানে শ্রীভগবৎ প্রাপ্তির উৎকট ইচ্ছা হয়, তাঁহার সেই স্থানেই শ্রীভগবৎ প্রাপ্তি হইয়া থাকে; প্রভু অমুক স্থানে বাস করেন, অতএব তাঁহাকে অমুক বাসস্থানে পাওয়া যাইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই। [ভক্তিরত্ন গোস্বামী অনূদিত]

স্বকৃত টীকায় সনাতন বলেছেন, "শ্রীভগবত প্রাপ্তৌ যথ্য উৎকটেচ্ছা লালসাধিক্যং প্রেমোৎকণ্ঠামিতি যাবৎ। ন তু ইচ্ছামাত্রম্। অমুং ভগবন্তম্; ন তু অস্য বাসো বসন্তিবাসস্থানং বা কেবলমস্য শ্রীভগবতো লাভং প্রাপ্তিং করোতীতি"॥ অর্থাৎ 'প্রেমোৎকণ্ঠা ব্যতীত কেবল বাসস্থান তাঁহাকে প্রাপ্তি কবাইতে পাবে না।'

শ্রীজীবও ব্রহ্মাসংহিতার টীকায় লিখেছেন—রাধামাধবের লীলাস্থল গোলোক

'অখিলাত্মভূতো' (টীকা, ৩৭) ; এবং সন্তগণ সেই অচিন্ত্যগুণস্বরূপ শ্যামসুন্দরকে প্রেমভক্তিভরা দৃষ্টিতে আপন আপন হৃদয়ে সর্বদা দেখতে পান—'প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি বিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি' (টীকা, ৩৮)।

পরবর্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে যদি এই তত্ত্ব দৃষ্টি লুপ্ত হয়ে থাকে, তার জন্য, শ্রীচৈতন্য এবং তাঁর সাক্ষাৎ অনুগামীদের মধ্যেও এই অভেদ দৃষ্টির অভাব ছিল—একথা আর বলা যাবে কি করে ? উপরিউক্ত উক্তিগুলি যে বিত্তলোলুপ গদীয়ানদের স্থান-মহিমা-কীর্তনের প্রয়াসকে গোড়া থেকেই কোপ লাগিয়েছে।

ড. দেবেন্দ্র মহান্তি চৈতন্য ধর্মকে পরবর্তীকালের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মাচারের সঙ্গে অভিন্ন রূপে দেখে তাই ভ্রান্ত হয়েছেন। তিনি একা নন, আধুনিক ওড়িষী বিদ্বৎ-সমাজের অধিকাংশই এই ভুল ক'রে চলেছেন। এই ভুলেরই পুনরাবৃত্তি হয় যখন তাঁরা বলেন, "উৎকলীয় বৈষ্ণবমানঙ্ক মতরে শ্রীক্ষেত্রবিহারী নীলাচলনাথ জগন্নাথ ষোলকলারে পরিপূর্ণ।...শ্রীকৃষ্ণ শ্রীজগন্নাথঙ্ক অংশরে জাত।...গৌড়ীয় বৈষ্ণবমানে কেবেহেলে এ প্রকার মতকু সমর্থন করিপারন্তি নাহিঁ। সংস্কৃত ভাগবতর পদ "এতেচাংশকলাপুংস ঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" অনুসারে সেখানে শ্রীকৃষ্ণঙ্কু স্বয়ং ভগবান বা অবতারী ভাবরে উপস্থাপিত করন্তি"! [পঞ্চসখা ওড়িআ সাহিত্য পৃ. ৩০] অর্থাৎ গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মতে কৃষ্ণ অবতারী এবং উৎকলীয় বৈষ্ণবদের মতে জগন্নাথ অবতারী।

আমরা বলতে বাধ্য, পঞ্চসখা সাহিত্যকে শ্রীচৈতন্য-প্রভাব বর্জিত ক'রে দেখাবার উৎকট আগ্রহ হেতুই বর্তমান ওড়িষী সমালোচকদের মধ্যে এই জাতীয় ভেদ বুদ্ধি আরোপ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। শ্রীচৈতন্য জগন্নাথ ও কৃষ্ণে তিনপোয়া চারপোয়া ভেদ করতেন ? তাঁর 'জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথ গামী ভবতু মে' ইত্যাদি জগন্নাথ বন্দনা বা সনাতন গোস্বামীর জগন্নাথ-বন্দনা—

শ্রীজগন্নাথ নীলাদ্রি শিরো মুকুটরত্ন হে।
দারু ব্রহ্মণ্ ঘনশ্যাম প্রসীদ পুরুষোত্তম ॥ [লীলাস্তব ১০৩]

ইত্যাদির কথা না-ই বললাম, স্বয়ং পঞ্চসখা এ বিষয়ে কি বলেছেন ?

দিবাকর দাসের 'জগন্নাথ চরিতামৃত' গ্রন্থটি শুরু হয়েছে যে-বন্দনা শ্লোকে, সেখানে গোপীনাথ কৃষ্ণের সঙ্গে জগন্নাথকে অভেদ জ্ঞানে বন্দনা করা হয়েছে—

রাধাচন্দ্রাবলীভ্যাং বলয়িতবপুষং কোটি কামাভিলাষ
প্রেমানন্দৈকপূর্ণং বিপুলতরমুদং নিতবৃন্দাবনস্থম্ ।...
রাধাচন্দ্রাবলীভ্যাং কলিতবরতনুং শেষপর্য্যঙ্কসস্থম্
কৃষ্ণেতি স্বর্ণ বাচাং মনুঘটিততনুং শ্রীজগন্নাথদেবম্ ।

এই গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ে জগন্নাথ দাস রাজা প্রতাপরুদ্রকে বলেছেন—

রাধাকৃষ্ণ স্বরূপশ্চ শ্রীজগন্নাথ উচ্যতে।
রাসক্রীড়ারতৌ রাধাকৃষ্ণৌ শ্রীদারু বিগ্রহে।

আসলে নিত্য বৃন্দাবনের নিত্যরাসে শূন্য যেখানে পূর্ণ হয়ে উঠেছে সেখানে জগন্নাথ, রাধাকৃষ্ণ, রাম, হরি—একই পরমতত্ত্বের নামান্তর মাত্র ; এ নিয়ে তারতম্য বা বিবাদ এসেছে পরবর্তীকালে, এই বিবাদে যাঁরা যে পরিমাণে লিপ্ত হয়েছেন, তাঁরা সেই পরিমাণে চৈতন্যপন্থা থেকে দূরে সরে গেছেন।

এ ব্যাপারে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজও তাঁদের দায়িত্ব এড়াতে পারেন না।

সাম্প্রদায়িক বা দলীয় কোন্দলের ফলে চৈতন্য-অনুগামী বিভিন্ন ধর্মগুরু ও তাঁদের অনুগামীরা ধীরে-ধীরে দূরে সরে গেছেন ; অথচ চৈতন্যের জীবৎকালে এই ধর্মগুরুরা ছিলেন চৈতন্যের অত্যন্ত ঘনিষ্ট প্রিয়জন।

পঞ্চসখার অন্যতম জগন্নাথ দাসকে চৈতন্য নিজে 'অতিবড়' আখ্যায় ভূষিত করে-ছিলেন। জগন্নাথদাসের অনুগামী অতিবড়ী সম্প্রদায়কে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের তোতারাম বাবাজী নিষিদ্ধ করেন :—"The Gaudiya Vaishnavas allege that Jagannatha started a heretical sub-sect of his own, known as 'Atibadi'...had been tabooed by Totaram Babaji—a Vaishnava divine of the Gaudiya School." [Prof. P. Mukherjee, *The History of Medieval Vaishnavism in Orissa*, pg 138]

পুষ্টিমার্গের প্রবর্তক বল্লভাচার্য্য (বল্লভ ভট্ট)-ও ছিলেন চৈতন্যের প্রিয়জন। স্বামী বিবেকানন্দ মনে করতেন বল্লভাচার্যের সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়েরই শাখা— "I have every reason to believe that the whole of the Vallabha-charya recension is only a branch of the sect founded by Shri Chaitanya". [Centenary vol. pg. 337]

চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখিত চৈতন্য-বল্লভাচার্য্য (বল্লভভট্ট) সাক্ষাৎকারের ঐতিহাসিকতা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতদ্বৈধতা আছে। কিন্তু কেবল চৈতন্যচরিতামৃতেই নয়, বল্লভ-সম্প্রদায় রচিত গ্রন্থেও এর উল্লেখ আছে। তাতে দেখা যায়, বল্লভ ও চৈতন্য প্রয়াগ থেকে একই সময়ে পুরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন : চৈতন্য বনপথ ধরে তাড়াতাড়ি আসেন, বল্লভ ঘুর পথে পরে এসে পৌছান। চৈতন্য নাকি বল্লভকে বলেন যে বনের মধ্যে হাতিরা তাঁকে আক্রমণ করেছিল, কিন্তু জগন্নাথ তাঁকে রক্ষা করেন। [M.C. Parekh : *Sri Vallabhacharya* : pg. 160-1]।

চৈতন্যচরিতামৃতের প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে, বল্লভের আত্মাভিমান দূর ক'রে চৈতন্য তাঁকে নিজস্বভঙ্গীতে দীনতার শিক্ষা দিয়েছিলেন [চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য/৭ম]। চৈতন্য 'তৃণাদপি সুনীচ' হবার আদর্শ সবসময় তুলে ধরতেন বৈষ্ণবদের সামনে। আর বল্লভ অল্প বয়স থেকেই তর্কযুদ্ধে নিপুণ—বিজয়নগরের সম্রাটের কাছে সম্মানিত হয়েছেন তর্কযুদ্ধে বিরোধীদের হারিয়ে দিয়ে।

ভাগবত পুরাণের ভাষ্য রচনার ব্যাপারে বল্লভ স্বকৃতভাষ্য শেষ পর্যন্ত কি করে-ছিলেন? চৈতন্যচরিতামৃতের বিবরণে জানা যায় শ্রীধর স্বামীর বিরোধী ভাষ্য রচনার জন্য চৈতন্য তাঁকে তীব্র ব্যঙ্গ করেন [প্রভু হাসি কহে, স্বামী না মানে যেই জন। বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন' ॥ অন্ত্য/৭ম পরিচ্ছেদ], পরে বল্লভের গর্ব দূর হলে তাঁকে উপদেশ দেন 'শ্রীধরানুগত কর ভাগবত ব্যাখ্যান। অভিমান ছাড়ি ভজ কৃষ্ণ ভগবান ॥'

উল্লেখযোগ্য এই, বল্লভ ভাগবত পুরাণের উপর তাঁর ভাষ্যটি সমাপ্ত করেন নি। বল্লভ সম্প্রদায়ের মতে পুরী থেকে ফিরে বল্লভ ভাগবতভাষ্য রচনা করছিলেন, কিন্তু ভগবান তাঁকে ডেকে নেন [M.C. Parekh : *Sri Vallabhacharya*, pg. 178] তাহ'লে কি বল্লভ তাঁর ভাষ্য নতুন করে লিখছিলেন?

বল্লভ তাঁর সম্প্রদায়ে বালগোপালের উপাসনা প্রবর্তন করেন। বালগোপালই প্রধান উপাস্য দেবতা। রাধারও উপাসনা হয়, তবে ততটা প্রাধান্য দিয়ে নয়। এক্ষেত্রে বল্লভ চৈতন্য কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারেন। বল্লভের পুত্র বিঠ্ঠলনাথের (১৫১৮-১৫৮৮ খ্রীঃ) উপর অবশ্য চৈতন্য প্রভাব সুস্পষ্ট। বিঠ্ঠল নবদ্বীপে ন্যায় পড়েছিলেন। পরে বিঠ্ঠলনাথ রাধার বন্দনাসূচক 'স্বামিনী অষ্টক', 'স্বামিনী স্তোত্র' এবং অন্যান্য স্তোত্র রচনা করেছিলেন। এ ছাড়া, ভক্তরা চৈতন্যকে 'মহাপ্রভু' এবং চৈতন্য পার্ষদদের 'গোস্বামী' ব'লে অভিহিত করতেন: অনুমান করা যায়, তাঁদের দেখাদেখি বল্লভ সম্প্রদায়ে বল্লভ ও বিঠ্ঠলকে যথাক্রমে মহাপ্রভু ও গোসাঁইজী বলার রীতি প্রচলিত হয় [তদেব : পৃ. ২৮৪-৮৬]।

বল্লভ সম্প্রদায় ১৫৭৩ খ্রীস্টাব্দে বৃন্দাবনে শ্রীনাথজীর মন্দির জোর ক'রে দখল ক'রে নিলে বল্লভ সম্প্রদায় ও চৈতন্য সম্প্রদায়ের সৌহার্দ্যে ফাটল ধরে। এই মন্দিরের সেবার ভার ছিল বাঙ্গালীদের উপর। উপরোক্ত ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন বিঠ্ঠলনাথের চতুর্থ পুত্র গোকুলনাথ, তাঁর চৌরাশী 'বৈষ্ণবোঁ কি বার্তা' গ্রন্থে [পৃ. ৩১৪-২০, বম্বে সংস্করণ, ১৯৫৮] এই বিবরণে দেখা যায় এই ঘটনার সময় রূপ সনাতন জীবিত ছিলেন এবং তাঁরা এই জুলুমের প্রতিবাদ করেছিলেন। সম্ভবতঃ মাধবেন্দ্রপুরী এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং পৌরোহিত্যে নিয়োগ করেছিলেন বাঙ্গালীদের। [চৈ. চ.: মধ্য/৪/৩৪-১০২]। 'চৌরাশী বৈষ্ণবোঁ কি বার্তা'য় বলা হয়েছে 'ঔর প্রথম সেবা শ্রীনাথজীকী বঙ্গালী করতে' [পৃ. ৩১৪]। এই গ্রন্থেই জানানো হয়েছে যে, বল্লভ এই বিগ্রহের সজ্জা হিসেবে হীরের অলংকার উপহার দিয়েছিলেন। একে চৈতন্যের প্রতি বল্লভের অনুরাগের নিদর্শন রূপে গ্রহণ করলে বোধহয় ভুল হবে না।

খুব সম্ভব, কৃষ্ণদাস কবিরাজ বল্লভ সম্প্রদায়ের শ্রীনাথজীর মন্দির জবর দখল ব্যাপারটি নিজের চোখেই দেখেছিলেন। চৈতন্য চরিতামৃতে বল্লভকে একবারও বল্লভাচার্য্য বলা হয় নি, বলা হয়েছে বল্লভ ভট্ট; এবং অন্যতম বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গুরু হিসেবে বল্লভের ভূমিকার কথা একবারও বলা হয় নি; এর মূলে সম্ভবতঃ ওই ঘটনা।

উত্তরকালের বৈষ্ণব সমাজ কিভাবে চৈতন্য-শিক্ষা বিস্মৃত হয়েছেন এবং চৈতন্যপন্থা থেকে দূরে সরে এসেছেন, তার একটি দৃষ্টান্তস্থল জাতিভেদ প্রসঙ্গ।

ঈশ্বরাংশ জীবকে যারা 'পতিত' ক'রে রাখতে চায়, তারা অসুরযোনি, অশুভকারী নরাধম—গীতায় (১৬ / ১৯) একথা বলা হয়েছে। গীতার পঞ্চম অধ্যায়ে (১৮, ১৯ শ্লোকে) বলা হয়েছে—পণ্ডিতেরা বিদ্যাবিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুক্কুর, চণ্ডাল সকলকেই তুল্যরূপ দেখেন। এইরূপ যাঁদের অন্তঃকরণ সর্বত্র সমভাবে অবস্থান করে, তারা ইহলোকেই স্বর্গলাভ করেন। নির্দোষ ব্রহ্ম সর্বত্র তুল্যভাবে আছেন, সুতরাং সমদর্শীরাও ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়ে থাকেন (ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ)। ভাগবতে এই একই উপলব্ধির সভক্তি প্রকাশ—ভগবান জীবরূপ অংশে সকল দেহেই প্রবিষ্ট রয়েছেন—এই ভেবে কুকুর, চণ্ডাল, গো এবং গর্দভ সকলকেই ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করবেন। ভক্তিবাদে এই সমদর্শিতাই পরিস্ফুট হয়েছে। শাণ্ডিল্য বলেছেন—'নিন্দিত জাতিরও ভক্তিসাধনায় অধিকার আছে—'আনিন্দ্য যোন্যধিক্রিয়তে' [শাণ্ডিল্যসূত্রম্ ২/৭৮]

নারদীয় ভক্তিসূত্রে বলা হয়েছে—ভক্তদের জাতি-বিদ্যা-রূপ-কুল-ধন-ক্রিয়াগত কোন ভেদ গণ্য নয়—'নাস্তি তেষু জাতিবিদ্যারূপকুলধনক্রিয়াদিভেদঃ। এই ভক্তিমার্গেরই পথিক মাধবেন্দ্র-অদ্বৈত-শ্রীচৈতন্য [সূত্র ৭২]।

প্রেমভক্তিবাদ তথা বৈষ্ণবদর্শনে স্বীকৃত হয়েছে, বিশ্বজগৎ এক আনন্দরসের অভিব্যক্তি, জীবপ্রকৃতির গভীরে আছে পরমতত্ত্বের আনন্দময়ী শক্তি হ্লাদিনীর চিৎকণ প্রকাশ, জীব সেই আনন্দময়ী লীলার শরীক—তাকে গোত্রবর্ণ জাতির গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখা মূঢ়তা, উচ্চনীচ ভেদ আরোপের চেষ্টাও ধৃষ্টতা। সুতরাং, দেখা যায়, বৈষ্ণব দর্শনের মূলেই আছে বর্ণাশ্রমধর্মের বিরোধিতা।

এই কারণেই ঈশ্বরপুরী লিখেছেন, "বেদ শিরোধার্য করে ব্রহ্মামৃত এবং কবিত্বের প্রশংসা যাঁরা করেন করুন, আমরা কিন্তু আশ্রয় নিয়েছি সেই বংশীধারীর—যাঁর কানে গুঞ্জাফুলের কর্ণভূষা।—

রসং প্রশংসন্তু কবিত্বনিষ্ঠা ব্রহ্মামৃতং বেদশিরোনিবিষ্টাঃ।
বয়ন্তু গুঞ্জাকলিতাবতংসং গৃহীতবংশং কমপি শ্রয়ামঃ" ॥ [পদ্যাবলী]

বৈষ্ণবীয় দৃষ্টিতে বেদবিহিত ধর্মাচার তথা বর্ণাশ্রম অস্বীকৃত হয়েছিল বলেই ঈশ্বরপুরী একথা বলেছেন। এবং লক্ষ্য করতে হবে, 'গুঞ্জাকলিতাবতংস' ও 'গৃহীতবংশ' যিনি, তিনি লৌকিক দৃষ্টিতে গোপনন্দন।

মাধবেন্দ্রপুরীর তিন শিষ্য—ঈশ্বরপুরী, কেশব ভারতী ও অদ্বৈত আচার্যের প্রভাব শ্রীচৈতন্য চরিত্রে লক্ষণীয়। ঈশ্বরপুরী তাঁকে দিলেন কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষা, কেশব ভারতী দিলেন সন্ন্যাসে দীক্ষা; অদ্বৈত আচার্য ভক্তিমার্গের সামাজিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলেন তাঁর কাছে।—

'অদ্বৈত বোলেন, "যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রী-শূদ্র আদি যত মূর্খেরে সে দিবা ॥
বিদ্যাধন কুল আদি তপস্যার বাদে।
তোর ভক্ত, তোর ভক্তি যে যে জনে বাধে ॥
সে পাপিষ্ঠ-সব দেখি মরুক পুড়িয়া।
চণ্ডাল নাচুক তোর নাম গুণ গায়্যা ॥"

[চৈ. ভা.: মধ্যখণ্ড/ষষ্ঠ অধ্যায়]

সন্ন্যাসদীক্ষার মধ্য দিয়ে শ্রীচৈতন্য সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছাতে চেয়েছেন। বর্ণাশ্রমের চিহ্ন শিখাসূত্র সে পথে বাধার সৃষ্টি করবে জেনে তিনি সেগুলি ত্যাগ করলেন।—

মুকুন্দেরে ডাক দিয়া বলিলা বচন।
দণ্ড কমণ্ডলু আমি করিব গ্রহণ ॥
শিখা সূত্র ত্যাগ করি সন্ন্যাস লইব।
তাহা না করিলে কিসে জীব উদ্ধারিব ॥

[গোবিন্দের করচা: পৃ. ৬]

জগত উদ্ধার যদি চাহ করিবারে।
ইহাতে নিষেধ নাহি করিবে আমারে ॥

[চৈ. ভা. : মধ্যখণ্ড/ ২৫ অ:]

যে-কালে বর্ণাভিমানী শিখাসূত্রধারী ব্যক্তিরা শূদ্রের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলতেন, সেকালেই সন্ন্যাসীর আদর্শ ছিল ভিন্নতর। মহানির্বাণ তন্ত্রে (অষ্টমোল্লাসে) বলা হয়েছে, সন্ন্যাসী হবেন কীটে নরে দেবতায় সমদৃষ্টি, সব কিছুই তাঁর কাছে ব্রহ্ম স্বরূপ। বিপ্রের অন্ন তিনি নির্বিচারে গ্রহণ করবেন—

'সৰ্ব্বত্র সমদৃষ্টিঃ স্যাৎ কীটে দেবে তথা নরে।
সৰ্ব্বং ব্রহ্মেতি জানীয়াৎ পরিব্রাট্ সৰ্ব্বকর্মসু ॥
বিপ্রান্নং শ্বপচান্নং বা যস্মাৎ তস্মাৎ সমাগতম্।
দেশং কালং তথা চান্নমশ্নীয়াদবিচারয়ন্ ॥

এ দেশে এ রীতি অতি প্রাচীন। মৌর্যযুগেও সন্ন্যাসীর এই আদর্শ লক্ষ্য করেছিলেন মেগাস্থিনিস। রাধাকুমুদ মুখার্জী লিখেছেন—"**Arrian mentions the singular fact that 'the Sophists (or Philosophers) could be from any caste,' showing that the life of a Sannyasi was open to all castes and that there was no caste in the life spiritual.** (***Ancient India. pg. 157***)**.**

শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসী হলেও 'সোহহংবাদী' সন্ন্যাসী ছিলেন না; তিনি ছিলেন বৈষ্ণব সন্ন্যাসী অর্থাৎ লীলাবাদী—গোপীনাথের চরণকমলের দাসানুদাস; এই কারণে তত্ত্বমুখে তিনি বর্ণাশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে চতুরাশ্রমে ভক্তাশ্রমকে স্থাপন করেছেন। এর পরিচয় আছে তাঁর রচিত এই শ্লোকটিতে—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল পরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্ধে—
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ ॥

[কর্ণপূর কাব্য ১৬/৭ ; চৈতন্যচরিতামৃত মধ্য/১৩/৮০ ; জয়ানন্দ, সন্ন্যাস-১]

এই হল বৈষ্ণব ধর্মের চিরন্তন আদর্শ — জাতি পরিচয়ে তুমি ব্রাহ্মণই হও, শূদ্রই হও, বৈষ্ণব হলেই তুমি 'দাস'—শ্রীহরির দাস : 'হরিকৃষ্ণোপাসকা লোকা দাসান্তে পরিকীর্ত্তিতা' [পাদ্ম উত্তরখণ্ড, ৯৯ অধ্যায়]।

এই 'হরিদাস' হওয়ার পথে কারো কোন বাধা ছিল না। হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ—সকল ভেদ ছাপিয়ে এলো কৃষ্ণপ্রেমের বন্যা। বৈষ্ণবধর্ম সমাজে প্রতিষ্ঠা করল সর্ব মানবের মিলন ক্ষেত্র। মহাপ্রভুর শিষ্যবর্গ বর্ণাশ্রম-শাসিত সমাজে এই মিলনের ও জড়ত্ব মুক্তির আদর্শ তুলে ধরলেন।

অদ্বৈত আচার্য যখন হরিদাসকে সঙ্গে নিয়ে ভিক্ষা নির্বাহ করতেন এবং কৃষ্ণকথায় কালযাপন করতেন। হরিদাস সংকোচ প্রকাশ করে বলেন—

মহা-মহা-বিপ্র এথা কুলীন সমাজ ! আমারে আদর কর, না বাসহ লাজ !'
তখন 'আচার্য' কহেন,— "তুমি না করিহ ভয় ।
সেই আচরিব, যেই শাস্ত্রমত হয় ।।
তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন ।"
এত বলি' শ্রাদ্ধ-পাত্র করাইলা ভোজন ।। [চৈ. চ. : অন্ত্য/৩]

হরিদাস ঠাকুরের জাতিকুলানপেক্ষ বৈষ্ণবাচার সেকালের হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজকেই প্রবল নাড়া দিয়েছিল। 'যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার' এই কারণে কাজীর বিচারে শেষ পর্যন্ত হরিদাসকে বাইশ বাজারে নিয়ে চাবুকের ঘা মারা হয়েছিল। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের প্রতিক্রিয়া—'দুর্জন ব্রাহ্মণের মুখে ব্যক্ত হয়েছে—

দরশন-কর্তা এবে হৈল হরিদাস । কালে কালে বেদপথ হয় দেখি নাশ ।।
যুগ শেষে শূদ্রে বেদ করিব ব্যাখ্যানে । এখনেই তাহা দেখি শেষে আর কেনে ।।
[চৈ. ভা. : আদি/১১]

দক্ষিণ ভারতেও জাতিভেদকে অগ্রাহ্য করে এবং ভক্তিবাদের উপর ভিত্তি করে নতুন সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন চৈতন্যদেব। তামিল তেলুগু কানাড়ী মালয়ালম ভাষায় রচিত বৈষ্ণব গীতির ভাব প্রেরণার মূলে যেমন ছিলেন মধ্বাচার্য ও ব্যাসরায়, তেমনই ছিলেন শ্রীচৈতন্য। ঐতিহাসিক নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী লিখেছেন—"**These singers got their inspiration from Madhvācārya and Vyāsarāya and the visit of Chaitanyā to the South in 1510 did much to stimulate the growth of this popular type of song.**" [***A History of South India* : *p. 393***]

Charles E. Gover দক্ষিণ ভারতের লোকগীতি সংকলন ***The Folk Songs of Southern India*** গ্রন্থে (১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত) 'বেমন' কবির রচিত একটি পদের অনুবাদ দিয়েছেন। এই বেমন কবি সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীর ক' গোভার তাঁর গ্রন্থে (২৬০ পৃ) জানিয়েছেন, "**Mr. C. P. Brown, the greatest of living Telegu scholars, thinks that he (Vemana) lived in the sixteenth century.**" সুতরাং 'বেমনে'র উপর চৈতন্যদেবের প্রভাব পড়া অসম্ভব নয়। তেলুগু ভাষায় রচিত ওই পদটির ইংরেজি অনুবাদ এখানে দেওয়া হল—

If we look through all the earth
Men, we see, have equal birth.
Made in one great brotherhood,
Equal in the sight of God.
Food or caste or place of birth
Cannot alter human worth.
Why let caste be so supreme ? [৪ সংখ্যক পদ]

গ্রন্থের ভূমিকায় গোভার জানিয়েছেন, এই সব গান গ্রামে গ্রামান্তরে গেয়ে বেড়াতেন

'দাস' গায়কেরা। এঁরা লৌকিক বিচারে নীচ বর্ণের হলেও উচ্চ নীচ নির্বিশেষে সকল বর্ণের মানুষের শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হতেন। "No questions of caste entered into the matter.···None dared to despise the 'Slave of God''. [*The Folk Songs of Southern India,* Introduction, XIII-XV]

এই 'দাস' গায়কদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে E. P. Rice তাঁর *A History of Kanarese Literature* গ্রন্থে দাস গায়কদের উপর চৈতন্য-প্রভাব স্মরণ করেছেন— "The worship of Krishna was popularised by songs in ragale metres by Vaishnava dāsas, or mendicant singers, who wandered from village to village. They received their inspiration from Madhvāchārya to whom they all express indebtedness, and from Chaitanya, who, about 1510, visited all the chief shrines of South India, teaching men everywhere to chant the name of Hari"··· [pg. 59]।

এই গ্রন্থেরই অন্যত্র তিনি দক্ষিণ ভারতে জৈন ধর্মের পতনের কারণ আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্য প্রচারিত কৃষ্ণভক্তির বন্যায় ভেসে গিয়েছিল জৈন ধর্মের কঠোর শাস্ত্রাচার :—"And finally, in the sixteenth century, a wave of Vaishnava enthusiasm, inspired by Chaitanya preaching the doctrine of Krishnabhakti, swept over the peninsula, and completed the alienation of the people from the austere teaching of the Jainas [pg. 21]।

প্রেমভক্তির এই বাঁধভাঙা বন্যায় যখন দক্ষিণ ভারত প্লাবিত হল, তখন তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষ যে অনাস্বাদিত এক মুক্তির আনন্দে আত্মহারা হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই; কেননা চৈতন্যদেব তাঁদের দিলেন কঠোর ও দুর্বোধ্য শাস্ত্রাচারের দাসত্বের পরিবর্তে সহজ, স্বাধীন ও আনন্দময় ধর্মজীবন; জাতিভেদজনিত হীনমন্যতা বর্জন ক'রে সমাজে মর্যাদা-সম্পন্ন জীবন যাত্রার সুযোগ পেলেন তাঁরা।

দক্ষিণ ভারতে রামানুজ-প্রমুখ আচার্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মে ব্রাহ্মণ শূদ্রভেদ যথেষ্টই ছিল। এ সম্পর্কে T. Rajagopalāchāri লিখেছেন 'Ramanuja in no place countenences the slightest departure from strict Shastric injunction. He is uncompromising in denying the privilege of Vedic study to Sudras and women ..

"In the South,···the grip of the Shastra and established social rules, was too strong to be shaken by the Brahmin Vaishnavites, and the Sudra followers were generally inferior in importance and never asserted themselves, ··the respect for the Brahmin as Brahmin ··was never forgotten.

[*The Vaishnavite Reformers of India p. 141 143*]

এই পরিবেশে চৈতন্য প্রভাবে যখন বৈষ্ণব 'দাস' গায়কদের উদ্ভব, তখন তাঁদের

অন্যতম লক্ষ্য হল জাতিভেদ বিস্মরণ :—"Their service was, first of all, poverty ; secondly, singing ; thirdly, forgetfullness of caste." সমাজ যে এঁদের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিল, এবং সমাজ জীবনে এঁদের যে একটা সম্মানের আসন গড়ে উঠেছিল, তার প্রমাণ—"At weddings and feasts, at fasts and funerals, at sowing and harvest, at full moon and Sankrānti, the dāsa must be invited, listened to, and rewarded. "Charles E. Gover : [*The Folk Songs of Southern India, Introduction-xiii-xv*]

দক্ষিণ ভারতের সাধারণ মানুষদের উপর চৈতন্যদেবের এই জাতিভেদবিরোধী অভিযানের প্রভাব যে কত ব্যাপক ও গভীর হয়েছিল, সে ইতিহাস আজ প্রায় লুপ্ত। কিন্তু দুটি একটি তথ্য বিস্মরণের মেঘাচ্ছন্ন নভে বিদ্যুৎ চমকের মতো আজও ঝলসে ওঠে। যেমন, দক্ষিণ ভারতের 'সাতানি' সম্প্রদায় আসলে 'চৈতন্য' সম্প্রদায় এবং আজও তারা সেই মূল সূত্র ভুলে যান নি। •

মহীশূর-কুর্গ অঞ্চলে ধর্ম সম্প্রদায় হিসাবে সংখ্যাধিক্যের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থান 'সাতানি' সম্প্রদায়ের। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার প্রকাশিত Imperial Gazetteer-এ বলা হয়েছে যে, 'সাতানি'রা বৈষ্ণব, কৃষ্ণোপাসক এবং চৈতন্যপন্থী। এঁরা নিজেদের বাংলার বৈষ্ণব ব'লে পরিচয় দেন।—

"The Sātāni (22 378) are the most numerous religious sect.... They are votaries of Vishnu, especially in the form of Krishna, and are followers of Chaitanya···They call themselves Vaishnavas, the Baişnabs of Bengal". [*Imperial Gazetter of India*, Mysore & Coorg. : pg 48] বর্তমানে এঁরা শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হন এবং হোলিয়া (Holeya) প্রভৃতি তথাকথিত নিম্নবর্ণের পৌরোহিত্য করেন। বৈষ্ণব মন্দিরগুলিতে এঁরা সাধারণত: পুষ্পচয়ন, মশালবহন ও নগর কীর্তনের কাজে নিযুক্ত থাকেন : "They are regarded as priests by the Holeya and other inferior castes, and themselves have the chiefs of the Sri Vaishnava Brāhmanas and Sannyāsis as their gurus.···As a rule they are engaged in the service of Vaishnava temples, and are flower-gatherers, torch bearers, and strolling musicians". [Ibid.]

সহজেই অনুমান করা যায়, চৈতন্যদেবের অপ্রকটের পর সমাজে বর্ণবিকার আবার যত মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে ততই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ভারতের এক প্রান্তের সঙ্গে আরেক প্রান্তের সেই জাতিকুলহারা দিব্যপ্রেমের যোগসূত্রটি। কিন্তু বিচ্ছিন্ন হলেও সেই সুখস্মৃতি যে বিলুপ্ত হয় নি আজও, এতেই বোঝা যায় দাক্ষিণভারতীয় সমাজে ও সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য কি দিব্যপ্রেরণা সঞ্চার করেছিলেন। তাঁর প্রভাব আজও দিব্যমন্ত্রের মত কাজ করে চলেছে ভারতের সর্বত্র। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে স্বামীজী সারাভারত পর্যটনের ভিত্তিতে বলেছিলেন "The influence of Shri Chaitanya is all over India. ......most of his so-called disciples in Bengal do not know how

his power is still woking all over India."—[*Complete Works of Vivekananda, Vol. IV. : pg. 337*].

চৈতন্যদেবের শিষ্যসম্প্রদায়ে এই জাতিভেদ বিরোধী অভিযান যে অব্যাহত ছিল, নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ প্রভুর জীবন কাহিনীতে তার পরিচয় আছে। 'অব্রাহ্মণ' হয়েও তাঁরা 'ব্রাহ্মণ'দের দীক্ষা দিয়েছেন। হরিদাস দাস সম্পাদিত 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন' গ্রন্থে এ বিষয়ে প্রচুর তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। পৃষ্ঠাঙ্কসহ এই তথ্যগুলি এখানে উদ্ধৃত হলো :

চৈতন্যদেবের পার্ষদ শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য শ্রীনরোত্তম ঠাকুর লৌকিক জাত-বিচারে ছিলেন কায়স্থ ; পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁর জন্ম। তাঁর 'ব্রাহ্মণ' শিষ্যদের মধ্যে আছেন—গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী (৩৮), জগন্নাথ আচার্য (৭৬), দুর্গাদাস বিপ্র (৯০), রাধাকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য (১৭৪), রামকৃষ্ণ আচার্য (১৭৭), রূপনারায়ণ চক্রবর্তী (১৮৯), ললিত ঘোষাল (১৯৩), শঙ্কর ভট্টাচার্য (১৯৬), শিবরাম চক্রবর্ত্তী (১৯৮) হরিদাস শিরোমণি (২২১), হরিরাম আচার্য (২২৩-২২৪) ইত্যাদি।

শ্যামানন্দ প্রভু প্রাকৃত দৃষ্টিতে ছিলেন সদ্‌গোপ। ইনি চৈতন্যদেবের পার্ষদ শ্রীহৃদয়-চৈতন্যের শিষ্য। ১৪৫৬ শকে এঁর জন্ম। বৃন্দাবনে শ্রীজীবগোস্বামীর আশ্রয়ে ভক্তি-শাস্ত্র অধ্যয়ন ও সাধন ভজন করেন। শেষ জীবনে উৎকল দেশের 'নৃসিংহপুর' গ্রামে অবস্থান করে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। ইনি বহু মুসলমানকে শিষ্য করেছিলেন। এঁর 'ব্রাহ্মণ' শিষ্যদের মধ্যে দামোদর যোগী (৮৭), ভঞ্জন অধিকারী (১৪৪) এবং 'মুসলমান' শিষ্যদের মধ্যে সের খাঁ (বৈষ্ণব নাম শ্রীচৈতন্য দাস-২১৭) উল্লেখযোগ্য।

নরোত্তম ঠাকুর সম্পর্কে সেকালের-'ব্রাহ্মণ' সমাজ 'গেল গেল' রব তুলেছিল—

'কৃষ্ণানন্দ দত্ত-পুত্র নরোত্তম দাস। ব্রাহ্মণেরে মন্ত্র দিয়া কৈল সর্বনাশ ॥
বুঝি এতদিনে ঘোর কলি উপস্থিত। শূদ্রের ব্রাহ্মণ শিষ্য শুনি কাঁপে চিত্ত ॥

[প্রেমবিলাস]

আমরা আগেই দেখেছি চৈতন্যদেবের সময় নবদ্বীপেও বৈষ্ণবদের জাতি নাশা-আচরণে এই ধরনের রব উঠেছিল। নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য রূপচন্দ্র ঘোষণা করেছিলেন—

হৃদে যাঁর ব্রহ্ম আছে, সে হয় ব্রাহ্মণ।
বাহ্যপৈতা কেবল ব্রাহ্মণ জাতির লক্ষণ ॥

[প্রেমবিলাস-গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন : পৃ. ১৯০-১]

এইভাবেই শ্রীচৈতন্য ও তাঁর শিষ্য সম্প্রদায় ভারতীয় সমাজ জীবনে বর্ণাশ্রমধর্মের ব্যভিচারের বিরোধিতা ক'রে দিব্যপ্রেম ও প্রচণ্ড পৌরুষের সমন্বয়ে মানবতার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করলেন।

এর পরবর্তীকালে এই আদর্শের ক্রমিক অবক্ষয় লক্ষ্য করা যায়।

নরোত্তমের সাধনার উত্তরাধিকারী বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী। বিশ্বনাথের শিষ্য বলদেব বিদ্যাভূষণ। বলদেব তাঁর গোবিন্দভাষ্যে বলেছেন ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রাধিকার নেই—শূদ্রস্য নাধিকারঃ তিনি লিখেছেন, শূদ্রাদির মোক্ষ পুরাণাদিশ্রবণজাত জ্ঞান থেকে সম্ভব, কিন্তু ফলের তারতম্য অবশ্যম্ভাবী—"শূদ্রাদীনাং মোক্ষস্তু পুরাণাদি

শ্রবণজ্ঞ জ্ঞানাৎ সম্ভাবিষ্যতি, ফলে তু তারতম্যং ভবতি।" [বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস : প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী : পৃ. ৮৪৫]

অবশ্য বলদেবের মতবাদের দায় চৈতন্য সম্প্রদায়ের উপর চাপানো সঙ্গত কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। কেননা, শ্রীজীব গোস্বামী ও বলদেবের সিদ্ধান্তে গুরুতর পার্থক্য আছে। "(১)শ্রীজীব প্রভু একই অদ্বয় পরতত্ত্ব হইতেই তাঁহার শক্তিবৈচিত্র্যক্রমে জীব ও প্রকৃতি প্রভৃতির প্রাকট্য স্বীকার করিয়াছেন; বলদেব কিন্তু ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম—এই পঞ্চতত্ত্বের উল্লেখ করত গোবিন্দ ভাষ্যের প্রারম্ভে ইহাদের মধ্যে অন্ত্য চারিটীকে ব্রহ্মেরই শক্তি বলিয়া 'শক্তিমদ্ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয়ই'—একথাও বলিয়াছেন। (২) শ্রীজীবপাদ জীবকে তটস্থা শক্তি বলিয়াছেন, কিন্তু বলদেব মধ্ব মতানুসারে জীবকে 'বিভিন্নাংশ' বলিয়া উল্লেখ করিলেও (গো. ভা. ২।৩।৪৭) তটস্থা শক্তি বলেন নাই। (৩) শ্রীজীবপ্রভু শক্তিসিদ্ধান্তের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ সুষ্ঠু স্থাপন করিয়াছেন, বলদেব কিন্তু একমাত্র 'বিশেষ' শব্দ ব্যবহার করত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ কিছুই বলেন নাই।" [গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান : হরিদাস দাস পৃ. : ১৫০৭-৮]।

কিন্তু বলদেবের সমকালে গৌড়ী বৈষ্ণব সমাজে বর্ণবিকার যে ধীরে ধীরে মুখব্যাদান করছিল, তাতে সন্দেহ নেই। এরই পরিণতি বর্তমান কালে বৈষ্ণব ভক্তদের মধ্যে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ-ভেদবিচারের প্রবণতা।

অশোক কুমার মজুমদার তাঁর *Chaitanya : His Life and Doctrine* গ্রন্থে জানিয়েছেন, যদিও স্বয়ং চৈতন্যদেব কায়স্থ রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে তাঁর নিজের অর্চিত শালগ্রাম দিয়েছিলেন, বর্তমানে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে আচরণ ভিন্নরূপ দেখা যায়। নারী ও অব্রাহ্মণদের শালগ্রাম পূজা করতে দেওয়া হয় না।

'শ্রীগৌরাঙ্গসেবক' পত্রিকার ১৩৩৪ সনের আষাঢ় সংখ্যায় জানানো হয়েছে—'গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী'র পঞ্চদশ বার্ষিক উৎসবে একটি বৈষ্ণব প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। প্রদর্শনীতে বৈষ্ণব গ্রন্থ বিভাগে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (১৮২৪ খ্রী:) 'শ্রীমদ্ভাগবত'ও প্রদর্শিত হয়েছিল। এই খবর দিয়ে ওই ভাগবত সম্পর্কে জানানো হয়েছে, "এইখানির বিশেষত্ব, ইহার ছাপা, কম্পোজ, তুলট কাগজ তৈয়ারী বাঁধাই, প্রভৃতি সমুদায় কার্য ব্রাহ্মণ দ্বারা সমাধা হইয়াছিল" (পৃ. ৫৬০)। যে ভাগবতে বলা হয়েছে 'ন মে ভক্তশ্চতুর্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ', সেই ভাগবতের এই 'পবিত্র সংস্করণ'-এর খবর নিঃসন্দেহে কৌতুকজনক। এবং শ্রীচৈতন্যের আদর্শ থেকে বৈষ্ণব সমাজ যে কি পরিমাণে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে, এটি তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। যে-চৈতন্য দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন 'মোর জাতি, মোর সেবকের জাতি—নাই', কোন সম্প্রদায় যদি সেই জাতিভেদ আবার আঁকড়ে ধরতে চায়, তাহলে সে সম্প্রদায়কে আর যা-ই হোক, চৈতন্য অনুগামী বলা চলে না।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে এই হল ভাঁটার টান। সম্প্রদায়ের বাইরে বৃহত্তর যে জন সমষ্টি সেখানে কিন্তু চৈতন্য শিক্ষার বিস্মরণ ঘটে নি। সেখানে লক্ষ্য করা যায় জনমানসে শ্রীচৈতন্যের চির অম্লান অনুপ্রেরণা।

তিনি কেবল শচীর দুলাল নন, 'বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া' তিনি কায়া ধারণ করেছেন। বাঙালী মায়ের চোখের জলে নিমাই সন্ন্যাস আজও অভিষিক্ত—লোকগীতির সুরে বাংলার আকাশ বাতাস আজও মথিত হয় -

এ কূলেতে কাঁদে শচী 'নিমাই, নিমাই রে',
ও কূল কাঁদিয়া কহে 'নাই, নাই, নাই রে'।

বাঙালীর বাৎসল্যের একটা বড় আশ্রয় নিমাই। বাঙালীর তার্কিকতায় পাণ্ডিত্যে হৃদয়বত্তায়, তার নৃত্যপারদর্শিতায়, অভিনয় প্রিয়তায়, সাহিত্য প্রীতিতে, সংগীতানুরাগে, তার ভাব বিহ্বলতায়, সাংগঠনিক প্রয়াসে, আত্মলীন সাধনায়, সমন্বয়মুখিনতায় এবং তার সমাজ সচেতন মানবিকতায় চৈতন্য প্রেরণা আজও জীবন্ত; বাঙালী তাঁরই উত্তরাধিকারে ধনী।

তাঁর প্রভাব ব্রাহ্মণ্য শাসিত সমাজে ভাঙন এনে বর্ণাশ্রম-বিধানের-ব্যভিচার থেকে মানুষকে মুক্তি দিয়ে তাকে সামাজিক সম্মানই দেয়নি, তার অন্তর্নিহিত দেবত্বেরও সন্ধান দিয়েছে; তাই বুঝি বাংলার প্রত্যন্ত প্রদেশের লোকজীবনে এবং অবর্ণাচারী আদিবাসীদের মধ্যেও তাঁর পবিত্র স্মৃতি আজও উজ্জ্বল। বিপিনচন্দ্র পালের ভাষায়— "Outside the Hindu communion, the Mahaprabhu's message proselytised entire non-Hindu clans by initiating them in the name of the Lord,···We thus find the whole clan of the Manipuris in north eastern India becoming Vaishnavas of the school of Shree Chaitanya Mahaprabhu. [*Bengal Vaishnavism* : *p. 103*] নৃতাত্ত্বিক নির্মলকুমার বসু জানিয়েছেন—"মহানদীর উত্তরভাগে ঢেংকানাল, পাল লহড়া এবং কেওনঝর নামে তিনটি ক্ষুদ্র রাজ্য···এই তিন রাজ্যে জুয়াঙ্গ নামে এক জাতি বাস করে। পাল লহড়াতে এখন পর্যন্ত জুয়াঙ্গদের মধ্যে একটি বিচিত্র ব্রত প্রচলিত আছে। বৎসরের মধ্যে কোনো একদিন জুয়াঙ্গগণ পাতার ঠোঙায় কিছু ফল সাজাইয়া বনের মধ্যে রাখিয়া আসে। মহাপ্রভু নাকি এক সময়ে ইহাদের নিকটে ফল ভিক্ষা করিয়াছিলেন; সেই প্রাচীন ঘটনার স্মৃতি আজও জুয়াঙ্গ জাতি এই ভাবে বহন করিয়া আসিতেছে ["হিন্দু সমাজের গড়ন', প্রথম অধ্যায় : পৃ. ৬]। চৈতন্যপ্রেরণা এইভাবে সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে লোকজীবনকে আশ্রয় ক'রে কালজয়ী হয়ে আছে।

বঙ্গদেশে তথা সমগ্র ভারতবর্ষে নবজাগরণের দুটি বড় ঢেউ এসেছিল—একটি মধ্যযুগে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের প্রায় সমান্তরালে, অপরটি উনিশ শতকে, য়ুরোপীয় শিক্ষাসংস্কৃতির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে।

মধ্যযুগের বাংলায় ও ভারতে ওই জাগরণের জোয়ার এসেছিল ভক্তিবাদকে আশ্রয় করে এবং উনিশ শতকের জাগরণের ভিত্তি ছিল যুক্তিবাদ। অবশ্য ভেবে দেখলে দেখা যায়, নিমাইয়ের ভক্তিবাদ যে মানবতাভিত্তিক হতে পেরেছিল, তার মূলে ছিল বাস্তব পারিপার্শ্বিক বিশ্লেষণ ক্ষমতা তথা যুক্তিবাদ। পক্ষান্তরে উনিশ শতকের রেনেসাঁসের মূলে যে যুক্তিবাদ তা-ও আবার ভক্তিবাদকে বর্জন করে নি। রেনেসাঁসের অন্যতম ধারা হল পুরাতনের নব মূল্যায়ন। উনিশ শতকের জাগরণে ধর্মীয় ঐতিহ্যের অনুসৃতি হয়েছে এই পথে। একালের মনীষী যাঁরা জাতির চৈতন্য বিকাশের ক্ষেত্রে

কাজ করেছেন, সকলেই ধরেছেন সমগ্র মানুষকে—তার শিক্ষা স্বাস্থ্য রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মকেও তাঁরা বাদ দেন নি। উনিশ শতকের রাজনীতির সঙ্গে এ কালের রাজনীতির চরিত্রগত পার্থক্য এখানেই। সেকালের জননায়ক বিপিন পালের ভাষায়, "রাষ্ট্র, সমাজ, শিল্প, সাহিত্য—বিশাল ও জটিল মানবজীবনের সকল বিভাগের সকল কর্মকে পূর্ণ করিয়াই এই বিশ্বজনীন সনাতন ধর্ম আপনার সিদ্ধিলাভ করে।" এই কারণেই উনিশ শতকের মনীষীরা একদিকে যুক্তিবাদী অপরদিকে ভক্তিবাদী। অবশ্য তাঁদের ভক্তিবাদে ভারতীয় ঐতিহ্যের ইতিবাচক দিকটাই গৃহীত হয়েছিল। আবার ভক্তিতে বা যুক্তিতে, জাতীয় জীবনের সঙ্গে জড়িত নানা বিচিত্র প্রসঙ্গে তাঁরা চৈতন্যকে এবং চৈতন্যের জীবন কর্মকে স্মরণ করেছেন। ধর্মে সাহিত্যে সঙ্গীতচিন্তায় সমাজ সংস্কারে এমন কি রাজনীতিক্ষেত্রেও তাঁরা চৈতন্যের জীবন কর্মের উল্লেখ ও বিচার বিশ্লেষণ ক'রে তাঁদের সমকালীন প্রয়োজন মিটিয়েছেন।

চৈতন্য আবির্ভাবের পর থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর জীবন কর্মের প্রভাব না পড়েছে এমন কোন কাল নেই।

ষোড়শ শতকের শেষার্ধে রচিত কবিকঙ্কন চণ্ডীতে যে মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ও সমন্বয়ী ধর্মবোধ প্রকাশ পেয়েছে, তার প্রেরণামূল যে কোথায়, তার স্পষ্ট আভাস মেলে কবিকঙ্কন-কৃত চৈতন্যবন্দনায়। ষোড়শ সপ্তদশ শতকে ওড়িয়া সাহিত্যে শূন্যবাদ ও যোগসাধনার সঙ্গে মিশে গেল চৈতন্য প্রচারিত প্রেমভক্তিবাদ। সপ্তদশ-অষ্টাদশ-উনিশ শতকে এই সমন্বয়ী প্রেমধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা গেল বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবিদের গৌরাঙ্গ-পদাবলী রচনায়, বিশেষতঃ লালন ফকিরের জাতিভেদকে ব্যঙ্গ করে লেখা গানে।

এই সমন্বয়ের সাধনপথেই পর পর এলেন রামঃ রামশ্চ রামশ্চ—রামপ্রসাদ, রামমোহন ও রামকৃষ্ণ। রামপ্রসাদ শাক্তবৈষ্ণব দ্বন্দ্বকে নস্যাৎ ক'রে গাইলেন—'কালী হলি মা রাসবিহারী নটবর বেশে বৃন্দাবনে।' রামমোহন সমস্ত ধর্ম সম্প্রদায়কে বসালেন এক বেদীতে, রামকৃষ্ণ সর্বধর্ম সমন্বয় ক'রে বললেন 'যত মত তত পথ।'

সুতরাং ষোড়শে যিনি, উনিশেও তিনি—দুটি রেনেসাঁসেরই সংযোগসেতু চৈতন্য; আবার দুটি রেনেসাঁসের আধেয় বস্তুরও অনেকখানি জুড়ে আছেন তিনি।

যাঁরা উনিশ শতকের রেনেসাঁসকে য়ুরোপীয় জাহাজে আমদানী করা বিশুদ্ধ বিদেশী সামগ্রী ব'লে মনে করেন, তাঁরা ভুলে যান, এভাবে কোন জাতির চিত্তজাগরণ হয় না। যে-গাছের গোড়াটাই নেই, হাজার বারিবর্ষণেও তার কোন কল্যাণ হয় না। য়ুরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির বারিবর্ষণও নিষ্ফল হতো, যদি আমাদের ঐতিহ্যের গোড়াটা না থাকতো। চৈতন্য প্রবর্তিত মানবিক আন্দোলন আমাদের ওই ঐতিহ্য মূল। উনিশ শতকের মনীষীদের এই ঐতিহ্যাশ্রয় তাঁদের পশ্চাদ্‌গামিতা নয়, বরং বলা যায় বাদ (থিসিস্) প্রতিবাদ (অ্যান্টি থিসিস্)-এর পরবর্তীস্তরে ঈপ্সিত সম্‌বাদ (সিন্‌থেসিস্); যেমন বিপিনচন্দ্র পাল বলেছেন—"ইংরাজী পড়িয়া য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সাধনার সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের অন্তরে পুরুষানুক্রমাগত বৈদান্তিক মায়াবাদের ভাবটা স্বল্পবিস্তর নষ্ট হইয়া যায়। ইংরাজী পড়িয়া আমরা সমাজদ্রোহী হইয়া উঠিলাম। এইরূপে ইংরাজী শিক্ষার আশ্রয়ে য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সাধনার প্রেরণাতেই বিদেশীয় ভাব ও আদর্শ আমাদের চিত্তে যে সকল দুরূহ জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করিয়াছিল, তারই মীমাংসার সন্ধানে যাইয়া আমরা এই বৈষ্ণবতত্ত্বের ও বৈষ্ণব সাধনার খোঁজ পাইয়াছি।"

অথচ উনিশ শতকের রেনেসাঁসের প্রাণপুরুষ রামমোহন চৈতন্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব। বিদ্যাসাগরও তথৈব—'নদীয়ার' চাঁদ' সম্পর্কে মাত্র দুটি ছত্র পাওয়া যায় বিদ্যাসাগর রচনাবলীতে। তবু একথা অনস্বীকার্য যে রামমোহন বিদ্যাসাগর যে-কাজ করেছিলেন উনিশ শতকে, ষোড়শ শতকে সেই কর্মচিন্তার প্রবর্তক চৈতন্য।

এই অনীহার কারণ সম্ভবত সমকালীন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একাংশের কার্যকলাপ যার পরিচয় মেলে কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোম প্যাঁচার নক্সায় :

"হিন্দুধর্মের বাপের পুণ্যে ফাঁকি দে খাবার যত ফিকির আছে, গোঁসাইগিরি সকলের টেক্কা।... গোঁসাইরা স্বয়ং কেষ্ট ভগবান বলেই অনেক দুর্লভ বস্তু অক্লেশে ঘরে বসে পান ও কালিয়দমন, পুতনাবধ, গোবর্ধনধারণ প্রভৃতি কটা বাজে কাজ ছাড়া বস্ত্রহরণ, মানভঞ্জন, ব্রজবিহার প্রভৃতি গোছালো গোছালো লীলেগুলি করে থাকেন।"

রামমোহনের লোকান্তরের ৩০ বছর পরে (১৮৬২-৬৩)-এ লেখা। স্বয়ং রামকৃষ্ণ নিত্যানন্দপুত্র বীরভদ্রের বারশো নেড়া বারশো নেড়ী আর একশো সেবাদাসীর গল্প শুনিয়ে বলেছেন, 'চৈতন্যদেব অবতার। তিনি যা ক'রে গেলেন, তারই কি রয়েছে বল দেখি?' স্বামী বিবেকানন্দ অধিকারী-অনধিকারী-নির্বিশেষে সর্বসাধারণের মধ্যে রাধাভাব সাধনার বিষময় পরিণতি সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা করেছেন।

অবশ্য বিকার সর্বদা বিকার-ই। বিকৃত শবদেহ দিয়ে জীবন্তদেহের বিচার চলে না। বৈরাগী-বৈরাগিনীদের সম্পর্কে উইলিয়াম হাণ্টার ১৮৭১ সালে যে কথা বলেছেন, তাতে আবার বোঝা যায়, অনাচার ব্যভিচার থাকলেও, তা সেকালের বৈষ্ণব সমাজকে সম্পূর্ণ গ্রাস করতে পারে নি। মন্দের পাশাপাশি ভালোও ছিল। নারীশিক্ষা বিস্তারে বৈষ্ণবীদের অগ্রণী ভূমিকার প্রশংসা ক'রে হাণ্টার লিখেছেন—"**For long they were the only teachers admitted into the zananas of good families in Bengal. Sixty years ago they had already effected a change for the better in the state of female education." (ORISSA-Vol 1.)**

উনিশ শতকের সাতের দশকের গোড়া থেকে সমাজের সর্বক্ষেত্রে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় ইতিবাচক আন্দোলন দেখা দিল। এর নেতৃত্বে ছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। তাঁর নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজের বেদী থেকে জাতিভেদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষিত হলো। অদ্বৈত আচার্যের বংশধর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মণরা উপবীত ত্যাগ করতে লাগলেন। শ্রমজীবী সাধারণ মানুষদের চেতনা জাগ্রত করার জন্য নৈশ বিদ্যালয়, শ্রমিক ক্লাব, অন্ন ব্যাংক ইত্যাদি বহুমুখী কর্মসূচী গৃহীত হলো। ১৮৭০ সালে কেশব সেনের 'সুলভ-সমাচার' পত্রিকায় তথাকথিত ছোটলোক শ্রমিক মজুর চাষীদের সংঘবদ্ধ হয়ে ধনীদের অত্যাচার-প্রতিরোধের ডাক দিলেন কেশব। এইসব কাজে কেশবের ডানহাত শশিপদ ব্যানার্জি (১৮৭৪ সালে ভারতের প্রথম শ্রমিকবিষয়ক পত্রিকা 'ভারতশ্রমজীবী'র প্রতিষ্ঠাতা) বরানগরের মিলশ্রমিকদের নিয়ে নগর সংকীর্তন বার করলেন।

উনিশ শতকের মানবতাবাদী আন্দোলনে এইভাবে শোনা গেল চৈতন্যের সেই জাতিভেদ বিরোধী ঘোষণা—'মোর জাতি মোর সেবকের জাতি—নাই'। এবং

জনসংহতির ক্ষেত্রে নগর সংকীর্তনের প্রয়োগেও জয়ী হলো চৈতন্যপন্থা—'সর্বনবদ্বীপে আজি কারিমু কীর্তন। দেখোঁ মোরে কোন্ কর্ম করে কোন্ জন'।

কেশবচন্দ্র সেনের সমকালে (১৮৭১ সালে) নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'সুরধুনী' কাব্যে লিখেছেন—

পরম পবিত্র আত্মা ভারত তপন।
মধুর গৌরাঙ্গ প্রভু সোনার বরণ॥…
দেবতা সমান তিনি লোকাতীত মতি;
বিরাজিতা রসনায় সদা সরস্বতী,…
উঠালেন জাতিভেদ ভ্রম বিড়ম্বনা,
পুত্তলিকা পূজা আর শিবজ্ঞ উপাসনা।

১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী কলকাতার ছাত্রসভায় শ্রীচৈতন্যের সমাজ বিপ্লব বিষয়ে বক্তৃতা করলেন। এই সভায় উপস্থিত ছাত্র পরবর্তীকালের জননেতা বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন—"ধর্মোপদেষ্টা না হইয়াও সুরেন্দ্রনাথ আপনার রাষ্ট্রীয় আদর্শ প্রচারে ধর্মের উপরেই যে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত—ইতিহাসের এই সত্যটা উজ্জ্বল করিয়া আমাদের সমক্ষে ধরিয়াছিলেন।"

এই সময় হিন্দু মেলার কাজকর্ম, ভারতসভার প্রতিষ্ঠা এবং বঙ্কিমচন্দ্র-সুরেন্দ্রনাথের জাতীয়তার মন্ত্র প্রচার ক্রমশঃই শিক্ষিত যুবকদের বেশীমাত্রায় আকর্ষণ করতে থাকে। হিন্দুমেলার অন্যতম উদ্যোক্তা রাজনারায়ণ বসু এই সময় (১৮৭৮ খ্রীঃ) বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতায় বাংলা সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের অবদান নির্ণয় করেন এবং চৈতন্যের চরিত্র মহিমা প্রসঙ্গে বলেন, "ধর্ম সংস্কার সম্বন্ধীয় যে সকল কার্য্য এই ঊনবিংশ শতাব্দীর কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা সম্পাদন করিতে ভীত হয়েন, চৈতন্য ধর্মোন্মত্ততার সাংক্রামিক গুণ প্রভাবে তাহা কিয়ৎ পরিমাণে সম্পাদন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।"

বঙ্কিমচন্দ্র য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে বাংলার পঞ্চদশ ষোড়শ শতকের রেনেসাঁসের তুলনা ক'রে বললেন—"যেমন মুমূর্ষু রোগী দৈব ঔষধে যৌবনের বলপ্রাপ্ত হয়, ইউরোপের অকস্মাৎ সেইরূপ অভ্যুদয় হইল। আজ পেত্রার্ক, কাল লুথর; আজ গেলিলিও, কাল বেকন; ইউরোপের এইরূপ অকস্মাৎ সৌভাগ্যোচ্ছ্বাস হইল।

'আমাদিগেরও একবার সেই দিন হইয়াছিল। অকস্মাৎ নবদ্বীপে চৈতন্য চন্দ্রোদয়; তারপর রূপ সনাতন প্রভৃতি অসংখ্য কবি, ধর্মতত্ত্ববিৎ, পণ্ডিত। আমাদের এই **Renaissance** কোথা হইতে? কোথা হইতে সহসা এই জাতির এই মানসিক উদ্দীপ্ত হইল, এ রোশনাইয়ে কে কে মশাল ধরিয়াছিল? সকল কথা প্রমাণ কর।"

বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী সমকালীন সমাজ সংস্কার (বিশেষতঃ বিধবা বিবাহ) ও রক্ষণশীল পণ্ডিত সমাজের বিরোধিতার পরিপ্রেক্ষিতে স্মরণ করলেন শ্রীচৈতন্যকে—"নবদ্বীপ, ভাটপাড়া আর বজ্রযোগিনীর পণ্ডিতেরা তাঁদের বোঝাই তূন থেকে শাস্ত্র বচনের চোখা চোখা তীর বা অভিশাপের বজ্র নিক্ষেপ করতে পারেন, তাতে কালের অগ্রগতিকে রোধ করা যাবে না।…ভবিষ্যৎ আমরা জানি না, কিন্তু অতীত আমাদের

নিকট খোলা গ্রন্থের মত। অতীত আমাদের বলছে, সনাতন ধর্মের প্রসিদ্ধ কেন্দ্রে রঘুনন্দন যখন হিন্দু আইন ও স্মৃতিগ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন, তাঁর প্রায় সমকালেই আবির্ভূত হয়েছিলেন বাংলা তথা-ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক প্রেমাবতার চৈতন্য মহাপ্রভু যিনি মানুষে-মানুষে পুরুষে-নারীতে ভেদ তুলে দিয়েছিলেন, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল মুসলমানকে দেখেছিলেন সমচক্ষে এবং নারী সমাজকে মুক্তি দিয়েছিলেন বাধ্যতামূলক বৈধব্যের নিপীড়ন থেকে ["...there rose the greatest reformer that Bengal or India, has ever produced, the prophet of Love (*Bhakti*) Lord Chaitanya, who would have no distinction between man and man, or between man and woman, who treated the Brahmin, the Chandal and the Moslem alike, and enfranchised our women from the bonds of enforced widowhood."—*A Nation in Making*

এইভাবে দেখা যায়, উনিশ শতকের বাঙালী এই শতকের প্রথম ছ'টি দশক ধরে পাশ্চাত্য-শিক্ষা আত্মসাৎ করেছে, তারপর সাতের দশক থেকে সংশ্লেষণী বুদ্ধিতে সে তার সমাজকে পুনর্গঠিত করতে চেয়েছে এবং তখনই সে পরম শ্রদ্ধায় অনুরাগে স্মরণ করেছে শ্রীচৈতন্যকে। চৈতন্য এক প্রবল ইতিবাচক অনিঃশেষ প্রেরণা—এ তারই প্রমাণ। এ প্রেরণা উনিশ পেরিয়ে বিশ শতকেও সমান উজ্জ্বল।

গ্রন্থপঞ্জী

ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্য : নীলকণ্ঠ দাস
ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাস : ড. মায়াধর মানসিংহ
কবীর : প্রভাকর মাচয়ে : সাহিত্য একাদেমী
কাঁহা গেলে তোমা পাই : ড. জয়দেব মুখোপাধ্যায় : ভোলানাথ প্রকাশনী
গম্ভীরা মাহাত্ম্য : হেমাঙ্গপ্রসাদ শাস্ত্রী
গোবিন্দ কর্মকারের করচা (প্রামাণিকতা বিচার) : নির্মল নারায়ণ গুপ্ত : সুবর্ণরেখা,

গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান/গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন : হরিদাস দাস
চৈতন্য চকড়া : বৈষ্ণবচরণ দাস
চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক : কবিকর্ণপুর পরমানন্দ সেন
চৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্য : কবিকর্ণপুর
চৈতন্য ভাগবত : বৈষ্ণবচরণ দাস : ধর্মগ্রন্থ স্টোর্স কটক
চৈতন্যভাগবত : ঈশ্বর দাস
চৈতন্য চরিতামৃত : কৃষ্ণদাস কবিরাজ : ড. সুকুমার সেন সম্পাদিত, সাহিত্য একাদেমী, ১৯৬৩/গৌড়ীয় মঠ সংস্করণ
শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান : ড. বিমানবিহারী মজুমদার : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৯
জগন্নাথ চরিতামৃত : দিবাকর দাস
দাদু : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য : দীনেশচন্দ্র সেন : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সনস্, ১৯২৭
বাঙলীর ইতিহাস : ড. নীহাররঞ্জন রায়
বাঙ্গালার ইতিহাস : রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম) : ড. সুকুমার সেন : মডার্ন বুক এজেন্সী, ১৯৪৮
ভক্ত রুইদাস : মধুসূদন মজুমদার : দেব সাহিত্য কুটীর
ভক্তি রত্নাকর : ঘনশ্যাম দাস
ভারতের সুফি (১ম) : মোবারক করীম জওহর : করুণা প্রকাশনী
মহাপ্রভুর অন্তর্ধান সংক্রান্ত গবেষণা পত্র : অধ্যাপক দীপক মিশ্র
শঙ্করদেব : মহেশ্বর নেওগ : ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া
শ্রীচৈতন্যদেব : সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ : গৌড়ীয় মিশন
শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণ : গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী : ক. বি. ১৯৫৭
শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব : সারদেশানন্দ
শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত : ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য (স) : মডার্ন বুক এজেন্সী, ১৯৮৯

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত : বৃন্দাবনদাস ঠাকুর : বসুমতী সাহিত্য মন্দির

শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল : লোচনদাস ঠাকুর : গৌড়ীয় মিশন, ১৯৭৩/রাধানাথ কাবাসী সম্পাদিত সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল : জয়ানন্দ : ড. বিমানবিহারী মজুমদার ও ড. সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত : এশিয়াটিক সোসাইটি

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর : নরহরি সরকার

শ্রীমদ্ভাগবত : সুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত : দেব সাহিত্য কুটির,

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপলীলা : হরিদাস গোস্বামী : শ্রীকৃষ্ণ জন্মস্থান সেবা সংস্থান

নির্দেশিকা

গ্রন্থ